ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ

দ্বিতীয় খণ্ড

নেপাল মজুমদার

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

Bharate Jatiyata O Antarjatikata
Ebang Rabindranath Vol. II
by
Nepal Majumdar
Rs. 60'00

পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত
প্রথম দে'জ সংস্করণ : ১৯৬৩

দাম : ষাট টাকা

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩
মুদ্রাকর : অশোককুমার ঘোষ, নিউ শশী প্রেস
১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৬

॥ লেখকের কথা ॥

'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই খণ্ডে ১৯১৯ হইতে ১৯২৯ সাল—এই কালের মধ্যে ভারতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চিন্তা-চেতনা ও আন্দোলনের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের রাজনীতিক ও আর্থনীতিক চিন্তার ধারাবাহিক ও বিস্তারিত তথ্য-সম্বলিত ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। সাথে সাথে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, বিপিনচন্দ্র পাল, মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, মহম্মদ আলি, সৌকত আলি, দীনবন্ধু এন্ড্রুজ, সরোজিনী নাইডু, ডাঃ আনসারী, জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ জাতীয় নেতৃবৃন্দের চিন্তা-চেতনার তুলনামূলক পরিচিতিও উপস্থাপিত হইয়াছে। প্রধানত রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর রাজনীতিক ও আর্থনীতিক চিন্তার তুলনামূলক সমালোচনা ও পরিচিতি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা দরকার। ভারতের জাতীয় ও স্বাধীনতা-সংগ্রামে সন্ত্রাসবাসী আন্দোলনের (বিশেষত বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের) ভূমিকা ও অবদানের সঠিক মূল্যায়ন আজও পর্যন্ত হয় নাই। বলা বাহুল্য, উহা ঠিক এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নহে। ভারতের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আন্দোলনের বিভিন্ন দল, গোষ্ঠী ও চিন্তানায়কদের রাজনীতিক-চিন্তার বৈশিষ্ট্যটিই এই গ্রন্থে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে, র‍্যাওলাট আন্দোলন ও জালিয়ানওলাবাগ হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে, খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে, হিন্দু-মুসলমান সমস্যার, খাদি ও চরকা-বিতর্কে, বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্প সম্পর্কে, সমবায় ও কৃষি-সমস্যার, শিক্ষা সংস্কারে, আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনে, সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধ ও ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলনে, স্বরাজ-চিন্তায় ও পূর্ণ-স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীজী ও উপরোক্ত নেতৃবৃন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার স্বাতন্ত্র্য ও সাযুজ্য প্রত্যেক পৃথক পৃথক বক্তব্যের মধ্যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হইয়াছে। তাছাড়া ভারতে আন্তর্জাতিক আন্দোলন ও স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের তথ্য-সম্বলিত ধারাবাহিক ইতিহাস এই খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে। এইকালে রোলাঁ-বারবুস প্রমুখ চিন্তানায়কদের নেতৃত্বে ইউরোপে যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলনের সূচনা হয় এবং রবীন্দ্রনাথ তাহার সহিত যুক্ত ছিলেন,—তাহার কথাও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা। 'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমি 'বিশ্বভারতী'র নিকট হইতে সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করিয়াছি এবং এ'জন্য 'বিশ্বভারতী'র নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ। এই গ্রন্থ প্রণয়নকালে 'বিশ্বভারতী'র উপাচার্য, পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীসুধীরঞ্জন দাস মহাশয়ের নিকট হইতে যথেষ্ট প্রেরণা ও উৎসাহ লাভ করিয়াছি। 'রবীন্দ্রসদন' ও বিশ্বভারতীর 'সেন্ট্রাল লাইব্রেরী'তে এই গ্রন্থের তথ্যাদি সংগ্রহের অনুমতি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিয়া তিনি আমাকে চিরবাধিত করিয়াছেন। এই সুযোগে আমি ব্যক্তিগতভাবেও তাঁহাকে আমার গভীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীমোহনলাল বাজপেয়ী, শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব, শ্রীবিমল দত্ত, শ্রীবীরেন বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীসুধীর কর এবং 'রবীন্দ্রসদন' ও বিশ্বভারতী 'সেন্ট্রাল লাইব্রেরী'র অন্যান্য কর্মীবৃন্দের নিকট হইতে সর্বপ্রকার সহযোগিতা লাভ করিয়াছি। কলিকাতায় গ্রন্থ প্রকাশের সময় বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগের লাইব্রেরী হইতেও সাহায্য পাইয়াছি। শ্রদ্ধেয় শ্রীসুশীল রায় মহাশয় বিভিন্ন বিষয়ে আমাকে পরামর্শ ও সাহায্য দান করিয়াছেন। বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগের কর্মীবৃন্দের সহযোগিতা লাভ করায় গ্রন্থ প্রকাশে অনেক সুবিধা হইয়াছে এবং গ্রন্থন-বিভাগ কয়েকটি ছবি প্রকাশের অনুমতি দিয়া আমাকে বাধিত করিয়াছেন। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' ও 'ন্যাশানাল লাইব্রেরী'তে পুরাতন বহু পত্র-পত্রিকার ফাইলগুলি দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। তাছাড়া হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ লাইব্রেরী হইতে এবারেও বহু দুর্মূল্য রেফারেন্স-গ্রন্থাদির সাহায্য পাইয়াছি। প্রীতিভাজন শ্রীনন্দদুলাল মুখার্জী কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদের সকলকেই আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

কিন্তু শ্রদ্ধেয় শ্রীশৈলেশচন্দ্র সেন ও শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী শৈলনন্দিনী সেনের নিকট হইতে যে সাহায্য ও আন্তরিক স্নেহ-প্রীতি লাভ করিয়াছি তাহা কোনোদিনই বিস্মৃত হইবার নয়। এই গ্রন্থের কয়েকটি অধ্যায় লইয়া শ্রীশৈলেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সহিত বহুদিন আলোচনা হইয়াছে। শান্তি-নিকেতনে তাঁহাদের বাড়িতে থাকিয়া কাজ করিয়াছি;—কোন কিছুরই অভাব আমাকে তাঁহারা অনুভব করিতে দেন নাই। এইখানে আমি তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

এই গ্রন্থ রচনাকালে নানা সমস্যা-সংকটের মধ্যে বন্ধুবর ডাঃ শচীন্দ্রনাথ চৌধুরী যেভাবে সাহায্য করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীমণি গাঙ্গুলী, শ্রীউমাপদ উপাধ্যায়, শ্রীযদুপতি রায়, শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঘোষ এবং আরও অনেকের নিকট হইতে বিভিন্ন প্রকারে সাহায্য পাইয়াছি। সকলের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নহে,—তাঁহাদের সকলকেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

এই গ্রন্থপ্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেডের শ্রীদীনেশচন্দ্র বসু ও শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য মহাশয় আমাকে বাধিত করিয়াছেন।

সর্বশেষে, একটি কথা উল্লেখ করা দরকার। দ্রুত প্রকাশনের জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও গ্রন্থমধ্যে কিছু কিছু মুদ্রণপ্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে যেগুলি গুরুতর, গ্রন্থশেষে তাহাদের একটি শুদ্ধিপত্র সংযোজিত হইল।

১লা আশ্বিন

১৩৭০

হেতমপুর,

বীরভুম।

নেপাল মজুমদার

॥ বিষয় নির্দেশ ॥

বিষয়



রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী



রমাঁ রোলাঁ ও রবীন্দ্রনাথ

যুদ্ধোত্তর পৃথিবী এবং ভারতবর্ষ

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয় ১৯১৮ সালের নভেম্বরের প্রথম ভাগে (১১-ই নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হয়)।

যুদ্ধে মিত্রশক্তির জয় হয়। অনতিকালের মধ্যে ভার্সাইতে সন্ধিচুক্তি আলোচনার জন্য বিজয়ী শক্তিবর্গের সম্মেলন বসে।

বলা বাহুল্য, এই সন্ধির ফলে জার্মানী, অস্ট্রিয়া ও তুরস্ক সাম্রাজ্য ভাঙিয়া চুরমার হইয়া যায়। পৃথিবীর মানচিত্রেরও বহু পরিবর্তন হয়। জার্মানী ও বিজিত শক্তিবর্গের সমস্ত উপনিবেশ কাড়িয়া লওয়া হয়। ফ্রান্স আলসাস্-লোরেন ফিরিয়া পায়। তা ছাড়াও জার্মানীকে ডানজিগ্, পোলিশকরিডর ও পোজেন ইত্যাদি হারাইতে হয়। ফলে পোল্যান্ড এবং চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লোভিয়া, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি কয়েকটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। এ ছাড়াও সোভিয়েত-বিপ্লবের পর এস্থোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া ও ফিনল্যাণ্ড নামক চারিটি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়। তুরস্ক সাম্রাজ্যটিকে ভাগ করিয়া লওয়ার উদ্দেশে উহার প্রায় দেড় বৎসর পরে একটি পৃথক সন্ধি (সেভার্স সন্ধি —১৯২০) স্বাক্ষরিত হয়। বলা বাহুল্য, লীগ্ অব নেশনস্-এর অভিভাবকত্বে ব্রিটেন-ফ্রান্স প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি বিজিতদের এই সব উপনিবেশে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকে। তা ছাড়াও ইতালী, জাপান, গ্রীস ইত্যাদি দেশগুলি কিছু কিছু করিয়া লুঠের বখ্রা পাইয়া নিজেদের উপনিবেশ বিস্তারের সুযোগ পায়।

এই দারুণ লোকক্ষয়ী মহাযুদ্ধে প্রায় দেড় কোটি লোক নিহত হয় (বিশেষজ্ঞদের মতে এই মহাযুদ্ধে প্রায় ১৫,০০০,০০০ লোক নিহত ও প্রায় ৩০,০০০,০০০ লোক পঙ্গু হইয়া পড়ে।) যুদ্ধোত্তর যুগের অনিবার্য প্রতিক্রিয়া —দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর করাল ছায়া, ইউরোপ ও ক্রমশ সারা পৃথিবীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। গৃহহীন লক্ষ লক্ষ স্ত্রীলোক ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধা প্রিয়জনদের হারাইয়া রাস্তায় রাস্তায় তখন খাদ্য ও জ্বালানীর সন্ধানে ঘুরিতেছে। যুদ্ধ-প্রয়োজনে যে বিরাট সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়,—তাহারা কর্মহীন ও বেকার হইয়া পড়িতেছে। অর্ধমৃত ও পঙ্গুরা রাস্তার পাশে পড়িয়া আছে। কল-কারখানা ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় অচল। চারিদিকে শুধু বেকার সমস্যা ও খাদ্যাভাব ;—আর্ত ও ক্ষুধার্তের হাহাকার।

প্রথম মহাযুদ্ধ এবং উহার ফলাফল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও যুগান্তকারী তাৎপর্য এবং শিক্ষা লইয়া আসে।

প্রথম মহাযুদ্ধের সর্বপ্রধান ও যুগান্তকারী অবদান, রাশিয়ার 'নভেম্বর-বিপ্লব' বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। এর ফলে পৃথিবীতে এক মহাযুগের সূচনা

হয়। কার্ল মার্কসের জীবন-দর্শন ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ পৃথিবীতে সর্ব প্রথম লেনিন ও বলশেভিকদের নেতৃত্বে রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠিতহয় (১৯১৭ নভেম্বর)। ফরাসী-বিপ্লব একদিন পৃথিবীর দেশে দেশে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিয়াছে। রাশিয়ার 'নভেম্বর-বিপ্লব' পৃথিবীতে ধনতন্ত্রবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রথম আঘাত হানিয়া সমাজতান্ত্রিকবিপ্লবের অগ্নিমন্ত্র পৃথিবীর দেশে দেশে ছড়াইয়া দেয়।

বস্তুত পক্ষে, নভেম্বর-বিপ্লবই পৃথিবীতে যুদ্ধবিরোধী ও আন্তর্জাতিকতাবাদী আন্দোলনকে দেশে দেশে সংঘবদ্ধ করিবার সূচনা করিয়া দেয়। সকলেই জানেন, লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরাই যুদ্ধের বিরুদ্ধে অবিরাম ক্ষমাহীন সংগ্রাম চালাইয়া যায়। কিন্তু 'প্যাসিফিষ্ট' বা শান্তিবাদীদের হইতে ইঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও বক্তব্য সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের। ইঁহাদের মূল বক্তব্য,—পৃথিবীর কিছু ভালো ভালো লোক মিলিয়া কেবলমাত্র যুদ্ধবিরোধী প্রচার ও বিবৃতি দিয়া যুদ্ধ বন্ধ করিতে পারেন না। ইহা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ;—পৃথিবীর বাজার ও উপনিবেশগুলি নিজেদের মধ্যে লুঠ ও ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া লইবার জন্য বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি প্রায়ই এই ধরণের মহাযুদ্ধে লিপ্ত হইবে, যতদিন তাহার মূল-কারণ পুঁজিবাদের উৎখাত না-হয়। 'ফেব্রুয়ারী-বিপ্লবে'র পরই রাশিয়ায় পদার্পণ করিয়া লেনিন সর্বপ্রথম যুদ্ধ বন্ধ করিয়া যুদ্ধরত দেশগুলির নিকট শান্তি ও সন্ধিচুক্তির প্রস্তাব পাঠাইবার দাবি করিলেন। কিন্তু তিনি স্মরণ করাইয়া দিলেন, ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ ব্যতীত এই যুদ্ধের শেষ নাই। তিনি বলিলেন, (১০-ই এপ্রিল ১৯১৭),

"The slogan 'Down with the war' ! is, ot course, a correct one. But it fails to take into account the specific nature of the tasks of the present moment and of the necessity of approaching the masses *in a differennt way*···

"The war cannot be ended 'at will'. It cannot be ended by the decision of one of the warring parties. It cannot be ended by 'sticking your bayonet in the ground', as one soldier, a defencist, expressed it.

"The war cannot be ended by an 'agreement' between the Socialists of the various countries, by the 'action' of the proletarians of all countries, by the 'will' of the peoples, and so forth···

"The war is not a product of the evil will of rapacious capitalists although it is undoubtedly being fought '*only*' in their interests and they alone are being enriched by it. The war is a product of half a century of development of world capital and of its billions of threads and connections. It is

impossible to escape from the imperialist war at a bound, it is *impossible* to achieve a democratic, non-oppressive peace without the overthrow of the power of capital and the transfer of state power to *another* class, the proletariat.

"The Russian revolution of February-March 1917 was the beginning of the transformation of the imperialist was into a civil war…"

[*Selected Works* (*Moscow*) : *Vol. II*, pp.-32-33]

বলা বাহুল্য, নভেম্বর-বিপ্লবের পর বলশেভিকরা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করিয়া জার্মানী ও যুদ্ধরত দেশগুলির নিকট শান্তি ও সন্ধিচুক্তির প্রস্তাব পাঠাইলেন।

প্রথম মহাযুদ্ধ জগতের বিবেকী মানুষ ও সমাজতন্ত্রীদের এক মহা অগ্নি-পরীক্ষা। যুদ্ধের পূর্বে যে-সব প্যাসিফিষ্ট ও সোস্যালিষ্ট যুদ্ধের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতেছিলেন, কার্যকালে দেখা গেল তাঁহাদের প্রায় অধিকাংশই 'পিতৃভূমি রক্ষার' মহান কর্তব্যের অজুহাতে আপন-আপন দেশের সরকারকে যুদ্ধে সমর্থন ও সহযোগিতা করিতেছেন। যুদ্ধের আগেও প্যাসিফিষ্টরা খুব সংবদ্ধ ছিলেন না এবং যুদ্ধের সময় আরও বিচ্ছিন্ন ও অসহায় বোধ করিতেছিলেন। রমাঁ রোলাঁ ও বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রমুখ কিছু বিবেকী শিল্পী ও মনীষী ব্যক্তিগতভাবে যুদ্ধের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন। এ সব কথা আমরা পূর্ব খণ্ডেই বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

যাহাই হউক, পৃথিবীতে যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনা ও মনোভাব সৃষ্টি করার পিছনে বলশেভিক কমিউনিষ্টদের সক্রিয় ভূমিকাটি অত্যন্ত উল্লেখ-যোগ্য। নভেম্বর-বিপ্লবের পর লেনিনের নেতৃত্বে 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক সংঘ' যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী তথা সমাজতান্ত্রিক-বিপ্লবের কর্মসূচী গ্রহণ করিয়া সমস্ত পৃথিবীব্যাপী সংগঠনের কাজে তৎপর হয়।

মহাযুদ্ধের দ্বিতীয় অবদান 'লীগ্ অব নেশনস্' (*League of Nations*)। বলা বাহুল্য, লীগ্ অব নেশনস্'-এর উদ্দেশ্য, কর্মসূচী ও ফতোয়া (*Covenant*) যতই মহান উদ্দেশ্যপূর্ণ হউক না কেন, আসলে এটি ছিল বিজয়ী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির কুক্ষিগত শক্তি-প্রতিষ্ঠান। জওহরলাল নেহরু লিখিয়াছেন,

"Whatever may have been the original intention of President Wilson about it, there can be no doubt that the League has been a tool in the hands of the great Powers, and especially of England and France…

"Fine words and phrases were used. The Imperialist Powers were 'trustees' for the inhabitants of the mandated territories, and the League was to see that the conditions of

the trust were fulfilled. As a matter of fact this made matters worse. The Powers did just what they liked, but they put on a more sanctimonious garb, and thus lulled the conscience of the unwary"…

"Thus the great Powers dominated the League, and they used it whenever it served their purpose to do so, and ignored it when this was found more convenient"…

[*Glimpses of World History* : P. 683]

তথাপি 'লীগে'র শত দোষ-ত্রুটি-সমালোচনা থাকিলেও একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, পৃথিবীর সকল দেশের বিশ্বসমস্যা আলোচনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি বিশ্বসংঘ সৃষ্টির ইহাই সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা। যুদ্ধোত্তর যুগে 'লীগের' মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও জাতিগুলি একটি বৃহৎ পারিবারিক আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হইবার আন্তরিক চেষ্টা না-করিলেও, অন্ততঃ উহার অভিনয়ও করিল। অন্ততঃ, আনুষ্ঠানিকভাবেও (formally) সাম্রাজ্যবাদীদের ঘোষণা করিতে হইল,—স্বাধীনতা, শান্তি ও গণতন্ত্র রক্ষার পবিত্র কর্তব্য পৃথিবীর সকল দেশের সম্মিলিত ও সক্রিয় প্রচেষ্টাতেই সম্ভব। অবশ্য অল্পকালের মধ্যেই 'লীগ অব নেশনস্'-এর স্বরূপ সকলের নিকট উদ্ঘাটিত হইয়া পড়ে।

মহাযুদ্ধের তৃতীয় অবদান—জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও ঔপনিবেশিক মুক্তি আন্দোলন (*Self-determination of Nations and Colonal Liberation Movement*)।

মহাযুদ্ধের পর রাশিয়ার বিপ্লব 'জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের' আন্দোলনে প্রবল প্রাণ প্রবাহ দিয়াছে। বলশেভিকরা ক্ষমতায় আসিবার পূর্বেই ঘোষণা করেন 'অবিলম্বে জার শাসিত সমস্ত পরাধীন জাতি ও উপনিবেশগুলিকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিয়া তাহাদের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লওয়া হইবে।' বলশেভিকরা ক্ষমতায় আসিবার পর এই প্রতিশ্রুতি কার্যকরী করেন। অপরদিকে প্রেসিডেণ্ট উইলসন্ ও লয়েড জর্জ প্রমুখ মিত্রশক্তি প্রধানেরাও নীতিগতভাবে ইহা সমর্থন করেন এবং যুদ্ধের পর উহা কার্যকরী করিবার প্রতিশ্রুতি দেন। বলা বাহুল্য, মহাযুদ্ধের অন্তে প্রায় সারা পৃথিবী জুড়িয়া জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের জোয়ার আসে। ভারতবর্ষ, চীন, পারস্য, তুরস্ক এবং মিশর, সিরিয়া ও ইরাক প্রভৃতি আরব রাষ্ট্রগুলিতেও এই আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে।

পক্ষান্তরে ইউরোপের পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে বর্ণবিদ্বেষ ও 'উগ্র-জাতীয়তাবাদ' (Racial hatred and national chauvinism) ক্রমশই প্রবল ও বীভৎস রূপে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। যুদ্ধোত্তর যুগে কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইউরোপীয় রাজনীতিতে দুই পরস্পর-বিরোধী আদর্শ ও শক্তির তীব্র সংঘর্ষ দেখা দিল। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ, গণতন্ত্র ও ফ্যাসিজম্

জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ—এক কথায় প্রতিক্রিয়া ও প্রগতির শক্তি কণ্ঠ আঁকড়িয়া পরস্পরকে হনন করিতে চাহিয়াছে। এই সময় রমাঁ রোলাঁ, অঁরি বারবুস্ প্রমুখ কিছু বিবেকী চিন্তানায়ক পুনরায় যুদ্ধবিরোধী ও আন্তর্জাতিক ভাবধারার আন্দোলনে জগতের বুদ্ধিজীবীদের সংঘবদ্ধ করার কাজে তৎপর হইয়া উঠিলেন। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথও এই আন্দোলনের সহিত সংযুক্ত ছিলেন।

মহাযুদ্ধের চতুর্থ অবদান.—জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যন্ত্রশক্তির অভূতপূর্ব উন্নতি এবং অপরদিকে উপনিবেশ ও পশ্চাদ্‌পদ দেশগুলিতে যন্ত্রশিল্পের প্রসার। বস্তুত পক্ষে, যুদ্ধের সময় কতকটা বাধ্য হইয়াই সাম্রাজ্যবাদীদের আপন-আপন উপনিবেশগুলিতে যন্ত্রশিল্পের প্রসার করিতে হয়। ভারতবর্ষেও যুদ্ধপ্রচেষ্টায় দেশী-বিদেশী শিল্পপতিরা তাঁহাদের শিল্পগুলিকে যথাসম্ভব প্রসারিত করেন এবং ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট উহাতে বাধা দেন নাই। ভারতবর্ষের সমাজ-অর্থনীতিক ও আভ্যন্তরীণ রাজনীতি ক্ষেত্রে এই রূপান্তর খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। অবশ্য এই শিল্পপ্রসারের পশ্চাতে ইংরাজদের কিছু গূঢ় অভিসন্ধিও ছিল। জওহরলাল উহার তাৎপর্য ও কারণগুলি সুন্দর বিশ্লেষণ করিয়া লিখিতেছেন,

1. War-time demands automatically force the issue and push on industrialization in India.

2. This increases the Indian capitalist class and strengthens it, so that they demand more and more facilities for the growth, of industry, to afford them an opportunity to invest their surplus funds. Britain is no longer in a position to ignore them completely, as this might alienate them and lead them to support the more extreme and revolutionary elements in the country, which are growing stronger. Therefore, it is desirable to keep them, if possible, on the British side by giving them some opportunities for growth.

3. The surplus money of the capitalist class in England also seeks opportunities for the investment in undeveloped countries, as profits are greater there…British capitalists naturally prefer investing in undeveloped areas under British control, such as India. Thus British capital comes to India, and this leads to still further industrialization.

"4.…England fears that the next war may be a war with Soviet Russia at the Indian frontier. If India has not got her own big industries, the British Government will not be able to carry on the war properly on the frontier…

For these reasons, inevitably, British policy changed and

the industrialization of India was decided upon···Having dicided upon this policy, Britain took steps to ensure that the real control of the new industry in India would remain in the hands of British capitalists"···

[*Glimpses of World History.* : pp. 670-71.]

কিন্তু তবুও, ভারতবর্ষের শিল্পপতি ও বুদ্ধিজীবীদের নিকট যুদ্ধ পরোক্ষতঃ একটা মহা আশীর্বাদের মত আসিয়াছিল। এই পরিবর্তন ও রূপান্তরের মধ্যে ইহারা পরিপুষ্ট ও বর্ধিত হইয়াছেন। স্বভাবতই, ইহার অনিবার্য প্রতিক্রিয়া রাজনীতিক ক্ষেত্রেও দেখা দেয়। এই প্রসঙ্গে নেহরু আরো লিখিয়াছেন,

"The growing strength of the Indian capitalist classes and upper *bourgeoisie* during the war began to show itself in the political movement also. Politics gradually came out of the pre-war and early war lull, and various demands for self-government and the like began to be made"···

[*Ibid* : p.-672.]

যাহাই হউক, খুব মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে এই সব বিষয় ও সর্তগুলি (factors and conditions) যুদ্ধোত্তরকালে ধীরে-ধীরে ভারতের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও চিন্তাজগতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব সৃষ্টি করিতে থাকে।

এই সব দেশের ও বিশ্বের বাস্তব পরিস্থিতি ও অবস্থার পরিবর্তন এবং চিন্তা-চেতনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ভারতের রাজনীতিক চিন্তাধারা ও আন্দোলনের একটা ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য দেখিতে পাই। আর এই পটভূমি ও পরিপ্রেক্ষিতেই রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-ভাবনা ও কার্যকলাপের প্রকৃত মূল্যায়ন সম্ভব হইবে।

পূর্বখণ্ডে আমরা দেখিয়াছি, তিলক-বেসান্ত-গান্ধীজী প্রমুখের নেতৃত্বে ভারতবর্ষ কিভাবে মহাযুদ্ধে ইংরেজকে সাহায্য করিয়াছে। যুদ্ধের পর ইংরেজ ভারতকে 'স্বরাজ' দিবে—তৎকালীন ভারতের গান্ধীজী প্রমুখ প্রায় সমস্ত রাজনীতিবিদদের এই আশা।

যুদ্ধের পর ভারতের রাজনীতিক সংকট অত্যন্ত ঘনীভূত হয়। ১৯১৮ সালের মাঝামাঝি মণ্টেগু ভারতশাসন-সম্পর্কে এক পরিকল্পনা পেশ করেন। বলা বাহুল্য, এই পরিকল্পনায় ইংরেজের ভণ্ডামি ও কূট অভিসন্ধি দেশের নেতৃবর্গ তখনই ধরিতে পারিয়াছিলেন। এই পরিকল্পনা লইয়া দেশে যখন তীব্র সন্দেহ ও অসন্তোষ চলিতেছে সেই সময় তুরস্কের সুলতান তথা ইসলামের খলিফার ভবিষ্যৎ লইয়া ভারতের মুসলিম সমাজ অত্যন্ত উদ্বেগ ও ক্ষোভের সঙ্গে যুদ্ধের সন্ধি-আলোচনার দিকে তাকাইয়া আছে। এক কথায় পরাধীনতার তীব্র বেদনা ও স্বাধীনতাস্পৃহা, উগ্র ধর্মীয় উন্মাদনা, সাম্প্র-

দায়িকতা ও বর্ণবিদ্বেষ প্রভৃতি একই সঙ্গে ভারতের রাজনীতিক আন্দোলনকে প্রভাবিত করিয়াছে। একদিকে ভারতের দৃঢ় জাতীয়-ঐক্য ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা; অপরদিকে ধর্মীয় উম্মাদনা ও সাম্প্রদায়িক বিভেদ-বিদ্বেষ,—গান্ধীজী প্রমুখ জাতীয় নেতৃবৃন্দের ইহাই ছিল প্রধান সমস্যা। গান্ধীজী যেন এই সমস্যার সমাধান ও পথ দেখিতে পাইলেন এবং তাহার ফলেই খিলাফৎ-আন্দোলন সমর্থন ও অসহযোগ আন্দোলন। সমস্যার সমাধান তাহাতে হয় নাই;—সমস্যা আরও জটিল ও গুরুতর হইয়াছে, প্রসঙ্গক্রমে আমরা এ আলোচনায় আসিব। গান্ধীজী আনিলেন সংগ্রামের অভয় মন্ত্র; তবে গান্ধীজীর রাজনীতিক সাধনায় 'নীতি ও মানবতা' প্রাধান্য পাইলেও তাহা ভারতের জাতীয় ও ভৌগোলিক পরিমণ্ডলের বাহিরে (তখনও পর্যন্ত) কোন সমস্যা দেখিতে পায় নাই। সমস্যাকীর্ণ বিরাট পৃথিবী—যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইউরোপের মরণান্তিক যাতনা ও দুঃখ—সেই সমস্যার পাকে পাকে আমাদের গ্রন্থিও জট পাকাইয়া রহিয়াছে।

পৃথিবীর চিন্তাশীল মনীষিগণ বর্তমান সভ্যতা-সংস্কৃতির মৌলিক প্রশ্নেই সংশয়িত,—তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বে চিন্তাকুল। এর কোন সমস্যাই আমাদের যেন স্পর্শ করে নাই;—আমাদের চিন্তায় ও সাধনায় তখনও পর্যন্ত জাতীয়তার বাহিরে আর কিছু যেন চিন্তা করিবার অবশিষ্ট ছিল না।

এই দুর্দিনে, এদেশে বোধ হয় একমাত্র ব্যতিক্রম, রবীন্দ্রনাথ। তিনিই জাতিকে এবং সমগ্র বিশ্বকে আশার বাণী শুনাইলেন। অতি অল্প বয়সেই তিনি সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন রূপটি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। মহাযুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধের পূর্ব হতেই যে সব মনীষী ও চিন্তানায়ক উগ্র-জাতীয়তাবাদ ও যুদ্ধকে বিনিপাত করিয়া সংগ্রাম করিয়া আসিতেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের অন্যতম। এসব কথা আমরা পূর্ব খণ্ডেই বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। যুদ্ধের এই হিংস্র তাণ্ডবলীলায় গভীর দুঃখ ও বেদনায় রবীন্দ্রনাথের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত। অথচ এই বর্বরতা—এই দানবীয় হিংস্রতার প্রতিরোধ করিয়া সমস্যার একটি সত্যকারের সমাধান ও পথ তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। অপরদিকে দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতাদের সহিত তাঁহার মৌলিক মত পার্থক্য। বিশ্বমানবতার আন্তর্জাতিক মিলন ক্ষেত্র রচনা, অপরদিকে ভারতের জাতীয় সাধনা; আন্তর্জাতিকতা ও জাতীয়তার সমন্বয় সাধনা—ইহাই রবীন্দ্রনাথের দিন-রাত্রির চিন্তা ও ভাবনা। আর এই সাধনার ফলেই কবির, 'বিশ্বভারতী'। যুদ্ধ চলাকালেই কবির মনে 'বিশ্বভারতীর' কল্পনার উদয় হয়; যুদ্ধাবসানে ১৯১৮ সালের ডিসেম্বরের শেষভাগে বিশ্বভারতীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা—সমগ্র মন জুড়িয়া অধিকার করিয়া বসিয়া আছে দেশের ও বিশ্বের এই সব যাবতীয় সমস্যা। আলোচনাকালে দেখিতে পাইব দেশের ও বিশ্বের প্রধান ও গুরুতর সমস্যাবলী ক্রমশই কি ভয়ঙ্করভাবে রবীন্দ্রনাথকে বিচলিত ও চিন্তিত করিয়া চলিয়াছে,—কিভাবে রবীন্দ্রমানস ক্রম-পরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে।

যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে

১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণ-ভারত ও কলিকাতা ঘুরিয়া আসিয়া শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম দিকে কবি 'সবুজপত্রে'র সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীকে পর পর পাঁচটি পত্র লেখেন। উহাই তাঁহার বিখ্যাত 'বাতায়নিকের পত্র' (সবুজপত্র-আষাঢ় ১৩২৬) নামে সুপরিচিত। এই পত্রগুলিতে তৎকালীন ভারতের এবং বিশ্বের পরিস্থিতি ও সমস্যাবলী সম্পর্কে কবির মানসিক কি প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

দীর্ঘ চারি বৎসর ব্যাপী মহাযুদ্ধের অবসানের পর পৃথিবীর অবস্থা কিছুটা যেন স্বাভাবিক হইয়া আসিতেছে। মানব-সভ্যতার সেই রক্ত-কলঙ্কিত কালরাত্রির অবসানে আজ যেন সব কিছুর হিসাব-নিকাশ—সব কিছুর পর্যালোচনা করিবার তাগিদ ভিতর হইতে কবি অনুভব করিতেছেন। এই সভ্যতা—এই সংস্কৃতির মূল গলদটি কোথায়?—কি তাহার পরিণতি, কোথায় তাহার সমাধান, কোথায় মানুষের মুক্তি,—এই সব প্রশ্ন কবির মনের মধ্যে ভিড় করিয়া আসিতেছে। কবি যেন সব কিছুর সামগ্রিক রূপটি সত্যদ্রষ্টার বেদীভূমি হইতে পর্যবেক্ষণ করিতেছেন। তিনি দেখিতেছেন, এই ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার মূল লক্ষ্য হইতেছে সামরিক ও বাহ্যিক শক্তিলাভ—উপকরণ ও বস্তুগত সম্পদলাভের তীব্র লালসা ও প্রতিযোগিতা। তিনি বলিলেন,

…"তাই যারা শক্তিকেই চরম ব'লে জানে তারা আয়তনে বড়ো হতে চায়। টাকার সংখ্যা, লোকের সংখ্যা, উপকরণের সংখ্যা, সমস্তকেই তারা কেবল বহুগুণিত করতে থাকে।

"এইজন্যেই সিদ্ধি লাভের কামনায় এরা অন্যের অর্থ, অন্যের প্রাণ, অন্যের অধিকারকে বলি দেয়। শক্তিপূজার প্রধান অঙ্গ বলিদান। সেই বলির রক্তে পৃথিবী ভেসে যাচ্ছে।

…"বলির পশুর রক্তে যে শক্তি ফুলে উঠল সে কেবল ফেটে মরবার জন্যেই। তার পিছনে যতই সৈন্য, যতই কামান লাগাই-না কেন, রণতরীর পরিধি যতই বৃদ্ধির দিকে নিয়ে চলি, লুঠের ভাগকে যতই বিপুল করে তুলতে থাকি, অঙ্কের জোরে মিথ্যাকে সত্য করা যাবে না, শেষকালে ঐ অতি বড়ো অঙ্কেরই চাপে নিজের বস্তার নীচে নিজে গুঁড়িয়ে মরতে হবে।"

রবীন্দ্রনাথ দেখিতেছেন আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা 'সত্যে', 'অলোভে', 'ক্ষমায়', 'সংযমে' ও 'শান্তি'তে বিশ্বাস করে না। কিপলিং-নীট্শের মত একদল সাম্রাজ্যবাদী সাহিত্যিক ও দার্শনিক এই ধর্মকে "দুর্বলের আত্মরক্ষা করবার কৃত্রিম দুর্গ" বলিয়া উপহাস করিতেন। তাঁহারা বলিতেন "শেষ পর্যন্ত শক্তিরই জয় হয়…অতএব ভীরু ধর্মভাবুকের দল যাকে অধর্ম ব'লে নিন্দা করে, সেই অধর্মই কৃতার্থতার দিকে মানুষকে নিয়ে যায়।"

কবি বলিলেন,…"প্রতাপসমুন্নত য়ুরোপের পলিটিকস্ এই শক্তিপূজা। এইজন্য সেখানকার ডিপ্লোমেসি কেবলই প্রকাশ্যতাকে এড়িয়ে চলতে চায়; অর্থাৎ সেখানে শক্তি যে মূর্তি ধারণ করেছে সে সম্পূর্ণ উলঙ্গ মূর্তি নয়; কিন্তু তার লোলিহান রসনার উলঙ্গতা কোথাও ঢাকা নেই। ঐ দেখো পীস্-কনফারেন্সের সভাক্ষেত্রে তা লক্‌লক্ করছে।"

বিগত মহাযুদ্ধে ইউরোপীয় শক্তিগুলির ধনসম্পদ, সামরিক শক্তি, আগ্নেয়াস্ত্র ও বিভিন্ন মারণাস্ত্রের উদ্ভাবনী শক্তির দিকে আমাদের দেশের লোকও সেদিন সপ্রশংস ও লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে আর মনে মনে সেই আদর্শের পূজা করিতেছে। কবি ইহাতে ব্যথিত। তিনি বলিলেন,

"আজকের দিনেও দেখি আমাদের দেশে সেই হাওয়া উঠেছে। আমরা ধর্মের নাম করেই এক দল লোক বলছি, ধর্মভীরুতাও ভীরুতা। বলছি, যারা বীর, অন্যায় তাদের পক্ষে অন্যায় নয়।…ধর্মকে উভয়েই বাধা বলে জানে, সেই বাধা গায়ের জোরে অতিক্রম করতে চায়। কিন্তু গায়ের জোরই পৃথিবীতে সব চেয়ে বড়ো জোর নয়।

"এই বড় দুঃসময়ে কামনা করি, শক্তির বীভৎসতাকে কিছুতে আমরা ভয়ও করব না, ভক্তিও করব না; তাকে উপেক্ষা করব, অবজ্ঞা করব। সেই মনুষ্যত্বের অভিমান আমাদের হোক, যে অভিমানে মানুষ এই স্থূল বস্তুজগতের প্রবল প্রকাণ্ডতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে মাথা তুলে বলতে পারে, আমার সম্পদ এখানে নয়; বলতে পারে, শৃঙ্খলে আমি বন্দী হই নে, আঘাতে আমি আহত হই নে, মৃত্যুতে আমি মরি নে; বলতে পারে, যেনাহং নামৃতঃ স্যাম্ কিমহং তেন কূর্যাম্। আমাদের পিতামহেরা বলে গেছেন: এতদমৃতমভয়ং শান্ত উপাসীত। যিনি অমৃত, যিনি অভয় তাঁকে উপাসনা করে শান্ত হও। তাঁদের উপদেশকে আমরা মাথায় লই, এবং মৃত্যু ও সকল ভয়ের অতীত যে শান্তি সেই শান্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করি।"

[কালান্তর: পৃঃ ১২৬-৩০]

এসব অধ্যাত্মবাদী ও ভাববাদী কবির মহানভাবোচ্ছ্বাস তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে দৃষ্টিকোণ হইতেই হউক,—'শক্তির বীভৎসতা'কে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করিবার—মৃত্যু ভয়কে উপেক্ষা ও তুচ্ছ করিবার যে বলিষ্ঠ উদাত্ত আহবান রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে আসিয়াছিল, তাহার জন্য ভারতবাসী মাত্রেই আজ গৌরব অনুভব করিবেন। কিন্তু ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার মর্মকথাটি তো তিনি সত্যই সুন্দরভাবে উদ্ঘাটন করিয়াছেন। সাম্রাজ্যবাদীদের ঐ জঘন্য পররাজ্য-লালসা ও পাশবিক শক্তি অর্জনের কুৎসিত প্রতিযোগিতা,—আধুনিক রাজনীতির ভাষায় যাহাকে বলা হয়, 'Armsrace,'—রবীন্দ্রনাথ ঘৃণাভরে উহার বিনিপাত ও নিন্দাবাদ করিতেছেন। অবশ্য নানাকারণে দেশের ও বিশ্বের রাজনৈতিক প্রশ্নগুলিতে তিনি সব সময় রাজনীতিগতভাবে চিন্তা করিতে পারিতেন না। তাই রাজনৈতিক প্রশ্ন বা সমস্যায় রাজনৈতিক সমাধান তিনি দেখিতে পান নাই।

সে যাহাই হউক,—যুদ্ধবাদীরা, সাম্রাজ্যবাদীরা কখনও তাঁহার সতর্ক দৃষ্টিকে এড়াইতে পারে নাই। মহাযুদ্ধের অবসানে বিজয়ী শক্তিবর্গ তাহাদের প্রতি-যোগী বা প্রতিদ্বন্দ্বী বৃহৎ শক্তিগুলিকে কিভাবে পঙ্গু ও শক্তিহীন করিয়া দিবার ষড়যন্ত্র করিতেছে,—উদীয়মান দেশ ও শক্তিগুলিকে কি পরিমাণ উদ্বেগ ও সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতেছে, তাহা রবীন্দ্রনাথের কাছে পরিষ্কার ধরা পড়িয়াছে।

ভার্সাই-তে সন্ধি চুক্তির বৈঠক বসিয়াছে। 'লীগ্ অব নেশনস্'-এর 'Covenant'-এর ধারাগুলি লইয়া আলাপ-আলোচনা চলিতেছে। কবির নজর সেখানেও রহিয়াছে। কবি লিখিতেছেন,

"যুদ্ধে এ পক্ষের জিত হল। এখন কী করলে পৃথিবীতে শান্তির ভিত পাকা হয় তাই নিয়ে পঞ্চায়েত বসে গেছে। কথা-কাটাকাটি প্রস্তাব-চালাচালি, রাজ্য-ভাগাভাগি চলছে। এই কারখানাঘর থেকে কী আকার এবং কী শক্তি নিয়ে কোন্ যন্ত্র বেরবে তা ঠিক বুঝতে পারছি নে।

"আর-কিছু না বুঝি একটা কথা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে আসছে; এত আগুনেও কলিযুগের অন্ত্যেষ্টিসংকার হল না, মন-বদল হয় নি। কলিযুগের সেই সিংহাসনটা আজ কোনখানে? লোভের উপরে। পেতে চাই, রাখতে চাই, কোনোমতেই কোথাও একটুও কিছু ছাড়তে চাই নে। সেইজন্যেই অতিবড়ো বলিষ্ঠের ভয়, কী জানি যদি দৈবাৎ এখন বা সুদূর কালেও একটুখানি লোকসান হয়।...

..."সকলেই জানেন, কিছুকাল থেকে পাশ্চাত্য দেশে *Yellow Peril* বা পীতসংকট নাম নিয়ে একটা আতংক দেখা দিয়েছে। এই আতংকের মূল কথাটা এই যে, প্রবলের লোভ সন্দেহ করছে পাছে আর কোথাও থেকে সেই লোভ কোনো-এক দিন প্রবল বাধা পায়। বাধা পাবার সম্ভাবনা কিসে? যদি আর-কোনো জাতি এই প্রবলদেরই মতো সকল বিষয়ে বড়ো হয়ে ওঠে। তাদের মতো বড়ো হওয়া একটা সংকট—এইটে নিবারণ করার জন্যে অন্যদের চেপে ছোটো করে রাখা দরকার। সমস্ত পাশ্চাত্য জগত আজ এই নীতি নিয়ে বাকি জগতের সঙ্গে কারবার করছে। এই নীতিতে নিরন্তর যে ভয় জাগিয়া রাখে তাতে শান্তি টিকতে পারে না।"

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আনাতোল ফ্রাঁসের দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়াছেন। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির '*Yellow Peril*'-এর তীব্র বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা করিয়া আনাতোল ফ্রাঁস সাম্রাজ্যবাদীদের কূটনীতির ভণ্ডামীকে প্রকাশ্যে ধিক্কৃত করিয়াছেন। কবি ইহা গভীর আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন। ফ্রাঁসের মন্তব্যটির অংশ-বিশেষ এইরূপ,

..."But men entitled to speak consider that the Yellow Peril is none the less to be dreaded for all that it is economic. Japan and China, organised by Japan, threaten us in all the markets of Europe, with a competition frightful, mons-

trous, enormous, and deformed, the mere idea of which causes the hair of the economists to stand on end."

কবি ইহার মন্তব্যে বলিলেন,

"যত ক্ষণ এই লোভ আছে তত ক্ষণ জগতে শান্তি আনে পীস-কনফারেন্সের এমন সাধ্য নেই। কলে অনেক জিনিস তৈরি হচ্ছে কিন্তু কলে-তৈরি শান্তিকে বিশ্বাস করি নে। কর্মিক-ধনিকদের মধ্যে যে অশান্তি তারও কারণ লোভ, এক রাজ্য-অন্য রাজ্যের মধ্যে যে অশান্তি তারও কারণ লোভ, আবার রাজা ও প্রজার মধ্যে যে অশান্তি তারও কারণ লোভ। তাই শেষকালে দাঁড়ায় এই, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

"এমন অবস্থায় সবলপক্ষীয়েরা যখন আপোষ নিষ্পত্তির যোগে শান্তি-কামনা করে তখন তারা নিজেদের পারে পাকা বাঁধ বেঁধে এবং অন্যদের পারে পাকা খাদ কেটে লোভের স্রোতটাকে নিজেদের দিক থেকে অন্যদিকে সরিয়ে দেয়। বসুন্ধরাকে এমন জায়গায় পরস্পর বখরা করে নিতে চায় যে জায়গাটা যথেষ্ট নরম, অনায়াসেই যেখানে দাঁত বসে, এবং ছিঁড়তে গিয়ে নখে যদি আঘাত লাগে নখ তার শোধ তুলতে পারে। কিন্তু জোর করে বলা যায় এমনভাবে চিরদিন চলবে না ; ভাগ সমান হবে না, লোভের ক্ষুধা সব জায়গায় সমান করে ভরবে না, পাপের ছিদ্র নানা জায়গায় থেকে যাবে ; হঠাৎ এক দিন ভরাডুবি হবে।"

[ঐ : পৃঃ ১৩৪-৩৭]

মহাযুদ্ধ ও ভার্সাই-সন্ধি সম্পর্কে এত সুন্দর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ অন্ততঃ এদেশের কোন দেশনেতার কাছ থেকে শোনা যায় নাই। মহাযুদ্ধে ইংরেজকে সাহায্য ও সহযোগিতা করার জন্য তখনও পর্যন্ত জাতীয় নেতৃবৃন্দের কাহাকেও প্রায়শ্চিত্ত বা অনুতাপে দগ্ধ হইতে দেখি না ;—এমন কি তখনও স্বয়ং গান্ধীজীর মধ্যেও কোন তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অনুশোচনাবোধ দেখি না। ১৯১৮ সালে (ডিসেম্বর মাসে) দিল্লী-কংগ্রেসে, সভাপতি মদনমোহন মালব্য তাঁহার অভিভাষণের শুরুতেই যুদ্ধজয়লাভের জন্য বৃটিশ-সম্রাটকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতে গিয়া বলিলেন,

"You, too, my countrymen, are entitled to rejoice as you have actually been rejoicing, that this great victory has been won. You are also entitled to feel justly proud that our country has played a noble part in this great war, and made a magnificient contribution to its glorious end···

"India had many grievances against England when the war broke out. But *she had not lost faith in the Briton's love of justice and liberty*. And the moment the message of His Majesty the King of England and Emperor of India was received, announcing that he had been compelled to draw the sword in defence of liberty and of treaty rights and obligations,

India loyally put aside her grievances, buried her differences, and her princes and people readily identified themselves with the cause which England had taken because it was the cause of righteousness and liberty···

···"Let me next, on your behalf and on mine, offer our loyal greetings and dutiful congratulations to His Majesty the King-Emperor on the happy termination of the war. It gives us Indians particular satisfaction to think that while the despotic monarchs of other lands have disappeared, our noble King Emperor, exercising his beneficent power in consonance with the constitution of the country and the will of his people, sits even more firm in the affections of the people than before."···

[*Congress Presidential Addresses : Vol.* II.-pp. 379-82]

ভার্সাই-সন্ধি ও শান্তি আলোচনা সম্পর্কে সভাপতি মালব্যজী আরও বলিলেন,

···"The principles for which Great Britain and the Allies fought have now been embodied in the Peace Proposals of President Wilson to which I have reffered before. These principles have been adopted with the hearty concurrence and support of Great Britain. Indeed, the credit for adopting them is in one sense greater in the case of Britain and France than in the case of America. For, Britain and France had borne the brunt of the war for four years and by their unconquerable courage and heroic sacrifices made it possible for themselve and the Allies to achieve the final victory. ···It was the more praiseworthy of them, therefore that they readily agreed to the Peace Proposals, which ran counter in same instances to the decisions which they had themselves previously arrived at." [*Ibid* : P. 399.]

মহাযুদ্ধ ও ভার্সাই-সন্ধি সম্মেলনকে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কি চোখে দেখিতে ছিলেন, ইহা হইতেই তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠে। ইংরেজ বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ন্যায়পরতা ও মহানুভবতার উপর তখনও তাঁহাদের কী প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও আস্থা, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

তৃতীয় পত্রটিতেও রবীন্দ্রনাথ সেই একই কথা অন্যভাবে বললেন,

"রক্তকলঙ্কিত পৃথিবী থেকে ঐ-যে আজ একটা শান্তির দরবার উঠেছে, ঊর্ধ্ব-আকাশের নির্মল নিঃশব্দতা তার কোলাহলকে ধুয়ে দিতে পারছে না।

"শান্তি? শান্তির দরবার সত্য সত্যই কে করতে পারে? ত্যাগের জন্যে যে প্রস্তুত। ভোগেরই জন্যে, লাভেরই জন্যে যাদের দশ আঙুল অজগর সাপের দশটা লেজের মতো কিলবিল্ করছে তারা শান্তি চায় বটে, কিন্তু সে ফাঁকি দিয়ে, দাম দিয়ে নয়। যে শান্তিতে পৃথিবীর সমস্ত ক্ষীরসর বাটি চেটে নিরাপদে খাওয়া যেতে পারে সেই শান্তি।

"দুর্ভাগ্যক্রমে পৃথিবীর এই ক্ষীরসরের বড়ো বড়ো ভাণ্ডগুলো প্রায় আছে দুর্বলদের জিম্মায়।···যেখানে শক্ত পাহারা সেখানে লোভ দমন করতে বেশি চেষ্টা করতে হয় না।···কিন্তু আলগা পাহারা যেখানে সেখানে ভয়ও থাকে না, লজ্জাও চলে যায়। এমন-সব জায়গা আছে যেখানে ভালো ছেলে বলে নিজের পরিচয় দিলে লাভ আছে; কিন্তু দুর্বলের সঙ্গে যেখানে কারবার সেখানে বেচারা প্রবল পক্ষের ভালো হওয়া সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ব'লেই যে কত কঠিন তার দৃষ্টান্তের অভাব নেই।"···

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি একদা কিভাবে এশিয়া-আফ্রিকার দুর্বল ও অনুন্নত দেশগুলিকে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া লইয়াছিল রবীন্দ্রনাথ তাহারই উল্লেখ করিলেন। একদা সাম্রাজ্যবাদীরা কিভাবে দুর্বল চীনের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, হিংস্র থাবা দিয়া মহা-চীনের বুক ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছিল —রবীন্দ্রনাথ আনাতোল ফ্রাঁসের এই বিবরণী পাঠ করিয়া ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হইয়া উঠিতেছেন,

"In our own times, the Christian acquired the habit of sending jointly or separately into that vast Empire, whenever order was disturbed, soldiers who restored it by means of theft, rape, pillage, murder, and incendiarism, and of proceeding at short intervals with the pacific penetration of the country with rifles and guns. The poorly armed Chinese either defend themselves badly or not at all, and so they are massacared with delightful facility···In 1901, order having been disturbed at Peking, the troops of the five Great Powers, under the command of a German Field-Marshal, restored it by the customary means. Having in this fashion covered themselves with military glory, the five Powers signed one of the innumerable treaties by which they guarantee the integrity of the very China whose provinces they divide among themselves."

সেই লোভেই আজও এশিয়া-আফ্রিকার বাজার ও উপনিবেশগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া লইবার উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদীরা মহাসমর বাধাইয়া তুলিতেছে, কবি তাহা লক্ষ্য করিতেছেন। বলা বাহুল্য, আনাতোল ফ্রাঁসের লেখা পড়িয়া তিনি সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধ সম্পর্কে আরও সতর্ক ও সচেতন

হইয়া উঠিতেছেন। তিনি বলিলেন,

"পীকিনে যে ভাঙচুর লুটপাট ও উৎপাত হয়েছিল মানুষের দুঃখ এবং অপমানের পক্ষে সে বড়ো কম নয়, কিন্তু সে সম্বন্ধে লজ্জা পাওয়া এবং লজ্জা দেওয়ার পরিমাণ আধুনিক য়ুরোপীয় যুদ্ধঘটিত আলোচনার তুলনায় কতই অণুপরিমাণমাত্র তা সকলেই জানেন।...

"যে জায়গায় হাওয়া হালকা সেই জায়গাই হচ্ছে ঝড়ের কেন্দ্র। এইজন্যে য়ুরোপের বড়ো বড়ো ঝড়ের আসল জন্মস্থান এশিয়া, আফ্রিকা।"...

কবি বলিতেছেন, ইহাই হইতেছে সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপের শক্তিপূজার মর্মকথা,

..."ঐ বীভৎস শক্তিমান মানুষটাকে যত বড়ো দেখাচ্ছে সে কি সত্যই তত বড়ো। বাইরে থেকে সে ভাঙচুর করতে পারে, কিন্তু ভিতর থেকে মানুষের জীবনের সম্পদ লেশমাত্র যোগ করে দিয়ে যাবার সাধ্য ওর আছে? ও সন্ধি করতে পারে, কিন্তু শান্তি দিতে পারে কি?"...

তিনি বলিলেন,

"কিন্তু এই শান্তির দেবতা, ত্যাগের দেবতা টিকল না। য়ুরোপেও আধুনিক শক্তিপূজক বলছেন, 'যিশুর মতো অমন গরিবের দেবতা, নিরীহ দেবতা, অমন নেহাত ফিকে রঙের দেবতা নিয়ে আমাদের চলবে না। আমাদের এমন দেবতা চাই জোর করে যে কেড়ে নিতে পারে; যেমন করে হোক যে নিজেকে জাহির করতে গিয়ে না মানে বাধা, না পায় ব্যথা, না করে লজ্জা।' কিন্তু য়ুরোপের এই যে-বুলি উঠেছে সে কাদের পানসভার বুলি? যারা জিতেছে, যারা লুটেছে, পৃথিবীটাকে টুকরো টুকরো করে যারা তাদের মদের চাট বানিয়ে খাচ্ছে।"

কী অপরিসীম ঘৃণা ও তীব্র ব্যঙ্গোক্তি বিদ্রূপ! ধনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতা-সংস্কৃতিকে এতখানি তীব্র ও কঠোর ভাষায় বিদ্রূপ ও সমালোচনা করিতে সে-যুগে আমাদের দেশে কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না;—সে সচেতনতাও কাহারও ছিল না। রবীন্দ্রনাথের মত কঠিন সংযত কবির লেখনী হইতে এতখানি উষ্মা ও অসংযত ভাষা, কী পরিমাণ ক্রোধোন্মত্ততার ফলে বাহির হইতে পারে, তাহা অনুমান করা শক্ত নহে। ঐ সৌম্য, শান্ত, ঋষিকল্প মানুষটি আজ যেন আপনিই আপনাকে সংযত করিতে পারিতেছেন না,

..."য়ুরোপের শক্তিপূজক আজ বুক ফুলিয়ে বড়ো সমারোহেই শক্তির পুজো করছেন—মদে তাঁর দুই চক্ষু জবাফুলের মতো টক্‌টক্‌ করছে, খাঁড়া শাণিত, বলির পশু যূপে বাঁধা। তাঁরা কেউ কেউ বলছেন 'আমরা যিশুকে মানি নে'...

"আর আমরাও বলছি, শিবকে মানব না। শিবকে মানা কাপুরুষতা। আমরা চণ্ডীর মঙ্গল গাইতে বসেছি।"...

কবি তাই বলিলেন,

"আমরা আজ য়ুরোপের দেবতাকে স্বপ্নে পুজো করতে বসেছি, এইটেতেই য়ুরোপের কাছে আমাদের সব চেয়ে পরাভব হয়েছে। যদি সে আমাদের আঘাত করতে চায় করুক, আমরা সহ্য করব, কিন্তু তাই বলে পুজো করব? সে চলবে না; কেননা পুজো করতে হবে ধর্মরাজকে। সে দুঃখ দেবে, দিক গে। কিন্তু, হারিয়ে দেবে? কিছুতে না।"...

[ঐ : পৃ-১৩৯-৪৯]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, বাংলা দেশে তখন স্বাদেশিকতাবোধকে জাগরিত ও উজ্জীবিত করিবার জন্য, কালীপূজা, দুর্গাপূজা বা শক্তিপূজার ঢেউ আসিয়াছে। বিশেষ করিয়া বাংলার রুদ্রপন্থী সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে কালীপূজা ও শক্তিপূজার প্রাবল্য লক্ষণীয়। সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী'র প্রভাব,—স্বামী বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ-মিশনের কালীপূজা এবং মহারাষ্ট্রের 'বীরপূজা', শিবাজী-উৎসব' ও ভবানীপূজার প্রভাব,—সে যুগে এই সব কিছু মিলিয়া আমাদের (বিশেষতঃ বাংলা দেশের) স্বাধীনতা-আন্দোলনের নৈতিক শক্তির প্রেরণা ও উৎসাহ-উদ্দীপনা যোগাইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ 'মঙ্গলকাব্যে'র সাহিত্যিকী ব্যাখ্যার আড়ালে, এই 'শক্তি পূজারীদে'র তিরস্কার করিয়াছেন। তিনি দেখিলেন ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদীদের 'শক্তিপূজা'র সহিত আমাদের স্বাদেশিকদের 'শক্তিপূজা'র আদর্শের কোন মূলগত ভেদ নাই। আমাদের শক্তিপূজার আড়ালে আমরা ইউরোপের হিংস্রশক্তিরই (*Force, violence, coercion*) পূজা করিতেছি। বলা বাহুল্য, কবি সংগ্রামের নীতি-আদর্শের (*Principle and means of struggle*) প্রসঙ্গেই এই আলোচনার উত্থাপন করেন। অবশ্য এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা দরকার,—কবি অন্যত্র বহুবার সন্ত্রাসবাদী ও বিপ্লবপন্থীদের লক্ষ্য, সততা, নিষ্ঠা, সহনশীলতা, সাহস ও কঠিন বীর্যবত্তার অকুণ্ঠ প্রশংসা ও আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন। এ'সব কথা তিনি 'পথ ও পাথেয়', 'সমস্যা', 'সদুপায়', 'দেশহিত' ও 'ছোট ও বড়ো' প্রভৃতি প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

অবশ্য 'বাতায়নিকের পত্র'-তে কবি সাম্রাজ্যবাদের বাহ্যিক ও মৌল কারণগুলির মোটামুটি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিলেও শেষ পর্যন্ত পশ্চিমী মানুষের বস্তুতন্ত্রতা ও লোভ-রিপুর প্রবল তাড়নাকেই যতকিছু অনিষ্টের চূড়ান্ত বা মূল কারণ (ultimate cause) বলিতে চাহিয়াছেন। এই লোভ-রিপুর তাড়না যে বিশেষ এক শ্রেণীর—এবং এক বিশেষ সমাজ-অর্থনীতিক ও রাজনীতিক-ব্যবস্থা-সঞ্জাত আর তাহা হইতেছে পুঁজিবাদ—একথা কবি তখনও পরিষ্কার বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। এই দিক হইতে বিচার করিলে তাঁহার 'ইম্পীরিয়লিজম', 'লড়াইয়ের মূল' ও '*Nationalism*' গ্রন্থের প্রবন্ধগুলিতে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচার-বিশ্লেষণ আপেক্ষিকভাবে অধিক বাস্তব ও বিজ্ঞান-ঘেঁষা হইয়াছে। ঐসব প্রবন্ধে তিনি সাম্রাজ্যবাদের বিশেষ অর্থনীতিক ও রাজনীতিক ব্যবস্থাকেই সব কিছু অনিষ্টের মূল বলিয়া দায়িক করিয়াছেন।

এককথায় তাঁহার চিন্তা-ভাবনার মধ্যে তখনও একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিভ্রান্তি চলিতেছিল। কখনও তাঁহার মনে হইয়াছে, সর্বনাশের কারণটা হইতেছে মানুষের spiritual, moral বা cultural অধঃপতন ও অবনতির জন্য, কখনও বা মনে হইয়াছে Socio-economic and political কারণের জন্য। আরও দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহার চিন্তা-ভাবনায় এই স্ববিরোধিতা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকট হইয়া উঠে।

শেষ পত্রটিতে রবীন্দ্রনাথ হিন্দুসমাজের বর্ণভেদ, সামাজিক অসাম্য এবং হিন্দু-মুসলমান সমস্যা বা সাম্প্রদায়িকতার তীব্র সমালোচনা করিলেন। তিনি বলিলেন,

…"মানুষের প্রধান কর্তব্য, তাকে এমনটি হতে হবে যাতে তাকে মানুষ বলে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। এ কর্তব্য কেবল তার নিজের সুবিধের জন্যে নয়, পরের দায়িত্বের জন্যেও। মানুষ মানুষকে মাড়িয়ে যাবে এটা, যে লোক মাড়ায় এবং যাকে মাড়ানো হয় কারও পক্ষে কল্যাণের নয়। আপনাকে যে খর্ব করে সে যে কেবল নিজেকেই কমিয়ে রাখে তা নয়, মোটের উপর সমস্ত মানুষের মূল্য সে হ্রাস করে।…

"প্রত্যেক মানুষের যে দেশে মূল্য আছে সমস্ত জাতি সে দেশে আপনিই বড়ো হয়।…

"কিন্তু, আমাদের দেশে কী হয়েছে? আমরা বিশেষ শিক্ষা দীক্ষা ও ব্যবস্থার দ্বারা সমাজের অধিকাংশ লোককেই খাটো করে রেখেছি। তারা যে খাটো এটা কোনো তর্ক বা বিচারের উপরে নির্ভর করে না, এটাকে বিধিমতে সংস্কারগত করে তুলেছি।…

…"যারা নীচে পড়ে আছে সংখ্যায় তারাই বেশি; তাদের জীবনযাত্রার আদর্শ সকল বিষয়েই হীন হলেও উপরের লোককে সেটা বাজে না।…

তাই তিনি বলিলেন,

"আমরা নিজেরা সমাজে যে অন্যায়কে আটেঘাটে বিধিবিধানে বেঁধে চিরস্থায়ী করে রেখেছি সেই অন্যায় যখন পলিটিক্সের ক্ষেত্রে অন্যের হাত দিয়ে আমাদের উপর ফিরে আসে, তখন সেটার সম্বন্ধে সর্বতোভাবে আপত্তি করবার জোর আমাদের কোথায়?

"জোর করি সেই বিদেশীরই ধর্মবুদ্ধির দোহাই দিয়ে। সে দোহাইয়ে কি লজ্জা বেড়ে ওঠে না! এ কথা বলতে কি মাথা হেঁট হয়ে যায় না যে 'সমাজে আমাদের আদর্শকে আমরা ছোটো করে রাখব, আর পলিটিক্সে তোমাদের আদর্শকে তোমরা উঁচু করে রাখো?' 'আমরা দাসত্বের সমস্ত বিধি সমাজের মধ্যে বিচিত্র আকারে প্রবল করে রাখব আর তোমরা তোমাদের ঔদার্যের দ্বারা প্রভুত্বের সমান অধিকার আমাদের হাতে নিজে তুলে দেবে; যেখানে আমাদের এলেকা সেখানে ধর্মের নামে আমরা অতি কঠোর কৃপণতা করব, কিন্তু যেখানে তোমাদের এলেকা সেখানে সেই ধর্মের দোহাই দিয়ে অপর্যাপ্ত বদান্যতার জন্যে তোমাদের কাছে দরবার করতে থাকব' এমন কথা বলি কোন মুখে?"

উল্লেখযোগ্য, দীর্ঘকাল যাবৎ জাতীয়-কংগ্রেস বর্ণবিদ্বেষ, অস্পৃশ্যতা ও সামাজিক বৈষম্য সম্পর্কে নীরব ছিল। ১৯১৭ সালে কলিকাতা কংগ্রেসেই সর্বপ্রথম অস্পৃশ্যতা-নিরোধ সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু ঐ পর্যন্তই, অস্পৃশ্যতা নিরোধের বা দূরীকরণের জন্য কংগ্রেস হ'তে কোন সুপরিকল্পিত আন্দোলন চালাইবার উদ্যোগ দেখা গেল না। গান্ধীজী ব্যক্তিগতভাবে অস্পৃশ্যতার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন কিন্তু তখনও পর্যন্ত উহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবার কথা চিন্তা করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল ধরিয়া দেশের নেতৃবৃন্দের নিকট এই গুরুতর প্রশ্ন ও সমস্যাটির কথা উত্থাপন করিয়া আসিতেছিলেন। তাছাড়া হিন্দু-মুসলমান বা সাম্প্রদায়িক সমস্যাটির দিকেও তিনি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই পত্রে তিনি উহার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিলেন,

"·· পরস্পরের মধ্যে পাকা দেওয়ালের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও এক চালের নীচে হিন্দু-মুসলমান আহার করতে পারবে না, এমন কি সেই আহারে হিন্দু-মুসলমানের নিষিদ্ধ কোনো আহার্য যদি নাও থাকে। যাঁরা এ কথা বলতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করেন না, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের সময় তারাই সন্দেহ করেন যে বিদেশী কর্তৃপক্ষেরা এই বিরোধ ঘটাবার মূলে। স্বদেশে মানুষে মানুষে ব্যবধানকে আমরা দুঃসহরূপে পাকা করে রাখব সেইটেই ধর্ম, কিন্তু বিদেশী সেই ব্যবধানকে কোনো কারণেই কোনো মতেই নিজের ব্যবহারে লাগালে সেটা অধর্ম। আত্মপক্ষে দুর্বলতাকে সৃষ্টি করব ধর্মের নামে, বিরুদ্ধপক্ষে সেই দুর্বলতাকে ব্যবহার করলেই সেটাকে অন্যায় বলব।"

কবি তাই বলিলেন,

"এমনি ক'রে যে দেশে ধর্মবুদ্ধিতে এবং কর্মবুদ্ধিতে মানুষ নিজেকে দাসানুদাস করে রেখেছে সে দেশে কর্তৃত্বের অধিকার চাইবার সত্যকার জোর মানুষের নিজের মধ্যে থাকতেই পারে না। সে দেশে এই-সকল অধিকারের জন্যে পরের বদান্যতার উপর নির্ভর করতে হয়।"

[ঐ : পৃ-১৫১-৫৫]

স্মরণ রাখা দরকার, ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ-কংগ্রেসে, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে এক আপোষ চুক্তিতে মিলিত শাসন-পরিকল্পনা রচিত হয় (*Congress-League Scheme*)। কিন্তু সমস্যার সমাধান তাহাতে হয় নাই। উহার অনতিকাল পরেই বিহার ও ভারতের অন্যত্র ভয়াবহ হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা শুরু হয়। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ এই ধরণের রাজনীতিক উদ্দেশ্য সাধনের ঐক্য-নীতিতে বিশ্বাস করিতেন না। তিনি বার বার স্মরণ করাইয়া দেন,—"মানুষের সঙ্গে মানুষের যে একটা সাধারণ সামাজিকতা আছে, যে সামাজিকতার টানে আমরা সহজ প্রীতির বশে মানুষকে ঘরে ডাকিয়া আনি, তাহার সঙ্গে বসিয়া খাই, যদি বা তাহার সঙ্গে আমাদের পার্থক্য থাকে সেটাকে অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া দেখিতে দিই না—সেই নিতান্ত সাধারণ সামাজিকতার ক্ষেত্রে যাহাকে আমরা ভাই বলিয়া, আপন বলিয়া

মানিতে না পারি, দায়ে পড়িয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ভাই বলিয়া যথোচিত সতর্কতার সহিত তাহাকে বুকে টানিবার নাট্যভঙ্গী করিলে সেটা কখনোই সফল হইতে পারে না।" ('লোকহিত' : ঐ, পৃঃ-৩০)। তিনি বলিয়া আসিতেছিলেন, জনসাধারণের মধ্যে অশিক্ষা, কুসংস্কার—ধর্মীয় ও সামাজিক নিগ্রহ ও অবমাননার মূল কারণগুলি দূর করিলে তবেই হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য ও পারস্পরিক সম্প্রীতির ভাব চিরস্থায়ী হইতে পারে।

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী

ফেব্রুয়ারী মাস ১৯১৯ সাল। সারা দেশব্যাপী 'মণ্ট-ফোর্ড' পরিকল্পনার' তীব্র সমালোচনা চলিতেছে। গান্ধীজী অবশ্য কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের সহিত একমত নহেন; তিনি বলিলেন, …"The scheme deserves sympathetic handling rather than summary rejection." অ্যানি বেসান্ত বলিলেন,…"unworthy of England to give and India to take." তিলক, চিত্তরঞ্জন প্রমুখ অন্যান্য সকলেই খুবই সন্দিহান ও বিক্ষুব্ধ। বিশেষ করিয়া 'র‍্যাওলাট কমিটি'র তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর হইতেই (৮ জুলাই, ১৯১৮) সারা দেশব্যাপী উহার তীব্র প্রতিবাদ ও অসন্তোষের বহ্নি ধূমায়িত হইতে থাকে।

যুদ্ধোত্তর যুগে দেশবাসীর স্বাধীনতা স্পৃহা ও প্রবল রাজনৈতিক উত্তেজনা দেখা দেয়। পণ্যমূল্যবৃদ্ধি, স্বল্প মজুরী, ছাঁটাই প্রভৃতি কারণে শ্রমিক অসন্তোষও প্রবল হইতে থাকে। 'পাঞ্জাবের পল্লী অঞ্চলে বলপূর্বক রংরুট সংগ্রহের তিক্তস্মৃতি তখনও বিদ্যমান। 'কামগাটমারু' জাহাজে আগত পাঞ্জাবীদের বিরুদ্ধে দলননীতি ও অপরাপর ষড়যন্ত্রের মামলায় অসন্তোষ বিস্তৃত হইতেছিল। বৈদেশিক যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত সৈনিকেরা আর পূর্বের ন্যায় যন্ত্রবৎ আদেশ পালনকারী নহে। তাহাদের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছিল ও তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট অসন্তোষ ছিল। অপরদিকে তুরস্কের ভবিষ্যৎ ও খিলাফৎ সমস্যায় এদেশীয় মুসলিম সমাজ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ। সারাদেশব্যাপী একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আভাস ইঙ্গিত পাইয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট 'র‍্যাওলাট বিল' বিধিবদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। ৬ই ফেব্রুয়ারী স্যার উইলিয়াম ভিনসেণ্ট্ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিল্‌টি উত্থাপন করিলেন। ভারতীয় সদস্যগণ একযোগে বিল্‌টির তীব্র প্রতিবাদ জানাইলেন। গান্ধীজীও উহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "র‍্যাওলাট আইন ভারতবাসীর ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও মানুষের জন্মগত স্বাভাবিক স্বাধীনতার পরিপন্থী।" ২৪শে ফেব্রুয়ারী গান্ধীজী ঘোষণা করিলেন যে, বিলটি প্রত্যাহৃত না হইলে প্রতিবাদে সত্যাগ্রহ বা নিষ্ক্রিয়-প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করিবেন। তৎসত্ত্বেও মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহ নাগাদ বিল্ পাস হইয়া গেল। গান্ধীজী সত্যাগ্রহ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তিনি সত্যাগ্রহের প্রতিজ্ঞাপত্রে ঘোষণা করিলেন, (২৪শে ফেব্রুয়ারী),—

…"we solemnly affirm that in the event of these bills becoming law and until they are withdrawn, we shall refuse civilly to obey these laws and such other laws as a committee,

to be hereafter appointed, may think fit, and we further affirm that in this struggle we will faithfully follow truth and refrain from violence to life, preson or property."

বলা বাহুল্য, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ 'স্বরাজের' (Self-government within the Empire) দাবি করিতেছিলেন। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয়, গান্ধীজী স্বরাজ দাবি কিংবা 'মণ্ট-ফোর্ড' পরিকল্পনা' বাছিয়া না-লইয়া র‍্যাওলাট আইনের বিরুদ্ধেই সত্যাগ্রহ-সংগ্রামের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। যাহাই হউক, দেশবাসী সংগ্রাম চাহিতেছিলেন, গান্ধীজী সংগ্রামের ডাক দিয়া পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইলেন। জাতীয় আন্দোলনের এক নূতন অধ্যায় সূচিত হইল।

বস্তুতপক্ষে, এই সময় হইতেই জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব গান্ধীজীর হাতে চলিয়া আসে। কংগ্রেস হইতে স্বতন্ত্রভাবে তিনি বল্লভভাই প্যাটেল, সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি কয়েকজনকে নির্বাচিত করিয়া একটি সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সংগঠিত করিয়া আন্দোলন শুরু করিলেন। ৩০শে মার্চ দেশের সর্বত্র হরতাল পালিত হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হয় এবং আত্ম-শুদ্ধির জন্য অনশন ও প্রার্থনা করিবার নির্দেশও ঐ-সাথে দেওয়া হয়। হঠাৎ দিন পরিবর্তন করিয়া ৬ই এপ্রিল হরতালের দিন ধার্য করা হয়। কিন্তু এই সংবাদ দেশের সর্বত্র গিয়া পৌঁছিল না;—নির্দেশ পাইবামাত্র বিক্ষুব্ধ জন-সাধারণ মিছিল ও শোভাযাত্রা করিয়া বাহির হইয়া পড়ে। দিল্লীতে শোভা-যাত্রাকারী জনতার সহিত পুলিশের সংঘর্ষ হয়, এবং বহুলোক হতাহত হয়। কলিকাতা, অমৃতসর, বোম্বাই ও আমেদাবাদেও বিক্ষুব্ধ শোভাযাত্রাকারীদের উপর গুলি চলে। গান্ধীজী পাঞ্জাব ও দিল্লীর অবস্থা শান্ত ও নিয়ন্ত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে বোম্বাই হইতে দিল্লীর পথে যাত্রা করিলেন কিন্তু পথিমধ্যে পুলিশ তাঁহাকে আটক করে এবং প্রায় বলপূর্বক তাঁহাকে বোম্বাইয়ে ফিরাইয়া আনা হয় (৯ই এপ্রিল)। সারা দেশে রাষ্ট্র হইল, গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এই সংবাদে দেশবাসী ক্রোধে প্রায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। আন্দোলন তখন সম্পূর্ণভাবে জনতার হাতে,—জনতা প্ররোচিত ও পুলিসী দমন-নীতিতে ভীষণ উত্তেজিত।

এদিকে পাঞ্জাবে আন্দোলন চূড়ান্ত আকার ধারণ করে। ১০ই এপ্রিল প্রাতে অমৃতসরে ডাঃ কিচলু ও ডাঃ সত্যপালকে অকস্মাৎ গ্রেপ্তার করিয়া কোথায় যেন অন্তরীণ করা হয়। মুহূর্তে সংবাদটা সারা শহরে ছড়াইয়া পড়ে। বিক্ষুব্ধ জনতা ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলো ঘেরাও করিয়া নেতাদের মুক্তি দাবি করে। বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিস কয়েকবারই গুলি-বর্ষণ করে। ফলে জনতা আরো ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। অমৃতসর, কাসুর, গুজরানওয়ালায় পুলিসের সহিত জনতার তীব্র সংঘর্ষ শুরু হয়। পাঞ্জাবের গভর্ণর স্যার মাইকেল ও'ডায়ার কঠোর হস্তে এই আন্দোলনকে দমন করিতে বদ্ধপরিকর হন। তারপর শুরু হয় বীভৎস পুলিসী দমন-নীতি। ১০ই

এপ্রিল পাঞ্জাবে মার্শাল ল' ঘোষিত হয়। প্রায় সাথে সাথেই সেখানকার সমস্ত সংবাদ প্রেরণ ও প্রকাশ নিষিদ্ধ করা হয়। পাঞ্জাবের বুকে কৃষ্ণ যবনিকা নামিয়া আসে—সমস্ত ভারতবর্ষ হইতে পাঞ্জাব বিচ্ছিন্ন হয়। এদিকে দিল্লী, বোম্বাই ও পাঞ্জাবে আন্দোলন যখন চূড়ান্ত আকার ধারণ করিয়াছে, গান্ধীজী তখন তাঁহার আদর্শ ও নীতির কথা চিন্তা করিয়া সংগ্রাম স্থগিত রাখার কথা চিন্তা করিতেছেন। তিনি বলিলেন, "I think the occasion has arrived when I should offer satyagraha against ourselves for the violence that has occurred."

রবীন্দ্রনাথ সারা দেশব্যাপী স্বাধীনতাকামী ও মুক্তিপাগল মানুষের এই আন্দোলনকে দূর হইতে লক্ষ্য করিতেছিলেন। দেশের স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য তিনিও কম উদ্‌গ্রীব ছিলেন না। কিন্তু গান্ধীজী পরিচালিত সত্যাগ্রহ আন্দোলন যখন বিদ্রোহ-বিপ্লবের স্বাভাবিক ও তৎসহজাত প্রতিক্রিয়ার পথে চলিতে শুরু করে, কবি তখন তাঁহার উদ্বেগ ও মতামতের কথা জানাইয়া গান্ধীজীকে এক খোলা চিঠি লিখিলেন! ১২ই এপ্রিল চিঠিটি লেখা হয় এবং ১৬ই এপ্রিল উহা 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সংগ্রামের নীতি ও পন্থা সম্পর্কে কবির মতামত হিসাবেও চিঠিটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান দলিল,

"Dear Mahatmaji,

Power in all its forms is irrational,—it is like the horse that drags the carriage blind-folded. The moral element in it is only represented in the man who drives the horse. Passive resistence is a force which is not necessarily moral in itself; it can be used against truth as well as for it. The danger inherent in all force grows stronger when it is likely to gain success, for then it becomes temptation.

"I know your teaching is to fight against evil by the help of the good. But such a fight is for heroes and not for men led by impulses of the moment. Evil on one side naturally begets evil on the other, injustice leading to violence and insult to vengefulness. Unfortunately, such a force has already been started, and either through panic or through wrath, our authorities have shown us their claws whose sure effect is to drive same of us into the secret path of resentment and others into utter demoralizatlon."

বলা বাহুল্য, এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের দূরদৃষ্টি ও সাধারণ ব্যবহারিক বুদ্ধি গান্ধীজী অপেক্ষা বাস্তব বা practical বলিয়া বোধ হইতে পারে; কিন্তু আসলে কবি অসংগঠিত গণসংগ্রামের নেতৃত্বের বিরাট দায়িত্বের ঝুঁকি লইবারমধ্যে

বিপদটা কোথায় তাহাই নির্দেশ করিতে গিয়া যেন সংগ্রামকেই স্থগিত রাখিবার ইঙ্গিত করিতেছেন। কবির আশংকা অমূলক নহে,—কিন্তু একটি পরাধীন দেশ ও জাতির মুক্তি সাধনার পথে নেতৃত্বকে অতি অবশ্যই এই দায়িত্ব ও ঝুঁকি লইতে হয়। গান্ধীজী বারে বারে এই দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছেন। অবশ্য তাই বলিয়া কবি গান্ধীজীর নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থা বা দুরাশা প্রকাশ করিতেছেন না। স্বাধীনতার জন্য তিনিও কম উদ্‌গ্রীব নহেন এবং তাহার জন্য জাতিকে যে কঠিন দুঃখ ও দীর্ঘ সংগ্রামের পথে অগ্রসর হইতে হইবে এ বিষয়ে তিনি গান্ধীজীর সহিত একমত। তাই গান্ধীজীর প্রতি সতর্কবাণী হইলেও ভরসা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া তিনি ঐ-পত্রে আরো লিখিলেন,

"In this crisis you, as a great leader of men, have stood among us to proclaim your faith in the ideal which you know to be that of India—the ideal which is both against the cowardliness of hidden revenge and the cowed submissiveness of the terror stricken. You have said, as Lord Buddha has done in his time and for all time to come : *'Conquer anger by power of, non-anger and evil by the power af good.'*

"This power of good must prove its truth and strength by its fearlessness, by its refusal to accept any imposition which depends for its success upon its power to produce frightfulness and is not ashamed to use its machine of destruction to terrorize a population completely disarmed. We must know that moral conquest does not consist in success, that failure does not deprive it of its dignity and worth···

"I have always felt, and said accordingly, that the great gift of freedom can never come to a people through charity. We must win it before we can own it. India's opportunity for winning it will come to her when she can prove that she is morally superior to the people who rule by their strength of conquest. She must willingly accept her penance of suffering, the suffering which is the crown of the great Armed with her utter faith in goodness, she must stand unabashed before the arrogance that scoffs at the power of spirit.

"And you have come to your motherland in the time of her need to remind her of her mission, to lead her in the true path of conquest, to purge her present-day politics of its feebleness, which imagines that it has gained its purpose

when it struts in .the borrowed feathers of diplomatic dishonesty.

"This is way I pray most fervently that nothing that tends to weaken our spiritual freedom may intrude into our marching line, the martyrdom for its cause of truth may never degenerate into fanaticism for mere verbal forms, descending into self-deception that hides itself behind sacred aims"...

[দ্রঃ *Modern Review* : May 1919—pp. 539-40.]

বলা বাহুল্য, ইহা কবি রবীন্দ্রনাথের কথা। ভারতের লক্ষ লক্ষ অশিক্ষিত জনসাধারণকে গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথ পরিকল্পিত ঐ বিশুদ্ধ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সংগ্রামের পথে পরিচালিত করিবার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে, ইহা স্বাভাবিক। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের কয়েকটি বিশেষ নির্দিষ্ট সর্ত ও রূপ আছে,—অবশ্য দেশ-কাল অনুযায়ী তাহার বিশেষ বাস্তব সমস্যাও আছে। তাছাড়া জনসাধারণের চেতনার মান, নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক প্রস্তুতি ইত্যাদি কি স্তরে আছে, তাহাও বিচার-বিবেচনার বিষয়। ভারতের কোটি কোটি অশিক্ষিত জনসাধারণকে কিভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে সংগঠিত এবং সেই সংগ্রামকে চূড়ান্ত জয়যুক্ত করা যায়, সেই সম্পর্কে প্রচলিত রাজনীতিক নীতি-কৌশল কিংবা দেশ-বিদেশের ইতিহাসের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লইতে গান্ধীজী বা রবীন্দ্রনাথ,—উভয়েই নারাজ। এই দুই মহান ভাবুক সমগ্র মানুষের হৃদয় ও চিন্তা-চেতনায় কি করিয়া একটি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিপ্লব ঘটান যায়, তাহারই চিন্তায় বিভোর। কিন্তু গান্ধীজীর শুধু আদর্শ চিন্তাই নয়—Action বা সংগ্রামটাও বড়ো কথা এবং সেই সংগ্রাম, অহিংস সত্যাগ্রহ সংগ্রাম। দেশের জনগণ এই সত্যাগ্রহ সংগ্রামকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত নহে, অথচ র‍্যাওলাট আইনের প্রতিরোধ করিতে হইলে ব্যাপক গণআন্দোলন ও সংগ্রামের প্রয়োজন,—গান্ধীজীর কাছে ইহাই প্রধান সমস্যা। কিন্তু এই প্রস্তুতির অজুহাতে গান্ধীজী কালক্ষেপ করিতে চাহেন নাই ; অধীর আবেগে তিনি এই প্রতিরোধ-সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। এদিকে আন্দোলন যখন ইতিহাস-নির্দেশিত-স্বাভাবিক গতিপথ করিয়া লইতে উদ্যত হইয়াছে, গান্ধীজী তাঁহার নীতি ও আদর্শের কথা চিন্তা করিয়া সংগ্রাম প্রত্যাহার করিয়া লইবার কথা চিন্তা করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের মনেও এই সত্যাগ্রহ সংগ্রাম সম্পর্কে একটি দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলিতেছে। একদিকে নীতিগতভাবে তিনি যেমন সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে আন্তরিক সমর্থন জানাইতেছিলেন, অপরদিকে বাস্তবত আন্দোলন স্বাভাবিক পথে চলিতে শুরু করিলে, আদর্শ ও নীতিগত বিচ্যুতির কথা চিন্তা করিয়া ঐ আন্দোলন সম্পর্কে সংশয় ও আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া গান্ধীজীকে সতর্ক করিয়া দিতে চাহিলেন।—যাহা মুষ্টিমেয় অহিংস সত্যসাধক বীরের পথ, তাহা অশিক্ষিত ও অসংযত জনতার পথ হইতে পারে কী করিয়া,—ইহাই কবির গভীর আশঙ্কা

ও অন্তর্দ্বন্দ্ব।

যাহাই হউক, আন্দোলন নেতৃত্বের হাত হইতে জনতার হাতে চলিয়া গেল। ১৩ই এপ্রিল ১৯১৯, হিন্দুদের নববর্ষের দিনে, সেই ইতিহাস-কুখ্যাত জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। এতখানি বীভৎস পৈশাচিক বর্বরতা ইংরাজশাসনকালে বুঝি আর কখনো দেখা যায় নাই। সেই স্বল্পপরিসর জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রায় ২০,০০০ জনতার উপর জেনারেল ডায়ার দেড়শত সৈন্য লইয়া প্রায় ১৬০০ রাউণ্ড গুলি বর্ষণ করে, যতক্ষণ পর্যন্ত বন্দুকের গুলি নিঃশেষিত না হইয়াছে। ইংরাজ-সরকারেরই হিসাব মতে প্রায় ৪০০ ব্যক্তি নিহত ও ১২০০ জন আহত হয়। তাছাড়া পরে বিচারে ৫১ জনের ফাঁসি ও ৪৬ জনের দ্বীপান্তর এবং বাকী সকলের ২ হইতে ১৩ বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড হয়। প্রায় এক বৎসর পরে 'হাণ্টার কমিশনের' সমক্ষে সাক্ষ্য দিতে গিয়া সেই মদোদ্ধত নরপিশাচ ডায়ার সগর্বে ঘোষণা করিয়াছিল,

…"It was a horrible duty I had to perform. I think it was a merciful thing. I thought that I should shoot well and shoot strong, so that I or anybody else, should not have to shoot again."…

জেনারেল ডায়ারের ঐ হত্যাকাণ্ড সমর্থন করিয়া পাঞ্জাবের গভর্ণর ও' ডায়ার তৎক্ষণাৎ একটি তারবার্তায় তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন, "Your action correct. Lieutenant Governor approves."

বলা বাহুল্য, এই বীভৎস পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের সঠিক সংবাদ দেশের লোক জানিতে পারিল না,—একটি অস্পষ্ট গুজবের মত ভাসা-ভাসা সংবাদ আসিতেছে। গান্ধীজীও সংবাদ পাইলেন। ১৮ই এপ্রিল গান্ধীজী সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়া লইতে গিয়া খেদোক্তি করিলেন,…"*a blunder of Himalayan dimensions* which had enabled ill-disposed persons, not true passive resisters at all, to perpetuate disorders."

গান্ধীজীর জীবনীকার টেণ্ডুলকর এই সময়কার যে সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, গান্ধীজী এইসব ঘটনায় ইংরেজ সরকার অপেক্ষা দেশের জনসাধরণের হিংসাত্মক ও বিশৃঙ্খল কার্যকলাপের জন্যই যেন বেশী ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। আন্দোলন প্রত্যাহার করিতে গিয়া আত্মসমালোচনা ও ঘটনাবলীর পর্যালোচনা করিয়া গান্ধীজী বলিলেন,

"…It is not without sorrow I fell compelled to advise the temporary suspension of civil disobedience…I am sorry when I embarked upon a mass movement, I underrated the forces of evil and I must now pause and consider how best to meet the situation…

…"I would be untrue to satyagraha if I allowed it by any

action of mine to be used as an occasion for feeding violence, for embittering relations between the English and the Indians. Our Satyagraha must, therefore, now consist in ceaselessly helping the authorities in all the ways available to us as satyagrahis to restore order and to curb lawlessness"...

[*Mahatma.* : *Vol I.* P. 261]

বড়লাট, চতুর চেমস্‌ফোর্ড, গান্ধীজীর এইসব বিবৃতির পূর্ণ সুযোগ লইলেন। দৃপ্তকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করিলেন, দেশের এই আন্দোলনকে তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি দিয়া ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দিবেন। গান্ধীজীর এই আত্ম-সমালোচনার আদর্শগত ও নৈষ্ঠিক তাৎপর্য যাহাই হউক না কেন, ইংরেজ সরকার ইহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া দেশবাসীর সংগ্রামের নৈতিক মনোবলকে (morale) ভাঙ্গিয়া দিতে চাহিল। হতবুদ্ধি ও বিমূঢ় দেশবাসী এই দারুণ দুর্দিনে গান্ধীজীর নিকট হইতে এইভাবে ভৎর্সিত ও তিরস্কৃত হইয়া বেশ কিছুটা ম্রিয়মান ও হতাশ হইয়া গেল। এই সম্পর্কে টেণ্ডুলকর আরো লিখিতেছেন,

"While Gandhi declared his readiness to assist restore normal conditions, Lord Chelmsford published a Government resolution conveying his intention, in the plainset terms, to employ all available force to suppress the national movement."

[*Ibid* : P.262.]

রবীন্দ্রনাথ ও এণ্ড্রুজ তখন শান্তিনিকেতনে। বহুদিন পর্যন্ত জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের সঠিক কোন সংবাদ তিনি পান নাই এবং পরে কিভাবে ও কাহার মারফতে এই সংবাদ পাইলেন, বলা শক্ত। শুধু সংবাদপত্রে দেশের পরিস্থিতির যেটুকু সংবাদ পাওয়া যায়, তাহার বাহিরে কিছু জানিবার উপায়ও নাই। উহাতেই কবির মন কী উদ্বিগ্ন তাহা এই সময়কার কবির চিঠিপত্রে প্রকাশ পায়। পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারী হইবার কয়েকদিন পরই এণ্ড্রুজ কবির সহিত পরামর্শ করিয়া দিল্লী চলিয়া গেলেন (১৭ই এপ্রিল)। উহার ২।১ দিন পরই সংবাদপত্রে গান্ধীজী কর্তৃক আন্দোলন প্রত্যাহারের সংবাদ প্রকাশিত হয়। ২০ শে এপ্রিল কবির লেখা এক পত্রে (খুব সম্ভবত এণ্ড্রুজকে দিল্লীতে) দেশের আন্দোলন ও গান্ধীজী সম্পর্কে কবির ধারণা ব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। কবি লিখিলেন,

"Dear Friend,

I belive our outcry against the wrongs inficted upon us by our governing power is becoming more vehement than is good for us. We must not claim sympathy or kind treatment with too great an insistance and intensity...He who causes suffering becomes small when his victims have the power to

rise above it by their heroism of fearlessness. This is the lesson which Gandhi has been trying to preach to his countrymen. And now when his attempt to hold the banner of moral power above those of the brute forces has met with an apparent failure, when those of us who desire success without having to pay for it and other who wait interminable days to reap their harvest of comfortable politics from the soil of sycophancy are hastening to disown him with shrill protestation of innocence, Gandhi's personality shines before us with a greater glory than when his light was blurred by the duststorm of popularity. And this one fact of his presence in our midst reconciles us to weatever sufferings we are passing through and whatever others we have to face. The expression of the best ideal os the age need not grow fat in bulk but let it become immortal with its truth. And the rejection of it by a number of timid people overwhelmed with terror by no means proves its rejection by our history. Please convey my namaskar to Mahatmaji in these days of hii trial."

[*Modern Review* : May 1919, pp. 556-57]

এই চিঠি হইতে আরও প্রমাণিত হয় যে, পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ড বা ইংরাজের পৈশাচিক দলননীতির, তখনও পর্যন্ত তিনি বিস্তারিত সংবাদ পান নাই। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিতেছেন,

..."পাঞ্জাবের এই অনাচার অত্যাচারের বিন্দু-বিসর্গ সংবাদ বেসরকারী মহলে প্রকাশিত হয় নাই। জনশ্রুতির মতো দুই একটি খবর আসিতেছে—তাহার সত্যাসত্য নির্ধারণের উপায় নাই। ৮ জ্যৈষ্ঠ বা প্রায় মাসাধিককাল পর্যন্ত যাহা কিছু জানা গিয়াছে তাহাতেই রবীন্দ্রনাথের মন কী উদ্বিগ্ন ও কী উত্তেজিত তাহার আভাস পাই ঐদিনে ভানুসিংহের পত্রাবলীর কয়েকটি ছত্র হইতে—'আকাশের এই প্রতাপ আমি একরকম ক'রে সইতে পারি কিন্তু মর্ত্যের প্রতাপ আর সহ্য হয় না।...পাঞ্জাবের...দুঃখের তাপ আমার বুকের পাঁজর পুড়িয়ে দিলে।'

"জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের খবর কবি কাহার কাছ হইতে পান স্পষ্ট জানা যায় না। কথা ছিল ২৯ মে শান্তিনিকেতনে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে কবি পৌরোহিত্য করিবেন। সেইভাবে নিমন্ত্রণ পত্র মুদ্রিত হয়। কিন্তু পঞ্জাবের খবর পাইয়া সে সমস্ত বাতিল করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন।

"কবি শান্তিনিকেতনে স্থির হইয়া বাস করিতে পারিলেন না ; ১২ জ্যৈষ্ঠ কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। পরদিন প্রাতে তিনি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন।...লেখক সেদিন কলিকাতায়। রামানন্দবাবুর দ্বিতলের বারান্দায় উভয়কে কথাবার্তা কহিতে দেখিয়াছিলাম—কী গম্ভীর, কী স্তব্ধ মূর্তি। তখন আমরা জানিতামও না যে পঞ্জাবে কী ঘটিয়াছে এবং কবি রামানন্দবাবুর সহিত কী পরামর্শ করিতে আসিয়াছেন।

"কবি কলকাতায় আসিয়া পঞ্জাব-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভার প্রস্তাব করেন, কিন্তু কোনো নেতার সাড়া পাওয়া গেল না। শেষে ২৯ মে রাত্রে ভাইসরয়কে লিখিলেন তাঁহার চরমপত্র।"...

[রবীন্দ্রজীবনী : ৩য় খণ্ড, পৃঃ-১৪]

সেই অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক দিনটির বিবরণ দিয়া শ্রীপ্রশান্ত মহলানবিশ মহাশয় লিখিতেছেন,

..."ভোর হয়নি—হয়তো চারটে হবে—উঠে স্নান করে বেরিয়ে পড়লুম। ...আকাশ একটু ফর্সা হয়েছে। কিন্তু ঘর তখনো অন্ধকার। আমি ঘরে যেতেই মুখ ফিরিয়ে বললেন, কী এসেছো? এই বলে আবার লিখতে আরম্ভ করলেন। দু-তিন মিনিট। তারপরেই একখানা কাগজ হাতে দিয়ে বললেন, পড়ো। বড়লাটকে লেখা নাইটহুড্ পরিত্যাগ করার চিঠি।...

"কবি তখন বললেন,—সারারাত ঘুমাতে পারিনি। বাস্ এখন চুকলো। আমার যা করবার তা হয়ে গিয়েছে। মহাত্মাজি রাজি হলেন না পাঞ্জাবে যেতে। কাল তাই নিজেই গিয়েছিলুম চিত্তরঞ্জনের কাছে। বললুম যে, এই সময় সমস্ত দেশ মুখ বন্ধ করে থাকবে এ অসহ্য। তোমরা প্রতিবাদ সভা ডাকো। আমি নিজেই বলছি যে, আমি সভাপতি হবো। চিত্ত একটু ভেবে বললে, বেশ। আর কে বক্তৃতা দেবে? আমি বললুম, সে তোমরা ঠিক করো। চিত্ত আরেকটু ভাবলে—বললে, আপনি যদি সভাপতি হন, তবে তারপরে আর কারুর বক্তৃতা দেওয়ার দরকার হয় না। আপনি একা বললেই যথেষ্ট। আমি বললুম, তাই হবে। এবার তবে সভা ডাকো। তখন চিত্ত বললে, আপনি একা যখন বক্তৃতা দেবেন, আপনিই সভাপতি, তখন সব চেয়ে ভালো হয় শুধু আপনার সভা-ডাকা। বুঝলুম ওদের দিয়ে হবে না। তখন বললুম, আচ্ছা আমি ভেবে দেখি। এই বলে চলে এলুম। অথচ আমার বুকে এটা বিঁধে রয়েছে কিছু করতে পারবো না, এ অসহ্য। আর আমি একাই যদি কিছু করি, তবে লোক জড়ো করার দরকার কি? আমার নিজের কথা আমার নিজের মতো করে বলাই ভালো। এই সম্মানটা ওরা আমাকে দিয়েছিল। কাজে লেগে গেল। এটা ফিরিয়ে দেওয়ার উপলক্ষ্য করে আমার কথাটা বলবার সুযোগ পেলুম।"

[শারদীয়া দেশ : ১৩৬৭, পৃঃ-২২]

কবি চাহিয়াছিলেন, ইংরেজের এই জঘন্য পৈশাচিক বর্বরতার বিরুদ্ধে সারা দেশের মধ্যে অন্তত একটি জায়গা থেকেও প্রতিবাদ উঠুক। ইহা কবির কর্ম নয়,—এ দায়িত্ব দেশের নেতৃবৃন্দের। কিন্তু কবিকে অত্যন্ত করুণভাবে নিরাশ হইতে হয়। কী মর্মান্তিক দুঃখ ও যন্ত্রণায় কবি শেষ পর্যন্ত নাইটহুড্

পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। কবি ভাইসরয়কে সেই ঐতিহাসিক পত্রে লিখিলেন, (২৯'শে মে),

"কয়েকটি স্থানীয় হাঙ্গামা শান্ত করিবার উপলক্ষে পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার প্রচণ্ডতায় আজ আমাদের মন কঠিন আঘাত পাইয়া ভারতীয় প্রজাবৃন্দের নিরুপায় অবস্থার কথা স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াছে। হতভাগ্য পাঞ্জাবীদিগকে যে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে, তাহার অপরিমিত কঠোরতা ও সেই দণ্ড প্রয়োগ বিধির বিশেষত্ব, আমাদের মত কয়েকটি আধুনিক ও পূর্বতন দৃষ্টান্ত বাদে সকল সভ্য-শাসনতন্ত্রের ইতিহাসে তুলনাহীন। যে প্রজাদের প্রতি এইরূপ বিধান করা হইয়াছে, যখন চিন্তা করিয়া দেখা যায়, তাহারা কিরূপ নিরস্ত্র ও নিঃসম্বল, এবং যাঁহারা এইরূপ বিধান করিয়াছেন, তাঁহাদের লোক-হনন-ব্যবস্থা কিরূপ নিদারুণ, নৈপুণ্যশালী, তখন একথা আমাদিগকে জোর করিয়াই বলিতে হইবে যে. এরূপ বিধান পোলিটিক্যাল প্রয়োজন বা ধর্মবিচারের দোহাই দিয়া নিজের সাফাই করিতে পারে না। পাঞ্জাবী নেতারা যে অপমান ও দুঃখ ভোগ করিয়াছেন, নিষেধরুদ্ধ কঠোর বাধা ভেদ করিয়াও তাহার বিষ ভারতবর্ষের দূরদূরান্তরে ব্যাপ্ত হইয়াছে। তদুপলক্ষে সর্বত্র জনসাধারণের মনে যে বেদনা-পূর্ণ ধিক্কার জাগ্রত হইল আমাদের কর্তৃপক্ষ তাহাকে উপেক্ষা করিয়াছেন এবং সম্ভবত এই কল্পনা করিয়া তাঁহারা আত্মশ্লাঘা বোধ করিতেছেন যে, ইহাতে আমাদিগের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হইল। এখানকার ইংরেজচালিত অধিকাংশ সংবাদপত্র এই নির্মমতার প্রশংসা করিয়াছে এবং কোনও কোনও কাগজে পাশব নৈষ্ঠুর্যের সহিত আমাদের দুঃখ ভোগ লইয়া পরিহাস করা হইয়াছে, অথচ আমাদের যে সকল শাসনকর্তা পীড়িত পক্ষের সংবাদ পত্রে ব্যথিতের আর্তধ্বনি বা শাসননীতির ঔচিত্য আলোচনা বলপূর্বক অবরুদ্ধ করিবার জন্য নিদারুণ তৎপরতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারাই উক্ত ইংরেজ-চালিত সংবাদপত্রের কোনো চাঞ্চল্যকে কিছুমাত্র নিবারণ করেন নাই। যখন জানিলাম যে, আমাদের সকল দরবার ব্যর্থ হইল, যখন দেখা গেল প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তিতে আমাদের গবর্ণমেণ্টের রাজধর্মদৃষ্টি অন্ধ করিয়াছে, অথচ যখন নিশ্চয় জানি, নিজের প্রভূত বাহুবল ও চিরাগত ধর্ম-নিয়মের অনুযায়িক মহদাশয়তা অবলম্বন করা এই গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কত সহজ কার্য ছিল, তখন স্বদেশের কল্যাণ কামনায় আমি এইটুকু মাত্র করিবার সংকল্প করিয়াছি যে, আমাদের বহুকোটি যে ভারতীয় প্রজা অদ্য আকস্মিক আতঙ্কে নির্বাক হইয়াছে, তাহাদের আপত্তিকে বাণী দান করিবার সমস্ত দায়িত্ব এই পত্রযোগে আমি নিজে গ্রহণ করিব। অদ্যকার দিনে আমাদের ব্যক্তিগত সম্মানের পদবীগুলি চতুর্দিকবর্তী জাতিগত অবমাননার অসামঞ্জস্যের মধ্যে নিজের লজ্জাকেই স্পষ্টতর করিয়া প্রকাশ করিতেছে। অন্তত আমি নিজের সম্বন্ধে এই কথা বলিতে পারি যে, আমার যে-সকল স্বদেশবাসী তাহাদের অকিঞ্চিৎকরতার লাঞ্ছনায় মানুষের অযোগ্য অসম্মান সহ্য করিবার অধিকারী বলিয়া গণ্য হয়,

নিজের সমস্ত বিশেষ সম্মান-চিহ্ন বর্জন করিয়া আমি তাহাদেরই পার্শ্বে নামিয়া দাঁড়াইতে ইচ্ছা করি। রাজাধিরাজ ভারতেশ্বর আমাকে 'নাইট' উপাধি দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন সেই উপাধি পূর্বতন যে রাজপ্রতিনিধির হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাঁহার উদারচিত্ততার প্রতি চিরদিন আমার পরম শ্রদ্ধা আছে। উপরে বিবৃত কারণবশত বড়ো দুঃখেই আমি যথোচিত বিনয়ের সহিত শ্রীল শ্রীযুক্তের নিকট অদ্য এই উপরোধ উপস্থাপিত করিতে বাধ্য হইয়াছি যে, সেই 'নাইট' পদবী হইতে আমাকে নিষ্কৃতিদান করিবার ব্যবস্থা করা হয়।"

সেদিনের সেই ঘোর দুর্যোগের অন্ধকারে দেশবাসীর সমস্ত অপমান ও লাঞ্ছনার কালিমা সবটুকুই কবি যেন একাই দুইহাতে সর্বাঙ্গে মাখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের এই প্রতিবাদপত্র সে-দিন সারা দেশের মানুষের বুকে যে কী আশা-ভরসা ও সাহসের সঞ্চার করিয়াছে,—যে কী বিপুল সাজাত্য-বোধ ও আবেগের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা বলিয়া প্রকাশ করা যায় না। এই একটিমাত্র প্রতিবাদের মাধ্যমে সমগ্র জাতি যেন বিশ্বের দরবারে বিচার ও প্রতিকার মাগিয়াছে। ইউরোপ আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের বিবৃতিতে কম চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় নাই ;—এই একটি মাত্র প্রতিবাদপত্র সকলের দৃষ্টিকে যেন ভারতবর্ষের দিকে অঙ্গুলি-সংকেত করিয়াছে। এমন কি বিলাতের রক্ষণশীল পত্র-পত্রিকাগুলির মধ্যেও ইহার ফলে বেশ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রজীবনীকার লিখিতেছেন,

"বিলাতের কাগজের মধ্যে 'ডেইলি হেরালড্' লিখিল, 'কবি প্রো-জার্মান বা এণ্টি-বৃটিশ নহেন ; ভারতীয় নেতারা যে উপাধির খাতিরে তাহাদের জন্মগত অধিকার ত্যাগ করিবে না তাহা রবীন্দ্রনাথের পত্র হইতে প্রতীয়মান হইতেছে।' ম্যানচেসটার গার্ডিয়েন কবির পত্র পাঠ করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত ও ব্যথিত হইয়া লিখিলেন যে, 'কবি যেসব কথা বলিয়াছেন সে-সম্বন্ধে অবিলম্বে ভারত-সরকারের তদন্ত করা প্রয়োজন।' দি ঈসট্ অ্যাংগলিকান টাইম্‌স সেই কথাই লিখিয়া বলিলেন, 'আমরা যদি এখনি তাহা না করি, তবে 'We are a disgraced people." [রবীন্দ্রজীবনী : তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ-১৭]

বস্তুত ইংরাজকে ইহার জন্য কম বিব্রত হইতে হয় নাই। অবশ্য রবীন্দ্র-নাথও এই প্রতিবাদপত্রের জন্য ইংলণ্ড-আমেরিকায় তাঁহার রক্ষণশীল বুদ্ধিজীবী বন্ধুদের বিরাগভাজন হন, যাহার জন্য কবি কম ব্যথিত হন নাই।

কবির জীবনে এই প্রতিবাদ-পত্র একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। মহাযুদ্ধের অবসানে কবি যখন 'বিশ্বজাতিক মহামিলন-যজ্ঞের' স্বপ্ন দেখিতেছেন তখন ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন বলিষ্ঠ রাজনীতি ও নেতৃত্বের অভাবে-কতকগুলি স্বাভাবিক অন্তর্বিরোধ ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে যাহার জন্য কবির মন তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বে ভারাক্রান্ত। ভারতের জাতীয় মুক্তি সাধনার যে সংগ্রাম-পদ্ধতি হইবে সেই সম্পর্কে গান্ধীজীকে তাঁহার আশঙ্কার কথা জানাইয়া যে পত্র লিখেন, পূর্বেই তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে অনেকটা এই

ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, কবি-সুলভ সংগ্রাম-বিমুখতাই রবীন্দ্রনাথকে এই ভয়াবহ আন্দোলনের বিরুদ্ধে পিছু টানিতেছে। বস্তুত কবি নিজেও যেন জাতির এই সংগ্রামে তাঁহার যথাযোগ্য ভূমিকাটি অন্বেষণ কিংবা পালন করিতে না-পারায় মনে মনে কিছুটা অসন্তুষ্ট ও অপরাধী ভাবিতেছিলেন। কিন্তু পাঞ্জাবের ঘটনায় তাঁহার অবরুদ্ধ মানসিক যাতনা যেন ফাটিয়া পড়িল। কিন্তু আতঙ্কে নয়,—সংগ্রাম-বিমুখতাই নয়;—কবি সত্য সত্যই হিংসা ও বলপ্রয়োগ-নীতিকে (force, violence) আন্তরিক ঘৃণা করিতেন, এবং কেন করিতেন, তাহা 'পথ ও পাথেয়,' 'সদুপায়', 'দেশহিত', 'ছোটো ও বড়ো' 'স্বাধিকার প্রমত্তঃ,' এবং 'বাতায়নিকের পত্র', প্রভৃতি প্রবন্ধে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্মরণ রাখা দরকার, তীব্র উত্তেজনার মুখে কবি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া কারাবরণ করিতে চাহিলেন,—রুগ্ন শরীরে কলিকাতায় নেতাদের দুয়ারে-দুয়ারে প্রতিবাদ-সভা সংগঠিত করার প্রস্তাব লইয়া ধর্ণা দিয়া ফিরিলেন। যখন কিছুতেই কিছু হইল না তখন বহু চিন্তা-ভাবনার পর স্থির করিলেন, ইংরেজের দেওয়া 'নাইট্' উপাধি ত্যাগ করিয়া ঐ বীভৎস পাশবিকতার প্রতিবাদ করিতে হইবে। আরও স্মরণ রাখা দরকার, তখন ইহা অপেক্ষাও কম উত্তেজনাকর সরকার-বিরোধী কথা বলার জন্য অনেকে গ্রেপ্তার হইতেছিলেন, এবং উহার পরিণামে কী হইতে পারে কবি তাহাও কতকটা অনুমান করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু সত্য সত্যই যদি গান্ধীজী ও নেতৃবর্গ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া আন্দোলন চালাইয়া যাইতেন, গান্ধীজী যদি কবির প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সম্মিলিত প্রতিবাদ আন্দোলন সৃষ্টি করিতেন তাহা হইলে ঘটনাস্রোত কোন দিকে প্রবাহিত হইত, তাহা বলা শক্ত। সেদিন এমনই এক বিপজ্জনক সীমানার শেষপ্রান্তে আসিয়া কবি উপস্থিত হইয়াছিলেন যে, উহার একচুল বেশী অগ্রসর হইলে তাঁহার জীবনের স্রোত কোন্ মুখে ও কি ভাবে প্রবাহিত হইত, তাহা বলা যায় না। বিপজ্জনক রাজনীতির এতো কাছাকাছি—এতো মুখোমুখি কবি আর কোনোদিন উপস্থিত হন নাই।

কিন্তু তবুও বলিতে হইবে, কবির এই ক্রুদ্ধ সংগ্রামী-আবেগ সাময়িক মাত্র। রাজনীতির যথাযথ তাৎপর্য ও ভূমিকাটি কোন দিনই কবির ঠিক বোধগম্য হয় নাই, এবং উহার প্রতি তাঁহার কোথায় যেন একটা সংশয় ও বীতরাগ রহিয়া গিয়াছে। আধুনিক রাজনীতি সদাচার, ন্যায়াচরণ ও ধর্মাধর্ম-বোধকে মুহূর্তেই পদদলিত করিতেছে,—অতি অল্প বয়স হইতেই রবীন্দ্রনাথ এই অভিযোগ করিয়া আসিতেছেন। দেশের তৎকালীন 'মডারেট রাজনীতি'র ইংরেজ-তোষণের মধ্যে যে ক্ষুদ্রতা, হীনতা ও দৈন্য প্রকাশ পাইয়াছে, কবি তাহা কোনদিনই সহ্য করিতে পারেন নাই। অপরদিকে 'এক্সট্রিমিস্ট' বা চরমপন্থীদের রাজনীতিকেও সমর্থন করিতে পারেন নাই। তাছাড়া insurrection, violence, strategy, tactics, diplomacy—আধুনিক বিপ্লবপন্থী রাজনীতির এই রুক্ষ, স্থূল বা crude দিকটা রবীন্দ্রনাথের মত তীক্ষ্ণ-সংবেদনশীল মানবতাবাদী কবির পক্ষে মানিয়া লওয়া সম্ভব হয় নাই। প্রধানত

এই সব কারণেই রাজনীতির প্রতি তাঁহার কোন অন্তরের আকর্ষণ ছিল না। এই কারণেই অর্থনীতি-রাজনীতি শাস্ত্র যথাযথভাবে পাঠ করিবার কোন আন্তরিক তাগিদ বা প্রেরণা পাইলেন না। অবশ্য তখনও এদেশে বিজ্ঞানসম্মত রাজনীতি চর্চা শুরু হয় নাই। তাছাড়া একটা প্রধান কথা এই যে, রবীন্দ্রনাথ প্রধানত ও মূলত কবি। তিনি যে রাজনৈতিক সেনানায়কের ভূমিকা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই এ সম্পর্কে তিনি বেশ কিছুটা সচেতন ছিলেন। কিন্তু নিরাপদ আরাম, আলস্য ও বিলাসের কোনো নন্দনতত্ত্বের গজদন্তমিনারে কাব্যরস-সুধা পান করিয়া তাঁহার দিন কাটে নাই। জগতের যত কিছু অন্যায়, অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে আজীবন তিনি অবিরাম লেখনী ধারণা করিয়াছেন। পরাধীন লাঞ্ছিত স্বদেশবাসী ও বিশ্বের সমস্ত নির্যাতিত মানুষকে রবীন্দ্রনাথ এতো ভালোবাসিয়াছেন, তাহাদের পক্ষ লইয়া এতো কথা বলিয়াছেন, সমকালীন বিশ্বে রোলাঁ, বারবুস্ ও গোর্কী ছাড়া অন্য কোনো শিল্পী ও সাহিত্যিককে তাহা করিতে দেখা যায় না।

যাহাই হউক, প্রবল রাজনীতিক আবেগ-উত্তেজনায় কবি মাঝে মাঝে রাজনীতিক রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইতে চাহিয়াছেন, অথচ তাঁহার স্বাভাবিক মানসিক গঠনপ্রকৃতি তাহাতে বাধা দিয়াছে;—ইহাতে মানুষ রবীন্দ্রনাথের ব্যথার অন্ত নাই। জীবনভোর কবির এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অন্তর্বিরোধ। আর জালিয়ানওয়ালাবাগের মত ঘটনায় কবি যেন তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে চাহিয়াছেন।

'কবি, তবে উঠে এসো—যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহো সাথে, তবে তাই করো আজি দান।'—

'এবার ফিরাও মোরে'-র কণ্ঠস্বর আবার যেন শুনা গেল। ঐ স্থিতধী, সৌম্য-শান্ত ঋষিকল্প মানুষটিকে আজ যতখানি বিচলিত হইতে দেখা গেল এমন বুঝি আর কখনও দেখা যায় নাই। বিশ্বমানবতার ও বিশ্বশান্তির সাধক যে তাঁহার দেশবাসীকে কী অপরিসীম ভালোবাসেন এই প্রতিবাদ-পত্রই তাহার প্রমাণ। আন্তর্জাতিক মহামিলনের অজুহাতে তিনি যে তাঁহার স্বদেশের লাঞ্ছিত মানুষের দাবিকে কোনমতেই বিসর্জন বা concession দিতে রাজী নহেন, ইহাই খুব স্পষ্ট হইয়া উঠে।

অত্যন্ত বিস্ময়ের কথা, দীর্ঘকালবাপী পাঞ্জাবে ইংরেজের সেই আসুরিক বর্বরতার বিরুদ্ধে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে কোথাও কোনো উল্লেখযোগ্য প্রতিবাদ-আন্দোলনই গড়িয়া উঠিল না। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে পাঞ্জাবের ঘটনাবলীর তদন্ত দাবী করিয়া, সিদ্ধান্ত গৃহীত (২০-২১ এপ্রিল) হইয়াছিল বটে কিন্তু ঐ-পর্যন্তই। প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ-আন্দোলন সম্পর্কে নেতারা কেহই উচ্চ-বাচ্য করিলেন না। গান্ধীজী উহার তদন্ত-কমিশনের জন্য চাপ দিতেছিলেন কিন্তু তিনিও তখন আন্দোলন চালাইয়া যাইতে আপত্তি ও অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। পাঞ্জাবের ঘটনাবলীর সংবাদ পরিবেশন এবং উহার তীব্র সমালোচনার জন্য *Bombay Chronicle*-এর সম্পাদক হর্নিম্যান'কে (B. G. Horniman)

প্রলিস গ্রেপ্তার করিয়া নির্বাসিত করিল। তাছাড়া '*Tribune*' পত্রিকার সম্পাদক কালীনাথ রায়েরও কারাগার হয়। গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথ—উভয়েই তাঁহার মুক্তির জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। পাঞ্জাবে দীর্ঘকাল একটানা সামরিক-আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া একমাত্র স্যর শংকরণ নায়ার ভাইসরয়ের 'একজিকিউটিভ-কাউন্সিল' হইতে পদত্যাগ (১৯'শে জুলাই) করিলেন। প্রসঙ্গক্রমে আর একটি কথা বলা দরকার, অনেকের ধারণা গান্ধীজী এই সময়ই তাঁহার 'কাইজার-ই হিন্দ' উপাধি ত্যাগ করেন। কিন্তু উহা ঠিক নহে। এবং প্রায় একবৎসর পরে তিনি ঐ-উপাধি বর্জন করেন (১লা আগষ্ট, ১৯২০)। উপরন্তু এই সময় ভাইসরয় গান্ধীজীকে প্রবল হুমকী দিয়া জানাইয়া দিলেন যে, গান্ধীজী পুনরায় আন্দোলন শুরু করিলে তাহার পরিণামে ভালো হইবে না। গান্ধীজীর প্রতিক্রিয়া ও আচরণ অদ্ভুত। ২১'শে জুলাই আন্দোলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত জানাইয়া গান্ধীজী যে খোলাচিঠি প্রকাশ করিলেন তাহা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি লিখিলেন,

"The Government of India has given me, through. His Excellency the Governor of Bombay, a grave warning that the resumption of civil disobedience is likely to be attended with serious consequences to public security. This warning has been reinforced by His Excellency the Governor himself at the interviews to which I was summoned. In response to these warnings and to the urgent desire publicly expressed by Dewan Bahadur Govind Raghava Aiyar, Sir Narayan Chandavarkar and several editors, I have, after deep consideration, decided not to resume civil resistance for the time being···I have been assured that the committee of inquiry such as I have urged for is in the process of being appointed. With these indications of goodwill, it would be unwise on my part not to listen to the warning given by the Government. Indeed, my acceptance of the Government's advice is a further demonstration of the nature of civil resistance. A civil resister never seeks to embarrass the Government."

[*Mahatma* : *Vol. I*. pp. 263-64]

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জুন মাসের শেষভাগে মতিলাল নেহরু, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, ও পণ্ডিত মালব্য পাঞ্জাবের ঘটনাবলীর তদন্তের জন্য সেখানে উপস্থিত হন। অল্প কিছুদিনের মধ্যে এণ্ড্রুজ, জওহরলাল ও চিত্তরঞ্জন দাশও পাঞ্জাবে যান। গান্ধীজীর বিরুদ্ধে পাঞ্জাব প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়া লওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তদন্তকার্যের জন্য তিনি সেখানে

উপস্থিত (১৭ই অক্টোবর) হন। সেপ্টেম্বর মাসে ভাইসরয় "হাণ্টার তদন্ত কমিশন" নিয়োগের কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু এই তদন্ত কার্যের ব্যাপারে ঐ কমিশনের সহিত কংগ্রেসের মৌলিক নীতিগত মতপার্থক্য হয় এবং কংগ্রেসের পক্ষ হইতে স্বতন্ত্রভাবে একটি তদন্তকমিটি নিয়োগ করা হয়।

এদিকে খিলাফত সমস্যা ক্রমশই তীব্র ও জটিল আকার ধারণ করিতে থাকে। 'সেভার্স সন্ধি' আলোচনায় অটোমান সাম্রাজ্যকে খণ্ড-বিখণ্ড করিবার ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়িতে থাকে। ২৪শে নভেম্বর দিল্লীতে খিলাফত কমিটির উদ্যোগে 'নিখিল ভারত খিলাফত সম্মেলন' হয়। গান্ধীজী এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার জন্য আহূত হন। সভায় খিলাফতের দাবীর অবিচারের প্রতিবাদে ভারত সরকারের আসন্ন শান্তি ও বিজয়োৎসবকে বর্জন বা বয়কট করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গান্ধীজী ঐ বয়কটের সিদ্ধান্তটি সমর্থন করিয়া সম্মেলনে তাঁহার অভিভাষণে বলিলেন,

"···The Khilafat conference has come to the decision not to participate in the coming peace celebrations. I think that is a proper decision···Eight crores of Muslisms are deeply interested in the peace terms affecting Khilafat. It is improper to ask them to celebrate peace whilst the fate of Khilafat hangs in the balance."···

উপসংহারে তিনি এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিলেন, পাঞ্জাবের ঘটনাকে যেন এই বয়কট-ব্যাপারে টানিয়া আনা না-হয়।

···"It has been contended that the Punjab grievance too is a good reason for refraining from the peace celebrations. I differ from that view···The Punjab grievance does not arise out of the peace terms as does the Khilafat question.······

···"We cannot say that the Punjab wrong is unredressed. The Hunter Committee is still at work. Our own committee is eqaully busy. The Khilafat question is serious one, and needs immediate remedies. We must isolate it, if we wish to give it its proper place and value."

[*Mahatma* : *Vol. I.*—pp. 272-74]

অর্থাৎ গান্ধীজী জালিয়ানওয়ালাবাগ-হত্যাকাণ্ড অপেক্ষাও খিলাফত সমস্যার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে চাহিলেন। গান্ধীজীর কাছে ইংরেজের পৈশাচিক দলন-নীতি ও পাঞ্জাবের ঘটনাবলী একান্তই আভ্যন্তরীণ ও স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র। এইগুলি যে ইংরেজের সাম্রাজ্য রক্ষা তথা সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধের জের ও ক্রমপরিণতি, ইহাও তিনি দেখিতে পাইলেন না। ভার্সাই ও সেভার্স-সন্ধির বিরুদ্ধে গান্ধীজী আর কোন কথা বলিলেন না। তাঁহার কাছে এই সন্ধিগুলির অন্য কোন বিশেষ গূঢ় রাজনৈতিক

তাৎপর্য'ও ছিল না। মহাযুদ্ধ হইতেও তিনি বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্য তীব্র মর্মবেদনা ও অনুশোচনায়ও তাঁহাকে দগ্ধ হইতে দেখা গেল না।

দিল্লীর খিলাফত সম্মেলনের কয়েকমাস পর জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের স্মরণ-দিবস উপলক্ষে কবি যে লিখিত ভাষণটি (ইংরেজিতে) জিন্না সাহেবকে পাঠাইয়া দেন, এই প্রসঙ্গে তাহা উল্লেখযোগ্য। কবি লেখেন,

"আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার অজুহাতে পাঞ্জাবে এক মহাপাপাচার অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মতো পাপের এইরকম ভীষণ আকস্মিক প্রকাশ তাদের পশ্চাতে রেখে যায়—আদর্শের ভগ্নস্তূপের ও ভস্মাবশেষের আবর্জনা। চার বছর ধ'রে যে দানবীয় সংগ্রাম বিধাতার সৃষ্ট এই জগতকে আগুনে দগ্ধ ও বিষে কলঙ্কিত করেছে, তারই আসুরিক ঔরস্য হোল এই জালিয়ানওয়ালাবাগ। যে দুঃসহ যন্ত্রণার রক্তলাঞ্ছিত দীর্ঘ পথে মানবতা চলেছে আজ পা টেনে টেনে, তারই বিপুল পাপভার যাদের হাতে যথেচ্ছ ক্ষমতা আছে তাদের মনে জাগিয়েছে অনমনীয় কাঠিন্য আর ঔদাসীন্য। সে-মনে না আছে এতটুকু দরদের বাধা বা বাইরে থেকে বাধা পাওয়ার একটুও ভয়। এই যে ক্ষমতাবানের কাপুরুষতা, তা' এতটুকু লজ্জা বোধ করেনি অস্ত্রহীন ও অসতর্কিত গ্রামবাসীদের উপর মারণাস্ত্র চালনার নিষ্ঠুরতায়; কিংবা, কুৎসিত বিচার-প্রহসনের যবনিকার অন্তরালে, অকথ্য অবমাননাপ্রয়োগে। এক মুহূর্তের জন্যও তাদের অনুভূতিতে এ-কথা জাগেনি, যে এটা তাদেরি মনুষ্যত্বের জঘন্য অপমান। গত যুদ্ধে মানুষ সত্য ও সম্ভ্রমবোধকে যে-ভাবে পদদলিত ক'রে, আপন স্বভাবের মহত্তর প্রকাশকে নিয়ত লাঞ্ছিত করেছে, তাতেই সম্ভব হয়েছে এই কাপুরুষতা। ভূকম্পের পর ভূকম্প সৃষ্টি ক'রে যাবে সভ্যতা-সৌধের এই সমূল উৎপাটন, মানুষকে প্রস্তুত থাকতে হবে আরও দুঃখভোগের জন্য। আত্মঘাতী হিংস্র প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি [য়ুরোপের পীস্ কনফারেন্সে] শান্তি-আলোচনার আবহাওয়াকে যে-ভাবে আজ কলুষিত করে তুলছে, তাতে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, যে ভারসাম্য আসতে লাগবে বহুদিন। জয়মদমত্ত শক্তিপুঞ্জের এই ভৈরবী-চক্রে আমাদের কোন স্থান নেই। তারা তাদের অভিপ্রায়মতো দুনিয়াটাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলছে।"···

[পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ : পৃ ৯৫-৯৭]

জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনাকে ঠিক এই দৃষ্টিকোণ হইতে সেদিন আর কেহই দেখেন নাই। এতখানি বিশ্বব্যাপী পটভূমি ও পরিপ্রেক্ষিতে পাঞ্জাবের ঘটনাবলীর বিচার-বিশ্লেষণ করিবার ক্ষমতা আর কাহারও ছিল কিনা সন্দেহ। আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দের কাছে ভারতের ভৌগোলিক পরিমণ্ডলের বাইরে পাঞ্জাবের ঘটনাবলীর অন্য কোন বিশেষ তাৎপর্য ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড বা সেদিনের ইংরেজ-দমন-নীতি শুধুমাত্র একটি একান্তই আভ্যন্তরীণ বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র ঘটনা নহে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির লোভ ও লালসার বহ্ন্যুৎসব বিগত চারি বৎসর ধরিয়া পৃথিবীতে যে

মহা-বিধ্বংসী তাণ্ডবলীলা চালাইয়াছে, জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা তাহারই জের ও অবশ্যম্ভাবী ক্রম-পরিণতি মাত্র। সাম্রাজ্যবাদকে এত তীক্ষ্ণ ও কঠোর ভাষায় আক্রমণ ও ভর্ৎসনা করিতে দেশে আর কাহাকেও দেখা গেল না।

ডিসেম্বরের শেষভাগে (১৯১৯), অমৃতসরে, কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন। 'মণ্ট-ফোর্ড ভারত-সংস্কার আইন' ও পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ড,— কংগ্রেসের প্রধান আলোচ্য বিষয়। ভারত-সংস্কার আইনের বিরোধিতা করিয়া মূল প্রস্তাব আনিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ,

"That this Congress···is of opinion that the Reforms Act is inadequate, unsatisfactory and disappointing.

"That this Congress further urges that Parliament should take early steps to establish full Responsible Government in India in accordance with the principle of Self-determination."

গান্ধীজী 'disappointing' কথাটির ঘোরতর বিরোধিতা করিয়া সংশোধনী হিসাবে আরও একটি সংযোজনী প্রস্তাব আনিলেন,

'Pending such introduction, this Congress begs loyally to respond to the sentiments in the Royal Proclamation, namely, 'Let the new era begin with a common determination among my people and my officers to work together for a common purpose, and trusts that both the authorities and the people will co-operate so to work the Reforms as to secure the early establishment of full Responsible Government.

"And this Congress offers its warmest thanks to the Rt. Hon. E S Montagu for his labours in connection with them."

[*The History of the Indian National Congress . Vol. I*-p. 179]

ইহা হইতেই গান্ধীজী ও কংগ্রেসের তৎকালীন রাজনীতিক চিন্তা ও লক্ষ্যের একটি পরিষ্কার ছবি পাওয়া যায়। লক্ষ্য করিবার বিষয়, চিত্তরঞ্জন মূলত ইংরেজ সরকারের সহিত অসহযোগিতা করিতে চাহিলেন, পক্ষান্তরে গান্ধীজী সহযোগিতার (সর্তসাপেক্ষে) উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে চাহিলেন। শেষপর্যন্ত মূল প্রস্তাবটি গান্ধীজীর সংশোধনী প্রস্তাব সহ একটু রদবদল করিয়া গৃহীত হয়। কিন্তু সেদিন কেই-বা জানিত, ইহার মাত্র ছয়-সাত মাস পরে স্বয়ং গান্ধীজীই বয়কট ও অসহযোগ-আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন।

কিন্তু ইহা অপেক্ষাও বিস্ময়কর ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় পাঞ্জাবের হাঙ্গামা ও সংগ্রামের নীতি-কৌশলের উপর। গান্ধীজী বোম্বাই ও পাঞ্জাবের হাঙ্গামার জন্য দেশের জনগণকেই প্রধানত দায়ী করিয়া জনতার হিংসাত্মক কার্যকলাপের নিন্দাবাদের প্রস্তাব আনিলেন। এই প্রসঙ্গে সীতারামীয়া

লিখিতেছেন,

……"Gandhi was anxious that the mob violence in the Punjab and Gujarat should be condemned. The Subjects Committee threw out the Resolution. Gandhi was disappointed. It was late at night. He firmly, but politely and respectfully, expressed his inability to be in the Congress if the Congress could not see its way to accepting his view-point. The next morning, amidst the whinings and whimperings of the bulk of delegates, Resolution V was approved which, 'while fully recognizing the grave provocation that led to a sudden outburst of mob frenzy, expressed the deep regret of the Congress at, and its condemnation of, the excesses committed in certain parts of the Punjab and Gujarat resulting in the loss of lives and injury to person and property during the month of April last.' Gandhi's speech on the subject was superb."…

গান্ধীজী তাঁহার ঐ ভাষণে বলেন,

"There is no greater Resolution before this Congress than this one. The whole key to success in the future lies in your hearty recognition of the truth underlying it, and acting up to it. To the extent we fail in recognizing the Eternal Truth that underlies it, to that extent we are bound to fail. I say if there was no violence on our part—we have abundant proof of it, and I can produce before you, chapter and verse from Viramgram, from Ahmedabad and from Bombay that there was violence on our part intended and committed. I agree that there was grave provocation given by the Government in arresting Dr. Kitchlew and Dr. Satyapal and in arresting me who was bent on a mission of peace at the invitation of Dr. Satyapal and Swamiji,—these troubles would not have arisen. But the Government went mad at the time; we went mad also at the time. I say, do not return madness with madness, but return madness with sanity and the whole situation will be yours."

[*Ibid.* : pp. 180-81]

ইহার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের নাইটহুড্-ত্যাগের পত্র ও জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবসের লিখিত ভাষণটি রাখিয়া বিচার করিলে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারার পার্থক্যটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ইংরেজের সীমাহীন

নিষ্ঠুরতা ও পাশবিক নীতির জন্য গান্ধীজী ইংরেজকে ধিকৃত করিয়া কিংবা উহার প্রতিবাদ জানাইয়া কোন নিন্দাবাদ বা ভর্ৎসনা করিলেন না। পরন্তু মণ্টেগুর সদভিপ্রায়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবার প্রস্তাব আনিলেন, এমনকি আসন্ন ভারত-সফর উপলক্ষে যুবরাজকে স্বাগত জানাইলেন। অপরদিকে পাঞ্জাবে ও দেশের অন্যত্র হাঙ্গামার জন্য প্রধানত জনসাধারণের হিংসাত্মক কার্যকলাপের নিন্দাসূচক প্রস্তাব আনিলেন। গান্ধীজীর জীবন-দর্শনে অত্যাচারীর সমালোচনার অবকাশ কম। দেশের মুক্তি-পাগল কোটি কোটি অশিক্ষিত জনসাধারণ প্রায়ই তাঁহার সমালোচনার বিষয়বস্তু হইয়াছে। গান্ধীজীর পক্ষে বলিবার কথা এই, শত্রুর আচরণ যতই ঘৃণার্হ ও নিন্দনীয় হউক না কেন তাহার সমালোচনায় কিছু লাভ হয় না; কিন্তু অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পথে জয়যুক্ত হইতে হইলে সর্বাগ্রে উচিত আমাদেরই কঠিন আত্ম-সমালোচনা করা এবং সেই ভুল-ত্রুটির যাহাতে পুনরাবৃত্তি না হয়, তাহার জন্য সচেষ্ট হওয়া।

পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথ দেশের ঐ সব হাঙ্গামা ও পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ডের জন্য প্রধানত ইংরেজ সরকারকেই দায়িক করিয়া নিন্দাবাদ করিয়াছেন। পাঞ্জাবের ঘটনার পর দেশবাসী যখন সব থেকে বিপন্ন অবস্থায় পড়িয়া-পড়িয়া মার খাইতেছে, তখন তিনি জনতার কার্যকলাপের সমালোচনা না করিয়া তাহাদের সকল দুঃখের ভাগী হইয়া তাহাদের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতে চাহিলেন। উহাই তিনি তখন অতি আশু কর্তব্য বিবেচনা করিয়া সারা দেশব্যাপী এক প্রতিবাদ-আন্দোলন তুলিবার প্রস্তাব দিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জানিতেন, দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণকে দোষারোপ করার কোন অর্থ হয় না,—নেতৃত্বই তাহার জন্য দায়ী এবং নেতৃত্ব যদি জনসাধারণের এই স্বাভাবিক চরিত্ররূপ সম্পর্কে সচেতন না থাকেন তবে সেই আন্দোলনের আহ্বান দিবার মধ্যে সার্থকতা কোথায়? এই জন্য আন্দোলনের সূচনাতেই গান্ধীজীকে তিনি সতর্ক করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। গান্ধীজী অমৃতসর কংগ্রেসে তাঁহার ঐ ভাষণে আরও বলিলেন,

"Real manliness consists in not retaliating even when under a shower of bullets, to suffer evil patiently and with the opposition of good That is the spirit of real heroes. That is why I want you to condemn the excess of mobs"...

[*Mathatma-Vol. I*-p. 227]

রবীন্দ্রনাথ জনসাধারণের কাছে এতখানি নৈতিক মনোবল ও বীরত্বের প্রত্যাশা করিতেন না। দোষ-গুণে ভরা সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা-স্পৃহা জাতীয়তাবোধকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিলে, তাহার বিক্ষোভ প্রকাশের রূপ কী হইতে পারে, তাহা তিনি অপরিসীম দরদ দিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতেন।

এই সব পীড়ন ও নির্যাতন হাস্যমুখে সহ্য করিবার আহ্বান জানাইয়া ইহার কয়েক মাস পর গান্ধীজী বলিলেন,

…"Progress is to be measured by the amount of suffering undergone by the sufferer. The purer the suffering, the greater is the progress…

"I have already stated that I do not deplore the massacre of Jallianwala Bagh so much as I deplore the murders of Englishmen and destruction of property by ourselves…But before we rise higher we shall have to undergo such processes many more times till they teach us to take up suffering voluntarily and to find joy in it"… [*Ibid.* : pp.293-94]

কিন্তু অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ আর তাহার প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করা এক কথা নহে। গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথ—উভয়েই প্রতিশোধ বা প্রতিহিংসা গ্রহণের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী যেখানে বলিলেন, উন্মত্ত অত্যাচারকে নির্বিকারচিত্তে সহ্য করার মধ্যেই বীরত্ব ; ঠিক তাহার বিপরীতে কবি বলিলেন, অত্যাচারকে নির্বিকারচিত্তে সহ্য ও মানিয়া লওয়ার মধ্যেই কাপুরুষতা ও আত্মার পরাভব। কবি বলিলেন, শত অত্যাচারের মধ্যেও পৌরুষকণ্ঠে প্রতিবাদ করার মধ্যেই মানুষের প্রকৃত বীরত্ব ও মহত্ব। পাঞ্জাবে 'মার্শাল ল' ও হত্যাকাণ্ডের পর দীর্ঘকাল ধরিয়া যে অমানুষিক অত্যাচার ও 'বুকে-হাঁটিয়া-রাস্তা-পার-হওয়া' প্রভৃতি যে-সব ঘৃণ্য জাতীয় অবমাননাকর নির্যাতন চলিতেছিল, তাহার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে গান্ধীজী ও নেতৃবৃন্দের কাহাকেও তখনও পর্যন্ত প্রতিবাদ আন্দোলন করিতে দেখা গেল না। ইহাই কবিকে গভীরভাবে পীড়িত ও ব্যথিত করিয়াছে। তাই যখন অমৃতসর-কংগ্রেস থেকে জালিয়ানওয়ালাবাগে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয় কবি তখন গভীর দুঃখে ক্ষোভের সহিত মন্তব্য করেন,

…"যে ঘটনা কেবলমাত্র দুঃখকর তাহার দ্বারা কাহারও অবমাননা হয় না ; কিন্তু মানুষের প্রতি পশুর মতো আচরণ-করা সম্ভবপর হইলে সেই লজ্জা দুঃখকে ছাড়াইয়া উঠে। পাঞ্জাবের ব্যাপারে আমাদের পক্ষে সেই লজ্জার কারণ ঘটিয়াছে। ইহাই বুঝিতেছি যে আমাদের চরিত্রের এমন গভীরতর হীনতা ঘটিয়াছে যে আমাদের প্রতি শুদ্ধমাত্র দুঃখ প্রয়োগ করা নহে আমাদের মনুষত্বের অসম্মান করা সহজসাধ্য হইয়াছে, ইহা আমাদের আন্তরিক দুর্গতির কারণ।

'পীড়ন যতই কঠিন হউক সহিব, কিন্তু আত্মাবমাননা কিছুতেই সহিব না' —পাঞ্জাবে এইরূপ পৌরুষের বাণী শুনিবার আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু যখন তাহা শুনিলাম না, তখন সর্বাগ্রে আপনাদিগকেই ধিক্কার দিতে হইবে। এই কারণেই আমরা বলি কোনো চিহ্নের দ্বারা পাঞ্জাবের এই ঘটনা চিরস্মরণীয় করা আমাদের পক্ষে গৌরবের নহে। বীরত্বই স্মরণের বিষয়, কাপুরুষতা নৈব নৈব চ। নিরস্ত্র নিঃসহায়ের প্রতি অত্যাচার কাপুরুষতা, সেই অত্যাচার দীনভাবে বহন করাও কাপুরুষতা, কেননা কর্তব্যের গৌরবে বুক পাতিয়া অস্ত্র গ্রহণ

করায়, মাথা তুলিয়া দুঃখ স্বীকার করায় পরাভব নাই। যেখানে পীড়নকারী ও পীড়িত কোনো পক্ষেই বীর্যের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না সেখানে কোন্ কথাটা সমারোহপূর্বক স্মরণ করিয়া রাখিব ?"…

[শান্তিনিকেতন পত্রিকা-১৩২৭ বৈশাখ : ২য় বর্ষ-১ম সংখ্যা, পৃঃ ৬৫-৬৬]

বুঝিতে কষ্ট হয় না, কবির এই দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ প্রধানত নেতৃবৃন্দ ও আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করিয়া।

অমৃতসর-কংগ্রেসে শ্রীশংকরণ নায়ারের প্রতিবাদকার্যের প্রশংসাবাদ ও ধন্যবাদ জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়, রবীন্দ্রনাথের নাইট-উপাধি বর্জন ও প্রতিবাদ-পত্র কংগ্রেসী মহলে এতটুকুও স্বীকৃতি কিংবা সমাদর পাইল না।—এই মহান কার্যের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া অমৃতসর-কংগ্রেসে কোন প্রস্তাব গৃহীত হইল না। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅমল হোম মহাশয় তাঁহার "পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থে যে চাঞ্চল্যকর তথ্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন তাহা যেমনই লজ্জাকর, তেমনই বেদনাদায়ক,—

"অমৃতসরে যখন দেখলাম, কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষদের তরফ থেকে যে-সব রেজোল্যুশন সব্জেক্টস্ কমিটির সামনে উপস্থাপিত হয়েছে, তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নাইট-উপাধি-ত্যাগের নামগন্ধ কোথাও নেই, তখন আমি আমার কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শের পর, সেই রকম একটি প্রস্তাবের খস্ড়া তৈরী করে প্রেসিডেণ্ট মোতিলালজীর কাছে কথা পাড়তেই তিনি বলিলেন,—'You move it in the Subjects Committee.'

…"আমি সকলের আগে ধরলাম জিতেন বাঁড়ুয্যে-মশাইকে। তিনি প্রথমে খুব উৎসাহ প্রকাশ করে, পরে—ঠিক আধ ঘণ্টা পরেই—কেন জানিনা—পিছিয়ে গেলেন। তখন আমি চিত্তরঞ্জন দাশ-মশায়ের শরণাপন্ন হলাম। তিনি বলিলেন,—'দেখ, আমার মনে হয়, বেঙ্গল ডেলিগেট কেউ এ-রকম প্রস্তাব না এনে, পাঞ্জাবের কাউকে দিয়ে এটা আনলে ভাল হয়।' আমি তখন ধরলাম লালা মনোহরলালকে—তিনি ছিলেন ক্যালকাটা য়ুনিভার্সিটির প্রথম মিণ্টো প্রফেসর অফ ইকনমিকস্, পরে হন পাঞ্জাবের শিক্ষাসচিব ও রাজস্ব-সচিব স্যর মনোহরলাল।…তিনি আমাকে বললেন,—You must have a passionate speaker to sponsor a motion like this. I don't feel equal to it !…… শেষে ইন্দুভূষণ সেন মশায়ের…সঙ্গে পরামর্শ করে সৈয়দ হোসেন সাহেবকে বলা মাত্রেই তিনি সম্মত হলেন। বললেন—It will be an honour ! …ঠিক হোল, যে সৈয়দ হোসেন প্রস্তাবটি পেশ করবার পর রঙ্গ আয়ার সেটি সমর্থন করবেন।

…"প্রস্তাবের খসড়া যথারীতি মোতিলালজীর সামনে নিয়ে ধরলাম। তখন সব্জেক্টস কমিটির মিটিং চলছে। তিনি কাগজখানিকে আড়চোখে একবার দেখে, তাঁর চশমার খাপটা চাপা দিয়ে সেটি রেখে দিলেন একপাশে। ভাবলাম, যথাসময়ে সৈয়দ হোসেনের ডাক পড়বে। কিন্তু ডাক আর পড়লো না—দু'দুবার স্মারক স্লিপ পাঠানো সত্ত্বেও! শেষে জওহরলালের খোঁজ

করলাম…তিনি গিয়ে 'পাপা'-র কানে কানে দু-একটা কথা কি বলতেই লক্ষ্য করলাম, পণ্ডিতজীর……ভুরুটা কুঁচকে উঠলো। ব্যাপার বুঝলাম না কিছুই। অনেক রাত্রিতে সবজেক্টস কমিটির মিটিং যখন ভাঙ্গলো—ছুটে গেলাম তখন পণ্ডিতজীর কাছে। তিনি শুধু বললেন—'wait'। ভাবলাম কাল হয়তো প্রস্তাবটা উপস্থিত করবেন কমিটিতে। কিন্তু সে 'কাল' আর এলো না।……অমৃতসরে বেঙ্গল ডেলিগেটদের ক্যাম্পেও এ-নিয়ে কোনো চাঞ্চল্য দেখিনি। রবীন্দ্রনাথ যে একটা মস্ত কাজ করেছেন, তাঁদের মধ্যে—দু'একজন ছাড়া—এ ধারণার কোন পরিচয় সেদিন পেয়েছিলাম বলে মনে পড়ে না। বাঙলার ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, বিপিনচন্দ্র পাল, কামিনীকুমার চন্দ, অখিলচন্দ্র দত্ত কাউকেই বলতে বাকী রাখিনি। তাঁদের মধ্যে যে কেউ একজন সবজেক্টস কমিটিতে উঠে দাঁড়ালেই হয়ে যেত। অন্যপ্রদেশের নেতাদের মধ্যেও কাউকে এ নিয়ে মাথা ঘামাতে দেখিনি।"… [পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ : পৃঃ ১০৭-১১১]

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। বিস্ময়ের কথা, সীতারামীয়া তাঁহার *'The History of the Indian National Congress'* গ্রন্থে এই বিষয়ে বহু তথ্যাদি পরিবেশন করিয়াছেন অথচ রবীন্দ্রনাথের নাইটহুড্ প্রত্যাখ্যানের কথা ঘুণাক্ষরে একবারও উল্লেখ করেন নাই!

সর্বশেষে, একটি তথ্যের উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। ইহার বেশ কয়েক বৎসর পর রবীন্দ্রনাথের নাইট্ পদবী ত্যাগ লইয়া নানা আলোচনা চলিতে থাকে। স্বয়ং কবি তাঁহার বিবৃতিতে নাইট্ পদবী ত্যাগের উপলক্ষ ও কারণটি পরিষ্কার ব্যাখা করিয়া লিখিলেন,

"Being aware that a discussion has been raised in regard to my knighthood, I feel it right to put clearly my own view of it before the public. It is obvious that it was solely to give utmost emphasis to the expression of my indignation at the Jallianwalla Bagh massacre and other deeds of inhumanity that followed it that I asked Lord Chelmsford to take it back from me…I have not the overweening conceit discourteously to display an insincere attitude of contempt for a title of honour which was conferred on me in recognition of my literary work. I greatly abhor to make any public gesture which may have the least suggestion of a theatrical character. But in this particulars case, I was driven to it *when I hopelessly failed to persuade our political leaders to launch an adequate protest against what was happening at that time in the Punjab.*"… [*Modern Review* : Feb. 1926, P. 158]

প্রশান্ত মহলানবীশ তাঁহার ডায়েরিতে কবির জবানীতে যে-সব কথা লিখিয়াছিলেন, কবির এই বিবৃতি দ্বারা তাহার সত্যতা প্রমাণিত হয়।

'চিন্তার স্বাধীনতা আন্দোলনে' রোলাঁ ও রবীন্দ্রনাথ

পাঞ্জাবের সেই বিভীষিকাময় দিনগুলিতে ইউরোপে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনের সূচনা হয়। এই সময় রমাঁ রোলাঁ, অ্যাঁরি বারবুস্ প্রমুখ চিন্তানায়কদের নেতৃত্বে ইউরোপের বিবেকী বুদ্ধিজীবীদের "চিন্তা ও আত্মার স্বাধীনতা" (*Independence of the Spirit*) নামে একটি সংঘবদ্ধ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। রোলাঁ ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথকে এক পত্রের মাধ্যমে এই ব্যাপারে সাহায্য ও সহযোগিতা করিবার আহ্বান জানান। রবীন্দ্রনাথের সহিত রোলাঁর পত্রালাপের এইখানেই সূত্রপাত হয়। গত মহাযুদ্ধের সেই অন্ধকারময় দিনগুলিতে যে সব বিবেকী মনীষী যুদ্ধের বর্বরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিলেন, রোলাঁ তাঁহাদের অন্যতম। এই মহান ও প্রবলপ্রাণ চিন্তানায়ক সেদিন কী নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণায় দগ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহার, "*Above the Battle*" ও "*I will not Rest*" পুস্তিকার পাঠক মাত্রেই তাহা জানিবেন। মহাযুদ্ধের সময় ইউরোপের অধিকাংশ শান্তিবাদী, শিল্পী ও মনীষী আপন আপন দেশের সরকারকে যুদ্ধে সমর্থন করিতেছিলেন। ইহাতে রোলাঁ অত্যন্ত হতাশা ও নৈরাশ্য বোধ করিতেছিলেন। এমন সময় জাপান ও আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ ও যুদ্ধ-বিরোধী বক্তৃতাগুলি পাঠ করিয়া রোলাঁ নূতন আশায় ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। ঐ বক্তৃতাগুলি পাঠ করিয়া তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হইলেন।

যুদ্ধান্তে রোলাঁ যখন জগতের স্বাধীন বিবেকী বুদ্ধিজীবীদের সংঘবদ্ধ আন্দোলনের পরিকল্পনা করিতেছিলেন, স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের কথা তাঁহার মনে আসে। তিনি "*Declaration of Independence of the Spirit*" এর কপি রবীন্দ্রনাথের নিকট পাঠাইয়া দিয়া যে পত্রটি লেখেন তাহাতে ঐ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের নাম ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি তথ্য প্রকাশ পায়। রোলাঁ লিখিয়াছিলেন (১০ই এপ্রিল, ভিলেনুভ),

"Dear Friend,

Certain free spirits, who feel the need of standing out against the almost universal oppression and servitude of the intellect, have conceived the project of a Declaration of Independencd of the Spirit, a copy of which I inclose. Would you give us the honour of uniting your own name with ours? It appears to me that our ideas are not out of harmony with yours. We have already received the consent of Henry Barbusse, of Paul Signac, the painter, of Dr. Frederik van

Eden, of Professor Georg Fr. Nicolai, of Henry van de Velde, of Stefan Zweig; and we expect the consent of Bertrand Russel, Selma Lagerlof, Upton Sinclair, Benedetto Croce, and others. We think of collecting at first three or four signatories for each country,—if possible, one writer, one savant, one artist,—and then publish the Declaration, making the appeal chiefly to the intellectual elite of all the nations. If you can recruit for us some names in India, Japan and China, I should be very much obliged. I could wish that henceforth the intellect of Asia might take a more and more regular part in the manifestation of the thought of Europe. My dream will be that one day we may see the union of these two hemispheres of the Spirit; and I admire you for having contributed towards this more than anyone else. Allow me to tell you in conclusion, how dear to us are your wisdom and your art, and accept, I pray, the expression of my profound affection."

ঐ পত্রের পুনশ্চে,—রবীন্দ্রনাথের জাপানে প্রদত্ত কয়েকটি বক্তৃতার অংশ-বিশেষ তর্জমা করিয়া তিনি তাঁহার যুদ্ধকালীন কোন প্রবন্ধে উদ্ধৃতি দিয়াছিলেন,—তাহা কবির নিকট পাঠাইয়া দিবার কথা উল্লেখ করিলেন। নিম্নে "*Declaration of Independence of the Spirit*"-এর অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করা হইল.

"Toilers of the spirit, companions scattered all over the world, separated from one another for five years by armies, by censorship and hate of nations at war, we take this opportunity, when barriers are falling and frontiers are re-opening, of making an appeal to you to re-form your fraternal union,—but let it be a fresh union, firmer and stronger than the one which existed before."

উহার উপসংহারে বলা হয়,

"Arise! Let us extricate the spirit from these compromises, these humiliating alliances, this secret slavery! The spirit is the servant of none. It is we who are servants of the spirit. We have no other master. We are born to bear its torch, to defend it, to rally round it all those who have strayed. Our part, our duty is to maintain a fixed point, to point out the polar star, amidst the whirl of passions

in the night. Amongest these passions of pride and mutual destruction, we shall choose none ; we shall reject all. We serve Truth alone which is free, with no frontiers, with no limits, with no prejudices of race or caste. Of course we shall not dissociate ourselves from the interests of Humanity ! We shall work for it, but for it *as a whole*. We do not recognise nations. We recognise the People—one and universal,—the People who suffer, who struggle, who fall and rise again, and who ever march forward on the rough road, drenched with their sweat and their blood,—the People comprising all men, all equally our brothers. And it is in order to make them, like ourselves, aware of this fraternity, that we raise above their blind battles the Arch of Alliance, of the Free Spirit, one and manifold, eternal."

[*Rolland and Tagore* : pp. 19-22]

রোলাঁ-বারবুস প্রমুখ চিন্তানায়কেরা কী পটভূমিকায় এই আন্দোলন শুরু করিলেন, তাহা আমাদের স্মরণ রাখা দরকার।

ভার্সাই-তে তখন সন্ধিচুক্তির বৈঠক বসিয়াছে। উইলসন, লয়েড জর্জ, ক্লেমেন্সো প্রমুখ বিজয়ী শক্তিবর্গের রাষ্ট্র-ধুরন্ধরদের শান্তি চুক্তি রচনার কপট অভিনয় চলিতেছে। অপরদিকে সোভিয়েট-বিপ্লব সারা ইউরোপের রাজনীতি ও চিন্তাজগতে এক প্রচণ্ড আলোড়ন তুলিয়াছে। ১৯১৯ সালের ২রা মার্চ লেনিনের নেতৃত্বে 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক সঙ্ঘে'র (*Third Communist International*) প্রতিষ্ঠা হয়। যুদ্ধোত্তর যুগের অর্থনৈতিক সংকটে সারা ইউরোপে গৃহযুদ্ধ, শ্রমিক-সংঘর্ষ ও এক মহা-বিপ্লবের সূচনা পরিলক্ষিত হয়। 'তৃতীয় আন্তর্জাতিকে'র প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য সম্পর্কে লেনিন ঘোষণা করিলেন, (৫ই মার্চ, ১৯১৯)

"The foundation of the *Third, Communist International* in Moscow, on March 2, 1919, was a record not only of what the Russians have won, not only of the proletarian masses of Russia, but also of the German, Austrian, Hungarian, Finnish, Swiss—in a word, of the international proletarian masses.

"And precisely because of this the foundation of the Third, Communist International is built on a firm ground···

"The foundation of the Third, Communist International is the forerunner of the International Republic of Soviets, of the international victory of Communism."

[*Selected Works in two vols. II* : pp. 435-36]

ঠিক এই পরিস্থিতিতে রোলাঁ-বারবুস্ প্রমুখ ইউরোপের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় 'চিন্তার স্বাধীনতা'-র দাবিতে অপর একটি আন্তর্জাতিক আন্দোলন সংগঠিত করিবার কাজে তৎপর হইয়া উঠিলেন। এই সময় হইতেই রোলাঁর চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির ভয়ানক পরিবর্তন সূচিত হইতে থাকে। এই সম্পর্কে স্বয়ং রোলাঁ তাঁহার "*I will not Rest*" গ্রন্থের সূচনাতেই লিখিতেছেন,

"যুদ্ধ শেষ হইয়া শান্তি আসিল বটে, কিন্তু শান্তি আসিল না আমার মনে। সম্মুখে তখনও তীব্রতম সংগ্রাম। যতদিন যুদ্ধ চলিয়াছে ফ্রান্সে আমাদের সংখ্যালঘু দলটির প্রথম কর্তব্য ছিল যুদ্ধ যে কতবড় অপরাধ, কতবড় নিবুদ্ধিতা তাহা দেখানো ও এইভাবে যুদ্ধের অবসান ঘটানো। যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল, কিন্তু যে-শান্তি আসিল তাহা শাশ্বত চিরন্তন যুদ্ধেরই বেদী রচনা করিল মাত্র ; কারণ যুদ্ধ যাহারা জিতিল পরাজিতের প্রতি হিংস্র আক্রোশে বিদীর্ণ, বিক্ষত, বিহ্বল পৃথিবীর বুকে যে কৃত্রিম শান্তির গুরুভার তাহারা চাপাইয়া দিল তাহাতে আরেকটি যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিল।

"স্পষ্ট বুঝা গেল পৃথিবীকে বাঁচিতে হইলে আরও অনেক নূতন যুদ্ধের মধ্য দিয়া তাহাকে যাইতে হইবে অথবা এমন বিপ্লব তাহাকে বরণ করিয়া লইতে হইবে যাহার আঘাতে সমগ্র সমাজের বনিয়াদ ধ্বসিয়া পড়িবে ; কারণ এ সত্য আজ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে নির্বিবেক বণিকস্বার্থের ধনতন্ত্রী-সাম্রাজ্যবাদ আজ এতখানি বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, এই অতিকায় দানবের অঙ্গুলি-হেলনে পরিচালিত বর্তমান সমাজব্যবস্থায় কিছুতেই সুস্থ ও দীর্ঘস্থায়ী শান্তি আসিতে পারে না।"···

"এই সমাজ ব্যবস্থার সহিত আমাদের বন্ধন আমরা ছিন্ন করিয়াছি। ১৯১৯ সালের ঠিক পূর্বাহ্নেই আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম যে, সমাজবিপ্লব আমাদের প্রয়োজন কিন্তু এই প্রয়োজন-সাধনের জন্য সাংঘাতিক মূল্য আমাদের দিতে হইবে। দুঃখের মধ্য দিয়া, রক্তের মধ্য দিয়া রাশিয়ায় এই বিপ্লব আসিয়াছে।···ভবিষ্যতকে বাঁচাইবার জন্য বর্তমান ব্যবস্থাকে ধ্বংস করিয়া রাশিয়ায় যে নূতন প্রাণশক্তির অভ্যুদয় হইল তাহার সম্মুখে এই বুদ্ধিজীবী-সম্প্রদায় অসহায় বোধ করিলেন।···

"অক্টোবর-বিপ্লবের যোদ্ধারা যে পথভুল করেন নাই, তাঁহারা তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু ভুল আমিও করি নাই। আমি বলিয়াছিলাম সংগ্রাম ও পুনর্গঠনের কার্যে বিভিন্ন কর্মীদলের বিভিন্ন কাজ ; বুদ্ধিজীবীদের কাজ মনের স্বাধীনতা রক্ষা করা, যাহাতে এই সংস্কারমুক্ত স্বাধীন মন লইয়া প্রত্যক্ষ সংগ্রাম হইতে দূরে দাঁড়াইয়া ব্যাপক দৃষ্টিপাতের ফলে সৈন্য-পরিচালনা অভ্রান্ত হইতে পারে।···

···"বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশই যে কর্তব্যপালন করেন নাই, দায়িত্বকে অবহেলা করিয়াছেন, স্বাধীনতার নামে স্বাধীন চিন্তাকে জনমতের কর্ণধারগণের দাসত্বশৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত করিয়াছেন, তাহাদের দেওয়া সম্মান ও অন্নকে পরমোল্লাসে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা ত' আমি যৌবনকাল হইতে দেখিয়া

আসিতেছি। যুদ্ধ ইহাদের মুখোশ খুলিয়া দিয়াছে। ইহারা যে কতখানি নিষ্ঠাহীন, চরিত্রহীন, যূথবদ্ধ পশুপালের মত কতখানি স্বাতন্ত্র্যহীন, যুদ্ধের কল্যাণে তাহা আজ দিবালোকের মত সুস্পষ্ট। কিন্তু এই যুদ্ধের মধ্য দিয়া বুদ্ধিজীবীদের আরেকটি দলকেও লোকে চিনিতে পারিয়াছে। সংখ্যায়, ইহারা অল্প, কিন্তু যুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষায় ইহারা উত্তীর্ণ হইয়াছে। ইহাদের দেখিয়া লোকের মনে আশা জাগিয়াছিল যে, যুদ্ধের পরে এই দলটিকে কেন্দ্র করিয়া এমন একটি সেনাবাহিনী গড়িয়া উঠিবে যাহারা সত্যের দাবীকে ভবিষ্যতের সর্বপ্রকার আঘাতের হাত হইতে রক্ষার সংকল্প গ্রহণ করিবে।…

"'চিন্তার স্বাধীনতার ঘোষণাবাণীর (*Declaration of Independence of Thought*) মধ্য দিয়া আমি এই সৈনিকগণকে সম্মিলিত হইবার আহ্বান জানাই। ১৯১৯ সালের ১৬ই মার্চ এই ঘোষণাবাণী রচিত হয়, ২৬শে জুন 'লুমানিতে' পত্রিকায় উহা প্রকাশিত হয়। স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা ছিল সত্যই বিস্ময়কর। এক বৎসরের মধ্যে এই সংখ্যা কয়েকশত বৃদ্ধি পায়।"…

[শিল্পীর নবজন্ম : শ্রীসরোজ দত্ত কৃত অনুবাদ, পৃ ১৬-২০]

রোলাঁ রবীন্দ্রনাথকে প্রথম পত্রটি লেখেন ১০ই এপ্রিল,—দ্বিতীয় পত্রটি ৯ই জুলাই। ইতোমধ্যে কবির নিকট হইতে জবাব না-পাইয়া দ্বিতীয় পত্রটি লেখেন বলিয়া অনুমিত হয়। এই পত্রে রোলাঁ লিখিয়াছিলেন (৯ই জুলাই),

"It is some months since I sent you a copy of the enclosed Declaration. But as I was then in Switzerland, it may be that you have not received my packet. Should you approve of the spirit and expression of this Address, we shall be glad to secure your adherence."

অবশ্য ইংরেজ রাজত্বের আমলে—বিশেষ করিয়া জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের ও কবির নাইট্ উপাধি ত্যাগের পর তিনি ইংরেজ সরকারের খুবই বিরাগভাজন হন। স্বভাবতই সেদিন রোলাঁর চিঠিপত্র রবীন্দ্রনাথের ঠিক সময়ে না-পাইবার কথা। যাহাই হউক, ঐ পত্রের শেষে রোলাঁ ১লা জুলাই অবধি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের যে-সব শিল্পী ও মনীষীর ঘোষণাপত্রে সম্মতি ও স্বাক্ষর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার একটি তালিকা সংযোজন করিয়া দেন। ইহা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল :

"Among the adherents secured up to 1st July are : Jane Addams (United States); Henri Barbusse (France); Bazalgette (France); Roberto Bracco (Italy); Paul Birukoff (Russia); Dr L. E. J. Bromver (Holland); Benedetto Croce (Italy); A. de Chateaubriand (France); Georges Duhamel (France); Prof. A. Einstein (Germany); Dr Frederik van Eeden (Holland); Georges Eckhond

(Belgium) ; Prof. A. Forel (Switzerland) ; Prof. A. H. Fried (Austria) ; Hermann Hesse (Germany) ; Verner von Heidenstam (Sweden) ; P. J. Jouve (France) ; Ellen Key (Sweden) ; C. Kapteyn (Holland) ; Selma Lagerlof (Sweden), Andreas Latzko (Hungary) ; Lindhagen (Sweden) ; M. Lopez Pico (Catalonia) ; Lehmann (Germany) ; Heinrich Mann (Germany) ; Frans Masereel (Belgium) ; Sophus Michaelis (Denmark) ; Mathias Morhadt (France) ; Prof. Georg Fr. Nicolai (Germany) ; Eugenio d'Ors (Catalonia) ; Edmond Picard (Belgium) ; Prof. A Prenant (France) ; Prof. L Ragaz (Switzerland) ; Romain Rolland (France) ; Jules Romains (France), Bertrand Russel (England) ; Nicholas Roubakine (Russia) ; Fritz von Unruh (Germany) Henri van de Velde (Belgium), Israel Zangwill (England) Stefan Zweig (Austria)."

কিন্তু এই পত্রটি পাইবার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ ২৪শে জুন রোলাঁর প্রথম পত্রটির জবাব দেন। কবি উক্ত ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া যে পত্রটি লেখেন, উহা *Modern Review* পত্রিকায় (জুলাই ১৯১৯) প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন,

"When my mind was steeped in the gloom of the thought, that the lesson of the war had been lost, and that people were trying to perpetuate their hatred and anger into the same organised menace for the world which threatened themselves with disaster, your letter came and cheered me with its message of hope. The truths that save us have always been uttered by the few and rejected by the many and have triumphed through their failures. It is enough for me to know that the higher conscience of Europe has been able to assert itself in one of her choicest spirits through the ugly clamours of passionate politics ; and I gladly hasten to accept your invition to join the ranks of those free souls, who in Europe have conceived the project of a Declaration of Independence of the Spirit. Kindly accept my thanks for the noble words with which you have introduced the French translation of the passages from my 'Message to Japan' in your pamphlet. I hope to be excused for publising, in one of our Magazines, an English rendering of the same, as well as your letter to me

with the Declaration.…

[*Modern Review* : July 1919, p: 81.]

ইহা হইতেই বুঝা যায়, ঐ 'Declaration' এবং রোলাঁর চিঠি রবীন্দ্রনাথের মনে কী গভীর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথ যেন রোলাঁর মত মহাপ্রাণ 'choicest spirit'-দের মধ্যে ইউরোপের মহত্তর বিবেকবুদ্ধির অভ্যুত্থান প্রত্যক্ষ করিলেন। ভার্সাই সম্মেলনে বিজয়ী রাষ্ট্র-ধুরন্ধরদের রাজনীতির প্রতি তাঁহার কী অপরিসীম ঘৃণা, তাহা তাঁহার 'বাতায়নিকের পত্রে' আমরা বিস্তারিত লক্ষ্য করিয়াছি। ইউরোপের তৎকালীন উগ্র জাতীয়তাবাদী রাজনীতি, ডিপ্লোমাসি-কূটনীতিকে তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন—উহাকেই তিনি 'ugly clamours of passionate politics' বলিয়া অভিহিত করিতে চাহিলেন। সশস্ত্র অভ্যুত্থান নয়,—মানুষের বিবেক ও শুভবুদ্ধির অভ্যুত্থান চাই, ইহাই কবির আশা ও কামনা। ইহার জন্য জগতের সত্যসাধক মহাপ্রাণ ভাবুক ব্যক্তিদের নৈতিক শক্তি ও সংগ্রামের উপরই যেন তাঁহার আস্থা ও ভরসা। অবশ্য ইউরোপের প্রগতিশীল রাজনীতিক সমস্যা ও চিন্তা-চেতনার সহিত কবি সবিশেষ পরিচিত ছিলেন কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে, যে-সব প্রশ্ন ও সমস্যা সেদিন রোলাঁ প্রমুখ চিন্তাবিদ্দের নূতন করিয়া চিন্তিত করিয়া তুলে। এইকালে রোলাঁর সমস্ত চিন্তা-ভাবনা ও সমস্যার স্বরূপটি কি ছিল তাহা একটু স্মরণ রাখা দরকার। রোলাঁ লিখিতেছেন,

…"আমার সমস্যা ছিল স্বাধীন বুদ্ধিজীবীদের কর্মক্ষেত্রের সহিত সর্বহারা শ্রমজীবীদের কর্মক্ষেত্রের সংযোগসাধন। …সর্বহারা শ্রমজীবী যে পথ প্রস্তুত করিবে তাহাকে আলোকিত করাই বুদ্ধিজীবীদের কাজ।

"ই. ডি. মরেলের নিকট লিখিত আরেকখানি চিঠিতে আমি (১৯১৯ সালের ৩০শে মার্চ) আমার তখনকার চিন্তা ও কর্মধারা বিশ্লেষণ করি।… আমি লিখিয়াছিলাম, 'আমার বিশ্বাস মনুষ্য সমাজের বিবর্তনের জন্য শ্রমিক-শাসনের অভিমুখেই সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন রহিয়াছে।'

"অপরপক্ষে এই চিঠিতে বুদ্ধিজীবীদের বিশেষধরণের কর্তব্যের দাবী ছিল, যাহা মিটাইতে গেলে প্রথম প্রয়োজন স্বাধীনতার, কারণ এই স্বাধীনতা ছাড়া সত্যের সন্ধান অসম্ভব। সর্বদেশের স্বাধীন বুদ্ধিজীবীদের লইয়া গঠিত একটি আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের কল্পনা তখন আমার মনে ছিল। ইচ্ছা ছিল, 'যে-সকল বুদ্ধিজীবী যুদ্ধপন্থী জাতীয়তাবাদীদের খাতায় নাম লিখাইয়া তাহাদের সর্বপ্রকারের অপকর্মে জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন, এই সঙ্ঘ তাহাদের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করিয়া 'মননজীবীদের বিশ্বসঙ্ঘের' মূলনীতিগুলি নির্ধারণ করিবে। আমি চাহিয়াছিলাম, 'এই সঙ্ঘের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হোক আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক সমালোচনাকেন্দ্র, ছাত্রসমিতি ইত্যাদি, অর্থাৎ এককথায় বিশ্বব্যাপী এমন একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান যাহা ভবিষ্যৎ সমাজের মস্তিষ্কের কাজ করিবে।' [শিল্পীর নবজন্ম : পৃ: ২৩-২৪]

যাহাই হউক, রবীন্দ্রনাথ ঐ '*Declaration*'-এর বহুল প্রচারকল্পে উহা (রোলাঁর চিঠি সহ) এদেশের দু'-একটি পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। একমাত্র আনন্দকুমারস্বামী ছাড়া অন্য কোন ভারতীয় শিল্পী ও মনীষী ইহাতে স্বাক্ষর করেন নাই। ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজনীতির চিত্রটি স্মরণ রাখা দরকার। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে তখন আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিত ও চিন্তা-চেতনার নামগন্ধও ছিল না। সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধের তাৎপর্য ও শিক্ষা, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, বিশ্বশান্তি, ইউরোপের প্রগতিশীল রাজনীতিক চিন্তা-চেতনা—ইহার কিছুই যেন জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবর্গকে সেদিন স্পর্শও করে নাই। ১৯১৯ ডিসেম্বর মাসে, অমৃতসর-কংগ্রেস অধিবেশন হয়, ইহার কথা পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। এমন কি জাতীয় আন্দোলনের পরিষ্কার রূপ কী হইবে, সে-সম্পর্কেও গান্ধীজী, মতিলাল নেহরু, তিলক, চিত্তরঞ্জন দাশ—কাহারও পরিষ্কার কোন ধারণা ছিল না। জাতীয়-স্বার্থের অত্যন্ত স্বল্প ও ন্যূনতম দাবির অধিক কিছু আমরা সেদিন কল্পনাও করিতে পারি নাই। এই রাজনীতিতে কমিউনিষ্টদের "*Third International*" কিংবা '*Declaration of Independence of the Spirit*'-এর কোন সংবেদন-প্রতিক্রিয়া থাকিতে পারে না। তাই রোলাঁ ও রবীন্দ্রনাথের আবেদন-বাণী ভারতের নেতৃবর্গকে স্পর্শও করিল না।

বলা বাহুল্য, বুদ্ধিজীবীদের এই আন্দোলন অল্পকালের মধ্যেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল। বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা সম্পর্কে যে অত্যধিক গুরুত্ব ও আশা পোষণ করিয়াছিলেন, রোলাঁ তাহা অচিরেই উপলব্ধি করিয়া লিখিলেন,

…"কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই এই ঘোষণাবাণীর মারফতই বুঝা গেল আমাদের এই সেনাবাহিনী কত শূন্য, কত ব্যর্থ, কত আত্মপ্রবঞ্চিত। এই আমার স্বপ্নভঙ্গের, আশাভঙ্গের প্রথম অভিজ্ঞতা, প্রথম হইলেও তীব্রতা ইহার কম নহে।"…

[শিল্পীর নবজন্ম : পৃ:-২০]

কিন্তু তবুও নানা ভুল-ত্রুটি ও বাধা-বিপত্তির মধ্যে আন্তর্জাতিকতার চিন্তাধারা ক্রমশই প্রসারলাভ করিতে থাকে।

প্রথম মহাযুদ্ধই সাম্রাজ্যবাদের অন্তিমকাল ঘোষণা করে। আর সেই উগ্র জাতীয়-উন্মাদনার যুগে মহাযুদ্ধই আন্তর্জাতিকতা-যুগের বাস্তব সূচনা করিল। মহাযুদ্ধ বিশ্বশান্তি ও আন্তর্জাতিকতার প্রশ্নটিকে যেমন বড়ো করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছে,—তেমনই তুলিয়া ধরিয়াছে পরাধীন ও ঔপনিবেশিক দেশগুলির জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে। যুদ্ধোত্তর যুগে ইহাই হইল পৃথিবীর বৃহত্তম ঘটনা।

একনিষ্ঠ ও একমুখী চিন্তা ও সাধনা রবীন্দ্রনাথের কোনদিনই ছিল না। কবির অতুলনীয় বিরাট সৃজনীশীল প্রতিভা নিয়তই বিভিন্ন ও বিচিত্র দিকে ধাবিত হইয়াছে।

গভীর রাজনৈতিক উত্তেজনায় কবি জীবনে বারে-বারে তীব্র রাজনৈতিক আলোচনায় বা আন্দোলনে প্রায়-অংশগ্রহণ করিয়াছেন, আবার পরক্ষণেই গভীর প্রতিক্রিয়া ও অবসাদের মুখে পল্লীউন্নয়ন, গঠনমূলক কাজ ও শিক্ষাসংস্কারে আত্মনিয়োগ করিতে চাহিয়াছেন, আর এক-এক সময় গঠনমূলক কাজ, বিশেষ করিয়া শিক্ষাসংস্কার-সমস্যাকে তিনি শুধু রাজনীতি অপেক্ষা নহে,—সবার উর্ধ্বে স্থান দিতে চাহিয়াছেন। ইহাই রবীন্দ্রমানস ও রবীন্দ্রচিন্তার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ডের সংবাদে যে-প্রচণ্ড আবেগ-উত্তেজনায় কবি প্রতিবাদ আন্দোলনের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন, 'নাইটহুড্'-পরিত্যাগ-পত্র লিখিবার পর তাহা যেন নিমেষে স্তিমিত হইয়া গেল। কিন্তু কেন সে-কথা পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। তাঁহার কর্তব্য ও বিবেকবুদ্ধি যেন নীরবে এই কথাটাই ঘোষণা করিল,—'ব্যস্! আমার কর্তব্য আমি করিয়াছি; আমার কাজ শেষ হইয়াছে!'

কবি জানিতেন, রাজনীতি তাঁহার জন্য নহে; অথচ দেশের ও বিশ্বের গভীর রাজনৈতিক সমস্যা-সংকটে তিনি চিন্তাভাবনা ও কথা না-বলিয়াও থাকিতে পারিতেন না। কিন্তু রাজনীতিক নেতৃত্বের ভূমিকা তিনি কখন—কোনদিনও গ্রহণ করিতে চাহেন নাই। শুধু একজন স্বদেশপ্রেমিক ও বিবেকী মানবতাবাদী কবি হিসাবে ঐ-সব সমস্যা ও তাহার সমাধান সম্পর্কে চিন্তা করিতেন। কিন্তু আদর্শ, লক্ষ্য ও পন্থাগত বিষয়েও জাতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত কিছুতেই একমত হইতে পারিতেছিলেন না,—কখনও, কোনদিনও পারেন নাই। এখানে তিনি যেন চিরদিনই নিঃসঙ্গ—একক। পাঞ্জাবে অমানুষিক হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের পর নেতৃবৃন্দের আচরণে তাঁহাদের প্রতি আস্থায় কোথায় যেন এক প্রচণ্ড আঘাত ও চির্ খাইয়াছে। তৎকালীন রাজনীতি ও নেতৃবৃন্দের উপর যেন বড় একটা আস্থা ও ভরসা তিনি করিতে পারিতেছেন না। এই সময় তিনি তাঁহার কর্মক্ষমতা, যোগ্যতা ও ভূমিকা পর্যালোচনা ও আত্মবিশ্লেষণ করিয়া মোটামুটি স্থির করিয়া ফেলেন,—বাস্তব গঠনমূলক কার্যের মধ্যে তাঁহার শক্তি ও উদ্যমকে নিয়োগ করিবেন। আর সেই পরিকল্পনা হইতেছে কবির 'বিশ্বভারতী'। একথা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি।

কলিকাতা হইতে শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিয়াই কবি বিশ্বভারতীর গঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। ৩রা জুলাই, ১৯১৯ (১৮ই আষাঢ়

১৩২৬) বিশ্বভারতীর কার্য শুরু হয়। 'বিশ্বভারতী বলিতে তখন এই নূতন বিভাগকে বুঝাইত, পরে এই অংশ উত্তর-বিভাগ ও স্কুল-অংশ পূর্ব-বিভাগ নামে খ্যাত হয়।'

ভারতবর্ষে এই সময় বিভিন্ন প্রদেশে নূতন-নূতন বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া তুলিবার আন্দোলন চলিতে থাকে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষানীতির আদর্শ কি হইবে এই লইয়া কিছু আলোচনা তর্ক উঠে। ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পুরাতন শিক্ষাবিধির উপর দেশের লোকের একটা বীতরাগ ও অসন্তোষ জমিয়া উঠিতে থাকে ; কবি উহা গভীরভাবে লক্ষ্য করিতেছিলেন। এই সময় দেশের শিক্ষা-সমস্যার উপর তিনি পর-পর তিনটি প্রবন্ধ লেখেন ("অসন্তোষের কারণ", "বিদ্যার যাচাই," "বিদ্যাসমবায়")।

'অসন্তোষের কারণ' (শান্তিনিকেতন পত্রিকা-১৩২৬ জ্যৈষ্ঠ) প্রবন্ধে তিনি বলিলেন,

…"আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষার যখন প্রথম পত্তন হইয়াছিল তখন তাহার লক্ষ্য ছিল এই যে, ব্রিটিশ ভারতের রাজ্যশাসন ও বাণিজ্যচালনের জন্য ইংরেজি-জানা দেশি কর্মচারী গড়িয়া তোলা।…যতকাল ছাত্র-সংখ্যা অল্প ছিল ততকাল প্রয়োজনের সঙ্গে আয়োজনের সামঞ্জস্য ছিল ; কাজেই সেদিক হইতে কোনো পক্ষে অসন্তোষের কোনো কারণ ঘটে নাই। যখন হইতে ছাত্রের পরিমাণ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে তখন হইতেই এই শিক্ষা ব্যবস্থার একটা প্রধান উদ্দেশ্য অধিকাংশ ছাত্রেরই পক্ষে ব্যর্থ হইতেছে। যদি আমাদের দেশের শিক্ষায় ছাত্রদিগকে চাকরি ছাড়া অন্যান্য জীবিকার সংস্থানের পটু করিয়া তুলিত তাহা হইলে এই সম্বন্ধে নালিশের কথা থাকিত না।"…

অসন্তোষের দ্বিতীয় কারণটি সম্পর্কে তিনি বলিলেন, আমরা দীর্ঘকাল ইংরেজী স্কুলে পড়িতেছি অথচ এখনও পর্যন্ত বিশ্বের ভাণ্ডারে এমন কিছু উল্লেখযোগ্য মৌলিক ও সৃজনশীল অবদান সংযোজন করিতে পারিলাম না। তাহার কারণ, তিনি বলিলেন,

…"আমাদের শিক্ষাকে আমাদের বাহন করিলাম না, শিক্ষাকে আমরা বহন করিয়াই চলিলাম"…তাই তিনি বলিলেন,

"বর্তমান শিক্ষা প্রণালীটাই যে আমাদের ব্যর্থতার কারণ, অভ্যাসগত অন্ধ মমতার মোহে সেটা আমরা কিছুতেই মনে ভাবিতে পারি না।…

"অনেক কাল এমনি করিয়া কাটিল, আর সময় নষ্ট করা চলিবে না। এখন মনুষ্যত্বের দিকে তাকাইয়া লক্ষ্যেরও পরিবর্তন করিতে হইবে। সাহস করিয়া বলিতে হইবে, যে শিক্ষা বাহিরের উপকরণ তাহা বোঝাই করিয়া আমরা বাঁচিব না, যে শিক্ষা অন্তরের অমৃত তাহার সাহায্যেই আমরা মৃত্যুর হাত এড়াইব।"

[শিক্ষা ।। পৃঃ ২১৮-২০]

দীর্ঘকালের এই ইংরেজী-শিক্ষায় সাহিত্যের মূল্যায়ন ও রসবিচারে যে আমরা কী দীন ও অসহায়ভাবে তখনও পর্যন্ত বিলাতের মাষ্টারমশায়দের মুখের-দিকে তাকাইয়া আছি, কবি অত্যন্ত ক্ষোভের সহিত তাহার কারণ উল্লেখ করিতে গিয়া 'বিদ্যার যাচাই' প্রবন্ধে (শান্তিনিকেতন পত্রিকা—১৩২৬ আষাঢ়) বলিলেন,

"ইংরেজি ইস্কুলে এত দীর্ঘকাল দাগা বুলাইয়াও কেন আমরা কোনো বিষয়ে জোরের সঙ্গে মৌলিনতা প্রকাশ করিতে পারিলাম না, এই প্রশ্ন আমাদের মনে উঠিয়াছে। ইহার কারণ, বিদ্যাটাও যেখান হইতে ধার করিয়া লইতেছি বুদ্ধিটাও সেখান হইতে ধার-করা। কাজেই নিজের বিচার খাটাইয়া এ বিদ্যা তেজের সঙ্গে ব্যবহার করিতে ভরসা পাই না। বিদ্যা এবং বুদ্ধির ক্ষেত্রে ইংরেজের ছেলে পরবশ নহে, তাহার চারিদিকেই স্বাধীন সৃষ্টি ও স্বাধীন বিচারের হাওয়া বহিতেছে। একজন ফরাসি বিদ্বান নির্ভয়ে ইংরেজি বিদ্যার বিচার করিতে পারে, তার কারণ, যে ফরাসি বিদ্যা তাহার নিজের সেই বিদ্যার মধ্যেই বিচারের শক্তি ও বিধি রহিয়াছে।"...

তিনি বলিলেন,

"আমাদের মুস্কিল এই যে, আগাগোড়া সমস্ত বিদ্যাটাই আমরা পরের কাছ হইতে পাই। সে বিদ্যা মিলাইব কিসের সঙ্গে, বিচার করিব কী দিয়া? নিজের যে বাটখারা দিয়া পরিমাপ করিতে হয় সেই বাটখারাই নাই"...

[শিক্ষা ॥ পৃঃ ২২২-২৩]

উনিশ শতকের শেষ ভাগে আমাদের জাতীয় আন্দোলন প্রবল হইতে থাকিলে ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতি ও দর্শন সম্পর্কে একটি উগ্র জাতীয়-অহমিকা প্রকাশ পাইতে থাকে। 'বিদ্যাসমবায়' প্রবন্ধে এই ভ্রান্ত চিন্তাধারার তীব্র সমালোচনা করিয়া তিনি বলিলেন, (শান্তিনিকেতন পত্রিকা-১৩২৬ আশ্বিন-কার্তিক)

..."শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে আমাদের নিজ দেশের বিদ্যার স্থান নাই, অথবা তার স্থান সব পিছনে; সেইজন্য আমাদের সমস্ত শিক্ষার মধ্যে এই কথাটি প্রচ্ছন্ন থাকে যে, আমাদের নিজ দেশের বিদ্যা বলিয়া পদার্থই নাই, যদি থাকে সেটা অপদার্থ বলিলেই হয়। এমন সময় হঠাৎ বিদেশী পণ্ডিতদের মুখে আমাদের বিদ্যার সম্বন্ধে একটু যদি বাহবা শুনিতে পাই অমনি উন্মত্ত হইয়া বলিতে থাকি, পৃথিবীতে আর সকল বিদ্যা মানবী আমাদের বিদ্যা দৈবী।... ইংরেজিতে যাহাকে বলে স্পেশাল ক্রিয়েশন ইহা তাই...অহংকারের আঁধি লাগিয়া একথা আমরা একেবারে ভুলিয়া যাই যে, কোনো-একটি বিশেষ জাতির জন্যই বিধাতা সর্বাপেক্ষা অনুকূল ব্যবস্থা স্বহস্তে করিয়া দিয়াছেন, এ-সব কথা বর্বরকালের কথা। স্পেশাল ক্রিয়েশনের কথা আজিকার দিনে আর ঠাঁই পায় না।..."

উপসংহারে, তিনি একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আন্তর্জাতিক শিক্ষা-সংস্কৃতির চর্চার আহ্বান জানাইয়া বলিলেন,

"একদিন চৈন পারসিক মৈশর গ্রীক রোমীয় প্রভৃতি প্রত্যেক বড়ো

জাতিই ভারতীয়ের মতোই ন্যূনাধিক পরিমাণে নিজের সুরক্ষিত স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে নিজ সভ্যতাকে বড়ো করিয়া তুলিয়াছিল। পৃথিবীর এখন বয়স হইয়াছে; জাতিগত বিদ্যাস্বাতন্ত্র্যকে একান্তভাবে লালন করিবার দিন আজ আর নাই। আজ বিদ্যাসমবায়ের যুগ আসিয়াছে। এই সমবায়ে যে বিদ্যা যোগ দিবে না, যে বিদ্যা কৌলীন্যের অভিমানে অনূঢ়া হইয়া থাকিবে, সে নিষ্ফল হইয়া মরিবে।

"অতএব, আমাদের দেশে বিদ্যা সমবায়ের একটি বড়ো ক্ষেত্র চাই, যেখানে বিদ্যার আদান প্রদান ও তুলনা হইবে, যেখানে ভারতীয় বিদ্যাকে মানবের সকল বিদ্যার ক্রমবিকাশের মধ্যে রাখিয়া বিচার করিতে হইবে।

"তাহা করিতে গেলে ভারতীয় বিদ্যাকে তাহার সমস্ত শাখা-উপশাখার যোগে সমগ্র করিয়া জানা চাই। ভারতীয় বিদ্যার সমগ্রতার জ্ঞানটিকে মনের মধ্যে পাইলে তাহার সঙ্গে বিশ্বের সমস্ত বিদ্যার সম্বন্ধনির্ণয় স্বাভাবিক প্রণালীতে হইতে পারে।…

"অতএব, আমাদের বিদ্যায়তনে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন ও পার্সি বিদ্যার সমবেত চর্চায় আনুষঙ্গিকভাবে য়ুরোপীয় বিদ্যাকে স্থান দিতে হইবে।"

"সমস্ত পৃথিবীকে বাদ দিয়া যাহারা ভারতকে একান্ত করিয়া দেখে তাহারা ভারতকে সত্য করিয়া দেখে না। তেমনি যাহারা ভারতের কেবল এক অংশকেই ভারতের সমগ্রতা হইতে খণ্ডিত করিয়া দেখে তাহারাও ভারত-চিত্তকে নিজের চিত্তের মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারে না।"…

'লীগ অব নেশনস্'-এর সর্বজাতিক ঐক্য কিংবা ভারতবর্ষে কংগ্রেসের জাতীয় ঐক্য ও মিলনের আহ্বান,—কবির মতে, এই পোলিটিকেল ঐক্যও যথেষ্ট নহে। তাই তিনি বলিলেন,

…"এই কারণ-বশতই পোলিটিকাল ঐক্যের অপেক্ষা গভীরতর উচ্চতর মহত্তর যে ঐক্য আছে তার কথা আমরা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে পারি না। পৃথিবীর সকল ঐক্যের যাহা শাশ্বত ভিত্তি তাহাই সত্য ঐক্য। সে ঐক্য চিত্তের ঐক্য, আত্মার ঐক্য। ভারতে সেই চিত্তের ঐক্যকে পোলিটিকাল ঐক্যের চেয়ে বড়ো বলিয়া জানিতে হইবে; কারণ, এই ঐক্যে সমস্ত পৃথিবীকে ভারতবর্ষ আপন অঙ্গনে আহ্বান করিতে পারে।"…

[শিক্ষা ॥ পৃঃ ২২৫-২৮]

বলা বাহুল্য, এ-সব রচনার মধ্যে বিশ্বভারতীর শিক্ষাদর্শটির মূল কথাটি প্রকাশ পেয়েছে। কিভাবে এবং কোন মূল আদর্শের ভিত্তিতে তিনি বিশ্বভারতীকে গড়িয়া তুলিবেন, তাহারই বিভিন্ন দিকে চিন্তাভাবনা প্রকাশ পাইতেছে।

কিন্তু শুধু সমালোচনা করিয়া ক্ষান্ত হইবার লোক রবীন্দ্রনাথ নহেন। এই সময় তিনি বিশ্বভারতীর আভ্যন্তরীণ উন্নতি ও সংগঠনের কাজে খুবই তৎপর হন। শুধু তাহাই নহে, এণ্ড্রুজ, বিধুশেখর শাস্ত্রী, কপিলেশ্বর মিশ্র ও

রথীন্দ্রনাথ প্রভৃতির সহিত কবি স্বয়ং ছাত্রদের সাহিত্যের ক্লাসে পড়াইতে লাগিলেন। অবলীলাক্রমে তিনি ছাত্রদের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিয়া তাহাদের হৃদয় জয় করিয়া ফেলিলেন, কবির অতুলনীয় পঠন ও বাচনভঙ্গীতে অতি নীরস, দুরূহ, দুর্বোধ্য বিষয়ও সহজ এবং সরস হইয়া উঠিত।

এই সময় বিশ্বভারতীর শিল্প, সঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতি ললিত ও চারুকলার কয়েকটি বিভাগের উদ্বোধন হয়।

মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও জ্ঞানানুশীলনের সহিত সৌন্দর্যবোধ ও রসবোধের বিকাশের প্রয়োজন; এক কথায় মানুষের সামগ্রিক বিকাশের (total development) মধ্যেই জীবনের সত্যকারের সার্থকতা,—ইহাই রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শের মূল কথা। এই সময় একটি প্রবন্ধে তিনি বলিলেন,

"মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি এমন একটা জিনিস জাতিবিশেষে যাহার তারতম্য আছে কিন্তু প্রকারভেদ নাই। যুক্তির নিয়ম সকল দেশেই সমান; যে সকল পদার্থ প্রমাণের বিষয় তাহাদিগকে প্রমাণ করিবার প্রণালী সর্বত্র এক।··· বুদ্ধিবৃত্তিমূলক যে শিক্ষা য়ুরোপ পৃথিবীকে দিতেছে, তাহা সর্বত্র এক হইবেই।

"কিন্তু হৃদয়বৃত্তির দ্বারা মানুষ আপন ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে। এই ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্য থাকিবেই আর থাকাই শ্রেয়।···এই হৃদয়বৃত্তির প্রকাশ কলাবিদ্যার সাহায্যেই ঘটে। সভ্য অসভ্য সকল দেশেই এই সকল কলাবিদ্যার পরে দেশের লোকের দরদ আছেই। কেবল আমাদের বিদ্যাদানের ব্যবস্থায় এই কলাবিদ্যার কোন স্থান নাই।

"···বস্তুতঃ আনন্দপ্রকাশ জীবনীশক্তির প্রবলতারই প্রকাশ। এই আনন্দ-প্রকাশের পথগুলিকে মারিয়া দিলে জাতির জীবনীশক্তিকেই ক্ষীণ করিয়া দেওয়া হয়।···যে জাতি আনন্দ করিতে ভোলে সে-জাতি কাজ করিতেও ভোলে।··· আমাদের দেশেই আনন্দকে বিজ্ঞলোক ভয় করে, সৌন্দর্যভোগকে তাহারা চাপল্য মনে করে এবং কলাবিদ্যাকে অপবিদ্যা ও কাজের বিঘ্নকর বলিয়া জানে।···"

তাই তিনি বলিলেন,

"বিশ্বভারতী যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তবে ভারতীয় সঙ্গীত ও চিত্রকলা শিক্ষা তাহার প্রধান অঙ্গ হইবে, এই আমাদের সংকল্প হাউক।"

[শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩২৬ অগ্রহায়ণ-পৃঃ ৬-৭]

বস্তুতপক্ষে এই সময় হইতেই সুরেন্দ্রনাথ কর, নন্দলাল বসু, অসিত হালদার প্রভৃতি শিল্পীদের সহায়তায় 'কলাভবন' এবং অজিতকুমার চক্রবর্তী, দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভীমরাও শাস্ত্রী, সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রী ও নকুলেশ্বর গোস্বামীর সহায়তায় 'সঙ্গীত ভবনের' পত্তন হয়।

ওদিকে 'ভার্সাই সন্ধিচুক্তি'র বিবরণ প্রকাশিত হইবার পর 'লীগ অব নেশনস্'-এর *covenant*এর বিভিন্ন ধারার উপর দৈনিক পত্র-পত্রিকায় আলোচনা

চলিতে থাকে।

যুদ্ধ ও বিশ্বশান্তির সমস্যায় কবি গভীরভাবে বিচলিত ও চিন্তিত। কবি ভাবিতেছেন, 'আজিকার এই দুর্যোগ মুহূর্তে বিশ্বভারতী পৃথিবীকে কী এমন আশ্বাসবাণী শুনাইতে পারে?' রমাঁ রোলাঁ ও আনাতোল্ ফ্রাঁস প্রমুখ মনীষীদের আকুল আবেদনও তাঁহাকে বিচলিত করিয়া তুলিতে থাকে।

এই সময় 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় আনাতোল ফ্রাঁসের একটি আবেদন প্রকাশিত হয়। তীব্র আবেগময়ী ভাষায় ফ্রাঁস এই যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার নিপাত জানাইয়া বলিষ্ঠ মানবতা, প্রেম ও শান্তির আদর্শে নবযুগের শিশুদের জন্য এক নূতন শিক্ষাদর্শের আবেদন জানাইলেন:

"শিশুদের চিত্তবৃত্তিকে আপনারা যে ভাবে বিকশিত করে তুলবেন তার উপর আমাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করচে।"...

"যুদ্ধের ফলে এই যে সামাজিক ও নৈতিক বিপর্যয় ঘটেছে এবং যুদ্ধ-অবসানে সন্ধিপত্র এই বিপর্যয়কেই যখন চিরন্তন করে তোল্‌বার অভিপ্রায় জানাচ্চে, তখন সব জিনিষকে পুনর্গঠিত সুসংস্কৃত করে তোলবার ভার আপনাদের উপর রয়েচে।...

"যে শিক্ষা আমাদের সর্ব্বনাশের অতল গহ্বরে টেনে নিয়ে যাচ্চে সে শিক্ষাকে আর টিঁক্‌তে দেওয়া চলবে না! সমস্ত বিদ্যালয় থেকে দূর করে দাও সেই শিক্ষা যে শিক্ষা শিশুদের মনে নরহত্যাপ্রিয়তা এবং পাপপ্রবণতা জাগিয়ে তোলে।

"বন্ধুগণ, এই সব নিদারুণ অভ্যাস দূর করতে হবে। অধ্যাপকরা শিশুদিগকে কর্ম্ম এবং প্রেমের জয়গান করতে শিক্ষা দিন্, যুদ্ধ-বিরোধকে ঘৃণা করতে শিক্ষা দিন্।...শিক্ষার আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করে সামাজিক বিপ্লব জাগিয়ে তুলে সব বলিষ্ঠ কর্ম্মীপুরুষ তৈরী করে তুলুন। যারা কর্ম্মী, বীর তারাই বাঁচবে আর সব বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

"দগ্ধ কর সেই সব বই যা মানব বিদ্বেষের সমর্থন করে। কর্ম্ম এবং প্রেমের জয়গান কর। আপনারা এমন সব বীর তৈরী করে তুলুন যারা এই উগ্র গর্ব্বস্ফীত স্বাজাত্য এবং Imperialism কে পদদলিত করে পৃথিবী থেকে চিরনির্ব্বাসিত কর্‌তে পার্‌বে।

"আর যুদ্ধ নয়, আর বাণিজ্য নিয়ে রেষারেষি নয়; আমরা চাই এখন কর্ম্ম এবং শান্তি। সব মানুষই এক, এই চেতনা যদি আমাদের মনে জাগ্রত না হয় তবে আর আমাদের ধ্বংস থেকে কে রক্ষা করবে?"

উপসংহারে আনাতোল ফ্রাঁস একটি প্রস্তাব জানাইয়াছিলেন,

..."আমার আন্তরিক ইচ্ছা এই যে, একটা আন্তর্জাতিক শিক্ষক সমিতি সংগঠিত হোক্ এবং তাঁরা সকলেই মিলিত হয়ে স্থির করুন কি প্রণালীতে শিশুদের শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য এবং এমন সব ভাব প্রচার করুন যার ফলে পৃথিবীতে অক্ষয় শান্তি স্থাপিত হবে আর 'সব মানুষ এক' এই ধারণা বিশ্ববাসীর মনে বদ্ধমূল হবে।

"একটা জগৎজোড়া আমূল পরিবর্ত্তনের সময় এসেছে। পাপশক্তি আপনার বিষে আপনি জর্জ্জরিত হয়ে মরবে। নরহন্তা, লোভী, নিষ্ঠুর যারা তারা দূষিত রক্তাধিক্যে নিজেরাই ফেটে মরচে।

"গর্ব্বান্ধ ও পাপিষ্ঠ উপরওয়ালাদের দুর্বৃত্ততার উৎপীড়নে জনসাধরণ পিষ্ট ক্ষতবিক্ষত হচ্চে, কিন্তু তবু এই জনসাধারণ মাথা উঁচু করে জেগে উঠবে, বিশ্ব-বাসী এই জনসাধারণ এক মহামিলন ক্ষেত্রে মিলিত হবে এবং Socialist-দের এই ভবিষ্যদ্বাণী তারাই সফল করবে 'সকল কর্ম্মীর মিলনেই জগতে অক্ষয় শান্তি স্থাপিত হবে'।"

[শান্তিনিকেতন পত্রিকা-১৩২৬ অগ্রহায়ণ ॥ পৃঃ ৮২]

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক উহা অনূদিত হয় কিন্তু একথা অনুমান করিতে কষ্ট হয় না, তা' রবীন্দ্রনাথেরই নির্দেশানুক্রমে। শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর শিক্ষাদর্শ বিশ্বের সমক্ষে উহার মূল কথাটাই তুলিয়া ধরিবে,—ইহাই কবির ইচ্ছা ও বাসনা।

৭ই পৌষ (১৩২৬) প্রাতে মন্দিরে কবি ইউরোপ তথা বিশ্বের যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি সম্পর্কে যে পর্যালোচনা করেন তাহা অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। কবি বলিলেন,

"আজকের দিনে য়ুরোপ ধন মান প্রতাপ ও বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত। সেই য়ুরোপের আসন আজ মৃত্যুর আঘাতে যেমন করে টলে উঠেচে ইতিহাসে এমন প্রায় দেখা যায় না। বাহিরের সেই টলার সঙ্গে তার অন্তর যে টলে ওঠেনি তা নয়—জীবনসমস্যা আর একবার চিন্তা করে দেখতে সে প্রবৃত্ত হয়েচে। কিন্তু নূতন জীবনের দীক্ষা নেওয়া ছাড়া তার কি আর কোন পথ আছে ?

"য়ুরোপে একদিন ফ্যুডালতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয়। সেই তন্ত্রে সেখানকার নিম্নস্তরের জনসাধারণ উচ্চস্তরের শাসনকর্ত্তাদের স্বার্থভার বহন করে এসেচে—একদলের দাসত্বের উপর আর একদলের প্রভুত্ব নির্ভর করেচে। তারপরে আজ সেখানে ডিমক্রেসির প্রাদুর্ভাব। এই ডিমক্রেসির প্রভাবে সেখানকার সমাজে অন্য ভেদরেখা ক্ষীণ হয়ে এসে ধনী নির্ধনের ভেদরেখা বিপুল হয়ে উঠেচে। এখন সেখানে অনেকদিন থেকেই ধনিকের স্বার্থ কর্ম্মিকেরা বহন করে এসেচে। এই ধনিকের স্বার্থজাল আজ সমস্ত জগৎকে বেষ্টন করেচে।

"এই স্বার্থ যতই বিপুল হয়ে উঠেচে এই স্বার্থের সংঘাতও ততই ভয়ংকর হয়েচে। সেই সংঘাতের ভীষণরূপ আমরা দেখচি। এই ভীষণতা বিজ্ঞানের সহায়তায় ভাবীকালে আরো যে বিরাট মূর্ত্তি ধরবে তার আর সন্দেহ নেই।

"য়ুরোপে আজ তাই সমাজকে গড়ে তোলবার কাজে আর একবার হাত লাগাবার কথা হচ্চে। কিন্তু 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যাস্বিদ্ধনং' একথা এখনো স্পষ্ট করে মনে উঠচে না। পূর্ব্বে যে স্বার্থের এক মহল দুর্গ ছিল তার জন্যে আজ সাতমহল দুর্গ বানিয়ে তাকে নিরাপদ করবার ইচ্ছা

য়ুরোপে জেগে উঠেচে। একথা বুঝেও বুঝচে না যে স্বার্থ কখনো বিরোধ মেটাতে পারে না। তাই একদিকে শান্তির কথা চল্‌চে আর একদিকে প্রকাশ্যে ও গোপনে অস্ত্রও শানিত হচ্চে। সেখানকার সমাজে বণিকের বেশে যে স্বার্থ গদীতে বসে আছে রাজার বেশে যে স্বার্থ সিংহাসনে—তারা নিজের বাহ্য বেশ অল্পস্বল্প বদ্‌লাতে রাজি আছে কিন্তু কি উপায়ে তাদের গদী তাদের সিংহাসন অনন্তকাল স্থায়ী হয় এ চিন্তা কিছুতে তাদের মন থেকে ঘুচতে চায় না।

"কিন্তু হয় নবজীবনের দীক্ষা নিতে হবে, নয় বারে বারে মৃত্যুর পর মৃত্যু এসে সমস্ত লোপ করে দেবে, এর মাঝখানে কোন রফা নিষ্পত্তির কথা চলবে না।"…

এখানে পুঁজিবাদিদের সমস্যাসমূহের মূল কথাটি কবি সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন।

কিন্তু তাহা হইলে এই সমস্যা সংকটের সমাধান কোথায়? উপসংহারে কবি উহার জবাবে বলিলেন,

…"দুঃখপীড়িত জগতের মাঝখানে বসে আজ আমাদের পক্ষে এই কথা গভীর ভাবে ভাববার দিন। মানুষকে তার অহমিকা থেকে নাড়িয়ে দিয়ে তাকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করবার যে দীক্ষামন্ত্র সেই মন্ত্র আমাদের প্রত্যেকের হোক্‌।"

[শান্তিনিকেতন পত্রিকা-১৩২৬ ফাল্গুন-পৃঃ ২-৩]

অর্থাৎ সর্বদেশের সর্বমানবের সত্যকারের যে অধ্যাত্মবোধ,—এই বোধ ও উপলব্ধির মধ্যেই আজিকার বিরোধ-সংঘাতের হাত হইতে পরিত্রাণ ও মুক্তির সন্ধান মিলিবে। কিন্তু উহা নিছক 'অধ্যাত্মচর্চা' নহে। অধ্যাত্মবোধ বলিতে কবি মানুষের বিশুদ্ধ জ্ঞান ও চেতনার কথাই বলিতে চাহিয়াছেন। আচার্যের বেদীভূমি হইতে কবি তাঁহার ভাষণে মূলত বিশ্বের যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি সম্পর্কে রাজনৈতিক আলোচনা করিলেন। বিশ্বসমস্যায় কবি বিশ্বশান্তি, সৌভ্রাত্র প্রেম ও বৃহত্তর মানবতার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিতে চাহিলেন।

কিন্তু তবুও তিনি আনাতোল ফ্রাঁসের মত দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে একথা ঘোষণা করিতে পারিলেন না, "একটা জগৎজোড়া আমূল পরিবর্তনের সময় এসেছে।…গর্বান্ধ ও পাপিষ্ঠ উপরওয়ালাদের দুর্বৃত্ততার উৎপীড়নে জনসাধারণ পিষ্ট ও ক্ষতবিক্ষত হচ্চে, কিন্তু তবু এই জনসাধারণ মাথা উঁচু করে জেগে উঠবে, বিশ্ববাসী এই জনসাধারণ এক মহা মিলন ক্ষেত্রে মিলিত হবে এবং Socialist-দের এই ভবিষ্যদ্বাণী তারাই সফল করবে 'সকল কর্মীর মিলনেই জগতে অক্ষয় শান্তি স্থাপিত হবে'।" রাশিয়ার-বিপ্লব ও যুদ্ধোত্তর ইউরোপের গণ-আন্দোলন আস্তে আস্তে আনাতোল ফ্রাঁসের চোখের সম্মুখে এক মহা-ভবিষ্যৎ—এক নূতন দিগন্ত মেলিয়া ধরে। উহাতেই তাঁহার কণ্ঠস্বরে এত দৃঢ়তা। রবীন্দ্রনাথ তখনও এই ইউরোপকে পরিষ্কার দেখিতে পান নাই। তাই বৈপ্লবিক গণচেতনা ও গণ-আন্দোলনের উপর তিনি আস্থা ও ভরসা রাখিতে পারিলেন না।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমস্যা আরও এবং জটিল। বিশ্বভারতী আন্তর্জাতিক

বিশ্ববিদ্যালয় আবার ন্যাশনাল বিদ্যালয়ও বটে। ন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা থাকা সঙ্গত হইবে কিনা, ইহাও কবির সমস্যা। স্মরণ রাখা দরকার, অল্প কয়েক বৎসর আগে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে 'কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়' (১৯১৬), হায়দ্রাবাদে 'ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়' (১৯১৮) প্রতিষ্ঠিত হয়। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ই কলিকাতায় 'গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন' এবং আলিগড়ে 'জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া', স্থাপিত হয়। এই সময় 'ধর্মশিক্ষা' (শান্তিনিকেতন পত্রিকা-১৩২৬ পৌষ) প্রবন্ধে তিনি বলিলেন,

..."এ পর্যন্ত আমাদের দেশে যে সকল ন্যাশনাল বিদ্যালয়ের পত্তন হইয়াছে সেগুলি বস্তুত হিন্দু বিদ্যালয়। এইজন্য সে সকল জায়গায় প্রধানত হিন্দুশাস্ত্র ও হিন্দুধর্ম্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে—ইহাতে ভেদ দূর না করিয়া ভেদবুদ্ধিকেই দৃঢ় করিবার উপায় অবলম্বন করা হয়।

"ন্যাশনলত্ব তাহাকেই বলে যাহা সমস্ত দেশ জোড়া সামাজিকতা।...

"কিন্তু ধর্ম্ম সম্বন্ধে সকলকে এক জায়গায় ডাকিয়া বসাইবার মত স্থান যদি আমাদের একেবারে না থাকে, যদি আমাদের সকল ধর্ম্মই নিতান্ত সাম্প্রদায়িক হয়, যদি তাহার আচার অনুষ্ঠান সমস্তই কেবল বিশেষ স্থানের বিশেষ সংস্কারেরই উপযোগী হয়, তবে আমাদের দেশের ন্যাশনাল বিদ্যালয়ে ধর্ম্মের কথাটা একেবারে তোলাই যাইতে পারে না।"

আবার ঠিক পরক্ষণই কবি বলিতেছেন,

"কিন্তু ভারতে কি কেবল সাম্প্রদায়িক ধর্মই আছে...ভারতের ধর্মক্ষেত্র কি সকল সম্প্রদায়কেই একত্রে আতিথ্যে আহ্বান করিবার স্থান নাই?... কিন্তু ভারতের সাধনা যেখানে সত্য, যেখানে সনাতন, সেখানে তাকাইয়া জোর করিয়া বলিতে পারি যে, আছে।

"উপনিষৎ হইতে এমন বিশুদ্ধ ঈশ্বরবাদ পাওয়া যায় যাহা কোনো সংকীর্ণ দেশ কাল বা জাতির বিশেষ সংস্কারের দ্বারা আবৃত নহে। যে কোন ধর্মসম্প্রদায় ঈশ্বরকে স্বীকার করে, উপনিষদে সে আপন ধর্মের প্রশস্ত নির্মল মূলতত্ত্বটি দেখিতে পাইবে। সেই উপনিষদে শান্তং শিবমদ্বৈতং যিনি, তাঁহারই নামে আমরা পৃথিবীর সমস্ত ঈশ্বরবিশ্বাসী ধর্মসম্প্রদায়কে একাসনে বসাইবার জন্য আহ্বান করিতে পারি...

[শান্তিনিকেতন পত্রিকা-১৩২৬ পৌষ-পৃঃ ৪-৫]

কিন্তু উপনিষদ হিন্দু ধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দর্শন-গ্রন্থ। উপনিষদের শিক্ষা যে আসলে হিন্দু-সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অহমিকা ও আবেগ-উচ্ছ্বাসকে প্রখর এবং উজ্জীবিত করিবে পক্ষান্তরে অন্যান্য ধর্ম-সম্প্রদায়কে স্ব-স্ব ধর্ম-সচেতন হইতে প্ররোচিত করিবে, কবি তখনও তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। কবি স্বয়ং ঐ প্রবন্ধেই আর এক জায়গায় বলিলেন,

..."ধর্মমতের মধ্যে সত্যকে লইয়াই বিবাদ আছে। এমন দুই ধর্মমত আছে যাহার একটিকে সত্য বলি তবে অন্যটিকে মিথ্যা বলিতেই হইবে।

শুধু তাই নয়, ধর্মের অনুষ্ঠানে ও মূলগত বিরুদ্ধতা থাকিতে পারে।”…

এই বাস্তব জটিল সমস্যাটি সত্য হইলে কবির বক্তব্যের স্ববিরোধিতাটি প্রকট হইয়া পড়ে। বিশুদ্ধ জ্ঞানবিজ্ঞান; সাহিত্য শিল্প ও সংস্কৃতি-চর্চা একমাত্র ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থাতেই সম্ভব, একথা কবি তখনও ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই।

সে যাহাই হউক, দেশ, কাল, জাতি, বর্ণ, ধর্ম-সম্প্রদায়ের সকল বেড়া-গণ্ডী অতিক্রম করিয়া কবি তখন বিশ্বমানবের মহামিলনের আহ্বান জানাইতেছেন।

১১ই মাঘ মন্দিরের ভাষণে তিনি বলিলেন,

…“হে ইতিহাস-রথের সারথি, তোমার বিশ্বরথের উপরে সকলের সঙ্গে যদি না দাঁড়াই তবে তোমাকে দেখব কেমন করে? তোমার চলার মাঝখানে সম্প্রদায়ের বেড়া গেঁথে তুলে এমন অহংকারের কথা বলবার আমরা কে, যে, এইখানেই পথ শেষ হয়ে গেছে, তোমার রথ আমাদের ধূলাঘরের প্রাচীরে এসে ঠেকে গেল—…কিন্তু সম্প্রদায়ের বাধা তোমার পথের মাঝখানে টিকবে কেন? রথের চাকার তলে গুঁড়িয়ে যাবে;—যুগে-যুগে এমন কত গেছে তাদের চিহ্নও নেই। আমাদের সকল অহমিকাকে সেই ধূলার মধ্যে বিসর্জন করে উগ্র স্বাতন্ত্র্যের সমস্ত আবরণ ঘুচিয়ে সহজ হয়ে নত হয়ে তোমার বিশ্বের মানুষ হয়ে তোমার চরণে আজ প্রণাম করি—আজ জীবনের সমস্ত বন্ধনকে তোমার সামনে এনে ধরি, তুমি ছিন্ন করে দাও; আজকের উৎসব বন্ধন-ছেদনের উৎসব হোক্।”

[শান্তিনিকেতন পত্রিকা-১৩২৬ ফাল্গুন-পৃঃ ৫]

এদিকে খিলাফত সমস্যা ক্রমশই গুরুতর আকার ধারণ করিতে থাকে। ১৯২০ সালে মার্চের প্রথম ভাগে মৌলানা মহম্মদ আলির নেতৃত্বে বিলাতে একটি ‘ডেপুটেশন্’ যায়। প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ তাঁহার পূর্ব-প্রতিশ্রুতির কথা বিস্মৃত হইয়া সরাসরি ‘খিলাফত’-এর মূল দাবিগুলি প্রত্যাখ্যান করিলেন (১৭ই মার্চ)।—অর্থাৎ পুরাতন তুরস্ক সাম্রাজ্যের অধীন দেশগুলির উপর খলিফার কোন কর্তৃত্ব থাকিবে না—শুধু তুরস্কের মূল ভৌগোলিক সীমার মধ্যেই তাহার প্রভাব ও কর্তৃত্ব থাকিবে। ইহা খিলাফত সেণ্টিমেণ্টের মূলেই আঘাত করে। ফলে ভারতীয় মুসলিম-সমাজ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হইয়া উঠে। ১৯শে মার্চ দেশের সর্বত্র শোক দিবস পালন করিবার আহ্বান জানান হয়। গান্ধীজী খিলাফত সমস্যায় সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে চাহিলেন।

১০ই মার্চ তাঁহার ঐতিহাসিক ভাষণে বলিলেন,

“The Khilafat has now become a question of questions… Now a word as to what may be done if the demands are not granted. The barbarous method is warfare, open or secret. This must be ruled out, if only because it is impracticable…

…Non-co-operation is, therefore, the only remedy left open to us. It is the clearest remedy, as it is the most effective, when it is absolutely free from all violence…England cannot expect a meek submission by us to an unjust usurpation of rights which to Muslims mean a matter of life and death…

[*Mahatma-Vol. 1.* p 284.]

১৯শে মার্চ দেশের প্রায় সর্বত্র শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ-দিবস উদ্‌যাপিত হয়। ঐ-দিন বোম্বাইয়ে খিলাফত কমিটির উদ্যোগে এক জনসভায় গান্ধীজী তাঁহার কর্মসূচী পেশ করিলেন।

গান্ধীজী খিলাফত-প্রশ্নে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের অপূর্ব সম্ভাবনা দেখিতে-ছিলেন। অপরদিকে গঠনমূলক কর্মসূচীতে স্বদেশী, খদ্দর, চরকা, এবং হিন্দীকে ভারতের সর্বজনীন জাতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করিবার প্রশ্নে গুরুত্ব আরোপ করিতেছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী যেন সংগ্রামের জন্যই অধীর হইয়া উঠিলেন। ইহার মাত্র তিন মাস পূর্বে অমৃতসর কংগ্রেসে যিনি council reform-এর জন্য গুরুত্ব আরোপ করিতেছিলেন তিনিই এখন সংগ্রামের জন্য আন্দোলন তুলিতে চাহিলেন। পক্ষান্তরে তিলক council reforms-এর পক্ষে গুরুত্ব দিতেছিলেন। টেণ্ডুলকর একটিমাত্র কথায় উঁহাদের চিন্তাধারার পার্থক্যটি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, "While, therefore, Tilak sought to concentrate the nation's attention on council entry, Gandhi became more and more indifferent to the working of the reforms and found no peace until the Khilafat and the Punjab questions were settled."

এই সময় রবীন্দ্রনাথ গুজরাট পরিভ্রমণে বাহির হন (২৯শে মার্চ—১৯২০) —আমেদাবাদে গুজরাটী-সাহিত্য-সম্মেলনে কবির সভাপতিত্ব করিবার কথা। ২রা এপ্রিল কবি ঐ সম্মেলনে যোগদান করেন। গান্ধীজীও উহাতে যোগদান করেন। আমেদাবাদের ব্যবসায়ী শ্রেণীর বণিক-মনোবৃত্তির শ্লেষাত্মক সমালোচনা করিয়া কবি বলিলেন, "The search after gold must be subservient to the search after God." অপরাহ্ণে সবরমতী আশ্রমে কবি গান্ধীজীর সহিত দেশের বিভিন্ন সমস্যা লইয়া আলোচনা করেন।

উহার প্রায় এক সপ্তাহ পরে রবীন্দ্রনাথ বোম্বাইয়ে উপস্থিত হন। ৬ই এপ্রিল হইতে ১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত 'জাতীয়-সপ্তাহ' পালন করিবার আহ্বান জানাইয়াছেন, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি। কবি বোম্বাইয়ে আসিয়া জানিতে পারিলেন, ১৩ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের সাম্বাৎসরিক সভা। কবি মহম্মদ আলি জিন্নার অনুরোধে এই সভার জন্য একটি লিখিত ভাষণ পাঠাইয়া দিলেন। পূর্বেই উহার কথা উল্লেখ করিয়াছি। তিনি স্পষ্টতই জালিয়ানওয়ালাবাগে শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের ও প্রতিহিংসার বিপক্ষে মত ব্যক্ত করিলেন।

কয়েকদিন পরেই কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলেন।

ইউরোপ যাত্রা

১৯২০ সালের এপ্রিলের মধ্যভাগে রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ড ও ইউরোপ ভ্রমণে বাহির হইলেন। সঙ্গে চলিলেন প্রতিমাদেবী, রথীন্দ্রনাথ ও মঞ্জুদেবী।

ইউরোপ যাত্রার পূর্বে কবির মানসিক অবস্থার কথা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। কবির ধারণা যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপের কিছুসংখ্যক মানুষের বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত হইয়াছে। রমাঁ রোলাঁ প্রমুখ 'চিন্তার স্বাধীনতা-কামী'দের সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগ ও আলাপ-আলোচনা এবং আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে 'বিশ্বভারতীর' আদর্শ তাহাদের নিকট উপস্থাপিত করা যাইতে পারে। কবির আশা, হয়ত-বা বিশ্বভারতীর জন্য প্রাথমিকভাবে কিছু সাহায্য ও সহযোগিতা পাওয়া যাইতে পারে। আর তাছাড়া ইংলণ্ড যাইবার অন্যতম কারণ, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ও ভারতের ব্রিটিশ শাসননীতি সম্পর্কে ইংলণ্ডের বিবেকী সুধীসমাজকে অবহিত করা। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর সমস্যা লইয়াও তাঁহাদের সহিত আলোচনা হইতে পারিবে। ইংলণ্ড ও ইউরোপের সুধীসমাজ ও বুদ্ধিজীবীদের 'পরে কবির তখনও আস্থা এবং কবির ধারণা, আজিকার দিনে বিশ্বমানবের সমস্যার সমাধানের মধ্যেই প্রতিটি দেশের জাতীয় সমস্যার সমাধান নিহিত আছে ;—খণ্ড খণ্ড ভাবে স্থানিক, দেশীয় ও জাতীয় সমস্যার প্রকৃত সমাধান কোথাও নাই। পথিমধ্যে জাহাজে কবি, এক পত্রে লিখিতেছেন,

"কিসের জন্যে যাচ্চি সে কথাও মাঝে মাঝে ভাবি। বেড়াবার জন্য নয় সে আমি জানি, আর কিসের জন্যে সে আমি স্পষ্ট জানি নে। কেবল একটা কথা মনে আসে সেটি হচ্ছে এই ;—মন্থনে দুধের থেকে নবনী বিচ্ছিন্ন হয়ে আসে; য়ুরোপে লোকসমুদ্রে যে মন্থন হয়েচে তাতে সেখানকার যাঁরা মনীষী যাঁরা ভাবুক তাঁরা আজ সেখানকার সমস্ত সমাজের মধ্যে মিলিয়ে অদৃশ্য হয়ে নেই। বোধ হয় আজকের দিনে তাঁদের দেখতে পাওয়া সহজ।...একথা মনে করা ভুল তাঁদের ভাবনায় ভারতবর্ষের ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। সর্বমানবের সমস্যার যাঁরা সমাধান না করবেন তাঁরা নিজের দেশের সমস্যার কোনো কিনারা করতে পারবেন না। কোনো জাতি যখন বড় রকমের দুঃখ পায় তখন একথা বুঝতে হবে সেই দুঃখের মূলে সর্বমানবের বিরুদ্ধে একটা অপরাধ আছে। স্থানীয় পলিটিক্সের ছিন্নতায় তালি লাগিয়ে এ দুঃখের প্রতিকার হতে পারবে না। আমরাও সুদীর্ঘকাল ধরে যে দুঃখ বহন করচি তার কারণটাকে সংকীর্ণ ও আকস্মিক করে দেখ্‌চি বলেই মনে ভাবচি মণ্টেগু ডাক্তারের হাতে এর ওষুধ আছে এবং রাষ্ট্রনৈতিক সভামঞ্চে রেজোল্যুশনের পটি লাগিয়ে ভারতের মর্মান্তিক ক্ষতগুলির আরোগ্য ঘটবে।"

[শান্তিনিকেতন পত্রিকা-১৩২৭ জ্যৈষ্ঠ-পৃঃ ৯৬]

পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ড ও ভারতে ইংরেজের পাশবিক দলন-নীতিতে কবির মন জাতির ঔপনিবেশিক পরাধীনতা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন হইয়া উঠে। পথিমধ্যে লোহিত-সাগরের উপকূলে এক জায়গায় দেখিলেন বড়-বড় করিয়া লেখা— *"Trespassers from Asia will be prosecuted."* ক্ষত যেখানে সব থেকে বেশী সেইখানেই যেন মানুষ বারে বারে আঘাত পায়। ঐ দৃশ্যে মুহূর্তেই কবির চোখের সামনে উপনিবেশবাদের কুৎসিত জঘন্য রূপটি স্পষ্টই ফুটিয়া উঠিল। কবি এণ্ড্রুজকে এক পত্রে লিখিতেছেন, (লোহিতসাগর—২৪ মে ১৯২০)

"We shall reach Suez this evening. …and now I feel that we have reached a truly foreign part of the world under the rule of different gods than ours. Our hearts are strangers in this region and even the atmosphere of this place looks askance at us. The people here want us to fight their battle and supply them with our raw materials, but they keep us standing outside their doors, over which is written on the notice-board. "Trespassers from Asia will be prosecuted." When I think of all this, my thoughts shiver with cold and I feel home-sick for the sunny corner in my Santiniketan bunglow."

[*Letters to a Friend*-p. 84.]

৫ই জুন (১৯২০) কবি ইংলণ্ডের প্লিমাথ্ বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কেদারনাথ দাশগুপ্ত ও পিয়ার্সন কবিকে অভ্যর্থনা জানাইলেন। কিন্তু এবার ইংলণ্ডে আসিয়া কবি কোথাও যেন আন্তরিক সম্বর্ধনা পাইলেন না। একমাত্র শিল্পী রোদেনস্টাইন ছাড়া তাঁহার পুরাতন বন্ধুসমাজ যেন তাঁহাকে এড়াইয়া চলিতে লাগিল। সর্বত্রই পাইলেন শুধুমাত্র লৌকিকতা ও মৌখিক ভদ্রতা—তাহাতে আন্তরিকতার লেশমাত্রও ছিল না। অবশ্য এবারেও ইংলণ্ডের বহু চিন্তাশীল ও গুণীজনের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তাঁহাদের মধ্যে বিখ্যাত পর্যটক উইলিয়াম হাড্‌সন্, ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রী ফক্স স্ট্রাংওয়েজ, দর্শনশাস্ত্রী কানিংগ্রেহাম, রুশ চিত্রকর নিকোলাস্ রোয়েরিখ্, কর্নেল লরেন্স —প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। কবি বুঝিলেন, তাঁহার 'নাইট' উপাধি ত্যাগের ফলেই এই প্রতিক্রিয়া। কয়েকদিন পরে ব্যাপারটি আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল একটি ঘটনায়। অক্সফোর্ডে কবির একটি বক্তৃতা-সভায় রাজকবি রবার্ট ব্রিজেসও কিছু বলিবেন, এইরূপ কথা ছিল। ব্রিজেস্ কিন্তু সভায় আসিলেন না এবং পরে তিনি কবিকে যে পত্র লেখেন তাঁহাতে তাঁহার মনোভাব স্পষ্ট হইয়া উঠে। শ্রীঅমল হোম মহাশয় সেই চিঠির অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন :

"…and am sorry that I do not feel able to accept the invitation, which I have just received, to speak at the meeting in Oxford on Friday…

I am writing, especially as I never sent any answer to your several communications since the late disturbances in India. I began a long letter but I feared that you might misunderstand it even more than you could misinterpret my silence, and in England we could not at first rely on the press reports of events."

[পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ ।। অমল হোম-পৃঃ ৮১]

রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই বুঝিলেন, ব্রিজেস্ কিসের ইঙ্গিত করিতেছেন।

ইহার পর তিনি কয়েকটি সভা-সমিতিতে যান এবং আরও কিছু গুণীজনের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় : তাহার মধ্যে অধ্যাপক আনডারসন, আর্নেস্ট রীস, গিল্‌বার্ট মারে, লরেন্স বিনিয়ন, চার্লস্ রবার্ট, রবার্ট সেসিল, সিবিল থর্নডাইক, লোস ডিকিন্‌সন্, কেইনিস এবং আয়ারল্যাণ্ডের কবি ও কর্মবীর হোরেস প্লাংকেটের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্যার হোরেস প্লাংকেটের সহিত 'সমবায় আন্দোলন' সম্পর্কে আলোচনা হয় এবং উহা কবিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। কিন্তু তাঁহার দেশের দাবি কোথাও উল্লেখ করিতে ছাড়েন নাই। শ্রীঅমল হোম মহাশয় লিখিতেছেন,

"···লণ্ডনে পোঁছিয়েই তিনি সকলের আগে গেলেন ইণ্ডিয়া অফিসে— মণ্টেগু ও লর্ড সিংহের সঙ্গে দেখা করতে। ইতিমধ্যে হাণ্টার-কমিশনের পাঞ্জাব হাঙ্গামা তদন্তের রিপোর্ট বেরিয়েছে। রথীন্দ্রনাথের ডায়েরীতে মণ্টেগুর সঙ্গে তাঁর পিতার পাঞ্জাব সম্বন্ধে কথাবার্তার যে-বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, তাতে দেখেছি তিনি সেক্রেটারী অব স্টেটকে বলেছেন যে, ভারতের লোক ডায়ারকে শাস্তি দেবার জন্য উদ্‌গ্রীব নয়; তারা জানতে চায়, যে অমৃতসরে তার অমানুষিক অত্যাচার মানবধর্ম-নীতির বিরোধী হয়েছে, ইংল্যাণ্ড তা' স্বীকার করে কিনা। পার্লামেণ্টে হাণ্টার কমিটির রিপোর্ট বিচারকালে যে সমগ্র ব্রিটিশ জাতির পরীক্ষা, সে-কথাটাই স্পষ্ট করে জানালেন রবীন্দ্রনাথ।···

"রথীন্দ্রনাথের ডায়েরীতেই দেখেছি, লণ্ডনে তাঁর এক সম্বর্ধনা সভায় রবীন্দ্রনাথ টোরী পার্টির বিশিষ্ট নেতা ভাইকাউণ্ট সেসিলের সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্রই তাঁকে একান্তে নিয়ে পাঞ্জাবের অনাচারের কথা জানাচ্ছেন; অক্সফোর্ডের বিশ্ববিশ্রুত অধ্যাপক গিলবার্ট ম্যরেকে বলছেন, ইংলণ্ডের মনীষীদের মধ্যে যাঁরা মনে করেন, যে পাঞ্জাবে তাঁদের স্বদেশীয়দের আচরণ ধর্মবিগর্হিত হয়েছে, তাঁদের তরফ থেকে একটা প্রতিবাদ-বিবৃতি প্রচার করা হয় যেন খবরের কাগজে। বিলাতে চুপ করে বসে নেই কবি।"

[ঐ-পৃঃ ৮৪ ৮৬]

৮ই জুলাই পার্লামেণ্টে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের তদন্ত কমিটির রিপোর্টের উপর আলোচনা হয়। বলা বাহুল্য এই বিতর্কে পরোক্ষভাবে ডায়ারকে সমর্থন করা হয়। স্বয়ং মণ্টেগু ডায়ারকে বাঁচাইতে গিয়া 'রাখঢাক'

করিয়া মন্তব্য করিলেন,—"General Dyer acted to the best of his lights and with a sincerity of purpose, but that he committed an error of judgment." সীতারামীয়া লিখিতেছেন,—"The debate in the House of Commons itself turned upon the supposed wrong and injustice of the punishment inflicted upon Dyer, while in the House of Lords, Lord Finlay's motion which was accepted was inaccurate, one-sided, and false in spirit and substance." ইহার ফলে কবি যে কতখানি মর্মাহত হইলেন তাহা সহজেই অনুমেয়। তিনি এণ্ড্রুজকে এই সম্পর্কে যে চিঠি লেখেন তাহাতে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট ও ইংরেজ বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সম্পর্কে তাঁহার মনোভাব স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়া উঠে। কবি লিখিলেন, লণ্ডন জুলাই ২২, (১৯২০)।

—"ভারতের প্রতি এ-দেশের শাসক সম্প্রদায়ের প্রকৃত মনোভাব নিদারুণ-রূপে প্রতিফলিত হয়েছে—পার্লামেণ্টের দুটি কামরাতেই [জেনারেল] ডায়ারসংক্রান্ত সাম্প্রতিক আলোচনা ও বিতর্কমূলে। এর থেকে যে-কথাটি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা' এই যে, এ-দেশে যাদের মধ্য থেকে আমাদের শাসনকর্তারা নির্বাচিত হয়ে থাকেন, তাঁদের আমলারা আমাদের উপর যত দানবীয় অত্যাচারই করুক না কেন, তাতে তাঁদের মনে কোনরকম বিক্ষোভের সঞ্চার হয় না।

"তাঁদের বক্তৃতায় পাশবিকতা যে-রকম নির্লজ্জভাবে প্রশ্রয় পেয়েছে এবং তাঁদের খবরের কাগজগুলোতে তারই প্রতিধ্বনি যে ভাবে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে, তা' অতি ভয়াবহরূপেই কুৎসিত। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান দাসত্বাধীনে আমাদের অবস্থায় লজ্জা ও আমাদের অনুভূতি, বিগত পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিককাল, প্রতি-দিন আমাদের উত্তরোত্তর অভিভূত করে ফেলেছে; কিন্তু তবুও আমাদের একটি মাত্র সান্ত্বনা ছিল, ইংরজে জাতির ন্যায়ানুরাগের উপর আমাদের আস্থা। আমরা ভেবেছি, যে সহজলভ্য যদৃচ্ছ ক্ষমতা ও প্রভুত্বের শক্তিমত্ততায়, অধীন দেশের সমগ্র জনমণ্ডলীর মনুষ্যত্ব নিতান্ত নিঃসহায়ভাবে দলিত মথিত করলেও, তার মারাত্মক গরল ইংরেজ সাধারণের আত্মাকে ক্লেদাক্ত করতে পারেনি।

"কিন্তু বেশ দেখা যাচ্ছে যে, সে-বিষ আমরা যা ভাবিনি তার চেয়ে অনেক বেশি গভীরে প্রবেশ করেছে; বৃটিশ জাতির নাড়ীতে ঘুণ ধরেছে; তার মজ্জা এই দারুণ বিষের প্রতিক্রিয়ায় জর্জরিত হতে চলেছে। আমি অনুভব করছি, যে ওদের সহদানুভূতির উদ্দেশে আমাদের আবেদন প্রতিদিনই ক্রমশঃ ক্ষীণতর সাড়া পাবে। কিন্তু আমার একান্ত আশা এই, যে আমার স্বদেশবাসিগণ এতে নিরাশ বা হতাশ হবেন না, অপিচ দেশের সেবায় তাঁহাদের সমস্ত উদ্যম ও সামর্থ্য অদম্য সংকল্পে ও সাহসে উৎসর্গ করবেন।

"সাম্প্রতিক ঘটনাবলী স্পষ্টই প্রমাণ করেছে, যে আমাদের সত্যকার মুক্তি রয়েছে আমাদের আপন হাতে; কোন জাতিরই প্রতিষ্ঠা ও মাহাত্ম্য কারও তাচ্ছিল্য-প্রণোদিত বা অবজ্ঞা-সঞ্জাত কার্পণ্যের মুষ্টিভিক্ষার উপর গড়ে তোলা

চলে না। আমাদের জাতীয় মুক্তির পথে বাধাবিঘ্ন সৃষ্টিতেই যাদের আত্মস্বার্থ-সংরক্ষণের নির্দেশ, তাদেরই দয়ার উপর নির্ভর করে জাতীয় সাধনার সুলভ-সিদ্ধির সন্ধান, আমাদের চরিত্রবলের দীনতারই পরিচায়ক হবে মাত্র। শুধু আত্মত্যাগ ও নিরতিশয় দুঃখবরণের দ্বারাই আমরা পাব সাফল্যের সন্ধান—তা'ছাড়া আর অন্য পথ নেই। অন্তর্নিহিত অমোঘ অমরাত্মার সক্রিয় শক্তি-বিকাশেই সম্ভব হয় মানুষের শ্রেষ্ঠ বরলাভ; এবং সেই শক্তির উদ্বোধন হয় কেবলমাত্র বিপদ ও ক্ষতির উপেক্ষামূলেই।"

[পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ]

সমুদ্রের এপারে ভারতবর্ষে, গান্ধীজীও তখন অধৈর্য হইয়া উঠিয়াছেন। ইংরেজ জাতির ন্যায়পরতা ও মহানুভবতার উপর তাঁহারও আস্থা ভাঙ্গিয়া পড়ে। ১লা আগষ্ট 'কাইজার-ই-হিন্দ্' ও অন্যান্য সম্মানসূচক পদকাদি বর্জন করিয়া ভাইসরয় লর্ড চেমস্‌ফোর্ডকে তিনি যে ঐতিহাসিক চিঠি লেখেন, তাহার অংশ-বিশেষ এইরূপ ঃ

…"Valuable as these honours have been to me, I cannot wear them with an easy conscience so long as my Musalman countrymen have to labour under a wrong done to their religious sentiment…I can retain neither respect nor affection for such a Government.

…"But the punitive measures taken by General Dyer, Colonel Frank Johnson, Colonel O' Berin, Mr. Bosworth Smith…and other officers were out of all proportion to the crime of the people and amounted to wanton cruelty and inhumanity almost unparalleled in modern times. Your Excellency's light-hearted treatment of the official crime, your exoneration of Sir Michael O'Dwyer, Mr. Montagu's despatch and above all the shameful ignorance of the Punjab events and callous disregard of the feelings of Indians betrayed by House of Lords, have filled me with the gravest misgivings regarding the future of the empire, have estranged me completely from the present Government and have disabled me from tendering, as I have hitherto wholeheartedly tendered, my loyal co-operation.

"In my humble opinion the ordinary method of agitating by way of petitions, deputations and the like is no remedy for moving to repentance a Government so hopelessly indifferent to the welfare of its charge as the Government of India has

proved to be. …I have, therefore, ventured to suggest the **remedy** of non-co-operation which enables those who wish to **dissociate** themselves from the Government and which, if it is **unattended** by violence and undertaken in an ordered manner, must compel it to retrace its steps and undo the wrongs committed."…

[*Mahatma—Vol. II* pp. 1-2]

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করিয়া কবি ফ্রান্সে যাত্রা করেন। ইংল্যাণ্ড ত্যাগের প্রাক্‌কালে কবি এক করুণ ও হৃদয় বিদারক ঘটনার সম্মুখীন হন। ব্রিটেনের তরুণ কবি Wilfred Owen'-এর মাতার নিকট হইতে কবি এক করুণ পত্র পান। Owen কিছুকাল পূর্বেই যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন, যুদ্ধের নিদারুণ বীভৎসতায় তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায় এবং তাহাই তাঁহার কাব্যে প্রকাশ পায়। পুত্রশোকাতুরা কবি-জননী রবীন্দ্রনাথকে সেই পত্রে লেখেন,

August 1st 1920

"Dear Sir Rabindranath,

"I have been trying to find courage to write to you ever since I heard that you were in London…The letter may never reach you for I do not know how to address it, tho' I feel sure your *name* upon the envelope will be sufficient. It is nearly two years ago, that my dear eldest son went out to the War for the last time and the day he said goodbye to me—we were looking together across the sunglorified sea—looking towards France, with breaking hearts—when he, my poet son, said those wonderful words of yours—beginning at 'When I go from hence, let this be my parting word'—and when his pocket book came back to me—I found these words written in his dear writing—with your name beneath. Would it be asking too much of you, to tell me what book I should find the whole poem in ?

"My precious boy was killed, one week before the awful fighting was over—the news came to us on Armistice day. A small book of my son's War Poems willbe published very soon—his heart was torn with sorrow at the suffering he saw 'out there' and the *callousness* of the majority at home—the futility of War · he speaks not of his own sufferings but any one who loved him can tell from his poems what he had passed

through, to be *able* to write as he did. **He was only 25.** Wilfred loved all that was beautiful, his life was beautiful and of great influence for good. ···I should like you to read my son's little book, if you will do *us* the honour···if I may, I should be proud to send you a copy."

With great respect and admiration—Susan H. Owen."

[*On the Edges of Time*—pp. 127-28]

এ চিঠির জবাবের ভাষা নাই !

৬ই আগষ্ট রবীন্দ্রনাথ প্যারিসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কয়েকদিন পর এণ্ড্রুজকে লিখিতেছেন, (১৩ই আগষ্ট),

···"Our stay in England has been wasted. Your Parliament debates about Dyerism in the Punjab and other symptoms of an arrogant spirit of contempt and callousness about India have deeply grieved me, and it was with a feeling of relief that I left England.

[*Letters to a Friend.*—p. 90]

ইংলণ্ডের শাসক-গোষ্ঠীর ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ব্যবহারে কবি যে কী পরিমাণ ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হইয়াছিলেন, ইহা হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্যারিসে আসিয়া রবীন্দ্রনাথ বিখ্যাত ধনী কাহ্ন্ (M. Kahn)-এর আতিথ্য গ্রহণ করেন।

প্রথম মহাযুদ্ধে ফ্রান্সই সব থেকে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়, (বিশেষ করিয়া ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চল। বিশেষজ্ঞদের মতে ফ্রান্সের প্রায় এক-দশমাংশ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। প্রায় ৩০০,০০০ বাসগৃহ, ২০,০০০ কলকারখানা, ৬,০০০ সরকারী ভবন এবং ১,৫০০ মাইল রেলপথ বিনষ্ট হয়।) বিগত যুদ্ধে মানুষ যে তাহার মহাবিধ্বংসী শক্তির কী ভয়ংকর স্ফুরণ ঘটাইয়াছে, যুদ্ধবিধ্বস্ত ফ্রান্সে আসিয়া কবি তাহার মনে মনে একটি চিত্র আঁকিয়া লন। এই প্রসঙ্গে শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিতেছেন,

···"একদিন (১৮ই আগষ্ট) কাহ্ন্ কবি ও রথীন্দ্রনাথদের লইয়া মোটর যোগে ফ্রান্সের উত্তরের Rheims প্রভৃতি যুদ্ধক্ষেত্র দেখাইয়া আনিলেন। রথীন্দ্রনাথ তাঁহার ডায়েরিতে লিখিতেছেন যে, সমস্ত দিনই প্রায় তাঁহারা মোটরে চলিয়াছেন, কোথায় প্রাণের চিহ্ন যেন নাই,—গাছপালা কংকালের ন্যায় খাড়া আছে—বাড়িঘর ধ্বংসপ্রাপ্ত, জনমানব নাই বলিলেই চলে, চারিদিকে গভীর ট্রেন্চ বা খাদ। এ দৃশ্য দেখিয়া আসিবার পর কবির সে রাত্রে ভালো ঘুম হইল না—মানুষ যে কী বীভৎস কাণ্ড করিতে পারে ইহার চাক্ষুষ জ্ঞান তাঁহার হইল।"···

[রবীন্দ্রজীবনী-তৃতীয় খণ্ড : পৃঃ ৪২]

কয়েকদিন পর এণ্ড্রুজকে এক পত্রে লিখিতেছেন (১২ই সেপ্টেম্বর ১৯২০)

…"It was a most saddening sight. It will take a tremendous effort and also an immense lapse of time to make this a thing of the past."…

[*Letters to a Friend* : p. 94]

কিন্তু কবি স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না। কলিকাতায় তখন কংগ্রেসের ঐতিহাসিক বিশেষ-অধিবেশন (সেপ্টেম্বর ৪-৯ পর্যন্ত) চলিতেছে। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাবের উপর জোর আলোচনা চলিতেছে। সংবাদপত্রে এই সব খবরে গভীর উদ্বেগে কবি চিন্তাকুল। অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে এণ্ড্রুজকে তাঁহার উদ্বেগের কথা জানাইয়া কবি লিখিতেছেন, (প্যারিস ৭ই সেপ্টেম্বর—১৯২০),

…"When Non-co-operation comes naturally as our final moral protest against the unnaturalness of our political situation, then it will be glorious, because true ; but when it is only another form of begging, then let us reject it.

"The establishment of perfect co-operation of life and mind among ourselve must come first, through sacrifice and self-dedication, and then will come in its natural course the non-co-operation…

…And for this, all the moral fervour which the life of Mahatma Gandhi represents, and which he, of all men in the world, can call up, is needed.

"That such a precious treasure of power should be put into the mean and frail vessel of our politics, allowing it to sail across endless waves of angry recrimination, is terribly unfortunate for our country, when our mission is to revive the dead with the fire of the soul…It is criminal to turn moral force into a blind force." [*Ibid* : pp 92-93]

কয়েকদিন পর প্যারিস হইতে আর একখানি পত্রে তিনি এণ্ড্রুজকে লিখিতেছেন (১৮ই সেপ্টেম্বর),

"I find our countrymen are furiously excited about Non-co-operation. It will grow into something like our Swadeshi movement in Bengal. Such an emotional outbreak should have been taken advantage of in starting independent organizations all over India for serving our country.

"Let Mahatma Gandhi be the true leader in this ; let him

send his call for positive service, ask for homage in sacrifice, which has its end in love and creation. I shall be willing to sit at his feet and do his bidding if he commands me to co-operate with my countrymen in service and love. I refuse to waste my manhood in lighting fires of anger and spreading it from house to house."

"It is not that I do not feel anger in my heart for injustice and insult heaped upon my motherland. But this anger of mine should be turned into the fire of love for lighting the lamp of worship to be dedicated through my country to my God."... [*Ibid* : p. 95-96]

এমনি এক উদ্বেগ-অশান্তিতে কবির দিন কাটে।

ফ্রান্সে আসিয়া সিলভ্যাঁ লেভি ও অ্যাঁরি বের্গ'স'র মত দুইজন বিশ্ববিশ্রুত মনীষীর সহিত কবির পরিচয় ও আলাপ-আলোচনা হয়। অধ্যাপক লেভিকে কবি শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দিবার জন্য আহ্বান জানাইলেন। সিলভ্যাঁ লেভি ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির গবেষণামূলক কার্যে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। সংস্কৃত, পালি, তিব্বতী, চীনা এবং মধ্য এশিয়ার অবলুপ্তপ্রায় ভাষা হইতে বৌদ্ধসংস্কৃতির ইতিহাস সম্পর্কে তাঁহার গবেষণামূলক কার্যের জন্য তিনি ভারতবাসীর তথা সারা বিশ্ববাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া আছেন। পরবর্তী কালে ভারতবর্ষ, চীন ও তিব্বতে তাঁহার গবেষণা কার্যে তিনি শান্তিনিকেতনে আসিলে কবির আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বিশ্বভারতীতে কিছুকাল অধ্যাপনাও করিয়াছিলেন।

কিন্তু ফ্রান্সে রবীন্দ্রনাথকে কোন রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় সম্বর্ধনা জানান হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের '*Nationalism*' গ্রন্থের বক্তব্য ফরাসী রাষ্ট্রনায়কদের ও জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলির আদৌ পছন্দ হয় নাই। একজন প্রাচ্যদেশীয় কবি তাহাদের সভ্যতা-সংস্কৃতিকে এইভাবে ধিক্কার ও তিরস্কার করিবেন, ইহা তাহাদের নিকট ঔদ্ধত্য বলিয়া বোধ হইয়াছে। আরও একটি কথা, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কবির 'নাইট্' পদবী ত্যাগ লইয়া ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় প্রতিক্রিয়া ফরাসী রাষ্ট্রনায়ক ও ন্যাশনালিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের সতর্ক করিয়া দিয়াছিল। তখন ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে গভীর রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক আঁতাত চলিতেছে। স্বভাবতই ফরাসীরা ইংলণ্ডের বিরাগ-ভাজন হয় এমন কিছু করিতে চাহে নাই।

এবার ফ্রান্সে থাকাকালে আঁদ্রে জীদ্, আঁদ্রে ও সুজান কার্পলেস্, কঁতেস্ দ্য ব্রিম', ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো, অধ্যাপক ল্য ব্রঁ প্রমুখ বিশিষ্ট ফরাসী বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে কবির পরিচয় হয়।

ফ্রান্স হইতে কবি হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামে গমন করেন। গত মহাযুদ্ধে এই

দুইটি ছোট দেশও ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্বভাবতই কবির মানবতাবাদ ইহাদের গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। হল্যাণ্ডে কবি যে সম্মান ও অভ্যর্থনা পাইলেন, কোন বিদেশীর ভাগ্যে তাহা জুটে নাই। এই সম্পর্কে শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিতেছেন,

"রবীন্দ্রনাথকে আহ্বান করিয়াছিলেন থিওজফিস্টরা ও Free Religion Community. তিনি যেখানে গিয়াছেন লোকে তাঁহাকে যে-সম্মান দেখাইয়াছেন তাহা কোনো য়ুরোপীয়ের ভাগ্যে হল্যানডে ঘটে নাই। তিনি যে কেবল তাঁহার বক্তৃতার দ্বারা ডাচদের মুগ্ধ করিয়াছেন তাহা নহে, তাঁহার সংস্পর্শ আশীর্বাদের ন্যায় সকলকে তৃপ্ত করিয়াছে। বক্তৃতার স্থলে স্থান হয় নাই ;···কিন্তু সব থেকে বড়ো সম্মান তাঁহাকে দিয়াছে রটারডাম। সেখানকার চার্চের কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথকে বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান করেন—শুধু তাহাই নহে বেদি হইতে তাঁহাকে উপদেশ দান করিতে হয়। এ পর্যন্ত কোনো অ-খৃষ্টানকে তাহারা এ কার্য করিবার জন্য আহ্বান করে নাই। যাহারা সেদিন চার্চে উপস্থিত ছিল জীবনে কখনো তাহারা সেদিনকার কথা বিস্মৃত হইবে না।"

[রবীন্দ্র-জীবনী-তৃতীয় খণ্ড : পৃঃ-৪৪]

এই সব অভ্যর্থনায় কবি খুবই উৎসাহিত হন। এণ্ড্রুজকে এণ্টোয়ার্প হইতে এক পত্রে লিখিতেছেন, (অক্টোবর '৩)

···"Of one thing you may be sure, that a communication of heart has been opened up between this little country and Santiniketan ;···Now I know more clearly than ever before that *Santiniketan belongs to the world and we have to be worthy of this great fact···Therefore Santiniketan must be saved from the whirlwind of our dusty politics.*" [*Letters* : p. 96]

হল্যাণ্ড হইতে রবীন্দ্রনাথ বেলজিয়ামে যান, সঙ্গে পিয়ার্সন। ব্রুসেলস্‌'এ *Palace of Justice Hall*'এ তিনি বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার বিষয়—পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন। পরে ইহা *Creative Unity* গ্রন্থে সংকলিত হয়। রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা দিবার জন্য তাঁহাকে এখানে বিচারালয়ে বিচারপতির আসন হইতে বক্তৃতা দিবার অধিকার প্রদান করা হয়।

হল্যাণ্ড হইতে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা যাত্রার পরিকল্পনা করিতেছিলেন এবং মেজর পণ্ড্‌কে এবিষয়ে লিখিয়াছিলেন। কিন্তু আমেরিকায়ও তখন রবীন্দ্রনাথের 'নাইট' উপাধি ত্যাগের প্রতিক্রিয়া চলিতেছে। মেজর পণ্ড্‌ তাঁহার অক্ষমতার কথা জানাইলেন। অবশেষে ঘুরিতে ঘুরিতে ইংলণ্ডেই ফিরিয়া আসিলেন। ইংলণ্ডে বসিয়াই হঠাৎ মনস্থির করিয়া ফেলিলেন, তিনি আমেরিকায়ই যাইবেন। তাঁহার বক্তব্য তিনি তাহাদের জানাইবেন। সর্বোপরি রহিয়াছে, বিশ্বভারতীর আর্থিক সমস্যা। বিশ্বভারতীর আদর্শ আমেরিকাবাসীর মনপূঃত হইলে হয়ত সেখান হইতে কিছু সাহায্য ও সহযোগিতা পাওয়া যাইতে পারে, ইহাই কবির আশা।

বিক্ষুব্ধ ভারত

১৯২০ সালের মধ্যভাগে খিলাফত আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। অপরদিকে পার্লামেণ্টে হাণ্টার-কমিশনের রিপোর্ট আলোচনার এবং মণ্টেগ্যু ও ভারত-সরকার কর্তৃক পাঞ্জাবের দুষ্কৃতকারীদের প্রকারান্তরে অনুমোদন ও প্রশ্রয়দানের ফলে সারা ভারতে অসন্তোষের বহ্নি ধূমায়িত হইতে থাকে। খিলাফত কমিটি গান্ধীজীর পরামর্শানুক্রমে অসহযোগ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। ৩০শে মে বেনারসে, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে, অসহযোগ-আন্দোলন সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সেপ্টেম্বরের প্রথম ভাগে কলিকাতায় কংগ্রেসের এক বিশেষ-অধিবেশনের আহ্বান জানান হয়।

এই হতাশা ও ঘৃণা হইতেই 'হিজরত-আন্দোলনের' সূত্রপাত হয়। এই সময় আফগানিস্তানের বাদশাহ আমানুল্লা ঘোষণা করিলেন যে, যাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে হিজরত করিবেন আফগানিস্তানে তাঁহাদের স্বাগত জানান হইবে। সহস্র সহস্র ধর্মপ্রাণ মুসলিম ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে লাগিলেন। আগষ্ট মাস নাগাদ প্রায় ১৮,০০০ মুসলিম ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন।

৭ই জুলাই গান্ধীজীর নেতৃত্বে নন-কো-অপারেশন কমিটি, কখন কিভাবে আন্দোলন শুরু করিবেন তাহার বিস্তারিত কর্মসূচী গ্রহণ করে। স্থির হয়, ১লা আগষ্ট হইতে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করা হইবে। স্মরণ থাকিতে পারে, ঐ দিনই গান্ধীজী তাঁহার উপাধি ও পদকাদি বর্জন করেন। কিন্তু ঐদিনই মধ্যরাত্রে তিলকের মৃত্যু হওয়ায় সারা দেশ শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়ে।

যাহাই হউক, অল্প কয়েকদিন পরেই গান্ধজী ও আলি ভ্রাতৃদ্বয় তীব্র আবেগময়ী ভাষায় সারা ভারতবর্ষব্যাপী আন্দোলনের ডাক দিয়া ফিরিতে লাগিলেন। অসহিষ্ণু গান্ধীজী বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন,

"I would rather risk violence a thousand times than risk the emasculation of a whole race."

কিন্তু জনসাধারণের উদ্দাম অন্ধ আবেগ ও বিক্ষোভকে সম্পূর্ণ অহিংস পথে সংযত ও সুসংহত করিবার জন্য ক্রমাগত তিনি সতর্কীকরণ করিতে থাকেন। এই সময়ই গান্ধীজী তাঁহার বিখ্যাত ঐতিহাসিক নিবন্ধ, *"The Doctrine of the Sword"* রচনা করেন (*Young India*-Aug. 11-1920).

তিনি বলিলেন,

"I do belive that, where there is only a choice between cowardice and violence, I would advise violence……Hence also do I advocate training in arms for those who believe in the method of violence. I would rather have India resort to arms in order to denfend her honour than that she should in a

cowardly manner become or remain a helpless witness to her own dishonour.

"But I believe that non-violence is infinitely superior to violence, forgiveness is more manly than punishment···We have better work to do, a better mission to deliver to the world.

I am not a visionary. I claim to be a practical idealist. Religion of non-violence is not meant merely for the *rishis* and saints. It is meant for the common people as well. Non-violence is the law of our species as violence is the law of the brute···The dignity of man requires obedience to a higher law, to the strenght of the spirit."

[*Mahatma* : *Vol. II*. pp. 4-5]

উপসংহারে গান্ধীজী বলিলেন,

"আমি সিন্‌ফিন্‌ আন্দোলন হইতে অসহযোগকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখি, ইহা হিংসার সহিত পাশাপাশি আন্দোলনস্বরূপে চলিতে পারে না। যাঁহারা হিংসা-মূলক কার্যে বিশ্বাসী তাঁহাদিগকে আমি এই শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বলিতেছি···অনেক উন্নতহৃদয় ব্যক্তি জাতীয় অপমান আর সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাদের ক্রোধের চরিতার্থতা খুঁজিতেছেন; তাঁহারা হিংসার পথ অবলম্বন করিবেন কিন্তু আমার মনে হয়, তাঁহারা তাঁহাদিগকে অথবা তাঁহাদের দেশকে অন্যায় হতে মুক্ত না করিয়াই বিনষ্ট হইবেন। ভারতবর্ষ তরবারির পথ গ্রহণ করিলে সাময়িক জয়লাভ করিতে পারে, কিন্তু সেই ভারতবর্ষে আমার গর্ব করিবার কিছুই থাকিবে না।" তিনি পুনরায় গুরুত্ব দিয়া বলিলেন, "I believe absoulutely that she has a mission for the world. She is not to copy Europe blindly.···

১০ই আগষ্ট 'সেভার্স সন্ধি চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। অগ্নিতে যেন ঘৃতাহুতি হইল। ক্রুদ্ধ ও অপমানিত মুসলিম সমাজের বিক্ষোভ ফাটিয়া পড়িতে চাহিল।

৪ঠা সেপ্টেম্বর কলিকাতায় কংগ্রেসের ঐতিহাসিক বিশেষ অধিবেশনের উদ্বোধন হয় (৪-৯'ই সেপ্টেঃ)। সভাপতি, প্রবীণ নেতা লালা লাজপৎ রায়। গান্ধীজীই অসহযোগ আন্দোলনের মূল প্রস্তাব আনিলেন। প্রস্তাবের খসড়াটি শুনিবামাত্র বিজয় রাঘবাচারী ও মতিলালজী আপত্তি করিলেন। তাঁহাদের আপত্তির প্রধান কারণ,—শুধুমাত্র খিলাফতের ও পাঞ্জাবের অন্যায় অবিচারের প্রতিকার সাধনই নয়, পরন্তু স্বরাজলাভই হইবে এই অসহযোগ-আন্দোলনের মুখ্য ও চূড়ান্ত উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য। অবশ্য গান্ধীজী সানন্দে 'প্রস্তাবের' এই ত্রুটি সংশোধন করিয়া লইলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, 'র‍্যাওলাট-আন্দোলনে' গান্ধীজী 'মণ্টফোর্ড রিফর্ম'' বা স্বরাজলাভের পরিবর্তে র‍্যাওলাট অ্যাক্টের বিরুদ্ধেই সংগ্রামের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

প্রস্তাবের মুখবন্ধে খিলাফত ও পাঞ্জাবের অন্যায়-অবিচারের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া শেষে বলা হয়,

..."This Congress is further of opinion that there is no course left open for the people of India but to approve of and adopt the policy of progressive, non-violent Non-co-operation inaugarated by Mr. Gandhi until the said wrongs are righted and Swarajya is established.

'And in as much as a beginning should be made by the classes who have hitherto moulded and represented public opinion, and in as much as Government consolidates its power through titles and honours bestowed on the people, through schools controlled by it, its law courts, and its legislative councils, and in as much as it is desirable in the prosecution of the movement to take the minimum risk and to call for the least sacrifice, compatible with the attainment of the desired object, this Congress earnestly advises :

(a) surrender of titles and honorary offices and resignation from nominated seats in local bodies ;

(b) refusal to attend Government Levees, Durbars, and other official and semi-official functions held by Government officials or in their honour ;

(c) gradual withdrawal of children from schools and colleges owned, aided or controlled by Government, and in place of such schools and colleges, establishment of National schools and colleges in the various provinces ;

(d) gradual boycott of British courts by lawyers and litigants, and establishment of private arbitration courts by their aid, for the settlement of private disputes ;

(e) refusal on the part of the military, clerical and labouring classes to offer themselves as recruits for service in Mesopotamia ;

(f) withdrawal by candidates of their candidature for election to the Reformed councils, and refusal on the part of the voters to vote for any candidate who may, despite the Congress advice, offer himself for election ;

(g) boycott of foreign goods."

[*Indian National Congress*—(1920-23)—pp. 7-8]

গান্ধীজী তাঁহার প্রস্তাবের সপক্ষে ভাষণের উপসংহারে বলিলেন,—"If there is a sufficient response to my scheme, *I make bold to reiterate my statement that you can gain swaraj in the course of an year.*"

বিপিনচন্দ্র পাল এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করিয়া একটি সংশোধনী প্রস্তাব আনিলেন এবং চিত্তরঞ্জন দাশ উহা সমর্থন করিলেন। এই সংশোধনী প্রস্তাবে, কংগ্রেসের মূল দাবিগুলি লইয়া বিলাতে একটি কংগ্রেস মিশন পাঠাইবার এবং ইতিমধ্যে দেশে ব্যাপক জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য প্রস্তুতিমূলক কার্যে সাংগঠনিক তৎপরতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। কাউন্সিলের ভিতর হইতে উহা বানচাল করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে কাউন্সিল নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিবার পক্ষেও ঐ প্রস্তাবে জোর দেওয়া হয়।

যাহাই হউক, গান্ধীজীর প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হয় (৯ই সেপ্টেম্বর)। এক মহম্মদ আলি জিন্না ছাড়া প্রায় সমস্ত মুসলমান প্রতিনিধি গান্ধীজীর প্রস্তাব সমর্থন করেন। জিন্না ও জাতীয়তাবাদী প্রবীণ হিন্দু নেতৃবর্গের অনেকেই চিত্তরঞ্জনের প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন। ঐ সময় কলিকাতায় মুসলিম লীগেরও এক বিশেষ অধিবেশন হয় (৭ই সেপ্টেম্বর) কিন্তু সভাপতি হিসাবে জিন্না অসহযোগ আন্দোলনে সমর্থন জানান।

কলিকাতায় কংগ্রেসের এই বিশেষ অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথকে লইয়া একটি অবাঞ্ছনীয় ও অপ্রীতিকর ঘটনার উদ্ভব হয়। এই সময় বিলাতের কয়েকটি পত্রিকা গুজব ছড়াইতে থাকে, রবীন্দ্রনাথ নাকি বিলাতের বন্ধুমহলে মণ্টেগুকে ভারতের ভাইসরয় করিয়া পাঠাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এই রকম একটি মিথ্যা গুজবের উপর ভিত্তি করিয়া কলিকাতা-অধিবেশনে জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কবির এই প্রচেষ্টার নিন্দাসূচক প্রস্তাব আনিবার কালে সভায় খুব বাদ-বিতণ্ডা হয়। জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার ভাষণের শেষে বলেন,

"A movement has been set on foot to pray that Mr. Montague may be our next Viceroy. That movement is associated with the name of a poet to whom we all pay reverence and tremage (homage). However deep to (or ?) great our reverence may be, I shall say his couduct has been premature, ill advised (question) injust, and against the wishes of the countrymen (cries of 'no no' 'yes yes')···In so far (order, order) as Rabindranath Tagore has demanded the appointment of Viceroy, I say he has done wrong to his countrymen ('no no' 'yes' yes')."···

অবশ্য জিতেন্দ্রলালের মুখ্য বক্তব্য ছিল, "We have lost our con-

fidence in Montague or British Cabinet."

['*Servant*'-8th Sept. 1920]

ঐদিনই '*Servant*' পত্রিকায় এই গুজব ও অপপ্রচারের আসল রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়,

…"We therefore have a sigh of relief to hear that there is sufficient ground to doubt the authenticity of the report associating our great thinker's name with a movement which, however suitable to a political opportunist, can never emanate from a person always looking at things from the high standpoint of principles."

কিন্তু প্রশ্ন এই, গান্ধীজী প্রবর্তিত অসহযোগ-আন্দোলনের এই কর্মসূচীর আইডিয়ার অভিনবত্ব কোথায়? স্বদেশী-আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশী-সমাজ' গঠনের যে আন্দোলন তুলিতে চাহিয়াছিলেন তাহার সহিতই বা উহার মৌলিক আদর্শগত পার্থক্য কোথায়? ঐ সময় রবীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ 'স্বদেশী-সমাজের' যে বিস্তারিত কর্মসূচী দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থাপিত করেন এই প্রসঙ্গে তাহা স্মরণ রাখা দরকার।

রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ' এবং গান্ধীজীর অসহযোগের কর্মসূচী পাশাপাশি রাখিয়া বিচার করিলে উভয়ের মূল আইডিয়ার কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ লক্ষ্য না-করিয়া পারা যায় না। সময়ের ব্যবধান প্রায় ১৫ বছর। উভয়ের আশু লক্ষ্য ছিল ইংরাজ সরকারের সহিত অসহযোগিতা অবশ্য রবীন্দ্রনাথ স্বাবলম্বী স্বদেশী সমাজ গঠনের উপরই প্রধানতঃ গুরুত্ব দেন। রবীন্দ্রনাথের আশু লক্ষ্য ছিল—বঙ্গ বিচ্ছেদ, ভাষা বিচ্ছেদ ও শিক্ষা সংকোচ-নীতি প্রভৃতি অন্যায়ের প্রতিকার সাধন—অবশ্য কবি বয়কট সমর্থন করেন নাই। গান্ধীজীর আশু লক্ষ্য—খিলাফত ও পাঞ্জাবের অন্যায়-অবিচারের প্রতিকার সাধন। লক্ষ্য করিবার বিষয়, গান্ধীজী তখনও পর্যন্ত চূড়ান্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা বা 'স্বরাজ লাভের' জন্য কোন গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন না। গান্ধীজী যে অহিংস সংগ্রাম নীতির কথা বলিলেন, রবীন্দ্রনাথ এই দীর্ঘদিন ধরিয়া উহাই নানাভাবে ও ভাষায় বলিয়া আসিতেছেন।

কিন্তু গান্ধীজী ইংরেজ শক্তিকে প্রত্যক্ষ আঘাত হানিতে চাহিলেন না। গান্ধীজীর এই অসহযোগ তত্ত্ব মূলতঃ নিষ্ক্রিয়-প্রতিরোধ আন্দোলন। স্বদেশী-যুগের বঙ্গবিচ্ছেদের প্রতিরোধে বিপিনচন্দ্র প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যে বলিষ্ঠ নিষ্ক্রিয়-প্রতিরোধ আন্দোলনের সূত্রপাত করেন তাহার সহিতই বা গান্ধীজীর এই আন্দোলনের পার্থক্য কোথায় এবং কতটুকু?

বলা বাহুল্য, গান্ধীজীর এই অসহযোগ আন্দোলন, ইংরেজ সরকারের উপর 'চাপ-দিবার-নীতি'। গান্ধীজী স্বরাজের দাবি করিলেও তখনও পর্যন্ত ইংরেজের সহিত সংশ্রব ত্যাগ করিবার বিরুদ্ধে। এক বৎসর পরে, ১৯২১ সালে আমেদাবাদ-কংগ্রেসে মৌলানা হজরৎ মোহানী যখন 'সর্বপ্রকার বিদেশী

প্রভাবমুক্ত স্বাধীনতার' প্রস্তাব আনিলেন, স্বয়ং গান্ধীজী তখন সেই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করিলেন। যথাস্থানে তাহা আলোচনা করা যাইবে।

বাংলাদেশের 'স্বদেশী-আন্দোলন' ও গান্ধীজী প্রবর্তিত 'অসহযোগ-আন্দোলনে'র পার্থক্যটি সম্পর্কে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে (২৫-২৭শে মার্চ, ১৯২১) বিপিনচন্দ্রের অভিভাষণটি সম্ভবত বিলাতে কবির নিকট কেহ পাঠাইয়া দেন। কবি দেশে প্রত্যাবর্তনের অল্পকাল পূর্বে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের জনৈক শিক্ষককে ঐ প্রসঙ্গে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন,

"দেশের পলিটিক্সের কথা মাঝে মাঝে আভাসে শুনতে পাই, কিন্তু দূর থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারিনে—সেইজন্য বিচার করতে সাহস হয় না। সম্প্রতি বিপিন-বাবুর এক সভাপতির অভিভাষণ আমার হাতে এসেচে। তাতে এক পক্ষের কথা শুনতে পেলুম—অন্য পক্ষের কথা আগাগোড়া স্পষ্ট করে শোনবার সুযোগ এখনো আমার হয়নি। বিপিন-বাবু বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে বর্ত্তমান আন্দোলনের তুলনা করে বলেছেন যে আমাদের আন্দোলন নাস্তিক ছিল না, আস্তিক ছিল। আমার কাছে এটা অত্যুক্তি বলে মনে হয়। কারণ তখন আমি এই নিয়েই আপত্তি করেচি এবং দেশের লোকের কাছে গাল খেয়েচি—আমার তখনকার প্রবন্ধ পড়লেই সে কথা স্পষ্ট হবে। তখন বাংলাদেশের লক্ষ্য ছিল বয়কট্ করে ইংরেজের লোকসান করা—আমিই একমাত্র তার প্রতিবাদ করেচি, বলেচি নিজের চেষ্টায় দেশের মধ্যে আত্ম-কর্তৃত্বের ভিত্তি স্থাপন করতে হবে। ছাত্রেরা আমার কাছে যখনি এসেচে আমি তখনি তাদের এই পরামর্শ দিয়েচি—বলেচি, গ্রামে গ্রামে গিয়ে দেশের সেবা কর—তারা কর্ণপাত করে নি। শেষকালে তোমাদের কয়েকজনকে শিলাইদহে নিয়ে নিজের চেষ্টায় যেটুকু পারি গ্রামে আত্মশাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলুম—কৃতকার্য্য হতে পারি নি, তার প্রধান কারণ বাংলাদেশ সেজন্যে প্রস্তুত ছিল না। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বসে কলকাতার জন্যে আমি কি চেষ্টা করেচি বিপিন-বাবু তা স্বয়ং জানেন—কারণ সে মন্ত্রণাসভায় তাঁকে ডেকেছিলুম—মনে হচ্ছে যেন তিনি একদিন এসেছিলেন, কিন্তু বিশেষ ভাবে সহযোগিতা পাইনি। তখন 'সন্ধ্যা' কাগজই দেশের চিত্ত অধিকার করেছিল—কিন্তু সন্ধ্যা কাগজের নীতি ছিল সংহারনীতি।—স্বদেশী সমাজে আমি তার উল্টো সুর ধরবার চেষ্টায় ছিলুম, কিন্তু কেউ তাতে কর্ণপাত করে নি। অথচ বিপিন-বাবু গান্ধির নৈষ্‌জ্য পন্থাকে খর্ব্ব করে বাংলার স্বদেশী আন্দোলনকে বড় করবার যে চেষ্টা করেছেন, সে আমার কাছে অন্যায় বলে মনে হয়। আমার মনে হয় দুই আন্দোলনেরই প্রকৃতি এক—প্রভেদ এই, বর্ত্তমান আন্দোলনের মূলশক্তি গান্ধির চরিত্র-মাহাত্ম্য, বাংলার আন্দোলনের মূলশক্তি কর্জ্জন নীতির বিরুদ্ধতা। চরিত্র-মাহাত্ম্য জিনিসটির মধ্যেই একটি আস্তিকতা আছে—সেইজন্যেই অন্যদিকে এই আন্দোলনের যতই অভাব থাক্—এইদিকে তার সফলতা অতি মহৎ—এই মাহাত্ম্যের গুণেই সমস্ত ভারতচিত্ত আজ মিলিত হয়েচে, উদ্বুদ্ধ হয়েচে। এই মাহাত্ম্যগুণেই স্বদেশী আন্দোলনের

চেয়ে গান্ধির নৈষ্কর্ম্য আন্দোলন অনেক বড়।"

[প্রবাসী-আষাঢ় ১৩২৮ : পৃঃ ৪৩২-৩৩]

বলা বাহুল্য, দূর হইতে কবি কল্পনানেত্রে অসহযোগ আন্দোলনের আধ্যাত্মিক মহিমা এবং গান্ধীজীর চরিত্র-মাহাত্ম্যটিকে বড়ো করিয়া দেখিতেছিলেন। উহার সমর্থনে এবং গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া তিনি আমেরিকায় বিবৃতিও দিয়াছিলেন। দেশে ফেরার পর এই আন্দোলনের আসল স্বরূপটি দেখিতে পান। যথাস্থানে তাহা আলোচিত হইয়াছে।

সে যাহাই হউক, গান্ধীজীর রাজনীতিক কর্মসূচী কতখানি রাজনীতিক-বিজ্ঞানসম্মত,—এক বছরের মধ্যে তাঁহার 'স্বরাজ' আনয়নের প্রতিশ্রুতি আদৌ বাস্তব কিংবা অবাস্তবোচিত কিনা, তাহা কেহই স্থির মস্তিষ্কে ভাবিয়া দেখিতে চাহিল না। দেশবাসী সংগ্রামের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছে, গান্ধীজী পুনর্বার সংগ্রামের ডাক দিয়া জনতার পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অর্দ্ধনগ্ন ফকিরের বেশে তিনি জনতার সহিত একাত্ম হইয়া মিশিয়া গেলেন,—সাধারণ মানুষের সহিত তিনি গাঁয়ের চাষির ভাষায় কথা কহিলেন; গান্ধীজী জনতায় হৃদয় জয় করিয়া ফেলিলেন। একদিকে পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ডে দেশবাসী নিদারুণ অপমানে ও রুদ্ধ আক্রোশে ফুঁসিতেছে, অপরদিকে খিলাফতের দাবিতে মুসলিম সমাজের ধর্মীয় আবেগ প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়িতে চাহিতেছে। এই উত্তাল গণ-বিক্ষোভের তরঙ্গশীর্ষে গান্ধীজী তাঁহার, 'অসহযোগ-তরণী' ভাসাইয়া দিলেন।

অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ শান্তিনিকেতন আশ্রমেও আসিয়া লাগিল।

কলিকাতা কংগ্রেসের বিশেষ-অধিবেশনের তিনদিন পর গান্ধীজী কয়েকদিনের বিশ্রামের জন্য শান্তিনিকেতন আসিলেন। সঙ্গে ছিলেন যুবক জওরলাল নেহরু। এই সময় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর হঠাৎ অসহযোগ আন্দোলনে অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া গান্ধীজীকে এক পত্রের মাধ্যমে তাঁহাকে সমর্থন জানাইলেন। এণ্ড্রুজের মধ্যস্থতায় শান্তিনিকেতনে তাঁহাদের উভয়ের সাক্ষাৎকার ও আলোচনা হইল। মৌলানা সৌকত আলিও শান্তিনিকেতনে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। সৌকত আলির আগমনে শান্তিনিকেতনে এক অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটে। এই প্রসঙ্গে শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিতেছেন,

…"শান্তিনিকেতন- আশ্রমের ইতিহাসে এটি স্মরণীয় ঘটনা। এখানে এতকাল মুসলমানদের সম্বন্ধে যে অন্ধ গোঁড়ামি কর্মীদের মধ্যে ছিল, তাহা আজ রাজনৈতিক উত্তেজনার মুখে হঠাৎ ভাঙিয়া গেল। বিধুশেখর ভট্টাচার্য স্বয়ং সৈয়কত আলিকে সাধারণ ভোজনাগারে লইয়া গিয়া আহারস্থানে বসাইলেন! অথচ কয়েক বৎসর পূর্বে যখন একটি মুসলমান বালক ছাত্ররূপে আসিবার প্রার্থী হয় তখন তাহাকে কোথায় কিভাবে আহার করিতে দেওয়া যাইবে, তাহা লইয়া অনেকের কী দুর্ভাবনা হইয়াছিল!…অথচ রবীন্দ্রনাথের শত উপদেশেও একাজ এতদিনে হয় নাই; কারণ, সেখানে উত্তেজনা ছিল না, ছিল বিশুদ্ধ ধর্ম-বুদ্ধির 'পরে নির্ভর। এণ্ড্রুস্ কবিকে মহোৎসাহে লিখিতেছেন (৮ই ডিসেঃ ১৯২০) 'So now, in the kitchen we have no Brahmin lines, for no one

cares a pin about it, at last."…[রবীন্দ্র-জীবনী-তৃতীয় খণ্ড : পৃঃ ৬০]

গান্ধীজীর শান্তিনিকেতন আগমনে এক অভাবনীয় চাঞ্চল্য দেখা দেয়। গান্ধীজীর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে আশ্রমের অনেকেই অসহযোগ আন্দোলনে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, এমন কি স্বয়ং এণ্ড্রুজ পর্যন্ত। কিন্তু এণ্ড্রুজ খিলাফত আন্দোলনে গান্ধীজীর যুক্তি সমর্থন করিতে পারিলেন না, পরন্তু খিলাফতের দাবির তীব্র বিরোধিতা করিয়া গান্ধীজীকে এক পত্রের মাধ্যমে তাঁহার মতামত জানাইলেন। তিনি লিখিলেন (২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯২০)

"I hate the Khilafat doctrine of a Turkish Empire which was too sacred to be touched and which involved the refusal of independence to another race…you have *not* made your meaning clear, and there is no trap in my question. It is as simple as A. B. C. Will you or will you not accept Arab and Aramenian and Syrian independence in lands which are obviously theirs and not the Truks ?"

[*C. F. Andrews*—pp. 154-55]

কয়েকদিন পর বিলাতে রবীন্দ্রনাথকেও ঐ মর্মে একটি চিঠিতে তিনি লিখিলেন (২২ ও ২৮শে সেপ্টেম্বর-১৯২০)

"I felt strongly that I could not actively join in Mr. Gandhi's Khilafat movement as such. I am out aganist 'Empire' altogether, and to agree to the Khilafat demand (for an Ottoman Empire) would surely cut the ground under the Indian demand for independence."… [*Idid :* p. 156]

খিলাফতের দাবিকে সেদিন আর কেহ এমন নির্মম আঘাত হানিতে পারেন নাই। খিলাফতের দাবি সমর্থন করিলে ভারতের স্বরাজ দাবির মর্মেই আঘাত করা হয়—ভারতের পায়ের তলা হইতে জমিন্ সরিয়া যায়। যে সঠিক পরিপ্রেক্ষিত হইতে এণ্ড্রুজ ভারত ও আফ্রিকা-এসিয়ার পরাধীন দেশগুলির স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন করিতেছিলেন, ভারতের সেই জাতীয় ও ধর্মীয় উম্মাদনার মাঝে সেদিন ঐ পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করা প্রায় অসম্ভব ছিল। অবশ্য এণ্ড্রুজ তাই বলিয়া অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করিলেন না। ভারতের প্রতি অন্যায় অত্যাচারের প্রতিকার একমাত্র তাহার স্বাধীনতালাভের মধ্যেই সম্ভব, এই কথাই তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন। তিনি অবশ্য একথাও উল্লেখ করিলেন,

"I do not think it will be taken up at present. It is in a sense before the time. But it is so hopeless to have the *aim* wrong, and I wished to say with all my heart that *independence alone could bring recovery of respect."*

এই সময়ই তিনি *"Independence : The Immediate Need"* নামক পুস্তিকায় ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে তীব্র ভাষায় তাঁহার মত ব্যক্ত করেন।

অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহে, ডাচ্ জাহাজ 'রটারডামে' রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা যাত্রা করেন। সঙ্গে চলিলেন পিয়ার্সন সাহেব ও কেদার দাশগুপ্ত।

বিশ্বভারতীর জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। কবির আশা, আমেরিকাবাসী বিশ্বভারতীর আবেদনে সাড়া দিবেন।—বক্তৃতা করিয়াও কিছু অর্থসংগ্রহ করা যাইতে পারে।

২৮ শে অক্টোবর কবি নিউইয়র্কে পৌঁছাইলেন। কবির মনে এতটুকু স্বস্তি নাই। ইউরোপে থাকিতেই এণ্ড্রুজের পত্রে অসহযোগ আন্দোলনের নিয়মিত খবর পাইয়াছিলেন, ঐদিনই এণ্ড্রুজকে সতর্ক করিয়া লিখিলেন,

"You must know that our Santiniketan belongs to that future. We have not yet reached it. We need stronger faith and cleare vision to direct our course towards its hill of sunlight… Our loyaliy must not be for any land of a limited geography. It should be for the nationality of the common idea, to which are born individuals belonging to various nations, who are carrying their gifts of sacrifice to the one great shrine of humanity. [*Letters to a Friend* : p. 102]

যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর প্রধান সমস্যা কী এবং তাহার সমাধানই বা কোথায়,—কবি আমেরিকাবাসীদের এই কথাটাই শুনাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন।

কবি ৩১শে অক্টোবর নিউইয়র্কের সাংবাদিক সম্মেলনে এক বিবৃতি-প্রসঙ্গে বিশ্বযুদ্ধ, বলশেভিজম্, শ্রমিক ধর্মঘট ও সংঘর্ষের তাৎপর্য প্রসঙ্গে বলিলেন,

"Most nations to-day and you in the United States particularly, are building great organisations which are constantly growing more complex, and the machinery of civilization is dominating you and stifling individual expression. That is what is at the back of Bolshevism—a craving for individual expression and the desire to get free from the cumbersome machinery of existence."

অবশ্য তাই বলিয়া 'বলশেভিজম্‌কে' তিনি সমর্থন করিলেন না। পরক্ষণেই বলশেভিজ্‌মের সমালোচনা করিয়া বলিলেন,

"Of course, Bolshevism is wrong because it is thoroughly selfish. It exploits one class at the expense of all others. So selfishness is at the bottom of the conflict between the forces of capital and labour. Labour asks for shorter hours and

more pay, but proposes to give nothing; capital asks for more capital, but proposes to give nothing. These conflicting forces of which labour and capital are only two, will wreck the world unless men find a new spiritual faith in which they can all grow together. I do not believe that one religion can serve the world for all time.

"The world war was only the rumbling before the real storm, which must come unless we can learn to understand one another better, and to care more for the rights of others. I think this country feels the need of that new faith more than any because it has followed the god of money and found it a hollow god. Yet it is young enough to find something in which to believe. Europe is old and cynical."

[*New York Herald*-Nov. 1.-1920]

কবি মানুষের অধ্যাত্ম-সত্তার উপর আস্থা স্থাপন করিবার আহ্বান জানাইলেন বটে। কিন্তু বলশেভিজম বা কমিউনিজম সম্পর্কে এবং শ্রমিকবিরোধ ও শ্রেণী-সংগ্রাম সম্পর্কে যে সব বিক্ষিপ্ত মন্তব্য করিলেন তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, ঐ সব সম্পর্কে তিনি খুব গভীরভাবে অধ্যয়ন-অনুশীলন ও চিন্তা করিবার মত সুযোগ পান নাই। বলশেভিকদের নিজস্ব বক্তব্যও কিছু শুনিবার বা জানিবার মত সুযোগ ও অবকাশ তাঁহার তখনও ঘটিয়া উঠে নাই। কয়েকমাস পূর্বে যাত্রাকালে বোম্বাই বন্দরে জাহাজের স্ট্রোকার ও শ্রমিক-ধর্মঘট দেখিবার ফলে তাঁহার মনে যে সব চিন্তার আলোড়ন চলে তাহাই এক পত্রে লিখিয়া জানাইয়াছিলেন,—এই প্রসঙ্গে উহা খুবই উল্লেখযোগ্য।

কবি লিখিতেছেন (১৯শে মে-১৯২০),

"আমরা আছি সভ্যতার সেই যুগে যেটার নাম দেওয়া যেতে পারে সরকারী যুগ।······কিন্তু সমষ্টি ও ব্যষ্টির যোগেই বিশ্বজগৎ। সমষ্টির খাতিরে ব্যষ্টিকে যদি অত্যন্ত বেশি সংকুচিত হতে হয়, তাতে সমষ্টির যথার্থ উৎকর্ষ হয় না। এতে শক্তির অভাব প্রকাশ পায়। এখনকার সভ্যতা বলচে বহুকে দলন করে যে পিণ্ড হয় সেই পিণ্ডই আমার বরাদ্দ অন্ন। প্রত্যেকের পুরো ব্যবস্থা করবার উপযুক্ত স্থান এবং সামর্থ্য আমার নেই। কিন্তু এইরকম সরকারী ব্যবস্থা ও নিষ্ঠুরতা কি সাম্রাজ্যে কি সমাজে প্রতিদিন স্তূপাকার হয়ে উঠচে। এই অন্যায় এবং দুঃখকে ভুলিয়ে রাখবার জন্যেই মানুষ নানা উক্তিতে অনুষ্ঠানে ও শাসনে রাষ্ট্রপুজা ও সমাজপুজাকে একটা ধর্ম্ম করে তুলচে। সেই ধর্ম্ম যারা মানচে এবং দুঃখ সহ্য করচে মানুষ তাদেরই সাধু সম্বোধন করে পুরস্কৃত করচে, যারা মানচে না তাদের বলচে বিদ্রোহী, তাদের দিচ্চে নির্ব্বাসন কিংবা প্রাণদণ্ড। এমনি করে প্রভুত নরবলির উপরে মানুষের রাষ্ট্র ও সমাজ ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু নিশ্চয়ই এমন একদিন আসচে যখন বলির মানুষ মেলা

সহজ হবে না ; যখন ব্যষ্টি আপন পুরো মূল্য দাবী করবে। আজ কর্ম্মিকের দল ধনিকের শাসন অমান্য করচে ; তাতে ক্রুদ্ধ সমাজ অর্থাৎ সমষ্টিদেবতা তাদের প্রতি চোখ রাঙাতে ত্রুটি করচে না, এবং রাষ্ট্র ধর্ম্মেরও দোহাই দিচ্চে ; বলচে, তোমরা যদি বাড়াবাড়ি কর তাহলে নেশনের ক্ষতি হবে, অন্য নেশন্ বাণিজ্য বিস্তারে এগিয়ে যাবে। কিন্তু কর্ম্মিক সে দোহাই আজ মানতে চাচ্চে না ; বলচে, আমার প্রতি অন্যায় করতে দেব না, আমার যা পুরো মূল্য তা আমাকে দিতেই হবে। য়ুরোপে রাষ্ট্রধর্ম্মের দোহাই দিয়ে বলির মানুষকে যূপকাষ্ঠে টেনে নিয়ে আসে, এই ধর্ম্মের দোহাই শুনে কর্ম্মিকেরা ধনদেবতার রথযাত্রায় রথ টানতে টানতে তার চাকার তলায় পড়ে পড়ে মরে, সৈনিকেরা শক্তি দেবতার কণ্ঠহার রচনার জন্যে আপন ছিন্নমুণ্ড উৎসর্গ করে' পুণ্যলাভ হল কল্পনা করে। আর আমাদের দেশে সমাজধর্ম্মের দোহাই দিয়ে আমরা এতকাল নরবলি দাবী করে' এসেচি ;—শূদ্রকে বলে এসেচি অগৌরবে তুমি সম্মত হও কেননা সমষ্টি দেবতার সেই আদেশ অতএব এই তোমার ধর্ম্ম ; নারীকে বলে এসেচি কারাবেষ্টনে তুমি সম্মত হও তাহলেই সমষ্টিদেবতার কাছে তুমি বরলাভ করবে, তোমার ধর্ম্ম রক্ষা হবে।"…

লক্ষ্য করিবার বিষয়, সমাজবিজ্ঞানে ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 'সমষ্টি ও ব্যষ্টির' স্থান ও ভূমিকা সম্পর্কে অধুনাকালে যে সব বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথ সেই প্রচলিত দৃষ্টিতে বা অর্থে আলোচনা করিলেন না। 'সমষ্টি' বলিতে কবি পুঁজিবাদী দেশগুলির national state'-কে ব্যাপক অর্থেই বুঝাইতেছেন। এবং 'ব্যষ্টি' বলিতে 'কর্মিক' বা শোষিত সর্বহারা শ্রমজীবী শ্রেণীকেই বুঝাইতেছেন। আর কবি এখানে শুধু শ্রেণী-সংগ্রাম ও শ্রেণীসংঘর্ষের অস্তিত্বকেই স্বীকার করিলেন না, অদূর ভবিষ্যতে এইসব শোষিত শ্রেণীগুলি একদিন তাহাদের ন্যায্য অধিকারের দাবিতে প্রলয়ংকরী ভূকম্প সৃষ্টি করিয়া চলিবে। সেই বিশ্বব্যাপী মহাবিপ্লবের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া রবীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্যবাদী জগৎকে সতর্ক করিয়া দিয়া ঐ পত্রে আরও বলিলেন,

…"কিন্তু সমষ্টি দেবতা সর্ব্বকালের দেবতার প্রতিযোগী হয়ে আমাদের বাঁচাতে পারবে না। মানুষকে খর্ব্ব করবার অন্যায় এবং দুঃখ রাষ্ট্রের এবং সমাজের স্তরে স্তরে জমে উঠ্‌চে এমনি করে প্রলয়ের ভূমিকম্পকে গর্ভে ধারণ করচে। রাষ্ট্রের এবং সমাজের ভিত্তি টলে উঠ্‌বে—হিসাব তলব হবে, তখন বহুকালের ঋণ পরিশোধের পালায় ব্যষ্টির কাছে সমষ্টিকে একদিন বিকিয়ে যেতেই হবে। ব্যষ্টির পূর্ণতা অপহরণ করে সমষ্টি যে পূর্ণতার বড়াই করে সে পূর্ণতা মায়ামাত্র, সে কখনই টিঁকতে পারে না। আজ আমরা তাকে ধর্ম্মের আবরণ দিয়েচি কিন্তু এমন কত বলিরক্ত-লোলুপ ধর্ম্ম কিছুকালের জন্য জননী বসুন্ধরাকে পীড়িত এবং অশুচি করে আজ অন্তর্দ্ধান করেচে।

…"সবই মানি, কিন্তু এও মানতে হবে যে যত সুবিধা যত সুখই হোক্ না, তাকে সভ্যতা বল আর যাইই বল না কেন, দুঃখ এবং অন্যায়ের হিসাব কিছুতেই চাপা পড়বে না। বলির মানুষ আপাতত মরে কিন্তু পরে

বলিদাতাকেই মারে।"

[শান্তিনিকেতন পত্রিকা-আষাঢ় ১৩২৭ : পৃ ১৫৭-৫৯]

কবির সহানুভূতিএই সব শোষিত মানুষের পক্ষেই স্পষ্টত ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কবি যে এই প্রলয়ংকরী বিপ্লবকে সমর্থন করিতেছেন তাহা নহে। এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া পাশ্চমী জগতকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন যে, আজ যদি তাহারা এই সব 'ব্যাণ্ট' বা শোষিত মানুষের মানবিক অধিকারের দাবি মানিয়া না লয় তবে অচিরেই সমস্ত দেশ ও সমাজ বিনষ্ট হইবে। কিন্তু কে শুনিবে সেই সতর্ক বাণী!

এদিকে ভারতবর্ষে তখন অসহযোগ আন্দোলনের উত্তেজনাপূর্ণ খবর আসিয়া পৌঁছাইতেছে। নিউইয়র্কে মার্কিন সাংবাদিকরা রবীন্দ্রনাথকে ছাঁকিয়া ধরিলেন; প্রশ্নের পর প্রশ্ন—'অসহযোগ আন্দোলনের তাৎপর্য কি?' 'কবি উহা সমর্থন করেন কিনা' 'করিলে কেন করেন' ইত্যাদি। জবাবে কবি বলিলেন,

"The non-co-operation movement is idealistic, and I believe in the forces of ideas and not in physical violence. I hope that future conflicts between human beings will not be on the plane of physical violence, but on the plane of ideas. Those who have no faith in ideas are ready to kill each other for its sake. The non-co-operation movement has in it the faith in ideas, and not in violence. If it is possible for us to realize this movement in our national life, to introduce this bloodless warfare in the history of man, then I shall feel proud of my nation.…"

[*New York Call*-Nov. 2. 1920]

গান্ধীজীর নেতৃত্বের উপর আস্থা প্রকাশ করিয়া কবি আরো বলিলেন, "এই আন্দোলনের গুরু শ্রীযুক্ত গান্ধী;—সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠ পবিত্র জীবনের জন্য যিনি সারা ভারতের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছেন এবং আমার স্থির বিশ্বাস তাঁহার নেতৃত্বে এই আন্দোলন পবিত্র ও শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। কিন্তু ইহা খুবই স্বাভাবিক ক্ষমতাসীন শাসকবর্গ কোন না কোন এক সময়ে হিংস্র আক্রমণে এই আন্দোলনকে পরাভূত করিতে চাহিবে এবং সেইদিন আমাদের পরীক্ষা দিতে হইবে আর সেদিন আমরা আমাদের লক্ষ্য ও আদর্শে যদি দৃঢ় অবিচল থাকিতে পারি তবে সেই পশুশক্তি আমাদের নিকট পরাভূত হইবেই।"……

লক্ষ্য করিবার বিষয়, কবি এখানে জাতীয় স্বার্থ ও মর্যাদার কথা বিবেচনা করিয়া সামগ্রিকভাবে অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করিলেন। বিশেষ করিয়া আন্দোলনের সংগ্রামের মূল আদর্শের দিকটিই অর্থাৎ 'অহিংস-সংগ্রাম নীতি'তে বেশী গুরুত্ব দিলেন। কিন্তু 'অসহযোগতত্ত্ব' বা Non-co-operation অথবা 'খিলাফত' সম্পর্কে বিস্তারিত সমালোচনা কিংবা মন্তব্য করিলেন না।

এদিকে এণ্ড্রুজের চিঠিতে জানিতে পারেন, শান্তিনিকেতন আশ্রমেও অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ আসিয়া লাগিয়াছে। ঐটিই ছিল কবির উদ্বেগ ও আশংকা। এণ্ড্রুজকে লিখিলেন, (৪ঠা নভেঃ ১৯২০),…"Keep Santiniketan away from the turmoils of politics. I know that the political problem is growing in intensity in India and its encroachment is difficult to resist. But all the same, *we must never forget that our mission is not political. Where I have my politics, I do not belong to Santiniketan.*

কবি রাজনীতির ভূমিকাকে অস্বীকার করিলেন না কিন্তু শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর আদর্শে এই রাজনীতির স্থান নাই। সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া কবি ঐ পত্রেই আরো বলিলেন, "I do not mean to say that *there is anything wrong in politics, but only that it is out of harmony with our Asram.*" [*Letters to a Friend*-P. 120]

১০ই নভেম্বর ব্রুকলীন সঙ্গীত ভবনে, ('*Academy of Music Hall*' এ) আমেরিকাবাসীদের নিকট কবি 'পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন' সম্পর্কে ভাষণ দেন। কবির ভাষণের মূল কথা এই,

"আজিকার দিনে সব থেকে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা এই যে, পশ্চিম পূর্বের সহিত মিলিত হইয়াছে। মনুষ্যত্বের এই অবিস্মরণীয় মিলনটিকে সার্থক করিতে হইলে আমাদের চাই এক মহান, উদার ও সৃজনশীল ভাবাদর্শের আবেগী মননশীলতা।…এই বিশ্ব আজ পশ্চিমের কাছে নিবেদিত। আজ মনুষ্যত্বের মহাসৃষ্টির কাজে সে যদি ইহাকে ব্যবহার না করে তবে তাকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে।…

"কিন্তু তবু ইহাও সত্য, শতাধিক বৎসর ধরিয়া পূর্বের সহিত পশ্চিমের সংযোগে পশ্চিম এমন কোন বলিষ্ঠ মহদাদর্শের নজির সৃষ্টি করিতে পারে নাই যাহাতে এই যুগের বিশেষ বাণী সার্থকতা লাভ করে। সর্বত্রই ইহা বর্জন ও বহিষ্কারের কাঁটা-বেড়া তুলিয়া দিয়াছে আর তাহাদের জাতীয়-স্বার্থের যূপকাষ্ঠে জুগাইয়াছে নরবলি।…সেইজন্যই, যে সমষ্টিভূত শক্তি আজ এই পাশ্চাত্য সভ্যতাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, তাহার কথা বলিতে গিয়া আমি দুঃখ ও বেদনা অনুভব করি। ইহাই রিপুর তাড়না,—কোন ভাবাদর্শ নহে।" তিনি তাই সতর্কবাণী করিয়া বলিলেন, The time has come when Europe must know that the forcible parasitism which she has been practising upon the two large Continent of the world—the two most unwieldy whales of humanity—must be causing to her moral nature a gradual atrophy and degenaration."

আফ্রিকা মহাদেশে এই পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বর্বর লুণ্ঠনকার্যের একটি নজির দিতে গিয়ে কবি Messrs Grogan এবং Sharp নামক দুইজন

লেখকের "*From the Cape to Cairo*" নামক একটি পুস্তিকার কথা উল্লেখ করিলেন। 'আফ্রিকাবাসীদের কথা বলিতে গিয়া এই লেখকদ্বয় পরিষ্কার খোলাখুলিই বলিয়াছেন, 'We have stolen his land. Now we must steal his limbs.' ঠিক ইহার পরবর্তী বক্তব্যে একেবারে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, সামান্যতম শালীনতাবোধ—যাহাকে বহুপূর্বে তাহারা কবরায়িত করিয়াছিল, সেই বিবেকবুদ্ধির প্রেতচ্ছায়ার তাড়নায় তাঁহারা সহজ কথায়—যাহাকে 'দাসত্ব' বা 'slavery' বলা হয়—তাহার পরিবর্তে 'বাধ্যতামূলক শ্রম' (compulsory labour) শব্দটির ব্যবহার করিয়াছেন ঠিক যেমন অধুনাকালের রাষ্ট্রনীতিবিদরা ভদ্রতা করিয়া 'injunction' শব্দটির পরিবর্তে 'Mandate' কথাটি ব্যবহার বা প্রয়োগ করেন। তাঁহারা বলেন যে, 'বাধ্যতামূলক শ্রম'টি ঐ দেশে (আফ্রিকার) আমাদের আধিপত্য থাকার স্বাভাবিক একটা অনুসিদ্ধান্ত (corollary) মাত্র। তাঁহারা বলেন, 'উহা খুব করুণ কিন্তু ইহাই ইতিহাস,' যেন মানবেতিহাসে নৈতিকবোধের কোন সত্যমূল্য নাই।'

এই সব লেখকদের রচনায়, কী ভয়ংকর নির্লজ্জভাবে তাহাদের বর্বর সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধি প্রকটিত হইয়া পড়িয়াছে, কবি তাহার উল্লেখ করিতে গিয়া বলিলেন,

'...For these writers seems to hold that the only important question for the white men of South Africa is, how indefinitely to grow fat on ostrich feathers and diamond mines, and dance jazz dances over the misery and degradation of a whole race of fellow-beings of a different colour from their own 'Possibly they believe that moral laws have a special domesticated breed of comfortable concessions for the service of the people in power. Possibly they ignore the fact that commercial and political cannibalism, profitably practised upon foreign races, creeps back nearer home ;...For, after all, man is a spiritual being, and not a mere living money-bag jumping from profit to profit, and breaking the backbone of human races in its financial leapfrog."...

তাই তিনি বলিলেন,

"When we think of it, we see at once what the confusion of thought was to which the Western poet, dwelling upon the difference between East and West, referred when he said, '*Never the twain shall meet.*' It is true that they are not yet showing any real sign of meeting: But the reason is because the West has not sent out its humanity to meet the man in

the East, but only its machine. Therefore the poet's line has to be *changed* into something like this ;

"Man is man, machine is machine,
and never the twain shall wed."

'Machine' বলিতে কবি এখানে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও পীড়নের রাষ্ট্র-যন্ত্রটির কথা বুঝাইতেছেন। কিন্তু তবুও আশাবাদী কবি অবিচল দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন, 'পশ্চিম-পূর্বের সহিত মিলিবেই।' কিপলিংদের লক্ষ্য করিয়া কবি তাই উপসংহারে ঘোষণা করিলেন,

"Earnestly I ask the poet of the Western world to realise and sing to you with all the great power of music which he has, that the East and West are ever in search of each other, and that they must meet not merely in the fulness of physical strength, but in fulness of truth ; that the right hand, which wields the sword, has the need of the left, which holds the shield of safety."

[*Creative Unity*-pp. 103-110]

ইহার কয়েকদিন পর বিভিন্ন জায়গায় কবি আরো কয়েকটি বক্তৃতা করিলেন। তন্মধ্যে *'The Poet's Religion'*, *'The Religion of the Forest'*, *'An Eastern University'* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কোথাও তাঁহার মনের বা অন্তরের কথা বলিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র ও পরিবেশ পাইলেন না। মার্কিনী পুঁজিবাদী সভ্যতার বিকাশধারা ও লক্ষ্য সম্পর্কে কবির খুব পরিষ্কার ধারণা ছিল না

বস্তুত পক্ষে মহাযুদ্ধের কল্যাণে সব থেকে লাভবান হয়, মার্কিন পুঁজিবাদ। মার্কিন পুঁজি আর্থিক ঋণ ও সামরিক সাহায্য দিয়া মিত্রপক্ষের নিকট হইতে বিপুল মুনাফা অর্জন করিয়াছিল। চার্চিল সাহেব লিখিতেছেন,…"At the end of the war the European Allies owed the United State about ten thousand million dollars, of which four thousand million were owed by Britvin." জওহরলাল আরো সহজ করিয়া লিখিতেছেন,

"…For ten years they (U. S. A.) prospered exceedingly. They had in war-time pushed out England from being the boss of the money-lending business. America was now the money-lender to the world, all the world was her debtor. In an economic sense she dominated the whole world…"

[*Glimpses of World History*-P. 686.]

এক কথায়, মহাযুদ্ধ একটি মহা-আশীর্বাদের মত আমেরিকার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। এ'হেন দেশে রবীন্দ্রনাথের যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বক্তৃতা—

বিশ্বভারতী ও আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সংযোগ—কোন কিছুরই সাড়া জাগিবে না, ইহা খুবই স্বাভাবিক। তাহা ছাড়া তাঁহার 'নাইটহুড্' ত্যাগের প্রতিক্রিয়া আমেরিকায়ও দেখা দিয়াছে। পণ্ড্ এসব কথা দ্বারা বুঝাইতে চাহিলেন, আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের পূর্বের সেই আকর্ষণ ও জনপ্রিয়তা নাই। অথচ বিশ্বভারতীর জন্য অর্থের প্রয়োজন ; কিন্তু কবিকে শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত করুণ-ভাবে নিরাশ হইতে হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিতেছেন,

"…এনড্রু কারনেগির স্ত্রীর সহিত কবি সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে, তিনি দেখা করিতে রাজি হইলেন না ; বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহার পক্ষে ভারতীয় প্রতিষ্ঠানে সাহায্যদান করা সম্ভব নহে। কবি এই আঘাত পাইয়া ভাবিতেছেন, অর্থের জন্য এই হীনতা আর স্বীকার করিবেন না। বিদ্যালয়ের জন্য অর্থসংগ্রহের উপর সাময়িকভাবে বিরক্তি আসিয়াছে,—এণ্ড্রুজকে লিখিতেছেন, 'This visit of mine to America, has produced in me intense contempt for money'…

"নিউইয়র্ক ত্যাগ করিবার পূর্বে *Poetry Society* কবিকে অভিনন্দিত করিল।…রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলিবার পর, আমেরিকানরা তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছে, তৎসম্বন্ধে তীব্র মত প্রকাশ করেন। তাঁহার নামের সহিত বিপ্লবী 'গদর' দলের নাম যোগ করিয়া যে সংবাদ রটিয়াছে, জারমান-ভক্ত বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে গোপনে যে প্রচারকার্য চলিয়াছে—তাহারই প্রতিবাদ সেদিন বাহির হইয়া পড়িল। আন্তর্জাতিকতার নামের অন্তরালে, কতকগুলি রাজনৈতিক অভীষ্ট সিদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি আমেরিকায় আসিয়াছেন —এই কথায় তিনি সর্বাপেক্ষা পীড়িত ও ক্ষুব্ধ। সভার বক্তৃতায় মনের ক্ষোভ প্রকাশ হইয়া পড়িল। রথীন্দ্রনাথ তাঁহার ডায়েরিতে লিখিয়াছেন যে, তিনি যাহা আশংকা করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। 'This was the first time, I thought, he lost his dignity. I was moved to tears, it hurt me terribly. It seemed a tragedy to me.' আন্তর্জাতিক বিদ্যায়তনের জন্য অর্থসংগ্রহের চেষ্টা জাতীয়তামোহমুগ্ধ দেশে এমনভাবেই ব্যর্থ হইল।"

[রবীন্দ্র-জীবনী-তৃতীয় খণ্ড ॥ পৃঃ ৪৯-৫০]

কবি স্বয়ং '*The Atlantic Monthly*' পত্রিকায় তাঁহার পূর্বাপর আমেরিকা ভ্রমণের এই তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা লিখিতে গিয়া বলিলেন,

"This was the first time in my life when I breathed the same privileged air with some of the denizens of the giant world of finance. I felt small, but my welcome to their accommodation proved to be still smaller, almost like that of the needle's eye to a camel. It cannot be said that I made the egregious mistake of thinking that the people's heart was in their bankers' keep ; on the contrary, I did try my best to

approach it directly with the help of friends; but to my utter dismay I found it barred by an unmerited discourtesy, insulting me with the suspicion that I was a political schemer who was trying to exploit the good-natured credulity of your country.

"I was told be some of my best friends there that powerful propaganda seemed to be working against me in consequence of the desperate protest which I had been compelled to make against the Jallian-Wallabagh atrocities in our own country, shortly before I had left India···

···"It pained me when I realised the cheapening of the spiritual value of man in this country through his mind being ceaselessly, exploited, in a wholesale manner and with a scientific thoroughness, for the sake of profit and power. Having had this chance to come into personal contact with prosperous America, with the mentality that could produce quickly rotating crops of an enormous harvest of success, I grew afraid of it···"

[*Visva-Bharati Quarterly*-April 1927, pp. 90-91]

অবশ্য এবার আমেরিকায় আসিয়া এলমহার্স্ট নামক এক ইংরেজ যুবকের সহিত কবির পরিচয় হয়। এলমহার্স্ট কবির আদর্শ ও পরিকল্পনায় খুবই মুগ্ধ ও প্রভাবিত হন। পরবর্তী কালে ইনি শ্রীনিকেতনের জন্য প্রচুর অর্থ সাহায্য করিয়াছেন এবং শ্রীনিকেতনের সাংগঠনিক কাজে তিনি অন্যতম পুরোধা-স্বরূপ ছিলেন। যথাস্থানে আমরা তাহার আলোচনা করিব।

আমেরিকায় তখনও *League of Nations* লইয়া উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা চলিতেছে। প্রেসিডেণ্ট উইলসন্ উহার প্রধান পরিকল্পক ছিলেন কিন্তু খোদ মার্কিন সেনেটররা উহা অনুমোদন করিলেন না অর্থাৎ আমেরিকা 'লীগে'র বাহিরেই থাকিল। সাংবাদিকের কৌতূহল, 'লীগ অব্ নেশন্‌স্' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত কী? কবি উহার জবাবে মন্তব্য করেন,

"What is the sense in talking about a league of nations, which aims to secure peace through the exercise of power? The story of the making of peace after the great war, is a story of greed and selfish desires. Jesus Christ preached peace, but He preached love also. Europe's parasitism upon her subject peoples is drying-up her moral nature and bringing her down to degeneracy. And to cloak her selfishness we

have the word 'mandate' which realy menans 'compulsion'."

[*New York City*-Nov. 17-1920]

'লীগ অব নেশনস্'-এর অভিভাবকত্বের ছলে '*mandated territories*' নাম দিয়া যে সব সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি ঐসব এলাকায় কর্তৃত্ব করিতেছিল এবং শান্তি স্থাপনের কপট অভিনয় করিতেছিল, কবি ঘৃণাভরে তাহাদের ধিক্কৃত করিলেন।

কিন্তু স্বদেশের তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনার খবরে কবির উদ্বেগ ও আশংকার সীমা নাই। এই সময়ে ঘন ঘন এণ্ড্রুজকে পত্রে তিনি নির্দেশ দিতেছেন। এই-সব চিঠিপত্রে কবির এই সময়কার মানসিক দ্বিধা, দ্বন্দ্ব বা অন্তর্বিরোধের চিত্রটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। এণ্ড্রুজকে সতর্ক করিয়া দিয়া একসময় লিখিতেছেন, (২৫ শে নভেঃ)

"But my earnest request to you is to keep your mind high above politics. The problem of this new age is to help to build the world anew. Let us accept this great task. *Santiniketan is to make accommodation for the workers from all parts of the world.* All other things can wait. We must make room for Man, the guest of this age, and let not the Nation obstruct his path. I am afraid lest the cry of our own sufferings and humiliations should drown the announcement of His comming…"

[*Letters to a Friend*-p. 103]

বর্তমান যুগের দাবী—তাহার আপন জাতীয় রাজনৈতিক-স্বার্থের দাবী। এই 'বর্তমান'কে কবি স্বীকার করিয়া লইতে পারিতেছেন না। আর একটি পত্রে এণ্ড্রুজকে লিখিতেছেন (নিউইয়র্ক-২১ শে ডিসেম্বর)

"…I do not belong to the present age, the age of conflicting politics. Nevertheless I cannot repudiate the age which has given me birth. I suffer and struggle. *I crave for freedom and yet am held back.* I must share the life of the present world, though I do not believe in its cry."…

[*Ibid*-p. 111]

কয়েকদিন পর আর একটি পত্রে লিখিতেছেন (নিউইয়র্ক—১৪ই জানুয়ারী ১৯২১)

"……It cannot be said that I am untouched by this heat and movement. But somehow, by my temperament as a poet, I am incapable of accepting these objects as final……my soul cries out : 'The complete man must never by sacrificed to the patriotic man, or even to the merely moral man."

[*Ibid*—p. 115

কেন তিনি এই 'Patriotic man' বা 'patriotism' সমর্থন করিতে পারিতেছেন না, তাহাই অপর একটি পত্রে লিখিতেছেন, (নিউইয়র্ক-৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯২১),

……"For in small minds, patriotism dissociates itself from the higher ideal of humanity…

"The whole world is suffering from this cult of Devil-worship in the present age, and I cannot tell you how deeply I am suffering, being surrounded in this country by endless ceremonials of this hideously profane cult. Everywhere there is an antipathy against Asia vented by a widespread campaign of calumny. Negroes are burnt alive, sometimes merely because they tried to exercise their right to vote, given to them by law. Germans are reviled. Conditions in Russia are deliberately misrepresented…"

তিনি আরো বলিলেন, তাঁহার ভয় হইতেছে, হয়ত দেশবাসী তাঁহার এইসব কথা শুনিয়া তাঁহাকে বর্জন করিতে পারে, 'I am afraid I shall be rejected by my own people when I go back to India. My solitary cell is awaiting me in my motherland"

[*Ibid*-p. 123]

জানুয়ারীর মধ্যভাগে (১৯২১) দেশবন্ধুর নেতৃত্বে কলিকাতায় কয়েক সহস্র ছাত্র স্কুল-কলেজ বয়কট করিয়া আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। এণ্ড্রুজের পত্রে এই সংবাদ পাইয়া কবি অত্যন্ত উদ্দীপিত হইয়া আন্দোলনের এই দিকটি সমর্থন করিয়া লিখিলেন, (চিকাগো-মার্চ ২, ১৯২১),

……"I hope that this spirit of sacrifice and willingness to suffer will grow in strength, for to achieve this is an end in itself. This is true freedom! Nothing is of higher value—be it national wealth or independence—than disinterested faith in ideals, in the moral greatness of man.

"The West has its unshakable faith in material strength and prosperity; and therefore, however loud grows the cay for peace and disarmament, its ferocity grows louder, gnashing its teeth and lashing its tail in impatience…We, in India, have to show the world what is that truth which not only makes disarmament possible but turns it into strength.

"The truth that moral force is a higher power than brute force, will be proved by the people who are unarmed."…

ঐ পত্রে, তিনি এমন কথাও বলিতে দ্বিধাবোধ করিলেন না, "স্বরাজ কী ?

স্বরাজ তো 'মায়া' মাত্র…স্বরাজ আমাদের লক্ষ্য নহে।"…"Swaraj is not our objective. Our fight is a spiritual fight—it is for Man. We are to emancipate Man from the meshes that he himself has woven round him—these organizations of national egoism …If we can defy the strong, the armed, the wealthy—revealing to the world the power of the immortal spirit—the whole castle of the Giant Flesh will vanish in the void. And then Man will find his Swaraj.

"We the famished ragged ragamuffins of the East, are to win freedom for all humanity. We have no word for 'Nation' in our language"… [*Ibid*-pp.-127-28]

লক্ষ্য করিবার বিষয়, কবি এখানে ছাত্রদের সংগ্রামের নৈতিক মনোবলকেই সমর্থন করিয়া 'moral force'-এরই জয়গান গাহিলেন। কিন্তু সংগ্রামের লক্ষ্য (objective and aim of our struggle) কি হইবে? এই প্রশ্নে তিনি বিশ্বমানবতার মহামিলনের এক বিরাট পরিপ্রেক্ষিত মেলিয়া ধরিলেন। উহা তো চূড়ান্ত লক্ষ্য মাত্র। জাতির আশু লক্ষ্য জাতীয় মুক্তি ও স্বরাজ। কিন্তু কবি খুব পরিষ্কার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বরাজ-আন্দোলনকে সমর্থন করিতে পারিলেন না। আসলে কবি নিজেই তখনও খুব পরিষ্কারভাবে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না, কি তিনি বলিতে চান বা ভারতবর্ষের পক্ষে কোন্‌টি সঠিক সত্য পথ হইবে। বিশেষ করিয়া গান্ধীজীর অসহযোগতত্ত্বটি তিনি যেন কিছুতেই মানিয়া লইতে পারিতেছেন না।

চিকাগো হইতে ৫ই মার্চ একটি পত্রে তিনি সেই কথাটাই বিস্তারিত আলোচনা করিলেন। তিনি বলিলেন, আমাদের ছাত্ররা দলে দলে আত্মত্যাগ করিতেছে সে কোন্ আদর্শের জন্য?—'Not to a fuller education, but to non-education." তিনি বলিলেন স্বদেশী আন্দোলনের সময়ও অনুরূপভাবে ছাত্ররা যখন দলে দলে স্কুল কলেজ বয়কট করিতেছিল তখনও তিনি উহা সমর্থন করেন নাই। তাঁহার প্রধান যুক্তি ছিল "The reason of my refusal to advise those students to leave their schools was because the anarchy of mere emptiness never tempts me, even when it is resorted to as a temporary measure…These students were no mere phantoms to me. Their life was a great fact to them and to the all. I could not lightly take upon myself the tremendous responsibility of a mere negative programme for them which would uproot their life from its soil, however thin and poor that soil might be."

এহ বাহ্য। কবি স্বয়ং যেন বুঝিতে পারেন তাঁহার দুর্বল যুক্তির কথা।

তাই পরিষ্কার তাঁহার বিভ্রান্তি ও অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা স্বীকার করিয়া ঐ পত্রেই লিখিলেন,

"I say again and again that I am a poet; that I am not a fighter by nature. I would give everything to be one with my surroundings."

"I love my fellow-beings and prize their love. Yet I have been chosen by destiny to ply my boat at that spot where the current is against me. *What irony of fate is this, that I should be preaching co-operation of cultures between East and West on this side of the sea just at the moment when the doctrine of non-co-operation is prehched on the other side!*"

[*Ibid*-pp.-129-33]

কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন বা '*Co-operation of cultures between East and West*'—এই আদর্শে তাঁহার কোন সংশয় কোন দ্বিধা নাই। এই আদর্শে তিনি তখন হিমালয়ের মত অচল-অটল এবং দৃঢ় সুনিশ্চিত। এই কারণেই গান্ধীজীর অসহযোগতত্ত্ব তিনি কোনমতেই গ্রহণ করিতে পারিতেছিলেন না। এই অসহযোগতত্ত্বের সমালোচনা করিয়া পরবর্তী চিঠিতে এন্ড্রুজকে বিস্তারিত লিখিলেন, (নিউইয়র্ক—১৩ই মার্চ ১৯২১)

কবির মূল বক্তব্য: সহযোগতত্ত্ব আবিষ্কার দ্বারা মানুষ পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। এতাবৎকাল যে-সমাজ বা সংঘ সহযোগতত্ত্বে বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে শান্তি ও সমৃদ্ধি সেইখানেই বিরাজিত। কিন্তু আপন গণ্ডী ও সীমানার বাহিরে এই সহযোগিতার তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারিল না। ফলে ক্রমে ক্রমে সারা বিশ্বের মানুষ আজ বিচ্ছেদ ও মতানৈক্যে ভুগিতেছে। ক্রমে আমরা এই সত্য আজ পরিষ্কার উপলব্ধি করিতেছি, আমাদের সমস্যাটা আজ বিশ্বব্যাপী;—কোন দেশ তাহার প্রতিবেশী হইতে দূরে বা তাহাকে বাদ দিয়া তাহার নিজের সমস্যার সমাধান করিতে পারে না। হয় আমরা সকলেই সমবেতভাবে রক্ষা পাইব নতুবা সমবেতভাবে সকলে ধ্বংসের অতল গহ্বরে তলাইয়া যাইব।

তাই তিনি বলিলেন,…"The spiritual Man has been struggling for its emergence into perfection, and every true cry of freedom is for this emancipation Erecting barricades of fierce separateness, in the name of national necessity, is offering hindrance to it Therefore in the long run it is building a prison for the nation itself…

…"The darkness of egoism which will have to be destroyed is *the egoism of the Nation.* The idea of the India is against the intense consciousness of the separateness of one's

own people from others, which inevitably leads to ceaseless conflicts. Therefore my own prayer is let India stand for the co-operation of all peoples of the world."

গান্ধীজী পাশ্চাত্যের মনীষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানকে নিষ্ঠার সহিত গ্রহণ করিতে বলিলেন না। পরন্তু তিনি এমনকি ইংরেজী ভাষাকেও বর্জন করিতে বলিলেন। পাশ্চাত্যের পণ্যদ্রব্য বয়কট—বস্তুত পাশ্চাত্যের সব কিছুকেই যেন তিনি বর্জন করিতে বলিলেন। কবি উহার তীব্র সমালোচনা করিয়া ঐ পত্রে লিখিলেন,

"Our present struggle to alienate our heart and mind from the West is an attempt at spiritual suicide. If, in the spirit of national vainglory, we shout from our housetops that the West has produced nothing that has an infinite value for man, then we only create a serious cause of doubt about the worth of any product of the Eastern mind. For it is the mind of Man, in the East and West, which is ever approaching Truth in her different aspects from different angles of vision.…Let us be rid of all false pride and rejoice at any lamp being lit in any corner of the world, knowing that it is a part of the common illumination of our house.

[*Ibid*-pp. 134-36]

এইসব চিঠিপত্রে অসহযোগ-আন্দোলন সম্পর্কে কবির দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও মানসিক যন্ত্রণার কারণটি কিছুটা পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে।

এদিকে যাহার জন্য আমেরিকায় আসা তাহা প্রায় একরকম সম্পূর্ণই ব্যর্থ হইল বলিতে হইবে। রবীন্দ্র-জীবনীকার লিখিতেছেন,

"এই চারিমাস বিশ্বভারতীর আদর্শপ্রচার বা প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থসংগ্রহের চেষ্টা একপ্রকার ব্যর্থ হইল বলিতে হইবে।…কবি আমেরিকায় আসিবার পূর্বে কল্পনা করিতেছিলেন যে এবার সে-দেশ হইতে পাঁচ মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করিবেন। হায় রে দুরাশা! শান্তিনিকেতনে তখন দারুণ অর্থাভাব। এণ্ড্রুস প্রাণপণে টাকা সংগ্রহের চেষ্টা করিয়া প্রয়োজন মিটাইতেছেন; কবিকে লিখিলেন, ব্যাংকে পাঁচ মিলিয়ন ডলার কল্পনা করার চেয়ে আপাতত পাঁচ হাজার টাকা পাইলে তিনি বাঁচিয়া যান।"

[রবীন্দ্র-জীবনী-তৃতীয় খণ্ড ।। পৃঃ ৫০]

তীব্র ক্ষোভ, দুঃখ, অপমান ও পরাজয়ের গ্লানিতে হৃদয় তাঁহার ভরিয়া যায়। ১৯শে মার্চ (১৯২১) নিউইয়র্ক হইতে '*Rhyndam*' জাহাজে ইউরোপের পথে যাত্রা করেন।

পুনরায় ইউরোপে

২৪শে মার্চ রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে আসিয়া পেঁছাইলেন।

আয়ারলণ্ডে তখন ডি'ভেলেরার নেতৃত্বে সিন্‌ফিন্‌ আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে।

মহাযুদ্ধের পর ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের নির্বাচন হয়। আয়ারলণ্ডে সিন্‌ফিন্‌রা বিপুল ভোটাধিক্যে তাহাদের প্রায় সবগুলি আসনই দখল করেন। কিন্তু তাঁহারা বৃটেনের সহিত সকল সম্পর্কচ্ছেদ করিবার জন্য পার্লামেণ্ট বয়কট করিলেন। তাঁহারা চাহিলেন আয়ারলণ্ডের জন্য এক স্বাধীন সার্বভৌম সরকার। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া এক অস্থায়ী স্বাধীন রিপাব্‌লিক গঠন করেন। ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহিত আইরিশ বিদ্রোহীদের প্রচণ্ড সংঘর্ষ শুরু হয়। ডি'ভেলেরা প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সহিত সহস্র সহস্র মুক্তিকামী বিদ্রোহী আইরিশ যুবককে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। সারা আয়ারলণ্ডের উপর ইংরেজের নির্যাতন ও পীড়নের ঝড় বহিতে লাগিল। কিন্তু বিদ্রোহী আইরিশ যুবশক্তিকে কোন মতে পরাস্ত করা গেল না। বন্দী বিপ্লবীরা কারাগারে অনশন শুরু করেন। আয়ারলণ্ডের প্রাতঃস্মরণীয় নেতা ম্যাক্‌ সুইনী (Mac Swiney) দীর্ঘ ৭৫ দিন অনশনের পর কারাগারে মৃত্যু বরণ করেন।

প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার, আয়ারলণ্ডের এই স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ ভারত মহাসাগরের কুলে আসিয়া লাগে। সিন্‌ফিন্‌দের অসহযোগ ও ব্রিটিশ পণ্য বয়কট আন্দোলন এবং তাহাদের অসমসাহসিক বীরত্ব আমাদের সেদিন কম উদ্দীপনা ও প্রেরণা জোগাই নাই। নাগপুর-কংগ্রেসে (১৯২০-ডিসেম্বর), আইরিশ স্বাধীনতা আন্দোলনে সমর্থন ও অমর শহীদ ম্যাক্‌ সুইনীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া যে সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়, এই প্রসঙ্গে তাহা উল্লেখযোগ্য,

(iv) "This Cogress pays its homage to the sacred memory of the great Irish patriot Mac-Swiney, and sends its message of sympathy to the Irish people in their struggle for Independence." [*Indian National Congress* (1920-23)-p -33]

'আয়ারল্যাণ্ডে রক্তপিঙ্গলের যে উন্মত্ত বর্বরতা দেখা গেল,' কবি তাহাতে কী ভয়ংকর ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হন, তা তাঁহার বিভিন্ন সময়ের রচনায় তীব্র ভাষায় ব্যক্ত হইয়া পড়ে। আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে আসার পথে 'S.S. Rhyndam' জাহাজে ইংরেজদের ঘৃণ্য সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তির তীব্র সমালোচনা করিয়া তিনি এণ্ড্রুজকে লিখিলেন,

......"You are fighting against that patriotism whereby the West has humiliated the East—the patriotism which is

national egoism. Thia is a comparatively later growth in European history and a far greater cause of misery and injustice in the human world than the bloodthirsty ferocity, the nomadic savagery, in the primitive history of man…Just see what hideous crimes are being committed by British patriotism in Ireland! It is a python which refuses to disgorge this living creature which struggles to live its seperate life."…

[*Letters to a Friend*-pp. 143-44]

বলা বাহুল্য, British partiotism বলিতে কবি এখানে 'British imperialism'-কেই বুঝাইতেছেন।

কবি ইংলণ্ডে পৌঁছিয়াই আয়ারলণ্ডে ইংরেজের পৈশাচিক দলননীতির বিস্তারিত সংবাদ পাইলেন। কুখ্যাত ইংরেজ, 'Black and Tans'-বাহিনী তখন নির্বিচারে আইরিশ স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-শিশুদের হত্যা করিতেছে—রাত্রির অন্ধকারে গ্রামকে গ্রাম জ্বালাইয়া দিতেছে। জওহরলাল এই লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের বিবরণ দিয়া লিখিতেছেন,

……"These *Black and Tans* started a campaign of cold-blooded murder, often shooting people in there beds, in the hope that they would thus terrorize the Sinn Feiners into submission. But the Sinn Feiners refused to submit, and carried on their guerrilla warfare. Thereupon the Black and Tans indulged in terrible reprisals, burning down whole villages and large parts of towns.…"

[*Glimpses of World History*-p. 692.]

এইসব সংবাদে রবীন্দ্রনাথ যে কী পরিমাণ ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হইয়াছিলেন, তা এণ্ড্রুজকে লেখা এই সময়কার একটি পত্রেই স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে,

"Things that are happening in Ireland are ugly. The political lies that are accompanying them are stupendous and in retaliation our anger seeks a victim adequately big; and we readily incriminate the whole people of England, though we know that a great number of English men feel shame and sorrow for these brutalities quite as keenly as any disinterested outsiders.

"The fact that such a great proportion of people here—whose interest in keeping Ireland tied to the British Empire is so vital—can feel so keenly the tyranny inflicated on the

Irish people, proves the inherent love of justice that thrives in the heart of this country in spite of all aberrations. The saving of a people depends upon the noble personalities holding up the moral tradition high above the floods of iniquity that occasionally deluge the land."

[*Letters to a Friend*-pp. 152-53]

লক্ষ্য করিবার বিষয়, কবি আয়ারল্যাণ্ডবাসীদের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিলেও, আয়রিশদের জাতীয় মুক্তিআন্দোলন সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে কোন কথা বলিলেন না। তাঁহার ধারণা প্রবলপ্রাণ ও মহদাশয় ব্যক্তিত্বই সাম্রাজ্যবাদী ইংলণ্ডকে ধ্বংস ও বিচ্যুতির হাত হইতে রক্ষা করিবে। ইংলণ্ডে ও ইউরোপে তিনি এই মহাপ্রাণ ব্যক্তিত্বকেই যেন খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলেন।

প্রায় একপক্ষকাল লণ্ডনে এমনিভাবে কাটিয়া গেল। ৮ই এপ্রিল (১৯২১) রবীন্দ্রনাথ লণ্ডনে, ভারতীয় ছাত্রদের হোস্টেলে, আমেরিকায় যে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন' সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহারই পুনরাবৃত্তি করিলেন। জনৈকা ইংরেজ মহিলা কবির এই বক্তৃতা শুনিয়া অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এক প্রতিবাদপত্রে এই বলিয়া অভিযোগ করিলেন যে, ইংরেজ জাতির প্রতি বিদ্বেষভাববশতঃ তিনি ইংরেজদের সম্পর্কে ঐসব মন্তব্য করিতেছেন। কবি জবাবে তাঁহাকে যে-পত্র লেখেন উহার অনুলিপি এণ্ড্রুজকেও পাঠাইয়া দেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, (১২ই এপ্রিল, ১৯২১) ঃ

"It is not unlikely that some unsuspected remnant of race-consciousness in your mind made you imagine that I gave vent to my feeling of anger against the British people in my lecture. I deeply feel for all the races who are being insulted and injured by the ruthless exploitation of the powerful nations belonging to the West or the East. I feel as much for the negroes, brutally lynched in America, often for economic reasons, and for the Koreans, who are the latest victims of Japanese imperialism, as for any wrong done to the helpless multitude of my own country"...

[*Ibid*-pp. 153-154]

রবীন্দ্রনাথ ১৬ই এপ্রিল বিমানযোগে লণ্ডন হইতে প্যারিসে গেলেন। এবারেও তিনি কাহ্নের আতিথ্য গ্রহণ করেন। প্যারিসে গিয়াই কবি রমাঁ রোলাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলেন। কিন্তু রোলাঁর নাম করিতেই ফরাসী বুদ্ধিজীবী মহলে এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। সকলেই ব্যাপারটাকে এড়াইয়া যাইতে চাহিলেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ

তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিবার দৃঢ় ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এই প্রসঙ্গে রথীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন,

…"Strangely enough, whenever Father mentioned his desire to meet Romain Rolland our French friends somehow or other avoided the subject. By his attitude towards the defeated Germans, Rolland had become a *persona non grata* in France and nobody cared to help us to find him, although we discovered that he was then living in Paris."…

[*On the edges of time*-p.-147.]

কিন্তু ফরাসী ন্যাশনালিস্ট বুদ্ধিজীবীদের রোলাঁর উপর বিরূপ হওয়ার আরো গূঢ় কারণ আছে। পূর্বেই তাহার কিছু আলোচনা করিয়াছি, পরে যথাস্থানে তাহা উল্লেখ করা যাইবে।

১৭ই এপ্রিল (১৯২১) রবীন্দ্রনাথের সহিত রোলাঁর প্রথম সাক্ষাৎকার হয়। নিখিল বিশ্ব-মানবের দুঃখ ও বেদনার সমুদ্রমন্থন করিয়া পূর্ব ও পশ্চিমের যে দুইজন মহাপ্রাণ ভাবুক মানবপ্রেমিকের উদ্ভব হয়, তাঁহাদের সাক্ষাৎ-মিলন নিঃসন্দেহে একটি স্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনা। বিশ-শতকের ভাববাদী কবি ও শিল্পীদের মধ্যে ইঁহাদের সমকক্ষ কয়জনকেই বা আমরা দেখিতে পাই!

এই সাক্ষাৎকারের কোন বিবরণ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তবে ইহার চারদিন পর রোলাঁ কবিকে যে পত্র লেখেন তাহাতে আলোচনার আভাস কিছুটা পাওয়া যায়।

রোলাঁ লিখিতেছেন (২২শে এপ্রিল, ১৯২১),

"I have read your noble appeal, and I have been profoundly touched by it. It responds to some of my dearest wishes. You may rest assured that I shall do all that is in my power to support your generous initiative and find in Europe adherents for your University of Santiniketan. I should even like to hope that, if my health permits me, I shall go some day to pay you there a visit……I have been very happy to know you personally, and I thank you for the hours you granted me: they will remain among the most precious in my memory. I regret only not to have been able to communicate with you directly."…

[*Rolland and Tagore*-P. 28.]

ইহাতে বুঝা যায় রোলাঁ এই সাক্ষাৎকারের ফলে রবীন্দ্রনাথের প্রতি কী গভীরভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং ইহাও আভাস পাওয়া যায়, তাঁহাদের

আলোচনা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও শান্তিনিকেতনের আন্তর্জাতিক বিশ্ব-বিদ্যালয় সংক্রান্ত বিষয়ে হইয়াছিল এবং বিশ্বভারতীর আদর্শ রোলাঁকে গভীর-ভাবে আকৃষ্ট করে।

এই সময় ফ্রান্সে ভারতীয়দের মধ্যে শ্রীধর রাণা এবং অধ্যাপক কালিদাস নাগ মহাশয় 'ভারতবন্ধু সমাজ' প্রতিষ্ঠা করিয়া বিশ্বভারতীর জন্য কিছু সাহায্য সংগ্রহ করেন।

২৭শে এপ্রিল রবীন্দ্রনাথ প্যারিস হইতে স্ট্রাস্‌বুর্গে আসিয়া পৌঁছাইলে অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি এবং ভারতীয় ছাত্ররা তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানান। স্ট্রাস্‌বুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে কবি, '*The Message of the Forest*' বক্তৃতা পাঠ করেন। লেভীর পাণ্ডিত্যে ও মনীষায় রবীন্দ্রনাথ খুবই মুগ্ধ হন। ফ্রান্সে আরো কয়েকটি জায়গায় কবি কয়েকটি বক্তৃতা করেন। তন্মধ্যে '*An Indian Folk Religion*', '*Meeting of the East and West*' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাহাড়া প্যাট্রিক গেডিসের মত দুই চারজন মনীষীর সহিতও তাঁহার এখানে পরিচয় হয়। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার রবীন্দ্রনাথের ফরাসী দেশ ভ্রমণের এক বিস্তারিত বিবরণ দিয়া *Modern Review* পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখেন (১৯২১ সেপ্টেম্বর)।

৩০শে এপ্রিল রবীন্দ্রনাথ সুইজারল্যাণ্ডে জেনেভা নগরীতে আসিয়া পৌঁছাইলেন। এখানে 'ইনষ্টিটউট-জাঁ-জাক্ রুসো' কলেজে ডাঃ ক্লাপারেডের সভাপতিত্বে কবিকে বিরাট সংবর্ধনা জানান হয়। ৬ই মে জেনেভায় কবির জন্মদিবস পালিত হয়। কবির ৬১তম জন্মদিবস উপলক্ষে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মনীষী ও গুণীজন কবিকে অভিনন্দন জানাইয়া পত্র লেখেন। দেশের ও বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কবির মন ভারাক্রান্ত। ঐ দিনই এণ্ড্রুজকে লেখা পত্রে তাঁহার মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব ও যন্ত্রণার চিত্রটি পরিষ্কার ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি লিখিতেছেন,

"Today is my birthday……The day has been crowded with visitors and the talk has been incessant, some part of which has unfortunately lapsed into politics, giving rise to a temperature in my mental atmosphere of which I always repent.

"Political controversies occasionally overtake me like a sudden fit of ague, without giving sufficient notice ; and then they leave me as suddenly, leaving behind a feeling of *malaise*. Politics are so wholly against my nature ; and yet, belonging to an unfortunate country, born to an abnormal situation, we find it so difficult to avoid their outbursts. Now when I am alone I am wishing that I could still my mind in the depth of that infinite peace where all the wrongs of

the world are slowly tuned up, out of their discordance, into the eternal rhythm of the flowers and stars.

"But men are suffering all over the world, and my heart is sick. I wish I had the power to pierce this suffering with music and bring the message of abiding joy from the deeper regions of the world soul, and repeat to the people who are angry and to the people whose heads are bowed down in shame: 'From joy all things are born, by joy they are maintained, and into joy they proceed and find their end"···

[*Letters to a Friend*-P. 161]

রণক্লান্ত মুমূর্ষু ইউরোপের কাছে ইহাই কবির জন্মদিনের শুভেচ্ছা বাণী।

কয়েকদিন পর রবীন্দ্রনাথ লুসার্নে আসিলেন। এখানে তিনি জানিতে পারিলেন যে, জার্মানীর গুণীজন ও সুধীসমাজ কবির জন্মদিবস উপলক্ষে বিশ্বভারতীর জন্য জার্মান ভাষার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসমূহ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেছেন। রবীন্দ্রনাথ এই সংবাদে অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া জার্মান বন্ধুদের উদ্দেশে লিখিলেন, (১০ই মে)

"Germany has done more than any other countries in the world for opening up and broadening the channel of the intellectual and spiritual communication of the West with India, and the homage of love, which she freely has given today to a poet of the East, will surely impart to their relationship the depth of an intimate and personal character."···

ঐদিন কবি বাসলে আসিলেন এবং বাসল বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বক্তৃতা করেন। এখানে বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ ওয়াকার নাগেল ও অধ্যাপক ভিসের প্রভৃতি মনীষীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়।

১৩ই মে জার্মান সরকারের আমন্ত্রণক্রমে কবি হামবুর্গ আসিয়া পেঁাছাইলেন। ২০শে মে হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বক্তৃতা করেন। অধ্যাপক সুব্রিং কবিকে জানাইলেন যে, হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ভারত-সংস্কৃতির একজন অধ্যাপক নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। স্বভাবতই কবি এই সংবাদে অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া ওঠেন।

হামবুর্গ হইতে রবীন্দ্রনাথ ডেনমার্কে আসিলেন। ২১শে মে কবি ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে আসিয়া পেঁাছাইলেন। বিরাট জনতা কবিকে অভ্যর্থনা জানাইল। ২৩শে মে কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে কবি বক্তৃতা করিলেন (*The Poet's Religion*); বক্তৃতার শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও সমবেত জনতা মশাল হস্তে বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া তাহাদের জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে কবিকে তাঁহার হোটেল পর্যন্ত পেঁাছাইয়া দেয়। এখানে বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত গ্রুনবেক ও প্রখ্যাত দর্শনশাস্ত্রী হেফডিং-এর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়।

২৪শে মে রবীন্দ্রনাথ সদলবলে সুইডেনের রাজধানী ষ্টকহমে আসিয়া পৌঁছাইলেন। 'সুইডিস্ একাডেমির' প্রতিনিধি সম্পাদক Karfeldt, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর, কাউণ্টেস্ উইল্ওমিট্জ্ প্রমুখ সুধীবৃন্দ কবিকে অভ্যর্থনা জানাইলেন।

স্মরণ রাখা দরকার, ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। কিন্তু তখন যুদ্ধ চলিতে থাকায় তাঁহার পক্ষে সুইডেনে আসিয়া পুরস্কার গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় নাই ; এই সুযোগে তিনি সুইডিস্-একাডেমি ও সুইডিস্ জাতির প্রতি তাঁহার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিলেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-জীবনীকার লিখিতেছেন,

"সুইডিস্ একাডেমির নিয়মানুসারে নোবেল পুরস্কার প্রাপক রূপে কবিকে একদিন একাডেমিতে বক্তৃতা করিতে হইল। সভাশেষে উপ্সালার আর্চবিশপ বলিলেন : 'The Nobel prize for literature is intended for the writer who combines in himself the artist and the prophet. None has fulfilled these conditions better than Rabindranath Tagore." [রবীন্দ্র-জীবনী-তৃতীয়খণ্ড ॥ পৃঃ ৫৬.]

সুইডেনে তখন জাতীয় লোকসংস্কৃতির উৎসব চলিতেছে। রবীন্দ্রনাথের ইহাতে প্রবল আগ্রহ ও আকর্ষণ এবং এই উৎসব তিনি উপভোগ করিবার সুযোগ পাইলেন। এখানকার সাংবাদিক ও সুধীবর্গের এক সভায় পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন সম্পর্কে তিনি বক্তৃতা দেন। আর এইখানেই লীগ অব নেশন্স'এর প্রথম সভাপতি ডাঃ ব্র্যাণ্টিং-এর সঙ্গে তাঁহার বিশ্বশান্তি সমস্যা বিষয়ে বহু আলোচনা হয়। এবার সুইডেনে ক্নুট হামসুন, বিওর্নসন, স্ভেন হেডিন, ইয়োহান বোইয়ের, সেল্মালায়েরলফ্ প্রমুখ স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান লেখকদের সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়।

সুইডেন হইতে কবি পুনরায় জার্মানীতে ফিরিলেন। ২রা জুন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। সভায় এত জনসমাগম হয় যে, সভার বাহিরেও প্রায় ১৫ হাজার নরনারী কবিকে দেখিবার জন্য ভিড় করে। পরদিন তিনি জার্মানীর ছাত্র-ছাত্রীদের সমক্ষে আর একটি বক্তৃতা করেন।

৬ই জুন রবীন্দ্রনাথ ব্যাভেরিয়ার রাজধানী মিউনিকে আসিয়া পৌঁছাইলেন। এইখানেই জার্মানীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক টমাস্ ম্যানের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ৭ই জুন তিনি মিউনিক্ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করিলেন এবং বক্তৃতার জন্য সংগৃহীত সমস্ত অর্থই তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত জার্মানীর শিশুদের জন্য দান করেন (প্রায় ১০,০০০ মার্ক)।

সেখান হইতে কবি ডার্মস্টাট (Darmstadt) সহরে হেসের গ্রাণ্ড ডিউকের আমন্ত্রণক্রমে কয়েকদিন তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করেন। কাউণ্ট কাইজারলিং সদা-সর্বদা কবির সাথে সাথে থাকিয়া তাঁহার বক্তব্য ও ভাষণগুলি জার্মান ভাষায় তর্জমা করিয়া দিতেছিলেন। এই ডার্মস্টাট সহরেই তৎকালীন জার্মানীর

বহু সুধীজন কবির ৬১তম জন্মদিবস উপলক্ষে এক সপ্তাহব্যাপী 'ঠাকুর-সপ্তাহ' (*Tagore Woche*) পালন করেন এবং বিশ্বভারতীর জন্য বহু পুস্তক সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। ডাঃ মেঘনাদ সাহা এই সময় জার্মানীতে কবির বিপুল সম্বর্ধনার বিস্তারিত সংবাদ দিয়া *Modern Review* পত্রিকায় লিখিতে থাকেন (১৯২১ আগস্ট)। এই সহরেই রবীন্দ্রনাথকে একদিন একটি শ্রমিকসংঘে বক্তৃতা করিতে হয়। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রজীবনীকার একটি অত্যন্ত কৌতুকাবহ সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন,

"ডার্মস্টাট একটি শিল্পকেন্দ্রও বটে ; তথাকার শ্রমিক-সংঘ বলিয়া পাঠায় যে ভারতীয় কবিকে তাহারা দেখিতে পায় নাই, তাঁহাকে তাহারা তাহাদের মধ্যে পাইতে চায়। সাধারণ শিল্প-শ্রমিকরা শিক্ষাদীক্ষার দিক হইতে আদর্শ মানুষ নহে ; কবি তাহাদের ক্লাবে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু শ্রমিকরা তাঁহাকে কোনও প্রকার সম্মান দেখাইবার জন্য ঔৎসুক্য দেখাইল না : বিয়ারের বোতল সম্মুখেই থাকিল, চুরুটের ধোঁয়া যথাপূর্ব কুণ্ডলিত হইয়া চলিল ; কবি তাহাদের মধ্যে গিয়া বসিলেন, ধীরে ধীরে কথা শুরু করিলেন এবং যেমন সেগুলি অনূদিত হইতে লাগিল, সভার শ্রোতাদের ব্যবহারে পরিবর্তন লক্ষিত হইল। কিছুক্ষণের মধ্যে বিয়ারের মগ বেঞ্চের নীচে গেল, চুরুট নিবাইয়া লোকে পকেটে পুরিল, ঋজু হইয়া স্তব্ধভাবে সকলে বসিল। কবি বলিয়াছেন, জীবনে তাঁহার এত বড়ো বিজয় কোনো দিন হয় নাই।" [রবীন্দ্র-জীবনী-তৃতীয় খণ্ড ॥ পৃঃ ৫৮-৫৯]

জার্মানী হইতে কবি অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় আসিয়া পৌঁছাইলেন। এখানেও তাঁহাকে বিপুল সম্বর্ধনা জানান হয়। ১৪ই জুন এখানে তিনি একটি বক্তৃতা দেন।

১৭ই জুন অস্ট্রিয়া হইতে তাঁহারা চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগে পৌঁছিলেন। প্রাগ্ ষ্টেশনে পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিনিধি ডাঃ হাইকা ও বিখ্যাত সংস্কৃতবিদ্ পণ্ডিত অধ্যাপক লেস্নি কবিকে অভ্যর্থনা করিয়া লইতে আসিয়াছিলেন। এখানে দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পর পর কয়েকটি বক্তৃতা করেন। রবীন্দ্রনাথের এই পরিদর্শন ভারত-চেক সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ইতিহাসে এক নব-অধ্যায়ের সূচনা করে। এইখানেই বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও প্রাচ্য-বিদ্যার্ণব উইণ্টারনীজের (M. Winternitz) সহিত কবির দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হয়। ভারতীয় সংস্কৃতি ও ভারতীয় শিল্প-সমালোচক শ্রীমতী স্টেলা ক্রামরিশের সহিত কবির ভিয়েনায় আলাপ-পরিচয় হয়। পরবর্তীকালে ইঁহারা সকলেই কবির বিশ্বভারতীর আদর্শে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইয়া শান্তিনিকেতনে আসেন এবং অল্প কিছুকাল সেখানে অধ্যাপনাও করেন। অধ্যাপক বিনয় সরকার কবির জার্মানী ও ইউরোপ ভ্রমণের সংবাদ দিয়া 'মডার্ণ রিভ্যু'-এ একটি প্রবন্ধ লেখেন (১৯২১ সেপ্টেম্বর সংখ্যা)।

১লা জুলাই মার্সেইলস্ বন্দর হইতে ভারতের পথে যাত্রা করেন। ১৬ই জুলাই রবীন্দ্রনাথ এবারের ভ্রমণ শেষ করিয়া বোম্বাই নগরীতে পদার্পণ করিলেন।

রবীন্দ্রনাথের এই ইউরোপ ভ্রমণের বিস্তারিত আলোচনা, এই গ্রন্থের বিষয় নহে। হল্যাণ্ড, জার্মানী ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তিনি যে বিপুল অভ্যর্থনা লাভ করেন তাহা 'রবীন্দ্র-জীবনী' (তৃতীয় খণ্ড), 'পিতৃস্মৃতি' 'বিশ্বভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ' এবং 'বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ' প্রভৃতি গ্রন্থে বহু তথ্য পূর্ণ বিবরণ আছে।

কবির এবারের ইউরোপ-আমেরিকা ভ্রমণের বক্তৃতাগুলি *'Creative Unity'* গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। *'The Poet's Religion'*, *'The Creative Ideal'*, *'The Religion of the Forest'*, *'An Indian Folk Religion'*, *'East and West'*, *'The Modern Age'*, *'The Spirit of Freedom'*, *'The Nation'*, *'Women and Home'*, *'An Eastern University'*—এই দশটি বক্তৃতা ঐ গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শেষোক্ত ছয়টি রাজনীতিক সমস্যা সংক্রান্ত। *'East and West'* বক্তৃতাটির কথা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি।

আধুনিক যুগের প্রধান সমস্যাটি কী, উহাই তিনি *'The Modern Age'* ভাষণে বিস্তারিত আলোচনা করিলেন। আধুনিক যন্ত্রসভ্যতা মানুষের সৌন্দর্য-বোধ, হৃদয়বৃত্তি ও সূক্ষ্ম-অনুভূতির তন্ত্রীগুলিকে নিয়তই ছিন্নভিন্ন করিয়া চলিয়াছে—মানুষও যন্ত্রে পরিণত হইতেছে। কলিকাতা মহানগরীর বড় বড় কলকারখানার কৃষ্ণধূমশ্বসিত চিমনীগুলি যেভাবে গঙ্গাতীরের মনোরম সৌন্দর্যকে দূষিত করিয়া চলিয়াছে, তাহা যেমনি কুশ্রী তেমনি পীড়াদায়ক। মানুষের সজীব প্রাণ ও হৃদয়বৃত্তির সহিত এই যন্ত্রসভ্যতার যেন কোন সঙ্গতি নাই। তবে কী সামাজিক অর্থে এই চটকল বা যন্ত্রসভ্যতার কোন প্রয়োজন নাই ?

রবীন্দ্রনাথ তাহার জবাবে বলিলেন,

…"I admit they are indispensable, and am willing to allow them a place in society, if my opponent will only admit that even gunny-bags should have their limits, and will acknowledge the importance of leisure to man, with space for joy and worship, and a home of wholesome privacy, with associations of chaste love and mutual service. If this concession to humanity be denied or curtailed, and if profit and production are allowed to run amuck, they will play havoc with our love of beauty, of truth, of justice, and also with our love for our fellow-beings, …It must not be permitted to occupy more than its legitimate place and power in society, nor to have the liberty to desecrate the poetry of life, to deaden our sensitiveness to ideals, bragging of its own coarseness as a sign of virility".…

[*Creative Unity*-pp. 117-18]

লক্ষ্য করিবার বিষয়, কবি যন্ত্রের ভূমিকাকে একেবারেই অস্বীকার করিতেছেন না। আধুনিক পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় যন্ত্র-সভ্যতার মর্মান্তিক স্ববিরোধ ও অসঙ্গতিটি কোথায়, তাহাই তিনি স্পষ্টই তুলিয়া ধরিলেন। কিন্তু

কী সেই সমাজ-অর্থনীতিক ব্যবস্থা, যেখানে যন্ত্র শুধু মুনাফা ও 'লোভরিপুর' চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইবে না?—যন্ত্রব্যবস্থার সঠিক ভূমিকা কোন সমাজব্যবস্থায়? এই প্রশ্নের খুব পরিষ্কার সমাধান তখনও রবীন্দ্রনাথের জানা ছিল না। তিনি আরো বলিলেন,

"But in recent centuries a devastating change has come over our mentality with regard to the acquisition of money. ...Such a state of things has come to pass because, with the help of science, the possibilities of profit have suddenly become immoderate. ... It has not only science for its ally, but other forces also that have some semblance of religion, such as nation-worship and the idealising of organised selfishness."...

এই লোভ যখন ব্যক্তিগত স্বার্থ হইতে রাষ্ট্রীয় তথা জাতীয়স্বার্থের রূপ পরিগ্রহণ করিয়া জাতীয় উন্মাদনাকে তীব্রতর করিয়া তুলিতেছে তখনই তাহার পরিণাম আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করিতেছে। যতক্ষণ এই লোভ ও স্বার্থ আছে ততক্ষণ জগতে কোন স্থায়ী শান্তি আসিতে পারে না;—কোন 'লীগ-অব-নেশনস্'ই পারে না। তাই তিনি বলিলেন,

"So long as the powers build a league on the foundation of their desire for safety, secure enjoyment of gains, consolidation of past injustice, and putting off the reparation of wrongs, while their fingers still wriggle for greed and reek of blood, rifts will appear in their union; *and in future their conflicts will take greater force and magnitude.* It is political and commercial egoism which is the evil harbinger of war. By different combinations it changes its shape, and dimensions, but not its nature.......by a mere change of temple, and by new committees of priests, will never save mankind."

[*Creative Unity*-pp. 119-29.]

'*The Nation*' বক্তৃতায় তিনি এই কথাই অন্য ভাষায় ও ভাবে বলিলেন,

"When a whole body of men train themselvs for a particular narrow purpose, it becomes a common interest with them to keep up that purpose and preach absolute loyalty to it. Nationalism is the training of a whole people for a narrow ideal; and when it gets hold of their minds it is sure to lead them to moral degeneracy and intellectual blindness"...

"...every nation which has prospered has done so through its career of aggressive selfishness either in commercial adventures or in foreign possessions, or in both. And this material

prosperity not only feeds continually the selfish instincts of the people, but impresses men's minds with the lesson that, for a nation, selfishness is a necessity and therefore a virtue. It is the emphasis laid in Europe upon the idea of the Nation's constant increase of power, which is becoming the greatest danger to man, both in its direct activity and its power of infection."

[*Creative Unity*.-pp. 148-50]

সবই সত্য, কিন্তু ইহাও ত নেতিমূলক।

আধুনিক যুগসমস্যার একটি সঠিক চিত্র উপস্থাপিত করিলেও কবি এই সত্য দেখিতে পাইলেন না যে, পুঁজিবাদী সমাজের অন্তর্নিহিত কারণের মধ্যেই রহিয়াছে এই সব দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের আসল বীজ। অর্থাৎ কবির নিকট আসল সমস্যার সমাধান অর্থনীতিক ও রাজনীতিক নহে;—সত্যকারের অধ্যাত্মসত্তার উপলব্ধির মধ্যেই মানুষের সকল সমস্যার সমাধান। *'The Modern Age'* বক্তৃতার উপসংহারে কবি এই কথাটাই জোর দিয়া ঘোষণা করিলেন,

"We must know that, as through science and commerce, the realisation of the unity of the material world gives us power, so the realisation of the great spiritual Unity of Man alone can give us peace." [*Creative Unity*-p. 130]

সেইজন্যই কোন বিশেষ সমাজ-আর্থনীতিক ব্যবস্থার মধ্যে ইহার সমাধান আছে বলিয়া কবি বিশ্বাস করেন না। *'The Nation'* ভাষণের উপসংহারে তাই তিনি বলিলেন,

"Therefore I do not put my faith in any new institution, *but in the individuals all over the world who think clearly*, feel nobly, and act rightly, thus becoming the channels of moral truth. Our moral ideals do not work with chisels and hammers. Like trees, they spread their roots in the soil and their branches in the sky, without consulting any architect for their plans."

[*Idid*-p. 153]

বলা বাহুল্য, কবির অন্বেষণ—সর্বহারা-শ্রমজীবীদের আন্দোলন নহে, বিদ্রোহ বিপ্লবও নহে। কবির অন্বেষণ,—প্রচণ্ড নৈতিক সম্পদে বলীয়ান আদর্শ ব্যক্তিত্ব। রমাঁ রোলাঁর সহিত এইখানেই রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য। রোলাঁ শুধু যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদকে নিপাত জানাইয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। এই মারমুখী যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিটি কুঅভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তিনি বুদ্ধিজীবী ও শোষিত শ্রমজীবীশ্রেণীর এক সম্মিলিত ফ্রণ্ট ও প্রতিরোধ-সংগ্রামের আহ্বান জানাইতেছিলেন। বস্তুত, সোভিয়েত বিপ্লবই রোলাঁর সম্মুখে এক নবদিগন্ত উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছে। রোলাঁ তাই লিখিতেছেন "আমার সমস্যা ছিল স্বাধীন বুদ্ধিজীবীদের কর্মক্ষেত্রের সহিত সর্বহারা শ্রমজীবীদের কর্মক্ষেত্রের সংযোগসাধন

…সর্বহারা শ্রমজীবী যে পথ প্রস্তুত করিবে তাহাকে আলোকিত করাই বুদ্ধিজীবীদের কাজ।" [দ্রঃ শিল্পীর নবজন্ম] 'বলশেভিজম্' বা যুদ্ধোত্তর ইউরোপের গৃহযুদ্ধ বা বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানগুলি বিশেষ তাৎপর্যে তখনও কবির চোখে ধরা পড়ে নাই।

রাশিয়ার 'নভেম্বর-বিপ্লব' ও মহাযুদ্ধের অনতিকাল পরে, সারা ইউরোপ যে এক আসন্ন মহাবিপ্লবের হাত হইতে অল্প একটুর জন্য বাঁচিয়া যায়, সে কথা স্মরণ রাখা দরকার। সারা ইউরোপের শ্রমজীবী ও সোস্যালিস্টদের একটিমাত্র slogan প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিতেছে :

"Workers of the wor unite—the working class have no fatherland !"

জওহরলাল অত্যন্ত সুন্দর বর্ণনা দিয়া লিখিতেছেন,

…"perhaps, it might be said that the greatest event of the post-war period in Western Europe was the revolution that did not come off. The conditions that produced the Bolshevik Revolution in Russia were present in the central and western European countries also, though in a lesser degree."…

"The Bolshevik appeals were suppressed by the German and Allied governments, but they managed to trickle down to the various fronts and the factory areas. Their effect was considerable everywhere, and a noticeable cracking up of the French army was visible. The German army and workers were even more affected. There were even risings and revolts in Germany and Austria and Hungary—the defeated countries—and for many months, or even a year or two, Europe seemed to be on the verge of a mighty social revolution.… in Europe the working classes threatened to upset the existing *bourgeois* capitalist social order and to seize power from the middle classes." [*Glimpses of World History-pp.*-784-86]

রবীন্দ্রনাথ ইউরোপের পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যলিপ্সা, যুদ্ধলিপ্সা ও উগ্র-জাতীয়তাবাদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে যত তীব্র সমালোচনা ও ভর্ৎসনাই করুন না কেন শেষ পর্যন্ত তিনি কিছুটা আধ্যাত্মিকতার কোলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি প্রতিরোধ-সংগ্রামের কথাও বলিলেন কিন্তু উহা খুবই মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীদের আদর্শগত নৈতিক সংগ্রাম। কবির এই আধ্যাত্মিক মানবতাবাদে ইউরোপের শাসক গোষ্ঠী কিছুটা খুশিই হইয়াছিল। বিশেষ করিয়া জার্মানীতে রবীন্দ্রনাথের বিপুল অভ্যর্থনা ও কবির রচনার সমাদরে ইঙ্গ-ফরাসী মহল মনে মনে একদিকে পুলকিত হইতে থাকে। কবি স্বয়ং এ'কথা বুঝিতে পারিয়া এণ্ড্রুজকে লিখিতেছেন,

"সেদিন বার্লিনে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা হল। জার্মানীতে আমার রচনার যে প্রভূত সমাদর হয়েছে তাতে তাঁর আনন্দ জানিয়ে তিনি বলেছেন—'এই জার্মানদের সান্ত্বনা দেবার জন্য উপযুক্ত কোনো দর্শনতত্ত্ব আমি জোগাতে পারি কিনা! আমি নিশ্চিত জানি এতে ব্রিটিশদের উপকারের কথা ভেবেই তাঁর আনন্দ হয়েছে। আমার মনে হল তাঁর ধারণা হয়েছে যে দর্শনতত্ত্ব হচ্ছে কোনো ঘুম-পাড়ানী ওষুধ যাতে জার্মান জাতির চঞ্চল কর্মশক্তিকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে দেবে· যার ফলে বিজয়ীরা নিরাপদে তাদের অর্থসম্পদ ভোগ করতে পারবে। কাজেই আনন্দের সঙ্গেই আত্মিক সম্পদ ও পরমার্থ প্রভৃতি এসব লোককে দান করে দিয়ে নিজের জাতের জন্য পার্থিব অর্থ-সম্পদটুকু রেখেই সুখী থাকবেন। মনে হল তিনি মনে মনে হাসছেন আর ভাবছেন যে এই দরাদরিতে তাঁর জাতই জিতে গেল!"··· [বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ ॥ পৃ-১৬৫-৬৬]

জার্মানীকে লইয়া তখন সমস্ত ইউরোপের মাথাব্যথা ও বিধিব্যবস্থা। ভার্সাই সন্ধি ও অন্যান্য সন্ধির ফলে জার্মানীকে যেভাবে খণ্ডিত ও পঙ্গু করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে—যে বিপুল ক্ষতিপূরণের পরিমাণভার (6,6000,000,000—পাউণ্ড বাৎসরিক কিস্তিতে) তাহার স্কন্ধে চাপান হইয়াছে সেই সম্পর্কে কিংবা তাহার আর্থনীতিক সংকট ও আভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ কিছু মন্তব্য করিতে দেখা যায় না। মহাযুদ্ধের সময় 'নীট্শের-জার্মানী' বা আধুনিক জার্মান সংস্কৃতি সম্পর্কে কবি যে তীব্র বিদ্রূপ ও কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন, এবার জার্মানী ভ্রমণকালে তাহার কিছু উল্লেখ করিতে দেখা গেল না। ইহার কারণ মনে হয় দুইটি। প্রথমত, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আন্তর্জাতিক মৈত্রীর বাণী বহন করিয়া বিভিন্ন দেশে অতিথির বেশে গিয়াছেন এবং সেই জন্য সেখানকার আভ্যন্তরীণ রাজনীতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে মন্তব্য না করিয়া সে-দেশের সহিত মৈত্রীর ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনে অধিক আগ্রহ প্রকাশ করেন। দ্বিতীয়ত শান্তিনিকেতনে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা তাঁহার চিন্তা অধিকার করিয়া থাকায় পূর্ব ও পশ্চিমের সাংস্কৃতিক ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদান-প্রদানের উপর তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিতেছিলেন।

কিন্তু তবুও রবীন্দ্রনাথের এই ইউরোপ ভ্রমণ একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপের কাছে তিনি যেন ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে শান্তি, প্রেম ও মানবমৈত্রীর বাণী বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি সেখানে পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ভাব-বিনিময়ের প্রস্তাব রাখিয়া আসিলেন। বস্তুত তাঁহার এই ভ্রমণের ফলে (এবং প্রধানত তাঁহারই উদ্যোগে) অধুনাকালের 'ভারত-ফরাসী', 'ভারত-জার্মান', ও 'ভারত-চেক্' সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনের এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়। আধুনিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাসে এর মূল্য ও ভূমিকা অপরিসীম।

অসহযোগ-আন্দোলন ও কবির অন্তর্দ্বন্দ্ব

১৯২০ সালে, ডিসেম্বর মাসে (২৬-৩০শে) নাগপুরে কংগ্রেসের ঐতিহাসিক অধিবেশন। সভাপতি সি. বিজয়রাঘবাচারী।

বাংলাদেশ হইতে চিত্তরঞ্জন দাশ প্রায় ২৫০ জন প্রতিনিধি সহ নাগপুর অধিবেশনে উপস্থিত হইলেন। উদ্দেশ্য, কলিকাতা বিশেষ-অধিবেশনের সিদ্ধান্তকে বানচাল করিয়া দিবেন। শুধু চিত্তরঞ্জনই নহেন—লালা লাজপৎ রায়, খাপর্দে, কেলকার, মতিলাল নেহরু, এমন কি সভাপতি বিজয়রাঘবাচারী পর্যন্ত গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের বিভিন্ন ত্রুটিপূর্ণ দিকগুলির সমালোচনা করিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীরই জয় হইল অর্থাৎ কলিকাতা অধিবেশনের মূল সিদ্ধান্তগুলি অল্পবিস্তর সংশোধন করিয়া বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হইল। আর বিস্ময়ের ব্যাপার, শেষ পর্যন্ত স্বয়ং চিত্তরঞ্জনই অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাবটি পেশ করিলেন এবং লালাজী উহা সমর্থন করিলেন,—মতিলালজীও।

নাগপুর কংগ্রেসে অসহযোগ আন্দোলনের বিস্তারিত কর্মসূচী ছাড়াও আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই অধিবেশনেই কংগ্রেসের নূতন গঠনতন্ত্র গৃহীত হয়। কংগ্রেসের আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে উহার প্রথম অনুচ্ছেদেই বলা হয়,

"The object of the Indian National Congress is the attainment of Swaraj by the people of India by all legitimate and peaceful means."

উল্লেখযোগ্য, এই সময় হইতেই এদেশে শ্রমিক আন্দোলন প্রবল ও ব্যাপক আকার ধারণ করিতে থাকে। নাগপুর-কংগ্রেসেই শ্রমিকদের ট্রেড-ইউনিয়ন সংগঠনে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তাহাদের ন্যায়সঙ্গত দাবি-দাওয়াগুলির জন্য আন্দোলন করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। *Duke of Connaught*'এর আসন্ন ভারত সফর উপলক্ষে উৎসবাদি বর্জন করিবার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়।

নাগপুর-অধিবেশনের পর সারা দেশে অসহযোগ আন্দোলন ক্রমশই ব্যাপক ও প্রবল আকার ধারণ করিতে থাকে। কাউন্সিল বয়কট অপূর্ব সাফল্য লাভ করিল। বহু উকিল মোক্তার আদালত বর্জন করিতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র, ছাত্র-ছাত্রী স্কুল, কলেজ বয়কট করিয়া আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিতে থাকে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাংলা দেশে কিছু জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু এখন এই আন্দোলনে সারা ভারতবর্ষব্যাপী জাতীয় বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করিবার আন্দোলন চলিতে থাকে। এই সময়ই 'কাশী বিদ্যাপীঠ', 'বিহার বিদ্যাপীঠ', 'গুজরাট বিদ্যাপীঠ', 'মহারাষ্ট্র বিদ্যাপীঠ', 'আলিগড় ন্যাশনাল মুসলিম বিদ্যাপীঠ' এবং কলিকাতায় 'ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি' প্রতিষ্ঠিত হয়।

চিত্তরঞ্জন দাশ কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়াই এই আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া

পড়িলেন। জানুয়ারীর মধ্যভাগে (১৯২১) চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে প্রায় তিন সহস্রাধিক ছাত্র কলেজ বয়কট করিয়া এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে। গান্ধীজী তাঁহাদের উদ্দেশে এক বাণীতে লিখিলেন,

"I had expected no less; I certainly expect still more.… You have falsified the calumny of cowardice on more occasions than one. There is, therefore, no reason why Bengal should not lead now as it has done before now.…For what is your sacrifice? To suspend your literary studies for one year or till swaraj is established If I could infect the whole of the student world with my faith, I know that the suspension of studies need not extend even to a year."

[*Mahatma-Vol. II.* p.-33]

৪ঠা ফেব্রুয়ারী গান্ধীজী কলিকাতায় 'ন্যাশনাল কলেজ' উদ্বোধন করেন। এই সময় সুভাষচন্দ্র সিবিল সার্ভিস হইতে পদত্যাগ করিয়া এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। সুভাষচন্দ্র হইলেন ন্যাশনাল কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ।

এদিকে শান্তিনিকেতনেও অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল উত্তেজনা ও উন্মাদনা দেখা দিয়াছে। স্বয়ং এণ্ড্রুজই এই আন্দোলনে মাতিয়া উঠিলেন। অধ্যাপক নেপাল রায় বাহিরের একদল ছাত্র লইয়া সুরুলের কুঠি বাড়িতে কেন্দ্র করিয়া পার্শ্ববর্তী এলাকায় গ্রামোন্নয়ন ও স্বদেশী আন্দোলনে মাতিয়া উঠিলেন।

এই সংবাদে রবীন্দ্রনাথ যে কী পরিমাণ উদ্বিগ্ন ও আশঙ্কিত হইয়া ওঠেন, তাহা এণ্ড্রুজকে লেখা চিঠিপত্রে অত্যন্ত পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। পূর্বেই আমরা তাহা বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। দেশের প্রতি অন্যায় ও অবিচারের প্রতিবাদে গান্ধীজী প্রবর্তিত অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলনকে তিনি আন্তরিক সমর্থন জানাইলেও গান্ধীজীর অসহযোগ-তত্ত্বকে তিনি কোন মতেই অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করিতে পারিতেছিলেন না।

দ্বিতীয়ত, অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলনকে তিনি সমর্থন করিলেও শান্তিনিকেতনকে উহার এবং সব কিছুরই ঊর্ধ্বে স্থান দিবার আহ্বান জানাইলেন।

শান্তিনিকেতন আশ্রম ও বিশ্বভারতী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই অতিসতর্কতা অবলম্বনের উপযুক্ত কারণ ও কৈফিয়ত আছে।

যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপে তিনি ভারতবর্ষের পক্ষে বিশেষ একটি বাণী ও mission লইয়া গিয়াছিলেন। তাহা হইতেছে পারস্পরিক সহযোগিতা, প্রেম ও মৈত্রীর ভিত্তিতে বিশ্বের সহিত ভারতের যোগসাধন; তাহা হইতেছে পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন, এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষা-সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান আর শান্তিনিকেতনই হইবে সেই আন্তর্জাতিক মানবতার মহামিলনক্ষেত্র। কিন্তু কবির ধারণা, গান্ধীজীর অসহযোগ-তত্ত্ব উহার সম্পূর্ণ বিপরীত আদর্শ। কবি গান্ধীজীর 'হিন্দ স্বরাজের' সমাজ-অর্থনীতিক চিন্তার কথা ভালোভাবেই জানিতেন। তাঁহার প্রধান ভয়, গান্ধীজী পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান, যন্ত্রশিল্প, সভ্যতা-সংস্কৃতি—

সবকিছুকেই বর্জন করিতে বলিতেছেন। তাই আদর্শগত দিক হইতে তিনি এই আন্দোলনের উম্মাদনাকে কিছুতেই যেন মানিয়া লইতে পারিতেছেন না।

এণ্ড্রুজ রবীন্দ্রনাথের ৪ খানি চিঠি (পূর্বোল্লিখিত) '*Modern Review*' পত্রিকায় প্রকাশ করিলে উহার প্রতি গান্ধীজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। গান্ধীজী বুঝিলেন, কবি তাঁহার অসহযোগ-তত্ত্ব সম্পর্কে ভুল খবর শুনিয়াছেন। গান্ধীজী, তাঁহার অসহযোগ-তত্ত্বের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়া লিখিলেন,

"I would like to assure him and India that non-co-operation in conception is not any of the things he fears, and he need have no cause to be ashamed of his country for having adopted non-co-operation. If in actual application it appears in the end to have failed, it will be no more the fault of the doctrine than it would be of truth if those who claim to apply it in practice do not appear to succeed …

"Nor need the poet fear that non-co-operation is intended to erect a Chinese wall between India and the West On the contrary, non-co-operation is intended to pave the way to real, honourable and voluntary co-operation based on mutual respect and trust. The present struggle is being waged against compulsory co-operation, against one-sided combination against armed imposition of modern methods of exploitation masquerading under the name of civilization.

"Non-co-operation is a protest against an unwitting and unwilling participation in evil"

ছাত্ররা দলে দলে সরকারী স্কুল, কলেজ বয়কট করিতেছে,—অথচ বিকল্প ব্যবস্থা-হিসাবে সেই পরিমাণে জাতীয় বিদ্যালয় গড়িয়া উঠিতেছে না; ছাত্ররা কী বিদ্যা-শিক্ষার সঙ্গেও অসহযোগিতা করিবে, ইহাই রবীন্দ্রনাথের প্রধান আশংকা। জবাবে গান্ধীজী বলিলেন, শিক্ষার সঙ্গে নহে,—ইংরেজ সরকার পরিচালিত শিক্ষায়তনের শিক্ষার সঙ্গেই অসহযোগিতা করিতে হইবে—যে শিক্ষা আমাদের প্রতিনিয়তই হীনতা, দৈন্য ও চারিত্রিক অবনতি ঘটাইতেছে।

…"My experience has proved to my satisfaction that literary training by itself adds not an inch to one's moral height and that character-building is independent of literary training. I am firmly of the opinion that the government schools have unmanned us, rendered us helpless and godless… I hold that as soon as we discovered that the system of government was wholly, or mainly evil, it became sinful for us to associate our children with it."

রবীন্দ্রনাথের প্রধান অভিযোগ, অসহযোগ আন্দোলন মূলত নেতিবাচক ; এই নেতিবাচক তত্ত্বে তাঁহার আস্থা নাই। গান্ধীজী উহার জবাবে বলিলেন,

…"In my humble opinion, rejection is as much an ideal as the acceptance of a thing. It is as necaessry to reject untruth as it is to accept truth…The nation's non-co-operation is an invitation to the Government to co-operate with it on its own terms, as is every nation's right and every good government's duty. Non-co-operation is the nation's notice that it is no longer satisfied to be in tutelage.…And if India is ever to attain the swaraj of the poet's dream, she will do so only by non-violent non-co-operation. Let him deliver his message of peace to the world and feel confident that India through her non-co-operation, if she remains true to her pledge, will have exemplified his message. Non-co-operation is intended to give the very meaning to patriotism that the poet is yearning after. An India prostrate at the feet of Europe, can give no hope to humanity. *An India awakened and free has a message of peace and goodwill to a groaning world* (emphasis Author). Non-co-operation is designed to supply her with a platform from which she will preach the message"

[*Mahatma.-Vol. II.* pp. 44-46]

গান্ধীজীর বক্তব্য, তাঁহার অসহযোগ ব্রিটিশের সহিত নহে, ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহিত ; তাঁহার অসহযোগ পাশ্চাত্যের সহিত নহে, পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদের সহিত। রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যের যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতাকে আরো তীব্র ভাষায় সমালোচনা ও নিন্দাবাদ করিয়া আসিতেছেন।

শুধু তাহাই নহে যুদ্ধবিধ্বস্ত পশ্চিমের নিকট কবি শান্তি, প্রেম, মৈত্রী ও আন্তর্জাতিকতার বাণী বহন করিয়া লইয়া গিয়াছেন। গান্ধীজীও কবির এই মহান আদর্শকে সশ্রদ্ধচিত্তে মানিয়া লইলেন কিন্তু তাঁহাকে একথাও স্মরণ করাইয়া দিলেন, পরাধীন ভারতের এই মহান আদর্শকে পাশ্চাত্য গ্রাহ্যও করিবে না। তাই তিনি বলিলেন '*An India awakened and free has a message of peace and goodwill to a groaning world.*" রবীন্দ্রনাথও স্বাধীনতা ও ভারতের জাতীয়-আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবিটিকে বহু পূর্ব হইতেই স্বীকার করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু বিদেশ ভ্রমণের সময় তিনি যেন আন্তর্জাতিকতার আদর্শের উপর আপেক্ষিক বেশী গুরুত্ব আরোপ করিতেছিলেন। পাশ্চাত্যের বিবেকের দরবারে তিনি ভারতের জাতীয় আত্মকর্তৃত্বের দাবিটি সুনিপুণভাবে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন কিন্তু স্বদেশবাসীকে একথার পরিষ্কার নির্দেশ তিনি দিতে পারিলেন না, ভারতের জাতীয় আত্মকর্তৃত্বলাভের জন্য

চূড়ান্ত সংগ্রামই অতি আশু প্রয়োজনীয় ব্যাপার। এই নির্দেশ দিতে পারিলেন না, কেন না জাতীয়তাবাদকে তাঁহার বড়ো ভয়। বিগত মহাযুদ্ধে এই বীভৎস জাতীয়-উন্মাদনার আগুনে সারা ইউরোপ কী নিদারুণভাবে আপনাকে দগ্ধ করিয়াছে, তাহার ধ্বংসাবশেষ তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছেন। অসহযোগ-আন্দোলন ভারতবর্ষের জনমানসে যে তীব্র ইংরেজ-বিদ্বেষ এবং তীব্র স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবোধের উন্মাদনা আনিয়াছে, কবি ভাবিতেছেন উহার পরিণতি কী ও কোথায় এবং কোনদিকে লইয়া চলিতেছে। এই তীব্র স্বাদেশিকতা ও জাতীয় উন্মাদনার আগুনে ভারতবর্ষ কী আপনিই আপনাকে দগ্ধ করিবে না? কবির স্থির বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদের যুগ শেষ হইয়াছে। কোন দেশই তাহার সংকীর্ণ জাতীয়তার আদর্শে আজিকার যুগের প্রধান সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে না। আজিকার যুগ বিশ্বমানবতার যুগ। শান্তিনিকেতনে সেই বিশ্বমানবতা ও আন্তর্জাতিক মিলনের সাধনা চলিতেছে। দেশে ফেরার অনতি-কাল পূর্বেই কবি শান্তিনিকেতনের সর্বাধ্যক্ষ জগদানন্দ রায়কে এই সমস্ত আশংকার কথা জানাইয়া একটি চিঠি লেখেন (৮ই মার্চ, ২৪শে ফাল্গুন ১৩২৭):

…"আমার দেশে ফের্‌বার সময় কাছে এসেছে। একদিকে যেমন খুশি হচ্ছে, তেমনি আর একদিকে ভয় লাগ্‌চে পাছে দেশের লোকের সঙ্গে আমার সুর না-মেলে। Nationalism হচ্ছে একটা ভৌগোলিক অপদেবতা, পৃথিবী সেই ভুতের উপদ্রবে কম্পান্বিত; সেই ভুত ঝাড়্‌বার দিন এসেছে। কিছু দিন থেকে আমি তার আয়োজন কর্‌চি। দেবতার নাম কর্‌লে তবেই অপদেবতা ভাগে। আমাদের শান্তিনিকেতনের দরজায় সেই দেবতার নাম লেখা; আমাদের বিশ্বভারতীতে সেই দেবতার মন্দির গাঁথ্‌চি। দেশের নাম করে এখানে যদি আমরা কোনো বাধা দেবার বেড়া তুলি তাহ'লে আমাদের দেবতার প্রবেশ-পথে বাধা দেওয়া হবে। যে ভারতবর্ষকে বহুকাল সমস্ত পৃথিবী একঘরে করে রেখেছে, সেই ভারতবর্ষে সমস্ত পৃথিবীকে নিমন্ত্রণ কর্‌বার পত্র নিয়ে আমি বেরিয়েছিলুম—পাছে কিছুতে এই নিমন্ত্রণের পথ রোধ করে সেই আমার ভয়।"

তিনি আরও লিখিলেন,

"অন্যায়কে অত্যাচারকে আমি কারো চেয়ে কম ঘৃণা করি একথা মান্‌তে পার্‌বো না,—পাঞ্জাবের ঘোর দুর্দিনের সময়ে সমস্ত দেশে আমি ছাড়া আর-একজনও একটি কথাও বলেনি। আমার শরীরে রক্তের পরিবর্তে বরফের জল প্রবাহিত হচ্ছে, একথাও সত্য নয়। কিন্তু আমার বিশ্বাস দেশের চেয়েও বড় জিনিষ আছে, সেই বড় জিনিষকে পেলেই দেশ বড় হবে। যে মানুষ নিজের বাড়ির সমস্ত দর্‌জা-জান্‌লার পথ বন্ধ করে তুলে দেওয়াল গাঁথা সুরু করে, সেই যে নিজের বাড়িকে ভালোবাসে একথা মিথ্যা।…সেদিন যখন খবরের কাগজে পড়্‌লুম মহাত্মা গান্ধী আমাদের মেয়েদের বলেছেন, তোমরা ইংরেজি পড়া বন্ধ কর, সেইদিন বুঝেছি আমাদের দেশে দেয়াল গাঁথা সুরু হয়েছে, অর্থাৎ নিজের ঘরকে নিজের কারাগার করে তোলাকেই আমরা মুক্তির পথ বলে মনে কর্‌চি—আমরা বিশ্বের সমস্ত আলোককে বহিষ্কৃত করে দিয়ে নিজের ঘরের অন্ধকারকেই

পূজা করতে বসেছি—একথা ভুলচি, যে-সব দুর্দান্ত জাতি পরকে 'আঘাত করে' বড় হতে চায় তারাও যেমন বিধাতার ত্যাজ্য, তেমনি যারা পরকে বর্জন করে' স্বেচ্ছাপূর্বক ক্ষুদ্র হতে চায় তারাও তেমনি বিধাতার ত্যাজ্য। এরপর কোনদিন কথা উঠবে এণ্ড্রুজ পিয়ার্সনকে ত্যাগ করতে হবে, কেন না তারা ইংরেজ। এখানকার এক কলেজের হিন্দু ছাত্রেরা সেই দোহাই দিয়ে পিয়ার্সনকে বক্তৃতায় আহ্বান করতে অসম্মত হয়েছিল। এর মানে হচ্ছে, আমরা একবার যখন 'না' মন্ত্রের সাধনা করতে বসি তখন তার প্রচণ্ডতা মরুবালুকার সীমানা কেবলি প্রসারিত করতে থাকি। আমি 'হ্যাঁ'-মন্ত্রের উপাসক…"

[প্রবাসী-১৩২৮ জ্যৈষ্ঠ ॥ পৃঃ ১৬৯]

উল্লেখযোগ্য, কবির এই চিঠির বক্তব্যের যুক্তি খণ্ডন করিয়া বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় আষাঢ় সংখ্যা প্রবাসী পত্রিকায় (১৩২৮) এক খোলা-চিঠি প্রকাশ করিলেন। সম্পাদকীয় মন্তব্যে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও কবির এই চিঠির দু'একটি অসতর্ক মন্তব্যের মৃদু সমালোচনা করিলেন।

বলা বাহুল্য, এই চিঠিও গান্ধীজীর নজরে আসে। তিনি বুঝিতে পারেন, কবি অসহযোগ আন্দোলনের সঠিক বিস্তারিত সংবাদ পান নাই। তাই গান্ধীজী উহার জবাবে অসহযোগ-আন্দোলনের মূল তাৎপর্যটি ব্যাখ্যা করিয়া এক খোলা চিঠি লিখিলেন, (*Young India*,-June 1, 1921)

…"I have since read his letter to the Manager of Santiniketan. I am sorry to observe that the letter is written in anger and in ignorance of facts. The Poet was naturally incensed to find that certain students in London would not give a hearing to Mr. Pearson, one of the truest Englishmen, and he became equally incensed to learn that I had told our women to stop English studies The reasons for my advice the Poet evidently inferred for himself."…

তিনি বলিলেন, এ-তথ্য ঠিক নহে যে, পিয়র্সন প্রমুখ যথার্থ ইংরেজদের এখানে বর্জন করা হইতেছে। ভারতবাসী এই আন্দোলনে শুধু এণ্ড্রুজদেরই নয় পরন্তু আরো বিভিন্ন দেশের দরদী সমর্থকদের বক্তৃতা শ্রদ্ধা ও ধৈর্য সহকারে শুনিতেছে।

তিনি ইংরেজী ভাষা বর্জনের সপক্ষে যুক্তিতে বলিলেন, যে, কবি হয়ত জানেন না আমাদের দেশে ইংরেজী শিক্ষার পিছনে একটি ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি রহিয়াছে। আমাদের ছেলেরা ইংরেজী শেখে সরকারী চাকুরী পাবার লোভে, আর মেয়েরা শেখে বিবাহের 'পাসপোর্ট'-লাভ' জ্ঞান করে। এমন বহু পরিবার আছে যাহারা ইংরেজী মাতৃভাষা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। গান্ধীজীর কাছে ইহা নিদারুণভাবেই অসহ্য। তাই তিনি বলিলেন,

…"All these are for me signs of our slavery and degradation. It is unbearable to me that the vernaculars should be crushed and starved as they have been."…

"I want the cultures of all the lands to be blown about my house as freely as possible. But I refuse to be blown off my feet by any. I refuse to live in other people's houses as an interloper, a begger or a slave. I refuse to put the unnecessary strain of learning English upon my sisters for the sake of false pride or questionable social advantage. I would have our young men and young women with literary tastes to learn as much of English and other world-languages as they like, and then expect them to give the benefits of their learning to India and to the world, like a Bose, a Roy, or the Poet himself. But I would not have a single Indian to forget, neglect or be ashamed of his mother-tongue, or to feel that he or she cannot think or express the best thoughts in his or her own vernaculars ..."

[*Tagore and Gandhi Argue*.-pp. 33-35]

অবশ্য এই বাদানুবাদ সমস্তই পরোক্ষে চলিতেছে, সম্ভবত এণ্ড্রুজের মাধ্যমে। কিন্তু গান্ধীজীর এই বক্তব্যের সহিত রবীন্দ্রনাথের চিন্তার পার্থক্য কোথায়? স্মরণ রাখা দরকার, অতি অল্প বয়স হইতেই রবীন্দ্রনাথ জাতীয় নেতৃবর্গের ইংরেজী-পোষাক ও ইংরেজী ভাষাপ্রীতির বিরুদ্ধে অত্যন্ত তীব্র ভাষায় অবিরাম সংগ্রাম করিয়া আসিতেছেন। তখন হইতেই মাতৃভাষায় ব্যাপক জনশিক্ষার প্রসারের কর্ম-সূচী গ্রহণের জন্য নেতৃবৃন্দের নিকট পুনঃ পুনঃ আবেদন জানাইয়া আসিতেছেন। আর মাতৃভাষায় শুধু ব্যাপক জনশিক্ষার কথাই নহে,—মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চ-শিক্ষার কথাও তিনি বলিয়া আসিতেছেন। এসব কথা পূর্বখণ্ডেই আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু কেন রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের এই দিকটি সমর্থন করিতে পারিতেছেন না, তাহার কারণটি বুঝিতে কষ্ট হয় না। গান্ধীজীর এই কর্ম-সূচীতে ছাত্রদের সরকারী স্কুল, কলেজ বর্জন এবং ইংরেজী বর্জন করিতে বলা হয়; কিন্তু কোথাও গান্ধীজী ছাত্রদের পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শ্রেষ্ঠ সবকিছুকে কঠোর নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত আয়ত্ত করিয়া লইবার পরিষ্কার নির্দেশও দিলেন না। রবীন্দ্রনাথের ভয় এইখানেই।

বস্তুত এই সময় কবির তীব্র মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলিয়াছে। শুধু ভাবাদর্শগত প্রশ্নেই নয়,—কবি-মানসের প্রকৃতিগত বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী সত্তার তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সংঘাত চলিতেছে। এই মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বে এক সময় অস্থির হইয়া এণ্ড্রুজকে তাঁহার মানসিক যন্ত্রণার কথা বিস্তারিত খুলিয়া লিখিলেন, পর পর তিনখানি চিঠিতে। আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে ফিরিবার পথে "S. S. RHYNDAM" জাহাজে চিঠিগুলি লেখা (১৯-২৪শে মার্চ—১৯২১)।

কবি স্বয়ং নিজের সম্পর্কে এতো কঠোর নির্দয় বিশ্লেষণ ও সমালোচনা কখনও করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। এই দিক থেকে কবির এই মহান স্বীকারোক্তি

ও আত্মসমালোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করিয়া চিঠিগুলির অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"I realize it all the more strongly when some problem, political or otherwise, becomes clamorous and insistent, trying to exact its answer from me. I rouse myself, strain my mind, raise my voice for prophetic utterances, and try in every way to be worthy of the occasion, but in my heart of hearts I feel exceedingly small and, to my utter dismay, discover I am not a leader, not a teacher, and farthest of all away from being a prophet.

"The fact becomes fully evident to me, that I had forgotten to grow. It comes of an incorrigible absentmindedness. My mind has ever wandered away from those things that mature one into wisdom and old age. I have neglected my lessons. And this utter want of training makes me such a wretchedly bad reader of journals dealing with the practical questions of the day! But I am afraid the present time is a tremendously difficult one in India for the child, the poet. It is no use protesting that he is lacking in understanding —that he is congenitally incapable of paying attention to anything urgent and serious.···

"And yet my heart is aching and longing to meet, with proper ceremony, the first day of the rainy season, or fill every pore of my mind with the smell of mango blossoms. Is that allowable at the present moment?"···

"But what is the use of complaining? The poets are too primitive for this age. If they had not ignominiously been discarded by the law of evolution, they would long ago have grown into their career as politicians. But the mischief is— they have been left behind in a world which has stopped growing, where things are still important which have no use or market value. The more the call for action grows loud from across the sea, the more I feel conscious of something in me that cries: 'I am of no use—leave me alone to my utter inutility.'

[*Letters to a Friend*-pp-139-40]

তিনি আরো বলিলেন, "কিন্তু আমি জানি, ভারতবর্ষে যখন গিয়ে পেঁছিব

তখন এই কবি পরাজিত হবে আর তখন আমি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে খবরের কাগজ পড়ব তার প্রত্যেকটি 'প্যারা' বা অনুচ্ছেদ পর্যন্ত।"

পরের চিঠিতে কবি আরো সুন্দরভাবে আত্মবিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলেন যে, তাঁহার মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধধর্মী অনেকগুলি মানুষ রহিয়াছে;—একই সঙ্গে তাহারা পরস্পরের মধ্যে লড়াই করিতেছে, কবির উপর প্রভাব বা আধিপত্য বিস্তার করিবার জন্য;—এদের এই লড়াইয়ের মধ্যে বেচারা কবি মানুষটা আজ যেন ক্লান্ত, শ্রান্ত ও হয়রাণ হইয়া উঠিয়াছে। তিনি লিখিতেছেন,

"Sometimes it amuses me to see *the struggle for supremacy that is going on between the different presons within me.* In the present condition of India, when the call is sure to come to me to take some part, in some manner or other, in some political affairs, the Poet at once feels nervous, thinking that his claims are likely to be ignored, simply because he is the most useless member in the confederacy of my presonality. He fully anticipates that argument against him, and takes special pains to glorify his deficiencey···He has proudly begun to assert: 'I belong to the great brotherhood of the supreme useless. I am the cup-bearer of the Gods.—My purpose is to reveal Purposelessness to the children of the Immortal. I have nothing to do with committee meetings or laying of foundation-stones for structures that stand against the passage of time and are sure to be trampled to dust. I am to ply the ferry-boat that keeps open the traffic between this shore and the shore of Paradise—this is our King's mail-boat···

"I say to him: 'Yes, I fully agree with you; but, at the same time, take my warning, that your mail-boat may have to be commandeered for other urgent purposes, wholly unconnected with the Celestial Postal Department'. He cheeks grow pale; his eyes become bemisted;···and he says to me. 'Do I deserve to be treated like this? Have you lost all your love for me, that you can talk of putting me under martial law?···'

"I sit dumb,and muse and sigh,when sheaves of news-paper-cuttings are poured upon my table, and a leer is spread upon the face of the Practical man; he winks at the Patriotic man sitting solemnly by his side; and the man who is Good thinks it his painful duty to oppose the Poet, whom he is ready to treat with some indulgence within proper limits."

কিন্তু তবুও তাঁহার মধ্যেকার কবি-মানুষটির জন্যই যেন তাঁহার টান ও দরদ এবং সহানুভূতি বেশী।

…"I have my deepest sentiment of tenderness for this Poet, possibly because he is so utterly good-for-nothing and always the first to be ignored in the time of emergency.…

"The rascal knows well how to flatter, and generally wins his case with me—especially when others are too certain of the result of their appeal ; and I jump up from my judgement-seat and, holding the Poet by the hand, dance a jig and sing : 'I shall join you, Comrade, and be drunk and gloriously useless.' Ah, my evil luck ! I know why the chairmen or meetings hate me, newspaper editors revile me, and the virile call me effeminate !… [*Ibid*-pp 142-43]

আবার ঠিক ইহার পরের চিঠিতেই এক জায়গায় লিখিতেছেন,

…"I have a great deal of the patriot and politician in me, and therefore I am frightened of them ; and I have an inner struggle against submitting myself to their sway.

…"When India suffers from injustice, it is right that we should stand against it; and the responsibility is ours to right the wrong, not as Indians but as human beings….." [*Ibid*-pp. 143]

কিন্তু উহাতেও দ্বিধাহীন চিত্তে তিনি সায় দিতে পারিতেছেন না পাছে স্বাদেশিক উন্মাদনা আমাদের চিত্তবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে।

আবার মাস দেড়েক পরে লিখিতেছেন,

…"Poltics are so wholly against my nature ; and yet, belonging to an unfortunate country, born to an abnormal situation, we find it so difficult to avoid their outbursts.…"

[*Ibid*-p. 161]

ইহা হইতেই কবির মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের চিত্রটি অত্যন্ত পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, আর এই দ্বন্দ্ব-সংঘাত কবির জীবনভোর।

অথচ অন্যায় ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাঁহার লেখনী অবিরাম ছুটিয়াছে। কিন্তু উহা এই মহান বিবেকী কবির ব্যক্তিগত প্রতিবাদ-আন্দোলনেই যেন সীমাবদ্ধ ছিল। তবুও তাঁহার সদা-সতর্ক দৃষ্টিতে একটি অন্যায়ও যেন এড়াইয়া যাইতে পারে নাই।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার। ভার্সাই-সন্ধির অনতিকাল পরেই মিশর, সিরিয়া ও ইরাক প্রভৃতি আরব রাষ্ট্রগুলিতে সাম্রাজ্যবাদী নাগপাশ ছিন্ন করিবার জন্য এক তীব্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনকে দমন করিবার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা তাহাদের

সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে থাকে। আর ইংরেজরা এই উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষ হইতে সৈন্য ও শ্রমিক সংগ্রহ করিতে থাকে। স্মরণ রাখা দরকার, কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে উহার প্রতিবাদে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া বলা হয়, "refusal on the part of the military, clerical and labouring classes to offer themselves as recruits for service in Mesopotamia."

রবীন্দ্রনাথও আমেরিকা হইতে উহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া একটি বিবৃতি পাঠাইলেন। তিনি লিখিলেন,

"The use of mercenary troops for utilitarian purposes is degrading to all parties concerned, and it grieves my heart as an Indian to see that members of the subject race, which has been deprived of its right to carry arms for its own self-protection, *are being turned into fighting automatons for the imperialistic aggrandisement of a nation* whose possessions are already too burdensome for its moral integrity and physical strength."

[*Tagore and Gandhi Argue*-p. 20]

এখানে একটি জিনিস লক্ষ্য করিবার মত। কংগ্রেসের সিদ্ধান্তে শুধু মেসোপোটিমিয়া বা ইরাকের ক্ষেত্রেই ইংরেজের সৈন্য সংগ্রহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান হয়। অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ মেসোপোটিমিয়া বা কোন বিশেষ দেশের কথা উল্লেখ না-করিয়া সামগ্রিকভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যপ্রসারনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিলেন। 'সেভার্স-সন্ধির' ফলে প্যালেস্টাইন ও মেসোপোটিমিয়াকে অটোমান-সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, ব্রিটিশের 'ম্যাণ্ডেট রাজ্যে' পরিণত করা হয়। তবে কি শুধু ভারতীয় মুসলিম সমাজের খিলাফতের ধর্মীয় আবেগের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই কংগ্রেসে ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়? সে যাহাই হউক, আন্তর্জাতিকতাবাদের উপর ভিত্তি করিয়া জাতীয় কংগ্রেস কলিকাতা বা নাগপুর অধিবেশনে কোন সুষ্ঠু ও বলিষ্ঠ পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ করিতে পারে নাই। এই আলোচনায় আমরা পরে আসিব।

এই প্রসঙ্গে আর একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা বলা দরকার। নাগপুর কংগ্রেসের পর হইতেই গান্ধীজী অস্পৃশ্যতা-নিরোধ আন্দোলনে তৎপর হইয়া উঠিলেন। স্বদেশী-আন্দোলনের সময় হইতেই রবীন্দ্রনাথ সমাজের এই অন্ত্যজদের প্রতি বর্ণহিন্দুদের পীড়ন-নির্যাতনের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করিয়া নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। ১৯১৭ সালে কলিকাতা-কংগ্রেসে (সভানেত্রী-বেসান্ত) অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। উহা বাস্তবে কার্যকর করার জন্য কংগ্রেস হইতে কোন আন্দোলন করা হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ উহা লক্ষ্য করিয়া পুনরায় 'বাতায়নিকের পত্রে' এই সমস্যাটির প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া অত্যন্ত তীব্র ভাষায় নেতৃবৃন্দকে তিরস্কার করিলেন। পূর্বেই তাহা আলোচনা করিয়াছি। গান্ধীজীও বিবেকের দিক হইতে কোনদিন অস্পৃশ্যতা প্রথাকে

মানিয়া লইতে পারেন নাই বটে, তবে উহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করার কথাও চিন্তা করিতে পারেন নাই। বিলাত যাত্রার পূর্বে গুজরাট ভ্রমণের সময় রবীন্দ্রনাথ এই সমস্যাটির প্রতি পুনরায় তিলক ও গান্ধীজীর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিয়াছিলেন (দ্রঃ—রবীন্দ্র-জীবনী—৩য় খণ্ড ॥ পৃঃ ৩৩)। ১৯২০ সালে কলিকাতার বিশেষ অধিবেশনেও এতবড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও কাহারও দৃষ্টি পড়িল না দেখিয়া এণ্ড্রুজ উহার কয়েকদিন পরই গান্ধীজীকে এক পত্র লিখিলেন (৯ই সেপ্টেম্বর)। এণ্ড্রুজ ঐ পত্রে আরো লিখিলেন,

"We *must* honestly and fairly and squarely face the non-Brahman movement and all that it implies···This kind of thing appears to me every whit as bad as the religion of the 'white-race' which is being proclaimed in Africa today. Congress, so far as I am aware, is still in the hands of the high castes. It is not possible to bring this isolationism to an end ?"

[*C. F. Andrews*-p. 156]

সেদিন কংগ্রেস নেতৃত্ব সম্পর্কে এতো রূঢ় সত্য ভাষণ আর কেহ করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ।

অবশ্য এই পত্রের ফলেই কিনা জানিনা, নাগপুর কংগ্রেসে ঐ ত্রুটি সংশোধন করিয়া হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের দ্বারা হিন্দুসমাজের সকল বর্ণ ও শ্রেণীর এক সম্মিলিত বা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

রবীন্দ্রনাথ এণ্ড্রুজকে পূর্বেই এই সমস্যাটির প্রতি গান্ধীজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য লিখিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীর উদ্দেশে নিউইয়র্ক হইতে *The Spirit of Freedom*' নামে এক দীর্ঘ খোলা চিঠি লেখেন। 'বাতায়নিকের পত্রে' (৫ম পত্র) তিনি যে কথা লিখিয়াছিলেন তাহাই আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়া লিখিলেন,

"My experience in the West,···has impressed me deeply with the truth that real freedom is of the mind and spirit ; it can never come to us from outside. He only has freedom who ideally loves freedom himself and is glad to extend it to others. He who cares to have slaves must chain himself to them ; he who builds walls to create exclusion for others builds walls across his own freedom ; he who distrusts freedom in others loses his moral right to it. Sooner or later he is lured into the meshes of physical and moral servility." [*Creative Unity*-p. 136]

যাহাই হউক, নাগপুরে অধিবেশনের পর সক্রিয়ভাবে গান্ধীজী, অস্পৃশ্যতা-নিরোধ আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। ১৯২১ সালে এপ্রিল মাসে নির্যাতিত শ্রেণীগুলির এক সম্মেলনে তিনি এই আন্দোলনের বিস্তারিত তাৎপর্য ও কর্মসূচী মেলিয়া ধরিলেন (দ্রঃ *Mahatma-Vol. 11*-p. 35)

স্বাধীনতা সংগ্রামে অসহযোগ-আন্দোলনের স্থান

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে অসহযোগ-আন্দোলন (১৯২০-২১) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সারা ভারত জুড়িয়া একই কার্যসূচী ও একটিমাত্র কেন্দ্রীভূত নেতৃত্বের অধীনে এতখানি ব্যাপক আন্দোলন আমাদের দেশে ইতিপূর্বে আর দেখা যায় নাই।

কিন্তু ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে অসহযোগ আন্দোলনের বিশেষ স্থানটি কোথায়? এবং উহার বিশেষ তাৎপর্যটিই বা কী?

সামগ্রিকভাবে বলিতে গেলে, অসহযোগ-আন্দোলন মূলত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তিআন্দোলন। কিন্তু ইহাতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ভাবাদর্শ বা দর্শন কিংবা রাজনীতির সেই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তেমন কিছু ছিল না (যদিও ব্যাপক অর্থে উহা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবেরই অংশমাত্র)।

কংগ্রেসের কলিকাতা বা নাগপুর অধিবেশনের সিদ্ধান্তের মধ্যে কোন বিজ্ঞানসম্মত রাজনীতি খুঁজিতে যাওয়া বৃথা। এণ্ড্রুজ কলিকাতা অধিবেশনের রাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গি ও আলোচনার ধারা লক্ষ্য করিয়া অধিবেশনের অন্তে এক চিঠিতে গান্ধীজীকে যে সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা বিবেচনা করিবার জন্য অনুরোধ জানান তাহা খুবই প্রণিধানযোগ্য। এণ্ড্রুজ লিখিলেন (৯ই সেপ্টেম্বর ১৯২০),

"How far can we accept the Bolshevik idea of a struggle against *all* forms of capitalism? Are *we* out and out against capitalism in India? Or are we only out and out against imperialism? Personally I am coming more and more to see that the two are one and the same thing—that capitalism is the alternative driving force of all this imperialist aggression…"

[*C. F. Andrews*-p. 156]

চিঠিতে একথা লিখিলেও এণ্ড্রুজ ঐ তত্ত্বের সঠিক তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। কিন্তু তাঁহার ইউরোপীয় প্রগতিশীল মানসিকতায় 'বলশেভিকবাদ' কতকগুলি গভীর প্রশ্নে আলোড়ন তুলে।

কিন্তু গান্ধীজীর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতায় বলশেভিক বিপ্লব বা ইউরোপের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কোন তাৎপর্য বা সংবেদন থাকিতে পারে না। শুধু গান্ধীজীই নহেন, ভারতের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর এবং জাতীয় রাজনৈতিক চেতনার মান অত্যন্ত নিম্নস্তরের ছিল।

একদা বাংলার রেনেসাঁসের সাধকরা ফরাসী বিপ্লবের পতাকাতলে বসিয়া যে ইউরোপীয় যুক্তিবাদের ও গণতান্ত্রিক আদর্শের শিক্ষা ও পাঠ গ্রহণ করিতে শুরু করেন, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ক্রমশই তাহা ক্ষীয়মাণ ও ম্রিয়মাণ হইয়া

আসিতে থাকে। তাহার পর হইতেই আমাদের জাতীয় আন্দোলন ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনবাদের আবরণে ক্রমশই তীব্রতা পাইতে থাকে।

১৯২০ সালের অসহযোগ আন্দোলন একই সাথে এই তীব্র ধর্মীয় ও জাতীয় উম্মাদনার উপর ভর করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে।

একথা খুবই সত্য, একদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের তীব্রতা অপরদিকে দেশের তৎকালীন সমাজ-অর্থনীতিক বিকাশের কৃশতা আমাদের জাতীয় চেতনার সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশের পথে প্রধান অন্তরায় স্বরূপ হইয়াছে। আর যে কারণে প্রায় প্রতিটি পরাধীন ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে উহা তীব্র অন্ধ সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতায় পর্যবসিত হইয়াছে। তাই অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলিতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে দর্শন ও রাজনীতিতে যে বলিষ্ঠ চিন্তাগত বিপ্লব দেখা গিয়াছে, অসহযোগ আন্দোলনে ভারতবর্ষে তাহার প্রায় কিছুই দেখা গেল না। রাজনীতিতে অহিংস নীতির পরীক্ষা,—অবশ্যই পৃথিবীর রাজনীতিক ইতিহাসে অভিনব বটে, তবে উহা মূলত সংগ্রামের নীতি-কৌশলগত বিষয়ে, উহাতে বিজ্ঞানসম্মত রাজনীতির কিছুই প্রায় ছিল না। গান্ধীজীর কাছে 'স্বরাজ' পূর্ণস্বরাজ নহে, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবও নহে ;—'রামরাজ্যের' এক অস্পষ্ট অদ্ভুত রহস্যময় পরিকল্পনা মাত্র। ইহাতে ইউরোপীয় যুক্তিবাদ ও চিন্তামত্তার সে গভীরতা বিন্দুমাত্রও ছিল না। পরন্তু দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, পোলিটিকেল ইকনমি, রাজনীতির তত্ত্ব, তথ্য ও যুক্তিবাদকে এই আন্দোলন দূরে হইতেই অতি সযত্নে পরিহার করিয়া চলিয়াছে। গীতাপাঠ, প্রার্থনা, ব্রহ্মচর্য ও চরকা কাটা—ইহাই ছিল দেশ-সেবকদের প্রতি নৈতিক নির্দেশ। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাজনীতিক ও আর্থনীতিক প্রয়োজনের তাগিদে ইউরোপে দর্শন-বিপ্লব হইয়াছে আর বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ভারতের রাজনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদে দর্শন-বিমুখতা ও শাস্ত্রবাক্যের নয়া ভাষ্য রচনা শুরু হইল। ধর্মীয় ও শাস্ত্রীয় নীতিকথা, আপ্তবাক্য ও মধ্যযুগীয় সাধুসন্তদের 'সহজিয়া মানবতাবাদ'কে যেন রাজনীতিতে ঢুকাইবার প্রয়াস চলিয়াছে, অর্থাৎ জাতীয় রাজনীতিক ও সামাজিক সমস্যাবলীতে এক অদ্ভুত সরলীকরণ ও সহজিয়াবাদ প্রবর্তনের প্রয়াস দেখা দিল। আর আমাদের চেতনার সুদূরতম প্রত্যন্ত প্রদেশেও যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর জ্বলন্ত-সমস্যাবলীর জন্য যেন এতটুকুও স্থান ছিল না। আর রাজনীতিকে এই বিজ্ঞানসম্মতভাবে না-দেখিবার ফলেই আমাদের জাতীয়তাবাদ ও স্বাদেশিকতা এক তীব্র ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষবীজ আপনার মধ্যে উপ্ত করিল, উত্তরকালে যাহার পরিণতি হইল বীভৎস-বর্বর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায়।

জওহরলাল তাঁহার আত্মজীবনীতে এইকালের রাজনীতির একটি সুন্দর বিবরণী দিয়াছেন,

"১৯২১ সালে খিলাফত আন্দোলনকে প্রাধান্য দেওয়ার ফলে বহু সংখ্যক মৌলবী ও মুসলমান ধর্মপ্রচারক রাজনৈতিক সংঘর্ষে যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহারা আন্দোলনের উপর ধর্মের রং চড়াইতেন যাহাতে মুসলমান জনতা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইত। অনেক পাশ্চাত্যভাবাপন্ন মুসলমান, যাঁহারা ধর্ম লইয়া

মাথা ঘামাইতেন না তাঁহারাও দাড়ি রাখিতে আরম্ভ করিলেন এবং ধর্মাচরণে নৈষ্ঠিক হইয়া উঠিলেন। পাশ্চাত্য ভাবের ক্রমপ্রসার ও নূতন নূতন চিন্তার ফলে যে মৌলবীদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি স্বাভাবিক রূপে কমিয়া আসিতেছিল তাহারা পুনরায় প্রবল হইয়া মুসলমান সমাজের উপর আধিপত্য বিস্তার করিল। আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের মনের ধর্মপ্রবণতা হইল ইহার সহায়ক, গান্ধীজীও ঐরূপ এবং তিনিও মৌলবী ও মৌলানাদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল।

"বলা বাহুল্য, গান্ধীজী সর্বদাই আন্দোলনের ধর্ম ও আধ্যাত্মিক ভঙ্গির উপর জোর দিতেন। তাঁহার অবশ্য ধর্মের গোঁড়ামি ছিল না। তথাপি সমগ্র আন্দোলনের মধ্যে এক ধর্মের জাগরণ অনুভূত হইল এবং জনসাধারণের মধ্যেও এই আন্দোলন ধর্মজীবনের আকাঙ্ক্ষা জাগাইল। অধিকাংশ কংগ্রেসকর্মী স্বাভাবিকরূপেই গান্ধীজীর জীবনাদর্শে নিজেদের জীবন গড়িতে লাগিলেন, এমনকি তাঁহার ভাষা পর্যন্ত নকল করিতেন।···

"কি হিন্দু কি মুসলমান—আমাদের রাজনীতির মধ্যে এই ধর্মভাবের আধিক্য দেখিয়া আমি বিব্রত হইলাম। আমার ইহা ভাল লাগিত না। অধিকাংশ মৌলবী, মৌলানা, স্বামীজীরা জনসভায় যে ভাবে বক্তৃতা করিতেন তাহা আমার নিকট ক্লেশকর মনে হইত। তাঁহারা ইতিহাস, সমাজ-নীতি, অর্থনীতির সহিত ধর্মের ওড়ন পাড়ন দিয়া সরলভাবে চিন্তা করিবার পথ রুদ্ধ করিতেন। আমার নিকট ইহা অন্যায় বলিয়া মনে হইত। গান্ধীজীর কতকগুলি উক্তিও আমার কাণে বাজিত। তিনি প্রথমই রামরাজ ও সত্যযুগ ফিরাইয়া আনিবার কথা বলিতেন, কিন্তু ইহা নিবারণ করিবার শক্তি আমার ছিল না।···

··"ভাগবত গীতার দার্শনিক তত্ত্ব আমি বুঝিতামও না কিম্বা উহার মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টাও করিতাম না। প্রতিদিন সন্ধ্যায় গান্ধীজীর আশ্রমিক প্রার্থনায় যোগ দিয়া গীতার শ্লোক পাঠ করিতাম। যাহার মধ্যে মানবজীবনের আদর্শের ইঙ্গিত ছিল—ধীর, বিগতস্পৃহ ও অনুদ্বিগ্ন হইয়া কর্তব্য কর্ম কর, ফলের জন্য লুব্ধ হইও না—আমার অধীর ও অশান্ত চিত্ত এই আদর্শে আকৃষ্ট হইত।" [আত্মচরিত-(সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার অনূদিত) ॥ পৃঃ ৭৭-৭৯]

জওহরলাল এই কালের রাজনীতিক ধ্যান-ধারণার আরও বিশ্লেষণ করিয়া বলিলেন,

"১৯২১ আমাদের নিকট এক স্মরণীয় বৎসর। জাতীয়তা, রাজনীতি, ধর্ম, অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদ এবং ধর্মান্ধ গোঁড়ামির এক আশ্চর্য মিলন মিশ্রণ। এই পটভূমিকার উপর পল্লীতে কৃষকচাঞ্চল্য এবং বৃহৎ নগরীগুলিতে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন মাথা তুলিতেছিল।···

"আমরা কর্মের আনন্দে মাতিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম কিন্তু আমাদের লক্ষ্য সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। এখন আশ্চর্য হইয়া ভাবি, তখন আমাদের আন্দোলনের কি তত্ত্বের দিক, কি দার্শনিক দিক কিম্বা আমাদের নিশ্চিত লক্ষ্য কি হওয়া উচিত, সে বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা কেন করি নাই। অবশ্য আমরা সকলে মিলিয়া উচ্চকণ্ঠে স্বরাজের কথা বলিতাম কিন্তু প্রত্যেকে

নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী উহার ব্যাখ্যা করিতাম।…কিন্তু আমাদের অধিকাংশ নেতা স্বরাজ বলিতে স্বাধীনতা অপেক্ষা অনেক কম বুঝিতেন। গান্ধীজী নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে বিষয়টিকে অস্পষ্ট রাখিতেন এবং এ বিষয়ে কোনও সুস্পষ্ট চিন্তাকে প্রশ্রয় দিতেন না।…গান্ধীজী কখনও কোন সমস্যাকে যুক্তিবাদের দিক হইতে দেখিতেন না, তিনি চরিত্র ও ধর্মের উপর ঝোঁক দিতেন।

…"আমার বিশ্বাস, আমাদের মধ্যে অতি অল্প লোকই যন্ত্র ও আধুনিক সভ্যতা সম্বন্ধে গান্ধীজীর পুরাতন মতবাদ মানিয়া লইয়াছিল।…তথাপি মহাত্মা গান্ধীর মতবাদে অনেকেই প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন এবং যন্ত্র ও তাহার পরিণাম সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করিতেন। একদল চাহিলেন ভবিষ্যতের দিকে, আর একদল অতীতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।…" [আত্মচরিত-পৃঃ ৭৯-৮২]

জওহরলাল তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সুন্দর ভঙ্গিতে এই যুগের রাজনীতিক চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্যগুলি তুলিয়া ধরিয়াছেন।

অসহযোগ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে গান্ধীজী ঘোষণা করিলেন, এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হইলে এক বৎসরের মধ্যেই স্বরাজ আসিবে। কিন্তু গান্ধীজী কী সত্যসত্যই সংগ্রামকে চূড়ান্ত জয়যুক্ত *final decisive struggle*) করিবার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন ?

কিন্তু অসহযোগ আন্দোলন প্রকৃত অর্থে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর আন্দোলন। কলিকাতা অধিবেশনের সিদ্ধান্তের ভাষায় যাহাতে ব্যাখ্যা করা হয় "by the classes who have hitherto moulded and represented public opinion" অর্থাৎ কিনা সেই সব শ্রেণী যাঁহারা দরবার, খেতাব, পদক ইত্যাদি বর্জন করিবেন ; যাঁহারা কাউন্সিল ও লোকাল বোর্ডগুলি বর্জন করিবেন ; যাঁহারা আদালতে ব্যারিষ্টারী, ওকালতি, মোক্তারি ছাড়িয়া দিবেন ; সরকারী স্কুল-কলেজ হইতে যাঁহারা সন্তানদের সরাইয়া লইবেন এবং বিদেশী পণ্য বয়কট করিয়া স্বদেশী পণ্য ব্যবহার করিবেন। কিন্তু এই শক্তি কী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে চূড়ান্তভাবে পযুর্দস্ত করিয়া স্বরাজ আদায় করিতে বাধ্য করিতে পারে ? মদোদ্ধত ইংরেজ গভর্ণমেণ্টকে অচল করিয়া দিতে শুধু বুদ্ধিজীবী ও কেরানীকুলের শক্তিই যথেষ্ট নহে, ভারতের গ্রামদেশের বিপুল কৃষক জনসাধারণ ও সহর-বন্দর-খনি-বাগিচার শ্রমিকেরা সেই শক্তি, যাহারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহিত সত্য সত্যই মোকাবিলা করিতে পারিত। গান্ধীজী তখনও পর্যন্ত এই শক্তিকে যথার্থভাবে কাজে লাগাইতে চাহিলেন না। অথচ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই সময় কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন ক্রমশই ব্যাপাক আকার ধারণ করিতে থাকে। নাগপুর-অধিবেশনে শ্রমিকদের ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনে সংগঠিত করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বটে, কিন্তু গান্ধীজী এই শ্রমিক শক্তিকে অসহযোগ-আন্দোলনে বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নিয়োজিত ও পরিচালিত করার বিরুদ্ধে ছিলেন। গান্ধীজী বলিলেন, (*Young India-16 Feb. 1921*)

"Strikes are the order of the day. They are a symptom of the existing unrest....(Labour leaders) consider that

strikes may be engineered for political purposes. In my opinion it *will be a most serious mistake to make use of labour strikes for such a purpose*"

অর্থাৎ আন্দোলনে এই বিশাল কৃষক ও শ্রমিক জনশক্তির কোনই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রহিল না; আর এইখানেই অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ। অথচ এই সময়ই ভারতের রাজনীতিক-রঙ্গমঞ্চে বিরাট এক সংঘবদ্ধ শক্তি হিসাবে শ্রমিক শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। ১৯২১ সালের প্রথম ভাগেই আসাম চা-বাগিচা ও 'আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে'তে বিরাট ঐতিহাসিক ধর্মঘট শুরু হয়। সরকারী হিসাব মতে ১৯২১ সালে প্রায় ৪০০ ধর্মঘটে প্রায় ৫,০০০,০০ শ্রমিক অংশ গ্রহণ করেন। ধর্মঘটীরা 'গান্ধীজী কি জয়,' 'বন্দে-মাতরম্' ধ্বনি সহকারে মিছিল করিয়া রাস্তায় বাহির হয়। তাছাড়া যুক্তপ্রদেশে ব্যাপক কৃষক অভ্যুত্থান হয় এবং স্বয়ং জওহরলাল উহার নেতৃত্ব দেন।

যাহাই হউক, এ'সব সত্ত্বেও অসহযোগ আন্দোলন ভারতের জনমানসে এক তীব্র স্বদেশ-প্রীতি জাগরিত করিয়া তাহাদের সংগ্রামমুখী করিয়াছে। 'অত্যাচার যত কঠিনই হউক, মানিয়া লইব না,' প্রতিবাদ করিবার জাতির এই কঠিন নৈতিকশক্তি, সাহস, আত্মবিশ্বাস ও মনোবল বহুল পরিমাণে গান্ধীজী আনিয়া দিয়াছেন অবশ্য এই ব্যাপারে সন্ত্রাসবাদীদের অবদান খুবই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সীমাবদ্ধ আকারে হইলেও গান্ধীজীই সাধারণ মানুষের জন্য সংগ্রামের বাণী লইয়া উপস্থিত হইলেন।

অবশ্য অসহযোগ-আন্দোলনের অহিংস সংগ্রামনীতি এমনই যাহা বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর চারিত্রিক ও মানসিক প্রকৃতির খুবই উপযোগী ছিল। যাহার জন্য মতিলাল নেহরু, লাজপৎ রায়, চিত্তরঞ্জন প্রমুখ জাতীয়তাবাদীরাও—যাঁহারা কাউন্সিল গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন—তাঁহারাও শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলনকে সমর্থন করিলেন এই ভাবিয়া যে, ইহাতে উদ্ধত ইংরেজকে আরো কিছুটা চাপ দেওয়া যাইবে। এমন কি সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবপন্থীরাও অনেকে উল্লসিত হইয়া আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিলেন এই ভাবিয়া যে, সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত তাঁহাদের অনুকূলে আসিবে। অবশ্য বহু বিভ্রান্ত সন্ত্রাসবাদীও এই সময় গান্ধীজীর জীবনাদর্শ গ্রহণ করেন)। একমাত্র গোঁড়া মডারেটরা ছাড়া প্রায় সকল দল ও গোষ্ঠী এই অন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন।

কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, চিন্তামণি, লর্ড সিংহ প্রমুখ গোঁড়া মডারেট-পন্থীরা এই আন্দোলনে সমর্থন করিলেন না। তাঁহাদের অনেকেই কাউন্সিল নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন। কেউ কেউ মন্ত্রিত্বও পান এবং লর্ড সিংহ উড়িষ্যা ও বিহারের ছোটলাট নিযুক্ত হন। বস্তুত এই সময়ই মডারেটরা কংগ্রেসের সহিত সকল সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া চলিয়া যান। এইভাবে দীর্ঘকালব্যাপী কংগ্রেসের মডারেট নেতৃত্বের এইখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে।

কিন্তু এই আন্দোলনে গান্ধীজীর অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব হিন্দু-মুসলিম-ঐক্য-স্থাপন (যদিও তাহা খুবই সাময়িক ঐক্য)। গান্ধীজী একটি স্থির প্রত্যয়

ও সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, ভারতের বিরাট মুসলিম সম্প্রদায়কে যতক্ষণ পর্যন্ত-না স্বাধীনতা সংগ্রামের 'সামিল' করা যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত ইংরেজ-গবর্ণমেণ্টকে কিছুতেই পর্যুদস্ত করা যাইবে না। এবং এই কারণেই খিলাফত আন্দোলনকে তিনি সমর্থন করিয়াছিলেন। গান্ধীজী মানুষের ধর্মীয় আবেগ ও বিশ্বাসকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন, সে-কারণেও বটে, কিন্তু বাস্তব প্রয়োজনে নীতি-কৌশলের দিক হইতে তিনি খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন করিতেছিলেন এই ভাবিয়া যে, এই সুবর্ণ সুযোগে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য স্থাপিত হইবে। গান্ধীজী তাই বিশেষ জোর দিয়া বলিলেন,

"...We have both now an opportunity of a lifetime. The Khilafat question will not recur for another hundred years. If the Hindus wish to cultivate eternal friendship with the Musalmans, they must perish with them in the attempt to vindicate the honour of Islam" [*Mahatma.-Vol. II*-p 44.]

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা দরকার। তিলক প্রমুখ জাতীয়তাবাদী নেতারাও প্রথমদিকে খিলাফতের দাবী সমর্থন করেন। কিন্তু তিলক এক স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ হইতে খিলাফতের দাবি সমর্থন করিতেছিলেন। তিনি তাঁহার রাজনৈতিক ফতোয়ায় (Political Manifesto) ঘোষণা করেন,

..."It believes in religious toleration, the sacredness of one's religion to oneself and the right and duty of the state to protect it against aggression This party supports the claim of the Muslims for the solution of the Khilafat question according to Muslim dogmas and beliefs and the tenets of the Koran"

অবশ্য হিন্দুদের খিলাফত আন্দোলন সমর্থন বলিতে তিলক অন্য কথা বলিতেন। তিনি বলিলেন,

"My idea is that the Muslims themselves should take the initiative in the matter. After full discussion, they must come to a definite decision and it is for the Hindus to support them in whatever decision they would arrive at."....

[*Mahatma.-Vol. I*-pp. 289 & 304]

বলাবাহুল্য, তিলকও গণতান্ত্রিক ও জাতীয়-ঐক্যের বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করিয়াই খিলাফতের দাবি সমর্থন করেন।

সর্বশেষে একটি কথা উল্লেখ করা দরকার, অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম পর্বে শ্রমিক ও কৃষক জনতার বিশেষ কোন রাজনীতিক সংগ্রামের ভূমিকা ছিল না বটে তবুও এই আন্দোলনের ফলে ভারতের বিশাল নির্যাতিত জনগণের মধ্যে এক অভূতপূর্ব জাগরণ ও চাঞ্চল্য দেখা দেয়। বিদেশী কাপড়-মাদক দ্রব্য ও অস্পৃশ্যতা-বর্জন—এই কয়টিই ছিল দেশের সাধারণ মানুষের নিকট গান্ধীজীর নির্দেশ। বলা বাহুল্য, এই নির্দেশে আশ্চর্যজনক সাফল্যের সহিত বয়কট

আন্দোলন দ্রুত প্রসারলাভ করিতে থাকে। ভারতের কোটি কোটি অবহেলিত মূক জনতার মুখে গান্ধীজী দিলেন প্রতিবাদের ভাষা। ইহাই গান্ধীজীর প্রধান কৃতিত্ব-আর তাহার জন্য গান্ধীজীর অসাধারণ ব্যক্তিচরিত্রই প্রধানত দায়ী। অবাক বিস্ময়ে রবীন্দ্রনাথ এই মহান ব্যক্তি-চরিত্রের দিকে তাকাইয়াছিলেন। দেশে ফেরার অল্পকাল পরেই কবি গান্ধীজীর এই 'চারিত্র মহিমার' সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি দিয়া লিখিলেন,

…"বহুদিন ধরে আমাদের পোলিটিকাল নেতারা ইংরেজি-পড়া দলের বাইরে ফিরে তাকান নি, কেননা তাঁদের দেশ ছিল ইংরেজি-ইতিহাস-পড়া একটা পুঁথিগত দেশ। সে দেশ ইংরেজি ভাষার বাষ্পরচিত একটা মরীচিকা,… তার মধ্যে প্রকৃত আত্মত্যাগ বা দেশের মানুষের প্রতি যথার্থ দরদ দেখা যায় নি। এমন সময় মহাত্মা গান্ধি এসে দাঁড়ালেন ভারতের বহুকোটি গরিবের দ্বারে— তাদেরই আপন বেশে, এবং তাদের সঙ্গে কথা কইলেন তাদের আপন ভাষায়। এ একটা সত্যকার জিনিস, এর মধ্যে পুঁথির কোনো নজির নেই। এইজন্যে তাঁকে যে মহাত্মা নাম দেওয়া হয়েছে এ তাঁর সত্য নাম। কেননা, ভারতের এত মানুষকে আপনার আত্মীয় করে আর কে দেখেছে?…চাতুরির দ্বারা যে রাষ্ট্রনীতি চালিত হয় সে নীতি বন্ধ্যা, অনেক দিন থেকে এই শিক্ষার আমাদের দরকার ছিল। সত্যের যে কী শক্তি, মহাত্মার কল্যাণে আজ তা আমরা প্রত্যক্ষ দেখেছি ;…" [কালান্তর ॥ পৃঃ ২০০-০১]

গান্ধীজীর এই অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও 'চারিত্র-মাহাত্ম্যের' জন্য অসহযোগ-আন্দোলনের সমস্ত রাজনৈতিক দুর্বলতাগুলি ম্লান হইয়া ঢাকা পড়িয়া যায়। সেদিনের দেশের প্রায় সমস্ত চিন্তা-চেতনা ও যুক্তিবুদ্ধি ইহার সম্মুখে নিরস্ত্র হইয়া অবনত মস্তকে আত্মসমর্পণ করে। কেননা অন্য কোন দল ও শক্তিরই সেই প্রবল ব্যক্তিত্ব ও 'চারিত্র-মাহাত্ম্য' ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ-গান্ধীজী সাক্ষাৎকার ও অসহযোগ বিতর্ক

১৬ই জুলাই (১৯২১), রবীন্দ্রনাথ বিদেশ ভ্রমণান্তে বোম্বাই হইতে শান্তিনিকেতনে চলিয়া যান।

দিন চার পর কলিকাতায় আসিলেন। দেশে তখন অসহযোগ আন্দোলন প্রবল। সাংবাদিকরা কবিকে ছাঁকিয়া ধরিলেন, অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে তাঁহার মত কী? ফলে কবির কয়েকটি বিক্ষিপ্ত মন্তব্যের উপর বিভ্রান্তিকর সংবাদ প্রচারিত হইতে থাকে। কবি তৎক্ষণাৎ এক বিবৃতিতে উহার প্রতিবাদে বলিলেন, (২৫শে জুলাই)

"I reffered to him (A. P. I. representative লেখক) to the interviews I gave on this subject in Europe and America, in which I expressed my approbation of the spirit and method of warfare against all wrongs as preached by Mahatmaji, in which absolute faith in moral force is insisted upon. As to how his propaganda is being carried out in India and what are the ideals, which he sets before his countrymen, I have yet to learn, and therefore, am unable to discuss.' ...

[*New India-Madras*-26 July, 1921]

তিনি বুঝিলেন, এ' ভাবে সাংবাদিকদের নিকট বিবৃতি দেওয়া বৃথা। কয়েকদিন পরে শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া কলিকাতায় যেসব সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে তাঁহার বক্তব্য ব্যাখ্যা করিয়া 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধটি লিখিলেন। ১০ই আগষ্ট অপরাহ্ণে আশ্রমবাসীদের সমক্ষে প্রবন্ধটি তিনি পাঠ করেন।

কয়েকদিন পর কবি পুনরায় কলিকাতায় আসিলেন। কলিকাতায় 'জাতীয়-শিক্ষা পরিষদের' পক্ষ হইতে কবিকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। স্যর আশুতোষ চৌধুরীর সভাপতিত্বে ১৫ই আগষ্ট ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট্ হলে ঐ সংবর্ধনা সভা হয়। এই সভাতেই তিনি 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। প্রবন্ধের ভূমিকাতেই কবি বলেন,

"এ কথা মানতেই হবে যে, আজকের দিনে পৃথিবীতে পশ্চিমের লোক জয়ী হয়েছে। পৃথিবীকে তারা কামধেনুর মতো দোহন করছে, তাদের পাত্র ছাপিয়ে গেল। আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছি; দিন দিন দেখছি, আমাদের ভোগে অন্নের ভাগ কম পড়ে যাচ্ছে। ক্ষুধার তাপ বাড়তে থাকলে ক্রোধের তাপও বেড়ে ওঠে; মনে মনে ভাবি, যে মানুষটা খাচ্ছে ওটাকে একবার সুযোগমতো পেলে হয়। কিন্তু ওটাকে পাব কি, ঐ'ই আমাদের পেয়ে বসেছে; সুযোগ এ পর্যন্ত ওরই হাতে আছে, আমাদের হাতে এসে পৌঁছয় নি।

"কিন্তু কেন এসে পৌঁছয় নি? বিশ্বকে ভোগ করবার অধিকার ওরা কেন পেয়েছে? নিশ্চয়ই সে কোনো একটা সত্যের জোরে।"···

পশ্চিমের এই শক্তির উৎস ও রহস্যের মূলে রহিয়াছে পশ্চিমের বিদ্যা,—পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা, ইহাই কবির ধারণা। তিনি আরো বলিলেন,

···"এই বিরাট বস্তুবিশ্ব আমাদের নানা-রকমে বাধা দেয়;···বস্তুর নিয়ম যে শিখেছে শুধু যে বস্তুর বাধা তার কেটেছে তা নয়, বস্তু স্বয়ং তার সহায় হয়েছে—বস্তুবিশ্বের দুর্গম পথে ছুটে চলবার বিদ্যা তার হাতে, সকল জায়গায় সকলের আগে গিয়ে সে পৌঁছতে পারে ব'লে বিশ্বভোজের প্রথম ভাগটা পড়ে তারই পাতে।··

"এমন অবস্থায়, পশ্চিমের লোক যে-বিদ্যার জোরে বিশ্ব জয় করেছে সেই বিদ্যাকে গাল পাড়তে থাকলে দুঃখ কমবে না, কেবল অপরাধ বাড়বে। কেননা, বিদ্যা যে সত্য।···

"···বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়মের কোথাও একটুও ত্রুটি থাকতে পারে না, এই বিশ্বাসটাই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের জোরেই জিত হয়। পশ্চিমের লোকে এই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসে ভর করে নিয়মকে চেপে ধরেছে, আর তারা বাহিরের জগতের সকল সংকট তরে যাচ্ছে।"··· [কালান্তর ॥ পৃঃ ১৬২-১৬৩]

গান্ধীজী পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞান ও বিশেষত যন্ত্র-সভ্যতার বিরুদ্ধে এবং কবি পূর্বেই তাঁহার 'হিন্দ্‌স্বরাজের' মতাদর্শের সহিত সুপরিচিত ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের উম্মাদনায় বহু শিক্ষিত ব্যক্তিও গান্ধীজীর অনুকরণে চিন্তা করিতে থাকেন। ইহাই কবির প্রধান আশংকা। বলা বাহুল্য মাত্র তিনি অন্ধভাবে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুকরণের পক্ষে ছিলেন না, পরন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্তর্বিরোধ ও অসঙ্গতিগুলির সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিলেন। পশ্চিমের ধনতান্ত্রিক লোভ, উগ্রজাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে তিনি দেশকে পুনরায় সতর্ক করিয়া দিলেন।

···"ফললাভের লোভে ব্যবসায়িকতাই যদি মানুষের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে তবে মানবসমাজ প্রকাণ্ড প্ল্যান হয়ে উঠতে থাকে···তখন মানুষের মধ্যে আত্মিক সম্বন্ধ খাটো হতে থাকে। তখন ধন হয় সমাজের রথ, ধনী হয় সমাজের রথী, আর শক্ত বাঁধনে বাঁধা মানুষগুলো হয় রথের বাহন। গড়্ গড়্ শব্দে এই রথটা এগিয়ে চলাকেই মানুষ বলে সভ্যতার উন্নতি। তা হোক, কিন্তু এই কুবেরের রথযাত্রায় মানুষের আনন্দ নেই, কেননা, কুবেরের 'পরে মানুষের অন্তরের ভক্তি নেই। ভক্তি নেই ব'লেই মানুষের বাঁধন দড়ির বাঁধন হয়, নাড়ীর বাঁধন হয় না। দড়ির বাঁধনের ঐক্যকে মানুষ সইতে পারে না, বিদ্রোহী হয়। পশ্চিম দেশে আজ সামাজিক বিদ্রোহ কালো হয়ে ঘনিয়ে এসেছে, এ কথা সুস্পষ্ট।"··· [ঐ-পৃঃ ১৭৬-৭৭]

স্পষ্টতই কবি পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থার নিন্দা এবং সেই সঙ্গে ইউরোপের আসন্ন সমাজ বিপ্লবেরও ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন। আধুনিক যুগের প্রধানতম স্ববিরোধ এবং বিশ্বসমস্যার মূল প্রশ্নটিতে তিনি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে চাহিলেন,

"বিজ্ঞানের কল্যাণে জলে স্থলে আকাশে আজ এত পথ খুলেছে, এত রথ ছুটেছে যে, ভুগোলের বেড়া আজ আর বেড়া নেই। আজ, কেবল নানা ব্যক্তি নয়, নানা জাতি কাছাকাছি এসে জুটল; অমনি মানুষের সত্যের সমস্যা বড়ো হয়ে দেখা দিল। বৈজ্ঞানিক শক্তি যাদের একত্র করেছে তাদের এক করবে কে? …একত্র হবার বাহ্য শক্তি হু-হু ক'রে এগোল, এক করবার আন্তর শক্তি পিছিয়ে পড়ে রইল।…

"যাই হোক, এর চেয়ে স্পষ্ট আর কিছুই নয় যে, জাতিতে জাতিতে একত্র হচ্ছে অথচ মিলছে না। এরই বিষম বেদনায় সমস্ত পৃথিবী পীড়িত।"…

তিনি বলেন, 'জাতীয়-আত্মম্ভরিতা'ই (*National chauvinism*) এই বিশ্ব-মিলনের পথে প্রধান অন্তরায় ও বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

…"পৃথিবীতে নেশন গড়ে উঠল সত্যের জোরে; কিন্তু ন্যাশনালিজ্‌ম্‌ সত্য নয়, অথচ সেই জাতীয় গণ্ডীদেবতার পূজার অনুষ্ঠানে চারি দিক থেকে নরবলির জোগান চলতে লাগল। যত দিন বিদেশী বলি জুটত তত দিন কোনো কথা ছিল না; হঠাৎ ১৯১৪ খৃস্টাব্দে পরস্পরকে বলি দেবার জন্যে স্বয়ং যজমানদের মধ্যে টানাটানি পড়ে গেল। তখন থেকে ওদের মনে সন্দেহ জাগতে আরম্ভ হল, 'একেই কি বলে ইষ্টদেবতা? এ যে ঘর পর কিছুই বিচার করেনা।'…যুদ্ধ যখন পুরোদমে চলছিল তখন সকলেই ভাবছিল, যুদ্ধ মিটলেই অকল্যাণ মিটবে। যখন মিটল তখন দেখা গেল, ঘুরে ফিরে সেই যুদ্ধটাই এসেছে সন্ধিপত্রের মুখোষ প'রে।…পশ্চিমের মনীষী লোকেরা ভীত হয়ে বলছেন যে, যে দুর্বুদ্ধি থেকে দুর্ঘটনার উৎপত্তি এত মারের পরেও তার নাড়ী বেশ তাজা আছে। এই দুর্বুদ্ধিরই নাম ন্যাশনালিজ্‌ম্‌, দেশের সর্বজনীন আত্মম্ভরিতা।…তাই তিনি বলেন,

"বর্তমান যুগের সাধনার সঙ্গেই বর্তমান যুগের শিক্ষার সংগতি হওয়া চাই। রাষ্ট্রীয় গণ্ডী-দেবতার যারা পূজারি তারা শিক্ষার ভিতর দিয়ে নানা ছুতোয় জাতীয় আত্মম্ভরিতার চর্চা করাকে কর্তব্য মনে করে। জর্মনি একদা শিক্ষাব্যবস্থাকে তার রাষ্ট্রনৈতিক ভেদবুদ্ধির ক্রীতদাসী করেছিল ব'লে পশ্চিমের অন্যান্য নেশন তার নিন্দা করেছে। পশ্চিমের কোন্‌ বড়ো নেশন্‌ এ কাজ করেনি?…আর আজ, ওদের অধিকাংশ খবরের কাগজের প্রধান কাজটা কী? জাতীয় আত্মম্ভরিতার কুশল কামনা করে প্রতিদিন অসত্যপীরের সিন্নি মানা।"

অসহযোগ আন্দোলনে সারা দেশে যে তীব্র স্বাদেশিকতা ও জাতীয় উম্মাদনার প্লাবন আসিয়াছে কবি পরোক্ষে ইহার সমালোচনা করেন। এই অত্যুগ্র-স্বাদেশিকতার গৃহপালিত মার্জারটি যে একদা বনের ব্যাঘ্রে পরিণত হইতে পারে,—(যেমন নাকি পশ্চিমী দেশগুলিতে হামেশাই দেখা যায়) ইহাই কবির প্রধান আশঙ্কা। সর্বোপরি এই উগ্র-স্বাদেশিকতার মধ্যে যখন কোন সর্বজনীন সত্য নাই,—ইহা যখন বর্তমান যুগধর্মের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এই যুগধর্মের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া কবি স্বদেশী-উম্মত্ত জাতির সম্মুখে একটি সঠিক পরিপ্রেক্ষিত রাখিতে গিয়া বলেন,

"স্বাজাত্যের অহমিকা থেকে মুক্তিদান করার শিক্ষাই আজকের দিনের প্রধান শিক্ষা। কেননা, কালকের দিনের ইতিহাস সর্বজাতিক সহযোগিতার অধ্যায় আরম্ভ করবে।...শুনতে পাচ্ছি সমুদ্রের ওপারে মানুষ আজ আপনাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছে, 'আমাদের কোন্ শিক্ষা, কোন্ চিন্তা, কোন্ কর্মের মধ্যে মোহ প্রচ্ছন্ন হয়ে ছিল যার জন্যে আমাদের আজ এমন নিদারুণ শোক?' তার উত্তরে আমাদের দেশ থেকেই দেশে দেশান্তরে পৌঁছুক যে, 'মানুষের একত্বকে তোমরা সাধনা থেকে দূরে রেখেছিলে, সেইটেই মোহ, এবং তার থেকেই শোক।'...

আমরা শুনতে পাচ্ছি সমুদ্রের ওপারে মানুষ ব্যাকুল হয়ে বলছে, 'শান্তি চাই।' এই কথা তাদের জানাতে হবে, শান্তি সেইখানেই যেখানে মঙ্গল, মঙ্গল সেখানেই যেখানে ঐক্য।"...

দৃঢ় কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করিলেন,

"এইজন্যেই আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতন পূর্বপশ্চিমের মিলননিকেতন ক'রে তুলতে হবে, এই আমার অন্তরের কামনা।"... [ঐ ॥ পৃঃ ১৮২-৮৬]

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের প্রবক্তারাও এক ধরণের বিশ্বজাগতিকতা বা 'বিশ্ব-নাগরিকতার' (*'Cosmopolitanism'*, *'World Citizenship'*-তত্ত্বের) কথা বলে যাহার আসল উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য হইল, এই ধরণের মেকী-আন্তর্জাতিকতার নামে পরাধীন দেশ ও উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অগ্রাহ্য করিয়া তাহাদের সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের নিগড়ে কুক্ষিগত করিয়া রাখা। ইহার সহিত কবির ঐ আন্তর্জাতিক মিলন ও ঐক্যতত্ত্বের পার্থক্য কোথায়? রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে তাঁহার ঐক্যতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, বৃহৎ ইম্পীরিয়ালিস্ট গোষ্ঠীর হাত হইতে পরাধীন দেশ ও জাতিগুলির মুক্তি ও আত্ম-স্বাতন্ত্র্য দিতে হইবে; আর তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া আন্তর্জাতিক মিলন-ঐক্য গড়িয়া উঠিবে। এই জন্যই তিনি সতর্ক করিয়া দিয়া বলিলেন,

"এই ঐক্যতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার কথা ভুল বোঝাবার আশংকা আছে। তাই যে কথাটা একবার আভাসে বলেছি সেইটে আর-একবার স্পষ্ট বলা ভালো। একাকার হওয়া এক হওয়া নয়। যারা স্বতন্ত্র তারাই এক হতে পারে। পৃথিবীতে যারা পরজাতির স্বাতন্ত্র্য লোপ করে তারাই সর্বজাতির ঐক্য লোপ করে। ইম্পীরিয়ালিজ্‌ম্ হচ্ছে অজগর সাপের ঐক্যনীতি; গিলে খাওয়াকেই সে এক করা ব'লে প্রচার করে।...পরস্পরের স্ব-ক্ষেত্রে উভয়ে স্বতন্ত্র থাকলে তবেই সমন্বয় সত্য হয়।...সেদিনকার মহাযুদ্ধের পর য়ুরোপ যখন শান্তির জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠল তখন থেকে সেখানে কেবলই ছোটো ছোটো জাতির স্বাতন্ত্র্যের দাবি প্রবল হয়ে উঠছে। যদি আজ নবযুগের আরম্ভ হয়ে থাকে তা হলে এই যুগে অতিকায় ঐশ্বর্য, অতিকায় সাম্রাজ্য, সংঘবন্ধনের সমস্ত অতিশয়তা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাবে। সত্যকার স্বাতন্ত্র্যের উপর সত্যকার ঐক্যের প্রতিষ্ঠা হবে। যারা নবযুগের সাধক ঐক্যের সাধনার জন্যেই তাদের স্বাতন্ত্র্যের সাধনা করতে হবে; আর তাদের মনে রাখতে হবে, এই সাধনায় জাতিবিশেষের নয়, নিখিল মানবের মুক্তি।"

এ'কথা এমন স্বচ্ছ বিশ্লেষণ করিয়া সেদিন ভারতের জাতীয় নেতৃবৃন্দের কেউই বলিতে পারিলেন না ;—এই আন্তর্জাতিক চিন্তা-চেতনা ও পরিপ্রেক্ষিতও তাঁহাদের কাহারও ছিল না। কিন্তু তত্ত্ব ও আদর্শগত ভাবে এ কথা স্বীকার করিলেও রবীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের বা জাতিসকলের আত্ম-স্বাতন্ত্র্যের জন্য সংগ্রামের আহ্বান পরিষ্কার উদাত্ত কণ্ঠে জানাইতে পারিলেন না। এ কথা আমরা পরে আরো বিস্তারিত আলোচনা করিব। অবশ্য সেদিন তাহার উপযুক্ত ক্ষেত্র ও উপলক্ষও ছিল না। আধুনিক ভারতের শিক্ষার ও সাংস্কৃতিক আদর্শ কি হইবে, ইহাই ছিল আলোচ্য বিষয়। তাই উপসংহারে কবি জাতির সম্মুখে শিক্ষা-সংস্কৃতির সঠিক আদর্শটি তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন,

"এইজন্যেই আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতন পূর্বপশ্চিমের মিলননিকেতন ক'রে তুলতে হবে, এই আমার অন্তরের কামনা।…

"আমার প্রার্থনা এই যে, ভারত আজ সমস্ত পূর্বভূভাগের হয়ে সত্যসাধনার অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করুক। তার ধনসম্পদ নেই জানি, কিন্তু তার সাধন-সম্পদ আছে। সেই সম্পদের জোরে সে বিশ্বকে নিমন্ত্রণ করবে এবং তার পরিবর্তে সে বিশ্বের সর্বত্র নিমন্ত্রণের অধিকার পাবে। দেউড়িতে নয় বিশ্বের ভিতর-মহলে তার আসন পড়বে।"… [কালান্তর ॥ পৃঃ ১৮১-৮৭]

উল্লেখযোগ্য, ইহার অল্প কাল আগেই মস্কোতে 'কমিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনালের' ঐতিহাসিক দ্বিতীয়-কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। (১৯ জুলাই – ৭ই আগষ্ট ১৯২০) এই সম্মেলনে ভারতের প্রবাসী বিপ্লবী এম এন. রয় উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলনে 'জাতীয় ও ঔপনিবেশিক সমস্যা-সংক্রান্ত বিষয়ে', লেনিন তাঁহার থিসিসের খসড়ায় এক জায়গায় বলিলেন,

"The Imperialist war of 1914-18 very clearly revealed the falsity of the bourgeois-democratic phrasemongering to all nations and to the oppressed classes of the whole world by practically demonstrating that the Versailles Treaty of the famous 'Western democracies' is an even more brutal and despicable act of violence against weak nations than was the Breast-Litovsk Treaty of the German Junkers and the Kaiser. The League of Nations and the whole post-war policy of the Entente reveal this truth more clearly and distinctly than ever ; they are everywhere intensifying the revolutionary struggle both of the proletariat in the advanced countries and of the masses of the working people in the colonial and dependent countries, and are hastening the collapse of the petty-bouregeois national illusion that nations can live together in peace and equality under capitalism.

"It follows from the above-enunciated fundamental pre-

mises that the cornerstone of the whole policy of the Communist International on the national and colonial question must be closer union of the poletarians and working masses generally of all nations and countries for a joint revolutionary struggle for the overthrow of the landlords and the bourgeoisie; for this alone will guarantee victory over capitalism, without which the abolition of national oppression and inequality is impossible".

[*Selected Works-Vol. 11.* pp.-654-55]

লেনিন আরও বিশেষভাবে বলিলেন,…" he communist International *must support* the bourgeois-demcoratic national movements in colonial and backward countries"…

স্মরণ রাখা দরকার, যুদ্ধের প্রথমভাগেই লেনিন সোস্যালিস্টদের উপনিবেশ ও জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবীতে সংগ্রাম করিবার আহ্বান জানাইয়া বলেন,

"Socialists cannot achieve their great aim without fighting against all oppression of nations. Therefore, they must without fail demand that the Social-Democratic parties of *oppressing* countries (especially of the so-called 'great' powers) should recognise and champion the right of *oppressed* nations to self-determination, precisely in the political sense of the term, i e., the right to political secession. The Socialist of a ruling or colony-owning nation who fails to champion this right is a chauvinist…

"Imperialism is the epoch of the constantly increasing oppression of the nations of the world by a handful of 'great' powers and, therefore, *it is impossible to fight for the socialist international revolution against imperialism unless the right of nations to self-determination is recognised. 'No nation can be free if it oppresses other nations'* (Marx and Engels). *A proletariat that tolerates the slighted violence by 'its' nation against other nations cannot be a socialist proletariat."*

[*Socialism And War* (*Moseow*)-pp.-40-41.]

রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিকতাবাদের সহিত কমিউনিষ্ট ইণ্টার-ন্যাশনালের দৃষ্টিভঙ্গির ও চিন্তাধারার পার্থক্য কোথায় ও কি ধরণের, পাঠক নিশ্চয়ই তাহা বুঝিতে পারিতেছেন।

এদিকে অসহযোগ-আন্দোলনের তেমন সর্বজনীন ব্যাপকতা দেখা গেল না ;

—বৃটিশ গবর্ণমেণ্টও অচল হইবার তেমন কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। আন্দোলনকে তীব্রতর করার জন্য জুলাইয়ের মধ্যভাগে করাচীর খিলাফত সম্মেলনে মহম্মদ আলি তীব্র ভাষায় ঘোষণা করিলেন যে, ইংরেজের সৈন্যদলে যোগ দান কিংবা যুদ্ধ করা, মুসলমানদের পক্ষে ইসলাম ধর্মের অবমাননা করা। এই বক্তৃতায় ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট সচকিত হইয়া উঠিল। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি, ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে বিদেশীপণ্য বয়কট করিয়া স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহার করিবার নির্দেশ দিলেন। গান্ধীজী এই আন্দোলনকে তীব্রতর করিবার জন্য 'বিদেশীবস্ত্র-দাহ' করিবার কর্মসূচী দিলেন। ৩১শে জুলাই বোম্বাইয়ের প্যারেলে আনুষ্ঠানিকভাবে এই বহ্নুৎসব বা বিদেশীবস্ত্র-দাহ উৎসবের উদ্বোধন হয়। স্বয়ং গান্ধীজী এই সভায় পৌরোহিত্য করিয়া পরদিন এই উৎসবের তাৎপর্য সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, (১লা আগষ্ট

"Bombay the Beautiful lit yesterday a fire which must remain forever alive, even as in a Parsi temple, and which must continually burn all our pollutions, as yesterday we burnt our greatest outward pollution, our foreign clothing···Untouchability of foreign cloth must be held to be a duty of every Hindu, Muslim, Jain, Sikh, Parsi, Christian, Jew and all other religious communities which have made India their home.···Untouchability of foreign cloth is as much a virtue with all of us as untouchability of the suppressed classes must be a sin with every devout Hindu."···

[*Mahatma.-Vol II*-P.-53]

এণ্ড্রুজ স্বয়ং গান্ধীজীকে এই '*chauvinistic*'-উন্মাদনার পৌরোহিত্য করিতে দেখিয়া অত্যন্ত মর্মাহত হইয়া উহার তীব্র সমালোচনা করিয়া লিখিলেন,

···"The picture of your lighting that great pile of beautiful and delicate fabrics shocked me intensely....this must, I fear, lead back to the old, bad, selfish nationalism.

···"But···destroying in the fire the noble handiwork of one's own fellow men and women of one's brothers and sisters abroad, saying it would be 'defiling' to use it—I cannot tell you how different all this appears to me! Do you know I almost fear now to wear the *khaddar* that you have given me, lest I should appear to be judging other people, as a Pharisee would, saying, 'I am holier than you.' I never felt like this before."

এই সংবাদে রবীন্দ্রনাথ কী পরিমাণ উদ্বিগ্ন ও চিন্তাকুল হইয়া উঠিলেন তাহা অনুমান করা শক্ত নহে। কিভাবে উহার প্রতিবাদ ও সমালোচনা করা যায় তাহাই

চিন্তা করিতেছিলেন। এই সময় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, বিদ্রোহীকবি নজরুল ইসলাম প্রভৃতি কবি-সাহিত্যিকগণ অসহযোগ-আন্দোলনে মাতিয়া উঠিলেন। সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই সময় রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার-মিলন' প্রবন্ধটির তীব্র সমালোচনা করিয়া 'শিক্ষার-বিরোধ' নামে একটি প্রবন্ধ লিখিলেন। এ অবস্থায় কবির পক্ষে চুপ করিয়া থাকা সম্ভব হইল না। অসহযোগ-আন্দোলন সম্পর্কে অত্যন্ত স্পষ্ট ও বিস্তারিত সমালোচনা করিয়া তিনি 'সত্যের আহ্বান' নামক প্রবন্ধটি লিখিলেন। ১৩ই ভাদ্র (১৩২৮) কলিকাতায় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে এক জনসভায় প্রবন্ধটি পাঠ করেন।

এই প্রবন্ধে তিনি অসহযোগ-আন্দোলনের সহিত বিগতদিনের রাজনৈতিক আন্দোলনের একটি তুলনামূলক আলোচনা করিয়া সেইযুগে তিনি যে-সব বিষয়ে দেশকে সতর্কীকরণ করিয়াছিলেন, তাহার পুনরুল্লেখ করিলেন। ভারতের নবযুগের রাজনীতি-ক্ষেত্রে গান্ধীজীর আবির্ভাবকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি ও অভিনন্দন জানাইলেন কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনকে তিনি সমর্থন করিতে পারিলেন না। গান্ধীজী তাঁহার 'বিদেশী বয়কট ও চরকাকাটা'র নির্দেশ-নামার পশ্চাতে কোন বিজ্ঞান-সম্মত আর্থনীতিক ও রাজনীতিক যুক্তিতত্ত্ব দেন নাই। তিনি জনগণকে প্রকৃত শিক্ষা ও গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিবার কর্মসূচীও গ্রহণ করিলেন না। দেশের অশিক্ষিত মানুষকে নির্দেশ দিলেন, 'বিদেশী পণ্য বর্জন কর'—বিদেশী কাপড় অপবিত্র ; 'বিদেশী কাপড় পোড়ানো পুণ্যকর্ম', 'চরকা কাটা ও স্বদেশী কাপড় পরা পবিত্র ও পুণ্য কর্ম' ;—আর এই সব করিলেই নাকি একবৎসরের মধ্যে স্বরাজ আসিবে। এ তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের মত যুক্তিবাদী ও বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চিন্তার-স্বাধীনতাকামীর পক্ষে মানিয়া লওয়া অসম্ভব। তাই তিনি বলিলেন,

"এত দিন পরে আমাদের দেশে সেই আনন্দময় মুক্তির হাওয়া বইছে, এইটেই আমি কল্পনা করে এসেছিলুম। এসে একটা জিনিস দেখে আমি হতাশ হয়েছি। দেখছি, দেশের মনের উপর বিষম একটা চাপ। বাইরে থেকে কিসের একটা তাড়নায় সবাইকে এক কথা বলাতে, এক কাজ করাতে ভয়ংকর তাগিদ দিয়েছে।

…"কথা উঠেছে সমস্ত দেশের বুদ্ধিকে চাপা দিতে হবে, বিদ্যাকেও। কেবল বাধ্যতাকে আঁকড়ে ধরে থাকবে হবে। কার কাছে বাধ্যতা ? মন্ত্রের কাছে, অন্ধবিশ্বাসের কাছে।

"কেন বাধ্যতা ?…অতি সত্বর অতিদুর্লভ ধন অতি সস্তায় পাবার একটা আশ্বাস দেশের সামনে জাগছে। এ যেন সন্ন্যাসীর মন্ত্রশক্তিতে সোনা ফলাবার আশ্বাস। এই আশ্বাসের প্রলোভনে মানুষ নিজের বিচারবুদ্ধি অনায়াসে জলাঞ্জলি দিতে পারে এবং অন্য যারা জলাঞ্জলি দিতে রাজি হয় না তাদের 'পরে বিষম ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে। বাহিরের স্বাতন্ত্র্যের নামে মানুষের অন্তরের স্বাতন্ত্র্যকে এই রকমে বিলুপ্ত করা সহজ হয়।…"

রবীন্দ্রনাথ দেশের রাজনীতিক-চেতানাহীন এই অন্ধ যান্ত্রিক গুরুবাদকে কিছুতেই যেন মানিয়া লইতে পারিতেছেন না। তিনি রাজনীতি ও অর্থনীতি শাস্ত্রকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে গ্রহণ করিতে চাহিলেন। দেশের সমাজ-বিজ্ঞানী,

অর্থনীতিবিদ্ প্রভৃতি অভিজ্ঞ পারদর্শীদের বা বিশেষজ্ঞদের এক সম্মিলিত ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা (*Economic Planning*) গ্রহণের কথা বলিলেন,

…"কিন্তু, স্বরাজ গড়ে তোলবার তত্ত্ব বহুবিস্তৃত, তার প্রণালী দুঃসাধ্য এবং কালসাধ্য, তাতে যেমন আকাঙ্ক্ষা এবং হৃদয়াবেগ তেমনি তথ্যানুসন্ধান এবং বিচারবুদ্ধি চাই। তাতে যাঁরা অর্থশাস্ত্রবিৎ তাঁদের ভাবতে হবে, যন্ত্রতত্ত্ববিৎ তাঁদের খাটতে হবে, শিক্ষাতত্ত্ববিৎ রাষ্ট্রতত্ত্ববিৎ সকলকেই ধ্যানে এবং কর্মে লাগতে হবে। অর্থাৎ দেশের অন্তঃকরণকে সকল দিক থেকে পূর্ণ উদ্যমে জাগতে হবে। …দেশের সকল শক্তিকে দেশের সৃষ্টিকার্যে আজ পর্যন্ত কেউ যোগযুক্ত করতে পারেন নি ব'লেই তো এত দিন সময় বয়ে গেল।

…"মহাত্মাজির কণ্ঠে বিধাতা ডাকবার শক্তি দিয়েছেন, কেননা তাঁর মধ্যে সত্য আছে ; অতএব এই তো ছিল আমাদের শুভ অবসর। কিন্তু তিনি ডাক দিলেন একটিমাত্র সংকীর্ণ ক্ষেত্রে। তিনি বললেন, 'কেবলমাত্র সকলে মিলে সুতো কাটো, কাপড় বোনো।' এই ডাক কি সেই 'আয়ন্তু সর্বতঃ সাহা' ? এই ডাক কি নবযুগের মহাসৃষ্টির ডাক ?…

"একটা কথা উঠেছে এই যে, ভারতে শতকরা আশিজন লোক চাষ করে এবং তারা বছরে ছয় মাস বেকার থাকে, তাদের সুতা কাটতে উৎসাহিত করবার জন্যে কিছু কাল সকল ভদ্রলোকেরই চরকা ধরা দরকার। প্রথম আবশ্যক হচ্ছে যথোচিত উপায়ে তথ্যানুসন্ধান দ্বারা এই কথাটি প্রতিপন্ন করা। অর্থাৎ কী পরিমাণ চাষা কত দিন পরিমাণ বেকার থাকে। যখন চাষ বন্ধ তখন চাষারা কোনো উপায়ে যে পরিমাণ জীবিকা অর্জন করে, সুতা কাটার দ্বারা তার চেয়ে বেশি অর্জন করবে কি না। চাষ ব্যতিরেকে জীবিকার একটিমাত্র উপায়ের দ্বারা সমস্ত কৃষাণকে বন্ধ করা দেশের কল্যাণের পক্ষে উচিত কি না, সে সম্বন্ধেও সন্দেহ আছে। কিন্তু মূল কথা এই যে, কারও মুখের কথায় কোনো অনুমানমাত্রের উপর নির্ভর ক'রে আমরা সর্বজনীন কোনো পন্থা অবলম্বন করতে পারব না ; আমরা বিশ্বাসযোগ্য প্রণালীতে তথ্যানুসন্ধান দাবি করি। তার পরে উপায়ের যথাযোগ্যতা সম্বন্ধে বিচার করা সম্ভবপর।"

তিনি আরও বলিলেন,

…"যেহেতু এই অল্প কালের মধ্যে এই উপায়ে আমরা স্বরাজ পাব ? তার যুক্তি কোথায় ? স্বরাজ তো কেবল নিজের কাপড় নিজে জোগানো নয়। স্বরাজ তো একমাত্র আমাদের বস্ত্রস্বচ্ছলতার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তার যথার্থ ভিত্তি আমাদের মনের উপর,…তার জন্যে কোন বাহ্য ক্রিয়া, বাহ্য ফল নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞান চাই। দেশের চিত্তপ্রতিষ্ঠিত এই স্বরাজকে অল্পকাল কয়েক দিন চরকা কেটে আমরা পাব, এর যুক্তি কোথায় ?…এই যে আজ বস্ত্রাভাবে লজ্জাকাতরা মাতৃভূমির প্রাঙ্গণে রাশীকৃত ক'রে কাপড় পোড়ানো চলছে, কোন্ বাণীতে দেশের কাছে আজ তার তাগিদ আসছে ? সে কি ঐ দৈববাণীতে নয় ?…'বিদেশী কাপড় অপবিত্র, অতএব তাকে দগ্ধ করো।' অর্থশাস্ত্রকে বহিষ্কৃত করে তার জায়গায় ধর্মশাস্ত্রকে জোর করে টেনে আনা হল। অপবিত্র কথাটা ধর্মশাস্ত্রের কথা, অর্থের নিয়মের

উপরের কথা।···অতএব এ ক্ষেত্রে অর্থশাস্ত্র বা রাষ্ট্রশাস্ত্রের কথা খাটে না, এখানে ধর্মশাস্ত্রেরই বাণী প্রবল। কিন্তু, কোনো কাপড় পরা বা না-পরার মধ্যে যদি কোনো ভুল থাকে তবে সেটা অর্থতত্ত্বের বা স্বাস্থ্যতত্ত্বের বা সৌন্দর্যতত্ত্বের ভুল, এটা ধর্মতত্ত্বের ভুল নয়।" [সত্যের আহ্বান-কালান্তর ॥ পৃঃ ২০২-১১]

স্মরণ রাখা দরকার, বরিশালে প্রাদেশিক সম্মেলনে (২৫-২৭ মার্চ, ১৯২১) গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের এই কর্মসূচীর বিরুদ্ধে বিপিন পাল তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, তিনি *Magic* এ বিশ্বাস করেন না, *Logic*-এ বিশ্বাস করেন। 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধে কবি প্রায় সেই কথাই বলেন।

'বেঙ্গল রেনেসাঁসের'—সেই 'ইয়ং-বেঙ্গলে'র যুক্তিবাদের তীক্ষ্ণ অশনি রবীন্দ্রনাথের হাতে যেন আর একবার ঝলসিয়া উঠিল।—উত্তেজিত কবিকে যেন কোনক্রমেই থামানো যায় না। উপর্যুপরি আঘাত হানিয়া তিনি বিপক্ষের তর্কজাল ছিন্নভিন্ন করিয়া চলিলেন,

···"কাপড় পোড়ানোর হুকুম আজ আমাদের 'পরে এসেছে। সেই হুকুমকে হুকুম ব'লে আমি মানতে পারব না; তার প্রথম কারণ হচ্ছে এই যে, চোখ বুজে হুকুম মানার বিষম বিপত্তি থেকে দেশকে উদ্ধার করবার জন্যে আমাদের লড়তে হবে···দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে, যে কাপড় পোড়ানোর আয়োজন চলছে সে আমার কাপড় নয়, বস্তুত দেশবাসীদের মধ্যে যাদের আজ কাপড় নেই এ কাপড় তাদেরই। ও কাপড় আমি পোড়াবার কে? ·

"কাপড় পোড়াতে আমি রাজি আছি, কিন্তু কোনো উক্তির তাড়নায় নয়। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা যথেষ্ট সময় নিয়ে যথোচিত উপায়ে প্রমাণ সংগ্রহ করুন এবং সুযুক্তি দ্বারা আমাদের বুঝিয়ে দিন যে, কাপড় পরা সম্বন্ধে আমাদের দেশ অর্থনৈতিক যে অপরাধ করেছে অর্থনৈতিক কোন্ ব্যবস্থার দ্বারা তার প্রতিকার হতে পারে।"···

তিনি বলিলেন এই ধরণের অন্ধ ইংরাজ-বিদ্বেষ ও সংকীর্ণ স্বাদেশিক চিন্তায় আমাদের মুক্তি নাই। সারা বিশ্বের সামগ্রিক অগ্রগতির সহিত আমাদের চিন্তা-ভাবনা, আমাদের জাতীয়তাকে এক যোগসূত্রে গ্রথিত করিতে হইবে। আমাদের জাতীয় সাধনাকে বিশ্বের সাধনা হইতে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে চলিবে না। তাই তিনি বলিলেন,

"একটি কথা আমাদের মনে ভাববার দিন এসেছে, সে হচ্ছে এই—ভারতের আজকের এই উদ্‌বোধন সমস্ত পৃথিবীর উদ্‌বোধনের অঙ্গ। একটি মহাযুদ্ধের তূর্যধ্বনিতে আজ যুগারম্ভের দ্বার খুলেছে।···যুদ্ধের আঘাতে এক মুহূর্তে সমস্ত পৃথিবীর মানুষ যখন বিচলিত হয়ে উঠল, তখন এই কথাটা আর লুকোনো রইল না। হঠাৎ এক দিনে আধুনিক সভ্যতা অর্থাৎ পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত কেঁপে উঠল। বোঝা গেল, এই কেঁপে ওঠার কারণটা স্থানিক নয় এবং ক্ষণিক নয়—এর কারণ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধ এক মহাদেশ থেকে আর-এক মহাদেশে ব্যাপ্ত, তার মধ্যে সত্যের সামঞ্জস্য যতক্ষণ না ঘটবে

ততক্ষণ এই কারণের নিবৃত্তি হবে না। এখন থেকে যে-কোন জাত নিজের দেশকে একান্ত স্বতন্ত্র ক'রে দেখবে, বর্তমান যুগের সঙ্গে তার বিরোধ ঘটবে, সে কিছুতেই শান্তি পাবে না। এখন থেকে প্রত্যেক দেশকে নিজের জন্যে যে চিন্তা করতে হবে তার সে চিন্তার ক্ষেত্র হবে জগৎজোড়া। চিত্তের এই বিশ্বমুখী বৃত্তির চর্চা করাই বর্তমান যুগের শিক্ষার সাধনা।"…

লক্ষ্য করিবার বিষয়, কবি জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে ঠিক অস্বীকার বা তার বিরোধিতাও করিতেছেন না। অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে সেদিন তার কোনো আন্তর্জাতিকতার আদর্শ ও পরিপ্রেক্ষিত ছিল না,—এমন কি যুদ্ধোত্তর ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব সাফল্য ও অগ্রগতির সহিত সংযোগ রাখিয়া চলিবারও কোন মহৎ বাণী ছিল না। আমাদের বিরোধ মুষ্টিমেয় সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে—সমগ্র ইংরেজ জাতির সঙ্গে কিংবা তাহার জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা, শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে নহে। শুধু ইংরেজই নয়—সমগ্র পাশ্চাত্য জাতি-গুলির সভ্যতা-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ সব কিছুকেই আমরা গ্রহণ করিব—এই বাণী অসহযোগ আন্দোলনের ছিল না। অসহযোগ আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের প্রধান আপত্তি এইখানেই। পরিশেষে খুব স্পষ্ট করিয়া তিনি বলিলেন,

"আজ এই বিশ্বচিত্ত-উদ্‌বোধনের প্রভাতে আমাদের দেশে জাতীয় কোনো প্রচেষ্টার মধ্যে যদি বিশ্বের সর্বজনীন কোন বাণী না থাকে তা হলে তাতে আমাদের দীনতা প্রকাশ করবে।…আমি বলছি নে, আমাদের আশু প্রয়োজনের যা-কিছু কাজ আছে তা আমরা ছেড়ে দেব। সকালবেলায় পাখি যখন জাগে তখন কেবল মাত্র আহার-অন্বেষণে তার সমস্ত জাগরণ নিযুক্ত থাকে না, আকাশের আহ্বানে তার দুই অক্লান্ত পাখা সায় দেয় এবং আলোকের আনন্দে তার কণ্ঠে গান জেগে ওঠে।"…

[সত্যের আহ্বান-কালান্তর ॥ পৃঃ ২১২-১৫]

এই প্রবন্ধ পাঠের কয়েকদিন পরই জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ির প্রাঙ্গণে কবি 'বর্ষামঙ্গল'-উৎসব উদ্‌যাপন করেন। দেশের তৎকালীন অবস্থায় এই ধরণের উৎসব-অনুষ্ঠান করার জন্য কবিকে এক শ্রেণীর নিকট হইতে তীব্র সমালোচনা ও নিন্দার সম্মুখীন হইতে হয়।

১৯শে ভাদ্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথকে এক অভ্যর্থনা জানান হয়। সভাপতি ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। কবি তাঁহার ভাষণে একটি কথাই বিশেষ জোর দিয়া বলিলেন যে,

…"আমরা বিশ্বের মানুষ, কেবলমাত্র দেশের মানুষ নই ;…আমার রচনায় আমি মহামানবের বাহন, এই বলে যদি আমাকে সমাদর করেন তবে তাঁর আতিথ্যের জন্য প্রস্তুত থাকুন। তাঁকে ফেরাবেন না, বলবেন না, আজ আমাদের দুঃসময়, আজ আমাদের দরজা বন্ধ।…এতদিন আমরা পরের দিকে তাকিয়ে ছিলেম ভিক্ষা করবার জন্য, তাতে লজ্জার পর লজ্জা পেয়েচি, অভাব পূরণ হয়নি। আজ যদি ধিক্কারের সঙ্গে বলতে পারি পরের কাছে ভিক্ষা করব না, সে তো ভালো কথা। কিন্তু সেই ক্ষোভে যদি বলি, পরের আতিথ্য করব না, তবে আরো বেশি লজ্জা।

ভিক্ষায় যে দীনতা, অতিথির প্রত্যাখ্যানে যে বিশ্বাবমাননা, তার অভিশাপ কঠিন।"

[সবুজপত্র-১৩২৮ ভাদ্র]

এই সময় গান্ধীজী কলিকাতায় ছিলেন। ৬ই সেপ্টেম্বর গান্ধীজী ও কবির সাক্ষাৎকার। একমাত্র এণ্ড্রুজ ছাড়া আলোচনাকক্ষে আর কেহ উপস্থিত ছিলেন না। অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে এতদিন যাহা দূর হইতে বা অপরের মুখে শুনিতেছিলেন, সাক্ষাত-আলোচনায় উভয়েই উভয়ের বক্তব্য পরিষ্কার বুঝিতে চেষ্টা করিলেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিতেছেন,

…"প্রায় চারি ঘণ্টা তাঁহাদের আলোচনা চলে। আলোচনার কোন রিপোর্ট প্রকাশিত হয় নাই।

"জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা' ভবনের দ্বিতলকক্ষে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর আলোচনা, আর বাড়ির সম্মুখে বিপুল জনতার কোলাহল চলিতেছে। জনতার মধ্যে যাহারা অতি বুদ্ধিমান তাহারা জানে রবীন্দ্রনাথ মহাত্মাজির অসহযোগ-নীতির বিরোধী এবং বিলাতী বস্ত্রে অগ্নিসংযোগের পক্ষপাতী নহেন। সুতরাং তাহাদের মতে রবীন্দ্রনাথের এই আন্দোলনের বিরোধিতার একমাত্র উত্তর হইতেছে, তাঁহারই গৃহের প্রাঙ্গণে বিলাতী বস্ত্র দগ্ধ করা। যাহাই হউক এই নিরুপদ্রব অহিংসক অসহযোগীদের ব্যবহারে সকলেই লজ্জিত হইয়াছিলেন। দুই মহা-পুরুষের মধ্যে যে দীর্ঘ আলোচনা হইল, তাহাতে বিশেষ কিছু ফল হইল না। গান্ধীজী যথারীতি তাঁহার অসহযোগ আন্দোলনের ইন্ধন সন্ধানে বাহির হইলেন; রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মিলনমূলক বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের পরিকল্পনায় মন দিলেন।"…

[রবীন্দ্র-জীবনী-তৃতীয় খণ্ড ॥ পৃঃ ৮৫]

বিস্ময়ের কথা, গান্ধীজীর জীবনীকার টেণ্ডুলকরও এই সাক্ষাৎকারের কোন উল্লেখ বা বিবরণ দেন নাই। তবে উহার কয়েকমাস পরে গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে ঐতিহাসিক বিতর্ক বা মসিযুদ্ধ হয় তাহা হইতেই তাঁহাদের চিন্তাধারার পার্থক্যটি স্পষ্টই ধরা পড়ে।

'সত্যের আহ্বান', প্রবন্ধটি '*A Call of Truth*' শিরোনামায় 'মডার্ন রিভ্যু' পত্রিকায় (*Modern Review*-October 1921) প্রকাশিত হইলে উহা গান্ধীজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গান্ধীজী উহার জবাবে '*Young India*'-(13 October '21) পত্রিকায় তাঁহার বিখ্যাত ঐতিহাসিক খোলাচিঠিটি লেখেন। পত্রের শুরুতেই কবির যুক্তিবাদী সতর্কবাণীকে অভিনন্দন জানাইয়া তিনি লিখিলেন,

"The bard of Santiniketan has contributed to the *Modern Review* a brilliant essay on the present movement…The poet tells us summarily to reject anything and everything that does not appeal to our reason or heart.…With all this one must heartily agree, and the poet deserves the thanks of his country-men for standing up for truth and reason…To mutter a mantra without knowing its value is unmanly. It is good,

therefore, that the poet has invited all who are slavishly mimicking the call of the charkha boldly to declare their revolt …I regard the poet as a sentinel warning us against the approach of enemies called bigotry, lethargy, intolerance, ignorance, inertia and the other members of that brood."

কি'ন্তু তবুও, দেশের এই সমূহ বিপদকালে তিনি কবিকে তাঁহার গান বন্ধ করিয়া চরকা কাটিবার আহ্বান জানাইলেন,

…"When there is war, the poet lays down the lyre, the lawyer his law reports, the schoolboy his books. The poet will sing the true note after the war is over…When a house is on fire, all the inmates go out, and each one takes up a bucket to quench the fire When all about me are dying for want of food, the only occupation permissible to me is to feed the hungry. It is my conviction that India is a house on fire because its manhood is being daily scorched, it is dying of hunger because it has no work to buy food with."…

গান্ধীজী তাই বলিলেন, চরকাই সেই উপায় যাহা লক্ষ লক্ষ দেশের ক্ষুধার্ত মানুষের কাজ ও অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিবে। তিনি চরকার পক্ষে আর্থনীতিক যুক্তি দিয়া আরো বলিলেন,

…"Hunger is the argument that is driving India to the spinning wheel. The call of the spinning wheel is the noblest of all....Swaraj has no meaning for the millions, if they do not know how to employ their enforced idleness. The attainment of this swaraj is possible within a short time, and it is so possible only by the revival of the spinning wheel."

পরিশেষে তিনি কবিকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,

"True to his poetical instinct the poet lives for the morrow and would have us do likewise.…But I have had the pain of watching the birds who for want of strength could not be coaxed even into a flutter of their wings. The human bird under the Indian sky gets up weaker than when he pretended to retire. For millions it is an eternal vigil or an eternal trance. It is an indescribably painful state which has to be experienced to be realized. I have found it impossible to soothe the suffering patients with a song from Kabir. The hungry millions ask for one poem—the invigorating food. They cannot be given it. They must earn it themselves. And

they can earn only by the sweat of their brow."

[*Mahatma.-Vol. II.* pp. 61-65.]

ইহা হইতেই তাঁহাদের উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারার পার্থক্যটি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

ইতিমধ্যে দেশের ঘটনাস্রোত ক্রমশই তীব্র ও জটিল আকার ধারণ করিতে থাকে। আগষ্ট মাসে মালাবারে মোপলারা বিদ্রোহ করে। এই মোপলারা সংখ্যায় ছিল প্রায় দশলক্ষ। জাতিতে তাহারা মুসলমান এবং প্রায় অধিকাংশই ছিল খুবই গরীব চাষী ও জেলে সম্প্রদায়ের। খিলাফৎ আন্দোলনের ঢেউ তাহাদের মধ্যে আসিয়া পড়ে। সরল ও উৎপীড়িত চাষীরা ইহার অর্থ করিয়া লয় যে, খিলাফৎ আন্দোলন বুঝিবা আপন-আপন এলাকায় মুক্ত ও স্বাধীন রাজ্য গঠনের নির্দেশ। এই উত্তেজনায় তাহারা কিছু ইউরোপীয় ও হিন্দু সুদখোর মহাজন ও জোতদারদের হত্যা করিয়া তাহাদের ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করে। কয়েকজনকে বলপূর্বক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে। গবর্ণমেণ্ট কঠোর হস্তে এই বিদ্রোহ দমন করিয়া এই আন্দোলন সম্পর্কে অতিরঞ্জিত ও উত্তেজক অপপ্রচার করিয়া দেশের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে লাগিলেন। গান্ধীজী এই সংবাদ পাইয়া কলিকাতা ত্যাগ করিয়া মহম্মদ আলিকে সঙ্গে লইয়া মালাবারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে ওয়ালটেয়ার ষ্টেশনে, (১৪ই সেপ্টেম্বর) মহম্মদ আলি গ্রেপ্তার হন, করাচীর তীব্র উত্তেজনাকর ও আপত্তিকর বক্তৃতার অভিযোগে। কয়েকদিন পর বোম্বাইয়ে সৌকত আলিও গ্রেপ্তার হন। তীব্র উত্তেজনার মুখে গান্ধীজী উহার প্রতিবাদে ঘোষণা করিয়া বলিলেন,

"The Governor of Bombay, evidently does not know that the Indian National Congress began to tamper with the loyalty of the sepoy in September last year, that the central Khilafat Committee began it earlier, and I began it earlier still, for I must be permitted to take the credit or the odium of suggesting that India had a right openly to tell the sepoy and everyone who served the Government in any capacity whatsoever that he participated in the wrongs done by the Government. The conference at Karachi merely repeated the Congress declaration in terms of Isalm."... [*Ibid*-p. 59]

আলি-ভ্রাতৃদ্বয়ের গ্রেপ্তারের ফলে গান্ধীজীর যেন দক্ষিণ হস্ত ভাঙ্গিয়া গেল।

অসহযোগ আন্দোলনের সময়ই কংগ্রেস সর্বপ্রথম পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা শুরু করে এবং ঐ সময় একটি সিদ্ধান্তও গ্রহণ করে। এই প্রসঙ্গে জওহরলাল নেহরু তাঁহার '*Discovery of India*' গ্রন্থে লিখিতেছেন,

"ভারতের অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠনের মত জাতীয় কংগ্রেসও দীর্ঘদিন ধরে দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যার বিচার ও নীতি নির্ধারণেই প্রায় পুরোপুরি ব্যস্ত ছিল। বিদেশের ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত বা পর্যালোচনা করার দিকে তার একেবারেই নজর ছিল না। এদিকে সর্বপ্রথম কংগ্রেসের দৃষ্টি পড়ে প্রথম মহাযুদ্ধের পর—বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। এই সময় সোস্যালিস্ট ও কমিউনিস্টদের ছোটখাটো দুই একটি দল ছাড়া অন্য কোনো সংস্থা বৈদেশিক ঘটনাবলী সম্পর্কে তেমন উৎসুক ছিল না।

"অবশ্য প্যালেস্টাইনের ঘটনাবলী সম্পর্কে কিছু কিছু মুসলিম সংস্থা আগ্রহান্বিত ছিল, এবং মাঝে মাঝে আরবী মুসলিমদের সহানুভূতি জানিয়ে তারা প্রস্তাবও গ্রহণ করত। তুরস্ক মিশর এবং ইরানের সমসাময়িক তীব্র জাতীয় আন্দোলনের দিকেও এরা আকৃষ্ট হত; কিন্তু এসব দেশে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে যে ব্যাপক সংস্কারের ঝড় বয়ে চলেছিল, সে সম্পর্কে এই সমস্ত মুসলিম সংস্থার মনে একটু দ্বিধার ভাব ছিল।…

"১৯২০ সালেই কংগ্রেস পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই প্রস্তাবে পৃথিবীর অন্যান্য জাতি, বিশেষ করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার উপর জোর দেওয়া হয়… [ভারতসন্ধানে-পৃঃ ৪৬৩]

কিন্তু, ১৯২০ সালে কংগ্রেস থেকে পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই; ১৯২১ সালেই নভেম্বর মাসে কংগ্রেস থেকে ঐ প্রস্তাব গৃহীত হয়। দ্বিতীয়ত এই ব্যাপারে প্রথম উদ্যোগ আসে খিলাফত কমিটির নিকট হইতে। ১৯২১ সালে ২৬শে এপ্রিল বোম্বাইয়ে 'সেন্ট্রাল খিলাফত কমিটির' উদ্যোগে এক জনসভায় কংগ্রেসকে পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার অনুরোধ জানাইয়া ঐ সভা যে সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করে, তাহাতে বলা হয়:

"In view of the fact that the destiny of the people of India is inevitably linked with that of the neighbouring Asiatic Nations and Powers, this public meeting of the Mussulmans of Bombay request the All-India Congress Committee to promote feelings of amity and concord with neighbouring states, and with a view to establish mutual good-will and sympathy, to formulate a clear and definite foreign policy for India"

উহার প্রায় তিন মাস পরে বোম্বাইয়ে, 'নিখিল-ভারত-কংগ্রেস কমিটি' এক সভায়, (২৮-৩০ জুলাই ১৯২১) উপরোক্ত সিদ্ধান্তটির উদ্ধৃতি দিয়া উহার মন্তব্যে যে সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করে, তাহাতে বলা হয়,

"Resolved further that the grateful acknowledgements of the All India Congress Committee be communicated to Mr. Pickthall, the chairman of the said meeting, and to the Central Khilafat Committee of India for inviting the attention of the All India Congress Committee to a matter of such importance, and that the Working Committee be asked to frame a statement of such policy for presenting the same at the next meeting of the All India Congress Committee for its consideration."

[*Indian National Congress*-(1920-23)-p. 70]

(Edited by-J. Nehru.)

আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের কিংবা খিলাফত নেতৃবৃন্দের উগ্র-ধর্মপ্রবণতা সুবিদিত ; কিন্তু পররাষ্ট্রনীতি-নির্ধারণে যে-মূল নীতির উপর তাঁহারা গুরুত্ব আরোপ করেন,—আর যাহা হউক, তাহাতে 'প্যান-ইস্‌লামিজ্‌ম্‌'-এর গন্ধ ছিল না।

৫ই অক্টোবর 'ওয়ার্কিং-কমিটি' পররাষ্ট্র-নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে গান্ধীজী প্রণীত একটি খসড়া-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ৫ই নভেম্বর 'নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি' (A. I. C. C.) খসড়া-সিদ্ধান্তটির সামান্য রদবদল করিয়া গ্রহণ করে। উহাতে বলা হয়,

..."that the Congress should let it be known to the neighbouring and other non-Indian States :—

(1) that the present Government of India in no way represent Indian opinion and that their policy has been traditionally guided by considerations more of holding India in subjection than of protecting her borders ;

(2) that India as a self-governing country can have nothing to fear from the neighbouring states or any state as her people have no designs upon any of them and hence no intention of establishing any trade relations hostile to or not desired by the people of such states ;

(3) and that the people of India regard most treaties entered into with the Imperial Government by neighbouring states as mainly designed by the latter to perpetuate the exploitation of India by the Imperial power, and would therefore urge the states having no ill-will against the people of India, and having no desire to injure her interests, to refrain

from entering into any treaty with the Imperial power.

"The Committee wishes also to assure the foreign states that when India has attained self-government, her foreign policy will naturally be always guided so as to respect their religious obligations." [*Ibid*-pp. 75-76]

প্রথম হইলেও উহার মধ্যে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপের সুর শুনা যায়। স্বয়ং গান্ধীজী তাঁহার এই প্রস্তাবের সপক্ষে যুক্তিতে বলিলেন,

"Indeed, while we are maturing our plans for *swaraj*, we are bound to consider and define our foreign policy. Surely we are bound authoritatively to tell the world what relations we wish to cultivate with i...We must not be afraid to speak our mind on all that concerns the nation."

[*Young India*,-October 20, 1921]

কিন্তু তবুও একটি লক্ষ্য করিবার বিষয়, এই সিদ্ধান্তের মধ্যে এশিয়া ও আফ্রিকার পরাধীন এবং ঔপনিবেশিক দেশগুলির স্বাধীনতা ও জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবীতে কোন কথাই বলা হয় নাই। বা পরেও অনুরূপ কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। আর সাম্রাজ্যবাদই যে আমাদের সকলের সাধারণ শত্রু (common enemy)—এই চিন্তা-চেতনাও তখনও ছিল না অধিকাংশ নেতৃবর্গের, তা' এই সিদ্ধান্ত হইতেই পরিষ্কার বুঝা যায়। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের সহিত সমকালীন জাতীয় নেতৃবর্গের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাচেতনার প্রধান পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথ শুধু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকেই দেখেন নাই, —সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদের জগৎজোড়া সামগ্রিক রূপটির বিরুদ্ধে তিনি এক তীব্র আক্রমণাত্মক সমালোচনা করিতেছিলেন, পূর্বেই তা বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

এ কথা সত্য, কলিকাতা-অধিবেশনে, কেবলমাত্র মেসোপোটেমিয়ার যুদ্ধে ব্রিটিশের সৈন্যদলে যোগদানে নিষিদ্ধ বা বিরত থাকিবার নির্দেশ দিয়া সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু এ' কথাও অস্বীকার করা যায় না, মহম্মদ আলিই সর্বপ্রথম সাধারণভাবে ইংরেজ সৈন্যদলে যোগদান বা ইংরেজ পক্ষে লড়াই করিবার বিরুদ্ধে ভারতীয় মুসলিমদের নিকট এক নির্দেশ বা আবেদন জানান। অবশ্য গান্ধীজীও তৎক্ষণাৎ উহা সমর্থন করেন। এই 'করাচী-সিদ্ধান্তকে' সামগ্রিক রূপদান করিয়া ৫ই অক্টোবর (১৯২১) বোম্বাইয়ে 'কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি' যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাহাতে বলা হয়,

"...the Working Committee is of opinion that the resolution (Karachi Khilafat Conference resolution—লেখক) virtually reaffirms the principle laid down by the Congress at its special session in Calcutta and its ordinary session in Nagpur last year, that it is contrary to the national dignity and national

interest for any Indian to engage or remain in the service of the Government in any capacity whatever, a government that has used the soldiers and the police for repressing the just aspirations of the people, as during the Rowlatt Act agitation, and that has utilised the soldiers for the purpose of crushing the national spirit of the Egyptians, the Turks, the Arabs and other nations. The Working Committee is further of opinion that the reasons given for the prosecutions with reference to the said Karachi resolution constitute an undue interference with religious liberty."

[*Indian National Congress*-(1920-23)-p. 121]

বলা বাহুল্য, কলিকাতা বিশেষ অধিবেশনে ও নাগপুর অধিবেশনে বিশেষভাবে মেসোপোটেমিয়ার ক্ষেত্রেই ভারতীয় সৈন্যদের ইংরেজ পক্ষে যুদ্ধ না-করার নির্দেশ ছিল, পূর্বেই তাহা উল্লেখ করিয়াছি।

কিন্তু তবুও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ রবীন্দ্রনাথের মত পরিষ্কার একথা ঘোষণা করিতে পারিলেন না,

..."that members of the subject race, which has been deprived of its right to carry arms for its own self-protection, are being turned into fighting automatons for the imperealistic aggrandisement of a nation whose possessions are already too burdensome for its moral integrity and physical strength."

আরও কথা এই যে, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে জাতীয়-আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির ভিত্তিতে সমর্থন করিতেছিলেন তাহা নহে; পরন্তু তখনও তাঁহারা খিলাফতের দাবিতে পরোক্ষে অটোমান-সাম্রাজ্যের পুনঃ প্রবর্তন দাবি করিতেছিলেন।

বিস্ময়ের কথা, ওয়ার্কিং-কমিটি বা A. I. C. C.'র ঐ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তগুলি আমেদাবাদ অধিবেশনে (১৯২১ ডিসেম্বর) চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য উত্থাপিত হইল না এবং বহুকাল পর্যন্ত পররাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক-নীতি সংক্রান্ত ব্যাপারে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ আর কোনই উচ্চ-বাচ্য করিলেন না। একথা সত্য, ১৯২২ সালে চিত্তরঞ্জন '*Asiatic Fedaration*' গঠনের শ্লোগান দেন তবে, ১৯২৭ সালে মাদ্রাজ-কংগ্রেসে, শ্রীজওহরলাল নেহরুই কংগ্রেসের আন্তর্জাতিক-নীতির পরিণত রূপদানের চেষ্টা করেন। পরে যথাস্থানে তাহা আলোচিত হইবে।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য কংগ্রেসের এই ধরণের রাজনীতিক ও আনুষ্ঠানিক পররাষ্ট্রনীতিতে বড়ো একটা আস্থা বা ভরসা রাখিতেন না। রাজনীতিক বিশেষ-স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই যাঁহারা মাত্র দুই তিন বৎসর পূর্বে ইংরেজের যুদ্ধে পূর্ণ সহযোগিতা করিয়াছিলেন, সেই উদ্দেশ্য সাধিত না-হওয়ায় তাঁহারা আজ ব্রিটিশের সমালোচনা ও নিন্দাবাদ করিয়া অসহযোগ আন্দোলনের ডাক

পাড়িতেছেন। রাজনীতিতে এই bargaining-এর মনোবৃত্তি, কবির কাছে খুব ভালো ঠেকে নাই। দেশে ফেরার অনতিকাল পূর্বে তাই তিনি কংগ্রেস নেতৃত্ব ও রাজনীতির তীব্র সমালোচনা করিয়া লিখিয়াছিলেন, (মার্চ-১৯২১),

"Why do we not feel the miserable shame of uttering in a tear-choked voice, or, for the matter of that, in a sullen growl, to our Governors—'We are sorely disappointed in you, and therefore we have no other alternative than to come down to our own people'. It is like the exclamation of a malcontent dog to its neglectful master. 'I was willing to guard your door and beautifully wag my tail at you, if you had provided me with the remnant of your dinner: but as you never cared to do so, I go to join my own species.'

"Not very long ago, we said to our rulers,—'We are willing to sacrifice our principles and to persuade our men to join in a battle about whose merit they have not the least notion; only in exchange, we shall claim your favour.' It was pitifully weak: it was sinful. And now we must acknowledge our responsibility,—to the extent of our late effort at recruiting,—for turning our men into a mercenary horde, drenching the soil of Asia with brothers' blood for the sake of the self-aggrandisement of a people wallowing in the mire of imperialism.

"I am mighty glad that any reward was refused, or, at least what was flung to us was deemed inadequate"···

[*Modern Review*-March 1921-p. 356.]

শুধু তাহাই নহে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা কালেও এই ধরণের মনোবৃত্তি এক শ্রেণীর কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে কাজ করে, যাহার ফলে কংগ্রেস রাজনীতির বিষম এক অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সংকট দেখা দেয়। যথাস্থানে তাহা আলোচিত হইবে।

অসহযোগ-আন্দোলনের শেষপর্বে

কলিকাতায় গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের দু' একদিন পরেই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন (৮ই সেপ্টেম্বর-১৯২১)।

শান্তিনিকেতনে ফিরিয়াই তিনি সব কিছু ভুলিয়া যেন কাব্য ও সংগীত রচনা এবং বিশ্বভারতীর সাংগঠনিক কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখিতে চাহিলেন। এই সময়ই তিনি 'শিশু ভোলানাথ' কাব্যগ্রন্থখানি রচনা (৫ই আশ্বিন হইতে ৪ঠা কার্ত্তিক-১৩২৮) করেন। তাছাড়া অনেকগুলি সংগীতও তিনি এই সময় রচনা করেন।

কবি স্বয়ং তাহার কৈফিয়ৎ হিসাবে এই সময় ইন্দিরা দেবীকে এক পত্রে লিখিতেছেন,

…"ছেলেদের কবিতা…লেখবার একমাত্র তাগিদ ছিল বয়স্ক লোকের দায়িত্ব-বোধের জীবনকে ক্ষণকালের জন্যে মন থেকে সরিয়ে দেবার ইচ্ছায়। খেলার জগতে শিশু হয়ে জন্মেছি এই ঘটনাটির মধ্যে অস্তিত্বের মূলসত্যটি আমাদের জীবনের ভুমিকারূপে লিখিত হয়েচে, এই কথাটি কিছুকাল থেকে বারবার আমি ভাবচি এবং শিশুর কবিতায় এক-রকম করে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেচি।"…

[চিঠিপত্র-৫'ম ॥ পৃঃ-৪৪]

প্রমথ চোধুরীকে এক পত্রে লিখিতেছেন (১৮ কার্ত্তিক ১৩২৮),

…"মাঝে মাঝে প্রায়ই গান লিখি। যখন লিখি তখন মনে হয় স্বরাজ ব্যাপারটা এমন কিছু গুরুতর জিনিস নয়—মানুষের ইতিহাসে অনেক স্বরাজ বুদ্বুদের মত উঠেছে আর ফেটে গেছে—কিন্তু যে গানগুলোকে দেখতে বুদ্বুদের মত তা'রা আলোর বুদ্বুদ নক্ষত্রের মতই। সৃষ্টিকর্তার খেলনাগুলির সঙ্গে তাদের রঙের মিল আছে। সেই জন্যেই যখন তারা গড়ে উঠতে থাকে তখন কর্ত'ব্য ভুলে যাই। অথচ দেশের কর্তাব্যক্তিদের কাছ থেকে হুকুম আসচে যে, 'সময় খারাপ অতএব বাঁশি রাখ, লাঠি ধর।' যদি তা করি তাহলে কর্তারা খুশি হবেন, কিন্তু আমার এক বাঁশিওয়ালা মিতা আছেন কর্তাদের অনেক উপরে, তিনি আমাকে একেবারে বরখাস্ত করে দেবেন।…'আমি ভুগোলের প্রতিমার পাণ্ডাদের যদি আজ মানতে বসি তাহলে আমার জাত যাবে।"…

[চিঠিপত্র ৫'ম-পত্র ৮৭ ॥ পৃঃ ২৬৯-৭০]

স্পষ্টই বুঝা যায়, ইহা সেই কবি-প্রকৃতির চিরন্তন অন্তর্দ্বন্দ্ব ও স্ববিরোধ। কিছুকাল পূর্বে ঠিক এই কথাই তিনি বিদেশে জাহাজে বসিয়া লিখিয়াছিলেন, পূর্বেই তা' উল্লেখ করিয়াছি।

প্রতিটি রাজনৈতিক উত্তেজনায় এক বিশেষ চরম মুহূর্তে কবি যেন তীক্ষ্ণ আত্মসমালোচনা করিয়া আবিষ্কার করেন, তিনি কবি; রাজনীতি তাঁহার জন্য নহে। তাঁহার 'বর্ষামঙ্গল-উৎসব' বা 'শিশু-ভোলানাথ' যেন দেশবাসীর উদ্দেশে

একটি নীরব কৈফিয়ৎ, "আমি কবি।"

কিন্তু স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন কই! তাঁহার সামনে বিরাট কাজ পড়িয়া আছে। সে কাজ বিশ্বভারতীর আদর্শের বাস্তব রূপায়ণ। এই সময় কাদম্বিনী দেবীকে এক পত্রে লিখিতেছেন,

..."আমি দেশের জন্যে কি রকম কাজ করতে চাই তার চিহ্ন বিশ্বভারতীতে কিছু রেখে যাব আশা আছে—তা কোন তর্কের দ্বারা পরিস্ফুট হবে না।"

[চিঠিপত্র-২'য়-পত্র ৭৩ ॥ পৃঃ ১০৩]

কয়েকদিন পর পিয়ার্সন ও এলমহার্স্ট (২৬ ও ২৭শে সেপ্টেম্বর) শান্তিনিকেতনে আসিলেন। এলমহার্স্ট আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর ও গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনায় খুবই আকৃষ্ট হন, পূর্বেই তাহা উল্লেখ করিয়াছি। পরে এলমহার্স্ট রবীন্দ্রনাথের গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনায় আত্মনিয়োগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া কবির মতামত চাহিয়াছিলেন। বিশ্বভারতীর আর্থিক-সঙ্গতি তখন ভালো ছিল না। এলমহার্স্ট সে-সমস্যার একটা সমাধান করিলেন। তিনি তাঁহার ধনী বান্ধবী, মিসেস্ স্ট্রেটের (পরে ইঁহাকে বিবাহ করেন) নিকট হইতে বাৎসরিক ৫০,০০০ টাকা এই পরিকল্পনার জন্য ব্যবস্থা করিলেন। রবীন্দ্রজীবনীকার লিখিতেছেন,

"স্থির হইল সুরুল এই গ্রামোদ্যোগের কেন্দ্র হইবে। কয়েক মাস পূর্বে সেখানে কলিকাতা হইতে আগত কয়েকজন অসহযোগী ছাত্র, নেপালচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে গ্রামের কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। স্থির হইল তাঁহাদের লইয়া এলমহার্স্ট কার্য শুরু করিবেন। কার্য আরম্ভ করিবার পূর্বে এলমহার্স্ট দেশের কোথায় কৃষি-আদি কার্য কিভাবে চলিতেছে গ্রাম্য সমস্যা চারিদিকের কিরূপ—সেইসব বিষয়ে ওয়াকিবহাল হইবার জন্য সফরে বাহির হইলেন।"

[রবীন্দ্রজীবনী-তৃতীয় খণ্ড ॥ পৃঃ ৮৯]

নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে (১০ই নভেম্বর) আসিলেন বিখ্যাত ফরাসী প্রাচ্যতত্ত্ববিদ অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি-দম্পতি। ফ্রান্সে কবির সহিত এ' ব্যাপারে কিছু কথা হয়। ইঁহারা কিছুকাল বিশ্বভারতীর *Visiting professor*-রূপে অধ্যাপনা করেন। প্রধানত তাঁহাদেরই উদ্যোগে বিশ্বভারতীতে চীনা ও তিব্বতী ভাষা শিক্ষা-চর্চা ও পঠন-পাঠন শুরু হয়। বলা বাহুল্য, এ' ব্যাপারে কবির আগ্রহ ও উৎসাহের অন্ত ছিল না। বিশ্বভারতীকে ঠিক এমনই একটি আন্তর্জাতিক শিক্ষা-সাংস্কৃতিক গবেষণা-চর্চার কেন্দ্র করিবার তিনি পরিকল্পনা করিতেছিলেন। মাদাম লেভি ফরাসী ভাষা-শিক্ষার ক্লাস লইতেন। ইতিপূর্বে হিরজি ভাই পেস্তানজী ও পল্ রিশারও কিছুদিন ফরাসী ভাষা শিক্ষা দিয়াছিলেন।

অল্পকাল পরেই 'পৌষ-উৎসব' আসিয়া গেল। ৭ই পৌষ প্রাতে কবি তাঁহার ভাষণে বিশ্বভারতীর নব-পর্যায়ের তাৎপর্যটি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিলেন,

"এ বৎসর আমাদের শান্তিনিকেতনে নূতন যুগের আবির্ভাব প্রকাশমান হল। এখানে আমাদের নবযুগের অতিথিশালা খুলেছে।

"মানুষের সঙ্গে মানুষে যে একত্র হয়েছে এই মহৎ ঘটনাকে আমরা আজও

সত্য বলে অনুভব করতে পারছিনে। তাই আমাদের শিক্ষাদীক্ষায় সেই প্রাচীন অভ্যাসটাকে মনের মধ্যে পাকা ক'রে তোলবার চেষ্টা এখনও চলেছে—তাই স্বাজাত্যের অভিমানকে অতিশয় করে' তোলাকেই আমরা কর্তব্য বলে স্থির করেছি। এমন অবস্থায় কোনো একজায়গায় আজ সেই বাণী-ঘোষণার কেন্দ্র থাকা চাই, যে-বাণী সীমাবন্ধ অতীত কালের বাণী নয়, যে-বাণী ভবিষ্যতের বিরাট মুক্তিক্ষেত্রের বাণী। এই বাণী কা'রা ঘোষণা করবে?···অকিঞ্চনের কণ্ঠ থেকে নবযুগের জয়ধ্বনি উঠবে এমন আশা আছে।"

[শান্তিনিকেতন ॥ ২য় খণ্ড-পৃঃ ৬২০-২১]

পরদিন 'বিশ্বভারতী পরিষদ' গঠিত হয় এবং উহার গঠনতন্ত্রও রচিত হয়। ঐ দিনই কবি তাঁহার আর একটি ভাষণে বলিলেন,

"কোন জাতি যদি স্বাজাত্যের ঔদ্ধত্যবশত আপন ধর্ম ও সম্পদকে একান্ত আপন বলে মনে করে, তবে সেই অহংকারের প্রাচীর দিয়ে সে তার সত্য সম্পদকে বেষ্টন করে রাখতে পারবে না। যদি সে তার অহংকারের দ্বারা সত্যকে কেবলমাত্র স্বকীয় করতে চায় তবে তার সে সত্য বিনষ্ট হয়ে যাবে।···আমরা কি এ কথাই বলব যে মানবের বড়ো অভিপ্রায়কে দূরে রেখে ক্ষুদ্র অভিপ্রায়কে নিয়ে আমরা থাকতে চাই! তবে কি আমরা মানুষের যে গৌরব তার থেকে বঞ্চিত হব না? স্বজাতির অচল সীমানার মধ্যে আপনাকে সংকীর্ণভাবে উপলব্ধি করাই কি সব চেয়ে বড়ো গৌরব?

"এই বিশ্বভারতী ভারতবর্ষের জিনিস হলেও এ'কে সমস্ত মানবের তপস্যার ক্ষেত্র করতে হবে।···এই জন্যই ভারতের ক্ষেত্রে বিশ্বভারতীকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই।" [শান্তিনিকেতন পত্রিকা-১৩২৮ মাঘ-পৃঃ ২-৩]

বলা বাহুল্য, কবির এই সব ভাষণ যেন বিশেষ করিয়া অসহযোগ নেতৃবর্গকে উদ্দেশ করিয়াই। ইহার অল্পকাল পরেই তিনি 'মুক্তধারা' নাটকটি রচনা করেন (১৩ই জানুয়ারী ১৯২২)।

ইতিমধ্যে দেশের আন্দোলনের পরিস্থিতি ক্রমশ গুরুতর ও জটিল আকার ধারণ করিতে থাকে। ১লা নভেম্বর করাচী-মামলার রায় বাহির হয়,—বিচারে আলি-ভ্রাতৃদ্বয়ের দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। 'নিখিল-ভারত-কংগ্রেস-কমিটি' বোম্বাইয়ে এক জরুরী অধিবেশনে সমস্ত প্রদেশকে 'আইন-অমান্য-আন্দোলনের' (individual & mass civil disobedience) প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন, অবশ্য কতকগুলি কঠিন সর্তসাপেক্ষে। চিত্তরঞ্জন, মতিলাল নেহরু, আজাদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হইলেন।

এই সময় যুবরাজের (Prince of Wales) ভারত সফর উপলক্ষে পণ্ডিত মালব্যের মধ্যস্থতায় সরকার ও নেতৃবৃন্দের মধ্যে এক আপোষ মীমাংসার চেষ্টা চলে। বড়লাট রীডিং (Lord Reading) প্রস্তাব দেন, যদি নেতৃবৃন্দ কলিকাতায় যুবরাজের সম্বর্ধনা-উৎসব বয়কট না-করেন তবে তাঁহাদের সকলকেই মুক্তি দেওয়া হইবে এবং এক 'গোল টেবিল বৈঠকে' আপোষ-মীমাংসার বিস্তারিত আলোচনা করা যাইবে। মৌলানা আজাদ ও চিত্তরঞ্জন প্রমুখ নেতারা আলিপুর

জেল হইতে মালব্যজীর মাধ্যমে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিবার জন্য গান্ধীজীকে অনুরোধ জানান, কিন্তু গান্ধীজী রাজী হইলেন না। তিনি বলিলেন, সর্বাগ্রে আলিভ্রাতাদের সহিত সমস্ত নেতার মুক্তি দিতে হইবে, পরে গোলটেবিলের কথা বিবেচনা করা যাইতে পারে। এই প্রস্তাবে বড়লাট চটিয়া গিয়া উহা প্রত্যাখ্যান করেন। চিত্তরঞ্জন ও আজাদ প্রমুখ নেতারা উহাতে খুবই অসন্তুষ্ট হন। আর বিস্ময়ের কথা, কিছুদিন পরে গান্ধীজীই শংকরণ নায়ারের মাধ্যমে অনুরূপ আর একটি 'গোল টেবিল বৈঠকের' প্রস্তাব দেন। কিন্তু বড়লাট তখন উহাকে আর কোন আমলই দিলেন না। [দ্রষ্টব্য M. Azad-*India Wins Freedom*-pp. 17-18] বোম্বাইয়ে যুবরাজের অভ্যর্থনার দিন (১৭ই নভেঃ) সমর্থনকারী ও আন্দোলনকারীদের মধ্যে এক তীব্র সংঘর্ষ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়। কিন্তু কলিকাতায় যে দিন যুবরাজ আসিলেন, সেদিন (১৯শে নভেঃ) সারা মহানগরী পূর্ণ হরতাল পালন করিতেছে। একটি দোকানপাটও খোলা নাই;—রাস্তা জনমানবশূন্য,—কলিকাতা যেন মৃতমহানগরী।

ডিসেম্বর মাসে (২৭-২৮শে) আমেদাবাদে কংগ্রেসের (৩৬-তম বাৎসরিক) অধিবেশন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কারাগারে;—পূর্বেই তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁহার অবর্তমানে হাকিম আজমল খাঁ সভাপতিত্ব করেন। গান্ধীজী এই অধিবেশনে এন্ড্রুজকে একটি ধর্ম-সংক্রান্ত ভাষণ দিবার অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। এন্ড্রুজ পরিষ্কার জানাইয়া দিলেন, তিনি বিদেশী কাপড় পোড়ানো নীতিকে সমর্থন করেন না। সেই কথাটিই ঘোষণা করিবার জন্য যেন তিনি ইউরোপীয় পোষাক পরিহিত হইয়া সভামঞ্চে উপস্থিত হইলেন। অবশ্য সকলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁহার বক্তব্য শুনিলেন। দেশবন্ধুর লিখিত বক্তৃতা পাঠ করিলেন সরোজিনী দেবী। দেশবন্ধু তাঁহার ঐতিহাসিক ভাষণে স্বাধীনতার ও এক বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার আহ্বান জানাইয়াছিলেন। কারান্তরাল হইতে তিনি রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ-বিরোধী বক্তৃতার তীব্র সমালোচনা করিয়া তাঁহার ঐ ভাষণের শুরুতেই বলেন,

"We stand then for freedom, because we claim the right to develop our own individuality and evolve our own destiny along our lines, unembarrassed by what Western civilization has to teach us and unhampered by the institutions which the West has imposed on us. But here a voice interrupts me, the voice of Rabindranath, the poet of India. He says: 'The Western culture is standing at our door; must we be so inhospitable as to turn it away, or ought we not to acknowledge that in the union of the cultures of the East and the West is the salvation of the world?' I admit that if Indian nationalism has to live, it cannot afford to isolate itself from other nations, But I have two observa-

tions to make to the criticism of Rabindranath ; first we must have a house of our own before we can receive a guest ; and secondly, Indian culture must discover itself before it can be ready to assimilate Western culture. In my opinion, there can be no true assimilation before freedom comes, although there may be, as there has been, a slavish imitation. The cultural conquest of India is all but complete ; it was the inevitable result of her political conquest. India must resist it. She must vibrate with national life ; and then we may talk of union of the two civilizations."

[*Congress Presidential Addresses-Voll. II.* p. 538]

উল্লেখযোগ্য দেশবন্ধুর বক্তৃতার এই প্রথম অংশটুকু বাংলায় অনূদিত হইয়া 'নারায়ণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (দ্রঃ নারায়ণ ৮ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা—ফাল্গুন-১৩৬৮) অসহযোগতত্ত্ব 'নেতি-নেতি' বস্তুত ইহাতে দেশ বিশ্ব হইতে একক নির্বাসন লইবে, কবির এই বক্তব্যের সমালোচনা করিয়া দেশবন্ধু আরো বলেন,

" I feel bound to answer the questions which have been raised by these critics, and, in doing so, I must ask myself the question : 'What is non-co-opertion ?' I find it easier to answer the question by considering for a moment what is not non-co-operation. Non-co-operation is not a refusal to co-operate with the English people because they are English people. Non-co-operation does not advocate a policy of separation, a policy of isolation. Indeed, in our conflict with the forces of injustice and unrighteousness, we are not forgetting Him, to quote the words of Rabindranath : 'Who is without distinction of class or colour, and Who, with His varied Shakti makes true provision for the inherent need of each every class'. But before we can join the forces of the world in the missionary enterprise to uplift humanity, it is at least necessary that we should find fulfilment in self-realization and self-development ; for, it is only as a nation, that has realized itself, that we can hope to be of any service of humanity··· Like the various flowers in a garden, the nations must follow their own laws and work out their own destiny, so that in the end they might each and all contribute to the life and culture of humanity. In order that humanity may be served, the

ultimate unity realized, that essential something, which distinguishes one nation from another, which I may discribe as the individuality of the nation, must have unfettered growth. This is the essence of the doctrine of nationalism for which men have been ready to lay down their lives."···

[*Ibid*-pp. 549-50]

বলা বাহুল্য এ' চিন্তার সহিত রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের খুব একটা বিরোধ বা পার্থক্য নাই। 'শিক্ষার আহ্বান' ভাষণে কবি প্রকাশ্যেই জাতিসকলের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দাবী করিয়াছিলেন। আত্মস্বাতন্ত্র্যের আন্দোলন ও সংগ্রামে আন্তর্জাতিকতার আদর্শে ও পরিপ্রেক্ষিতটি আমরা বিস্মৃত হইব কেন,—এই ছিল কবির বক্তব্য। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনে যে উগ্র-স্বাদেশিকতা ও বিদেশী পণ্য বয়কটের উম্মাদনা আসিয়াছিল, কবির ভয় তাহাতেই। সেদিন সমগ্র ইংরেজ জাতির, এমনকি সমগ্র শ্বেতকায় মানুষের বিরুদ্ধে দেশবাসীর যে তীব্র ঘৃণা, বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল, এমনকি আধুনিক ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান ও সবকিছুকেই বর্জন ও দেশের সবকিছুকেই মাথায় তুলিয়া গর্বান্ধ উম্মত্ত নৃত্য শুরু হইয়াছিল, তাহাই কবিকে আতঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে এ' ধরণের সাময়িক জাতীয়তার উম্মাদনা দেশে অনিবার্য এবং উহা কিছুটা স্বাস্থ্যকরও। পরাধীন দেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যে একটি বিশেষ ঐতিহাসিক ও প্রগতিশীল ভূমিকা আছে—রাজনীতির এ' জটিলতত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের খুব ভাল বোধগম্য হয় নাই। কেননা রবীন্দ্রনাথ কবি,—এক মহান আদর্শবাদী ভাবুক কবি। কোন দেশের সাময়িকতার বা ঐতিহাসিক-প্রয়োজনে (historical necessity) সত্য মিথ্যার নিরূপণ হয়, রবীন্দ্রনাথ এ-তত্ত্ব মানিতে পারেন না ;—সত্যের একটি সার্বিক ও চিরন্তন-রূপ আবিষ্কার করাই ছিল তাঁহার সারা জীবনের এষণা ও সাধনা। পক্ষান্তরে দেশবন্ধু ভারতের স্বরাজ লাভের সঙ্গে আন্তর্জাতিক মানবতার লক্ষ্য ও আদর্শকে গ্রহণ করিলেও পৃথিবীর সব দেশ ও জাতি-সকলের স্বাধীনতা ও জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারকে উহার অতি আশু ও আবশ্যিক পূর্বসর্ত হিসাবে গণ্য করিবার আহ্বান জানাইতে বা সঠিক তাত্ত্বিক রূপদান করিতে সমর্থ হন নাই। 'সাম্রাজ্যবাদই প্রধান শত্রু' 'বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের অবসান চাই'—দেশবন্ধু একথাও পরিষ্কার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করিতে পারিলেন না।

আমেদাবাদ অধিবেশনের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, এই অধিবেশনেই মৌলানা হজরৎ মোহানি সর্বপ্রথম 'সর্বপ্রকার-বিদেশী-প্রভাবমুক্ত পূর্ণ-স্বাধীনতা কংগ্রেসের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ' (*Complete Independence, free from all foreign control*)—বলিয়া এক আন্দোলন তুলিবার আহ্বান জানাইলেন। বিস্ময়ের কথা, গান্ধীজী উহাতে অত্যন্ত বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়া উহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন,

"The levity with which the proposition has been taken by some of you has grieved me. It has grieved me because it shows lack of responsibility.···We shall be charged by the thinking portion of the world that we do not know really what we are. Let us understand too our limitations. Let Hindus and Muslims have absolute, indissoluble unity. Who is here who can say to-day with confidence : 'Yes Hindu-Muslim, unity has become an indissoluble factor of Indian Nationalism.···' Let us first of all gather up our strength, let us first of all sound our own depths. Let us not go into waters whose depths we do not know, and this proposition of Mr. Hasrat Mohani leads you into depths unfathomable."···

[*The History of the Congress*-Vol. I. p. 228.]

গান্ধীজীর এই প্রতিবন্ধকতার দুর্বল যুক্তি অনেকেই উপলব্ধি করিলেও তখন আর কেহ উচ্চবাচ্য করিতে সাহস করেন নাই, এমনকি দেশবন্ধু মতিলাল প্রমুখ নেতারাও না। বেশ কয়েক বৎসর পরে ১৯২৭ সালেই জওহরলাল মাদ্রাজ কংগ্রেসে এই প্রস্তাব পুনরায় উত্থাপন করেন। যথাস্থানে তাহা আলোচিত হইয়াছে।

আমেদাবাদ অধিবেশনের পর গভর্ণমেণ্টের দমন নীতি প্রবল হইয়া ওঠে। জানুয়ারীর (১৯২২) প্রথমদিকে শংকরণ নায়ারের মাধ্যমে পুনরায় একটি আপোষ-মীমাংসার প্রস্তাব হয় কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তাচ্ছিল্যের সহিত উহা প্রত্যাখ্যান করে, পূর্বেই তাহা উল্লেখ করিয়াছি। এদিকে আইন অমান্য আন্দোলনের প্রস্তুতি হিসাবে দেশের বিভিন্ন এলাকায় খাজনা-ট্যাক্স আদায় বন্ধ করিবার ব্যাপক উৎসাহ ও উত্তেজনা দেখা দেয়। 'ওয়ার্কিং-কমিটি' অবিলম্বে উহার তীব্র নিন্দা করিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এলাকায় জমিদারদের 'প্রাপ্য' খাজনা-ট্যাক্স মিটাইয়া দিবার নির্দেশ দিলেন (৩১শে জানুয়ারী); কিন্তু একমাত্র গান্ধীজীর নেতৃত্বে বরদৌলি তালুকেই আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু হইবার কথা ঘোষণা করা হয়। বলা বাহুল্য, ঐ এলাকায় রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত ছিল। ১লা ফেব্রুয়ারী গান্ধীজী বড়লাট রীডিংকে ঐ মর্মে এক চরম-পত্র দেন। সারা দেশ এক আসন্ন সংঘর্ষের আশংকায় উন্মুখ হইয়া উঠিল—সকলের দৃষ্টি বরদৌলির প্রতি নিবন্ধ।

এই সময় গুজরাটের কবি নানালাল দলপতরাম এই আন্দোলনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাঁহার মতামত জানিতে চাহিলেন। কবি দলপতরাম তাঁহার চিঠিতে লিখিলেন, (সাণ্টাক্রুজ—১লা ফেব্রুয়ারী ১৯২২),

"To-day is the frist of February···Fight between Government and civil disobedience seems unavoidable. A unique war between Satyagrahis unarmed and Government armed with

law and powder appears imminent: novel warfare to India and civilization, though not probably to Gandhiji, having fought in South Africa···Does it not become imperative duty of us the Independents to see, atleast, that both Indian Government and *Satyagrahis* remain *ahimsake* as in South Africa obedient to the rulers of warfare, equity and not violeting laws of humanity, which (the) Allies asked, though unsuccessfully, from Germany ? Have not both parties in India to respect non-violence equity and humanity ? Will the Independents rally together, and soon, at least, to this ? Is it, or is it not, our sacred duty towards the combatants, towards the Indians, and towards mankind ? History awaits a reply."

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জবাবে লিখিলেন,

"I believe in the efficacy of ahimsa as the means of overcoming the congregated might of physical force on which the political powers in all countries mainly rest. But like every-other moral principle ahimsa has to spring from the depth of mind and it must not be forced upon man from some outside appeal of urgent need. The great personalities of the world have preached love, forgiveness and non-violence, primarily for the sake of spiritual perfection and not for the attainment of some immediate success in politics or similar department of life. They were aware of the difficulty of their teaching being realised within a fixed period of time in a sudden and wholesale manner by men whose previous course of life had chiefly persued the path of self No doubt through a strong compulsion of desire for some external result, men are capable of repressing their habitual inclinations for a limited time, but *when it concerns an immense multitude of men of different traditions and stages of culture, and when the object for which such repression is exercised needs a prolonged period of struggle, complex in character, I cannot think it possible of attainment.* The conditions of South Africa (refering to the Passive Resistence of South Africa and those in India) are not nearly the same, and fully knowing the limitations of my powers I restrict myself to what I consider as my own vocation, never venturing to deal with blind forces which

I do not know how to control.

[*The Bengalee*,-3 Feb. 1922]

এখানেও গণ-সংগ্রাম সম্পর্কে কবির সেই চিরকালের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। অশিক্ষিত ও অসংগঠিত বিপুল সংখ্যক জণগণকে লইয়া প্রথমেই এমন একটি সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম চালনার সাফল্য সম্পর্কে কবির খুবই সন্দেহ ছিল। বিশেষ করিয়া এধরণের সত্যাগ্রহ-সংগ্রামের যখন কিছুমাত্র পূর্বপ্রস্তুতি নাই তখন তাহা হঠকারি প্রচেষ্টায় পর্যবসিত হইবে।

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের ঠিক একদিন পূর্বে কবি গান্ধীজীকে এমনই এক সতর্কবাণী করিয়া চিঠি লিখিয়াছিলেন আর আশ্চর্যের ব্যাপার এই চিঠির ঠিক দুইদিন পরে, ৫ই ফেব্রুয়ারী 'চৌরিচৌরা হত্যাকাণ্ড' ঘটিয়া যায়। প্রচণ্ড প্ররোচনা ও গুলিবর্ষণের মুখে সেদিনের সেই মিছিলের বিক্ষুব্ধ জনতা চৌরিচৌরা থানায় অগ্নিসংযোগ করিয়া প্রায় ২২ জন পুলিশকে জীবন্ত-দগ্ধ করে।

এই সংবাদে গান্ধীজী স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। ভগ্নকণ্ঠে গান্ধীজী বলিলেন,

"God has been abundantly kind to me. He has warned me the third time that there is not as yet in India that non-violent and truthful atmosphere which alone can justify mass disobedience···He warned me in 1919 when the Rowlatt Act agitation was started···But the bitterest humiliation was still to come···but God spoke clearly through Chauri Chaura···It was the bitterest cup of humiliation to drink.'···

[*Mahatma.-Vol. II* pp.82-83]

তীব্র অনুশোচনার মুখে তিনি আন্দোলন স্থগিত রাখিবার নির্দেশ দেন। ১২ই ফেব্রুয়ারী বরদৌলিতে গান্ধীজীর সভাপতিত্বে ওয়ার্কিং-কমিটির এক অধিবেশনে, আন্দোলন স্থগিত রাখিয়া কংগ্রেস কর্মীদের জন্য এক গঠনমূলক পরিকল্পনার নির্দেশ দেওয়া হয়।

এই সংবাদে কারাগারে চিত্তরঞ্জন, মতিলাল ও জওহরলাল নেহরু প্রমুখ নেতবৃন্দ অত্যন্ত বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইলেন। মতিলালজী গান্ধীকে আন্দোলন চালাইয়া যাইবার অনুরোধ জানাইয়া লিখিলেন,

'Why should, a town at the foot of the Himalayas be penalized, if a village at Cape Comorin failed to observe non-violence ? Isolate Chauri Chaura and Gorakhpur, but go on with civil disobedience, individual and mass.'

এই সংবাদে রবীন্দ্রনাথের মানসিক প্রতিক্রিয়া কি হয়, অনুমান করা শক্ত নয়। ঘটনাস্রোতের অনিবার্য এই পরিণতি তিনি যেন বহুপূর্বেই প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছিলেন। তাই রাজনৈতিক উত্তেজনা হইতে দূরে থাকিয়া

তিনি শান্তিনিকেতনে গঠনমূলক কার্যে আরো গভীরভাবে মনোনিবেশ করিতে চাহিলেন।

চৌরিচৌরার ঘটনা ৮ই ফেব্রুয়ারী প্রত্যুষে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ৫ই ফেব্রুয়ারী কবি কাদম্বিনী দেবীকে এক পত্রে লিখিতেছেন, (২২শে মাঘ-১৩২৮),

"ইংরেজের অত্যাচার সহ্য করতে হবে কিম্বা ভারতবর্ষ কোনদিন স্বাধীন হবার চেষ্টা করবে না এমন কথা আমি বলিনি। মহাত্মাজি বলেচেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যেই আমরা থাকব এবং সে রকম থাকবার ইচ্ছা না করা 'religiously wrong' অর্থাৎ ধর্মবিরুদ্ধ। আমি তা বলি নে। আমি বলি, স্বাধীনতা বাইরের কোন একটা ঘটনার উপর নির্ভর করে না; দেশের যে অবস্থা ঘটলে স্বাধীনতার মূলপত্তন হয়, স্বাধীনতা সত্য হয় সে অবস্থা ঘটাবার জন্যে চেষ্টা করাই আমাদের বর্তমান কর্তব্য। সে অবস্থা চরকা কেটেও হয় না, জেলে গিয়েও হয় না—তার সাধনা তার চেয়েও কঠিন ও বিচিত্র—তাতে শিক্ষার দরকার এবং দীর্ঘকালের তপস্যা চাই। হঠাৎ একটা কিছু করে বসা তপস্যা নয়। যে সব কাজে মনের সমস্ত শক্তির জাগরণ ও দীর্ঘকালের প্রাত্যহিক ত্যাগস্বীকার চাই সে কাজে যখন আমাদের ছেলেদের কোনো উৎসাহ দেখি নে যখন দেখি তারা নিরন্তর তীব্র হৃদয়াবেগের নেশায় মেতে থাকতে চায় 'তদা ন সংশে বিজয়ায়, সঞ্জয়।'……

[চিঠিপত্র-৭ম ॥ পৃঃ ১০৭]

গান্ধীজী মৌলানা হজরৎ মোহানীর 'পূর্ণ-স্বাধীনতা' দাবীর সমালোচনা করিয়া লিখিয়াছিলেন,

"But assuming that Great Britain alters her attitude, as I know she will when India is strong, it will be *religiously unlawful for us to insist on independence.*"…

[*Young India*-5 January-1922]

রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর এই উক্তির সমালোচনা প্রসঙ্গে চিঠিতে উহার উল্লেখ করিলেন। কিন্তু চিঠিতে কবি দীর্ঘকালের যে তপস্যার কথা বলিলেন, কী সেই তপস্যা?

পরদিন ৬ই ফেব্রুয়ারী (২৩শে মাঘ-১৩২৮) এলমহার্স্টের উদ্যোগে সুরুল গ্রামে শ্রীনিকেতন 'গ্রাম পুনর্গঠন কেন্দ্র' (Rural reconstruction) স্থাপিত হয়। বিশ্বভারতীর ইতিহাসে এই দিনটি খুবই স্মরণীয়। স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতেই রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশী সমাজ' অর্থাৎ গ্রাম পুনর্গঠনের কর্মসূচী গ্রহণ করার জন্য দেশের নেতাদের নিকট পুনঃ পুনঃ আবেদন করিয়াও কোন সাড়া পান নাই। এখন তিনি এলমহার্স্টের সহযোগিতায় উহার কার্য বা বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করিয়া দিলেন। কবির বক্তব্য, দেশের একটি জায়গায় যদি এই রকম একটি আদর্শ গ্রাম পুনর্গঠন কেন্দ্রকে সফল করিয়া তুলিতে পারা যায়, তাহা হইলে একদিন উহার প্রতি সারা দেশের নজর পড়িবে এবং উহা গ্রহণ করিবে। সেইজন্য তিনি বহু আক্ষেপেই কাদম্বিনী দেবীকে

লিখিয়াছিলেন, "আমি দেশের জন্যে কি রকম কাজ করতে চাই তার চিহ্ন বিশ্বভারতীতে কিছু রেখে যাব আশা আছে—তা কোন তর্কের দ্বারা পরিস্ফুট হবে না।" এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রজীবনীকার লিখিতেছেন,

"দেশের কাজ বলিতে রবীন্দ্রনাথ যাহা বুঝিতেন তাহাকে মূর্তি দিবার জন্য শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠা। কবি হইলেও রবীন্দ্রনাথ জমিদার; বহুবৎসর জমির সহিত ও চাষীর সহিত তাঁহার নিবিড় যোগ ছিল। তিনি ভালো করিয়াই জানিতেন যে ভারতের সর্বাপেক্ষা বড়ো সমস্যা কৃষি। দেশের জনসংখ্যা প্রতিবৎসরই কিছু-না-কিছু বাড়িতেছে; অথচ কৃষির উপযোগী জমি অফুরন্ত নহে। সুতরাং ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়াইতে না পারিলে, পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য জোগাইয়া মানুষকে শক্তিমান করিতে না পারিলে, দেশের মূল সমস্যার সমাধান হইবে না।

"শ্রীনিকেতনে এলমহার্স্টের সহিত এই সব বিষয় লইয়া প্রায়ই আলোচনা হয়, নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে অনেক সমস্যা, অনেক সমাধানের কথা তাঁহাকে বলেন। এলমহার্স্ট সেখানে কবি রবীন্দ্রনাথের অন্য একটি রূপ দেখেন। এলমহার্স্ট বলিতেন যে, মানুষ ভূমিলক্ষ্মীর বিত্ত-অপহারী; মাটি হইতে সে তাহার সমস্ত খাদ্য সংগ্রহ করে, কিন্তু মাটিকে পর্যাপ্ত পরিমাণে তাহার খাদ্য সে ফিরাইয়া দেয় না। ফলে মাটি নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে এবং চারিদিকের খাদ্যাভাব ও খাদ্যাভাবজনিত ব্যাধি মৃত্তিকার মানব-সন্তানকে দুর্বল করিয়া ফেলিতেছে। এই সকল কাজের কথার আলোচনা চলে রবীন্দ্রনাথের মনের এক কোঠায়; মনের অন্য কোঠায় কবিচিত্ত তথ্য ও তত্ত্ব হইতে সংগ্রহ করে রস।··· আজও দেখি মাটির তত্ত্ব সর্বপ্রাণ-আধার ধরিত্রীর রহস্য কবিচিত্তকে নূতন রসে অভিষিক্ত করিতেছে। জড় মৃত্তিকা ভেদ করিয়া যে প্রাণতরঙ্গ উদ্ভাসিত—তাহার রহস্য অন্তরের বিস্ময়ে গীতে ও ছন্দে মুক্তি পাইল।"

[রবীন্দ্র-জীবনী-তৃতীয় খণ্ড ॥ পৃঃ ৯৩]

রবীন্দ্রজীবনীকার বলিতেছেন, এই ভাব হইতে কবি এই সময় 'মাটির ডাক' কবিতা ও 'ফিরে চল মাটির টানে' গানটি রচনা করেন (২৩ ফাল্গুন-১৩২৮)। কিন্তু তবুও এই কথাটি স্মরণ রাখা দরকার, শ্রীনিকেতন গ্রাম পুনর্গঠন কেন্দ্র হইতেছে রবীন্দ্রনাথের গান্ধীজীর চরকার একটি নীরব ও নম্রনিষ্ঠ জবাব। সেই কথাটিই আরো পরিষ্কার করিয়া তিনি কাদম্বিনী দেবীকে পরের একটি চিঠিতে লিখিলেন, (২৮শে ফেব্রু-১৯২২-১৬ই ফাল্গুন-১৩২৮),

"তুমি আমাকে ভুল বুঝেচ। দেশ সম্বন্ধে আমাদের কিছুই করবার নেই এ কথা আমি কখনই বলি নে। কিন্তু উন্মত্ত হয়ে কিছু একটা করাই কর্তব্য এ আমি মানতে পারি নে। সেই মাতামাতির একটা সুখ আছে তা জানি কিন্তু ফল না থাকতে পারে।···

···"দেশে আগুন লেগেচে অতএব ইত্যাদি' এ কথা কিছুকাল থেকে শুনচি —এ আগুন বহু বহু শতাব্দী থেকেই লেগেচে—কিন্তু 'আড়ি, আড়ি, আড়ি, আড়ি' বলে চীৎকার করবার জন্যে ছেলেরা লেখাপড়া এবং বুড়োরা কাজকর্ম

ছেড়ে দিলেই এ আগুন নিবুবে এ কথা বিশ্বাস করি নে। চরকা চালিয়ে খদ্দর পরে' এই আগুন নিবুবে এটা এতবড় একটা ছেলেভোলানো কথা যে, এ কথায় দেশসুদ্ধ লোক ভুলেচে দেখে হতবুদ্ধি ও হতাশ হতে হয়। সন্ন্যাসী বলচে তামাকে সোনা করবার একটা সহজ প্রক্রিয়া আমি জানি, আমি বলুচি সোনা যথানিয়মে উপার্জন করতে হবে অন্য কোন প্রক্রিয়া নেই…চরকা চালিয়ে কোনো ফল হয় না এ কথা কেউ বলে না, তার যেটুকু ফল তাই হয় তার বেশি হয় না। কুইনিন্ খেলে ম্যালেরিয়া সারে, ম্যালেরিয়া সারলে দেশের পরম উপকার ঘটে, কিন্তু কুইনিন খেলে স্বরাজ হয় একথা কুইনিন বিক্রির মহাজনও বলে না।"

[চিঠিপত্র-৭'ম খণ্ড ।। পৃঃ ১০৯-১০]

১০ই মার্চ গান্ধীজী গ্রেপ্তার হইলেন। ১৮ই মার্চ আমেদাবাদে গান্ধীজীর বিরুদ্ধে মামলা শুরু হয়। গান্ধীজী তাঁহার নিজ স্কন্ধে সমস্ত দোষ গ্রহণ করিয়া বিচারপতির নিকট কঠিন শাস্তির জন্য আবেদন জানাইয়া তাঁহার ঐতিহাসিক স্বীকারোক্তিতে বলিলেন,

…"I knew that I was playing with fire…I know that my people have sometimes gone mad. I am deeply sorry for it and I am, therefore, here to submit not to a light penalty but to the highest penalty. I do not ask for mercy."…

বিচারে গান্ধীজীর ছয় বৎসর কারাগার হয়। 'ওয়ার্কিং-কমিটি'র এক জরুরী অধিবেশনে দেশকে শান্ত থাকিবার আহ্বান জানাইয়া, চরকা, খাদি, এবং অস্পৃশ্যতা-ও মাদকদ্রব্য-বর্জন প্রভৃতি গঠনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু রায়তদের প্রতি জমিদার-মহাজনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেশকর্মীদের রায়তদের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইবার এমন কি জমিদারদেরও সরকারী রাজস্ব বন্ধ রাখার কোন নির্দেশ তাঁহারা দিলেন না। ওয়ার্কিং-কমিটির এই গঠনমূলক কর্মসূচীতে একটি প্রধান ত্রুটি থাকিয়া যায়। উহাতে গ্রামের কৃষি উৎপাদন-সমস্যা ও ভূমিসমস্যা এবং কৃষকসমস্যা সম্পর্কে একটি কথাও বলা হয় নাই। আর জমিদারী ব্যবস্থা যে জগদ্দল পাহাড়ের মত গ্রামের চাষীর বুকে চাপিয়া বসিয়া আছে,—উহাই যে ভারতের জনগণের অন্যতম প্রধান শত্রু ও প্রকাণ্ড বাধা এ'কথাও গান্ধীজী প্রমুখ কংগ্রেসনেতৃবৃন্দ ঘোষণা করিলেন না। পরন্তু আন্দোলন চলিবার মুখে দেশের বিভিন্ন স্থানে কৃষকেরা জমিদারদের খাজনা-ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করিয়া দেয়। ওয়ার্কিং-কমিটি উহার নিন্দা করিয়া জমিদারদের প্রাপ্য বা তাহাদিগকে দেয় খাজনাদি মিটাইয়া দেওয়ার নির্দেশ দেন। অথচ রায়তওয়ারী এলাকায় ইংরেজ গভর্ণমেণ্টকে খাজনা বা রাজস্ব বন্ধের আহ্বান জানান হয়। স্বয়ং গান্ধীজী ও সর্দার প্যাটেল বরদৌলিতে এই রাজস্ব ও ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ওয়ার্কিং-কমিটির বরদৌলি-সিদ্ধান্তে (১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯২২) পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া হয়,

"Complaints having been brought to the notice of the Working Committee that ryots are not paying rents to the

zemindars, the Working Committee advises Congress workers and organisations to inform the ryots that such withholding of rents is contrary to the resolutions of the Congress and that it is injurious to the best interests of the country.

"The Working Committee assures the zemindars that the Congress movement is in no way intended to attack their legal rights and that even where the ryots have grievances the Committee's desire is that redress should be sought by mutual consultations and by the usual rescourse to arbitrations."

[*Indian National Congress*-(1920-23)-p. 178]

রবীন্দ্রনাথের আর্থনীতিক-চিন্তায় কৃষি উৎপাদন সমস্যাই প্রাধান্য পায়। তাছাড়া তিনি গ্রামের সামগ্রিক সমস্যার কথা চিন্তা করিয়াই গ্রাম পুনর্গঠনের কর্মসূচী গ্রহণ করেন। তিনি অবশ্য জমিদারি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তখনই আক্রমণ বা সমালোচনা করিলেন না। কিন্তু জমিদাররাই যে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের আসল খুঁটি বা স্তম্ভ এ কথা তিনি খুব পরিষ্কার বুঝিতেন। জনৈকা মহিলা শান্তিনিকেতনে যখন চরকা না-কাটার জন্য কবির নিন্দাবাদ করিয়া যান তখন কবি অত্যন্ত বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়া প্রমথ চৌধুরীকে এক চিঠিতে লিখিলেন,

[১৮ই কার্তিক ১৩২৮]

•..."আশ্চর্যের. বিষয় এই যে,...নিজে চরকা কাটে না—সে মনে করে তার পক্ষে ওটা জরুরি নয়। চরকা যদি নাও কাটে তাহলে অন্তত ওর উচিত প্রতিদিন চরকা কেটে যে আয় হয় তাতেই জীবিকানির্বাহ করে' তার বেশি সমস্তই দেশকে দান করা। আমি আমার একটা কর্তব্য স্থির করে বসেচি—অন্তত তার জন্যে আমি নিজের লোকসান করতে ছাড়িনি—শুধুই যদি বাক্যব্যয় করতুম তাহলে জীবনের হিসাবের খাতায় জমাখরচের কোন কোঠায় সেটা কি রকম অংকপাত করত? যাঁরা বাংলা দেশের জমিদার তাঁরা যতক্ষণ সদর খাজনা জুগিয়ে নিজের জীবিকা ও আরামের সংস্থান করতে চান ততক্ষণ অন্যলোককে ত্যাগস্বীকার করতে বলতেই পারেন না। আমি আমার এক চিঠিতে বড়দাদাকে এই কথাটা স্মরণ করিয়েছিলাম। বাংলাদেশে জমিদারদের চেয়ে গবর্ণমেণ্টের বড় কর্মচারী আর কে আছে?" [চিঠিপত্র-৫ম খণ্ড। পৃঃ ২৭২]

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজ আনিবার জন্য আন্দোলন করিতেছেন, তাঁহাদের উচিত জমিদার ও ভূস্বামীদেরও সদরখাজনা জমা বন্ধ করার আহ্বান জানান,—এই ছিল কবির বক্তব্য। যেটা বিশেষভাবে লক্ষণীয়, কবি এই সময়ে রচিত তাঁর 'মুক্তধারা' রূপক-নাট্যে স্বৈরাচারী রাজার বিরুদ্ধে খাজনা বন্ধ আন্দোলনের অবতারণা এবং তাকে মহিমান্বিত করেন।

মুক্তধারা

১৩২৮ সালে পৌষের শেষভাগে রবীন্দ্রনাথ 'মুক্তধারা' নাটকটি রচনা করেন।

'মুক্তধারা'র আখ্যানভাগ বা গল্পাংশ সকলেরই সুপরিচিত। এই নাটকটি রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাট্য বা উল্লেখযোগ্য রূপকনাট্যগুলির অন্যতম। কিন্তু 'মুক্তধারা'র সেই গভীর তত্ত্বকথাটি কী? এই সম্পর্কে স্বয়ং কবির কৈফিয়ৎ ও ব্যাখ্যাটি স্মরণ রাখা দরকার। কয়েকমাস পরে কবি শ্রীকালিদাস নাগকে নাটকটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখিতেছেন (২১ বৈশাখ ১৩৬৯),

…"তোমার চিঠিতে তুমি machine সম্বন্ধে যে আলোচনার কথা লিখেছ সেই machine এই নাটকের একটা অংশ। এই যন্ত্র প্রাণকে আঘাত করছে, অতএব প্রাণ দিয়েই সেই যন্ত্রকে অভিজিৎ ভেঙেছে, যন্ত্র দিয়ে নয়। যন্ত্র দিয়ে যারা মানুষকে আঘাত করে তাদের একটা বিষম শোচনীয়তা আছে—কেননা যে-মনুষ্যত্বকে তারা মারে সেই মনুষ্যত্ব যে তাদের নিজের মধ্যেও আছে—তাদের যন্ত্রই তাদের নিজের ভিতরকার মানুষকে মারছে। আমার নাটকের অভিজিৎ হচ্ছে সেই মারনেওয়ালার ভিতরকার পীড়িত মানুষ। নিজের যন্ত্রের হাত থেকে নিজে মুক্ত হবার জন্যে সে প্রাণ দিয়েছে। আর ধনঞ্জয় হচ্ছে যন্ত্রের হাতে মারখানেওয়ালার ভিতরকার মানুষ। সে বলছে, 'আমি মারের উপরে; মার আমাতে এসে পেঁছয় না—আমি মারকে না-লাগা দিয়ে জিতব, আমি মারকে না-মার দিয়ে ঠেকাব।' যাকে আঘাত করা হচ্ছে সে সেই আঘাতের দ্বারাই আঘাতের অতীত হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু যে-মানুষ আঘাত করছে আত্মার ট্র্যাজেডি তারই—মুক্তির সাধনা তাকেই করতে হবে, যন্ত্রকে প্রাণ দিয়ে ভাঙবার ভার তারই হাতে। পৃথিবীতে যন্ত্রী বলছে 'মার লাগিয়ে জয়ী হব'। পৃথিবীতে মন্ত্রী বলছে, 'হে মন, মারকে ছাড়িয়ে উঠে জয়ী হও।' আর নিজের যন্ত্রে নিজে বন্দী মানুষটি বলছে, 'প্রাণের দ্বারা যন্ত্রের হাত থেকে মুক্তি পেতে হবে মুক্তি দিতে হবে। যন্ত্রী হচ্ছে বিভূতি, মন্ত্রী হচ্ছে ধনঞ্জয়, আর মানুষ হচ্ছে অভিজিৎ।"… [রবীন্দ্র রচনাবলী-১৪'শ খণ্ড ।। পৃঃ ৫৩২-৩৩]

স্বয়ং কবির এই ব্যাখ্যার পর অন্য ব্যাখ্যা বা মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু তবুও বলিতে হইবে, যন্ত্র সম্পর্কে এইটিই রবীন্দ্রনাথের চূড়ান্ত বক্তব্য নয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার বিজ্ঞান ও যন্ত্রকে গ্রহণ করিবার প্রশ্নে অতি অল্প বয়স হইতেই কবিমানসে একটি দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা যায়। কখনও তিনি উহাকে গ্রহণ করিতেছেন, কখনও বা নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে বর্জন করিতে চাহিতেছেন। এ'সব কথা আমরা পূর্ব খণ্ডেই বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। তাছাড়া অসহযোগ আন্দোলনে গান্ধীজীর খাদি ও চরকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া তিনি পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিজ্ঞানের সপক্ষে মত প্রকাশ করিতে-ছিলেন। আর গ্রামাঞ্চলে সমবায় প্রথায় কৃষিতে যন্ত্রবিজ্ঞান প্রবর্তনের জন্য

তখনও তিনিই আন্দোলন তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। সুতরাং উহার সহিত 'মুক্তধারা'র বক্তব্যের সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য কোথায় ?

কিন্তু 'মুক্তধারায়' যন্ত্র সম্পর্কে কবির বক্তব্য বুঝিতে কষ্ট হয় না। কবি যে ঠিক যন্ত্রকে অস্বীকার করিতেছেন তাহা নয়। অর্থাৎ কবির আক্রমণের লক্ষ্য ঠিক 'যন্ত্র' নয় ; যন্ত্র-ব্যবস্থা অর্থাৎ কিনা পুঁজিবাদ। এই যন্ত্র-ব্যবস্থাকেই 'নেশন্-রূপী *machine*' ও '*organization*' বলিতেছেন, আর ইহারই বিরুদ্ধে সারা জীবন তিনি আপসহীন সংগ্রাম করিয়াছেন। প্রাণগঙ্গার-মুক্তধারার উৎসমুখেই এই যন্ত্রব্যবস্থা যেন অতিকায় বাঁধ বাঁধিয়া তাহাকে অবরুদ্ধ করিতে চাহিতেছে। যন্ত্র-ব্যবস্থারূপী এই বাঁধ ভাঙ্গিয়া তিনি দুরন্ত প্রবাহমান প্রাণশক্তির মুক্তি দিবার আহ্বান জানাইলেন 'মুক্তধারা'য়।

কিন্তু ধনঞ্জয় যেখানে বলিতেছে, "যে শক্তি দুরন্ত তাকে বেঁধে ফেলা কি কম কথা ? তা সে অন্তরেই হোক বাহিরেই হোক।"—এখানে কি তিনি যন্ত্রশক্তির মহিমা প্রচার করেন নাই ? যন্ত্র-উপাসকদের মুখে তিনি যে যন্ত্রমহিমা-সঙ্গীত গাহিলেন,

"নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র।
তুমি চক্রমুখরমন্দ্রিত,
তুমি বজ্রবহ্নিবন্দিত
তব বস্তুবিশ্ববক্ষোদংশ
ধ্বংস বিকট দন্ত
তব দীপ্ত অগ্নি শত শতঘ্নী
বিঘ্নবিজয় পন্থ।
তব লৌহগলন, শৈলদলন
অচল-চলন মন্ত্র
কভু কাষ্ঠলোষ্ট্রইষ্টকদৃঢ়
ঘনপিনদ্ধ কায়া,
কভু ভূতল-জল-অন্তরীক্ষ-
লঙ্ঘন লঘুমায়া,
তব খনি-খনিত্র-নখ-বিদীর্ণ
ক্ষিতি বিকীর্ণ-অন্ত্র
তব পঞ্চভূত-বন্ধনকর
ইন্দ্রজাল তন্ত্র।"

এখানে কি তিনি যন্ত্রবিজ্ঞানের 'পঞ্চভূত-বন্ধনকর ইন্দ্রজাল তন্ত্রকারী মহাশক্তি'র মহিমা প্রচার করেন নাই ? 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে তিনি এই শক্তির জয়গান গাহিয়াছেন। কিন্তু যন্ত্র যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রাণশক্তিকে আঘাত করে ততক্ষণ পর্যন্তই তিনি ইহাকে স্বীকার বা গ্রহণ করিতে রাজী আছেন। সেই কথাই তিনি '*The Modern Age*' নামক বক্তৃতায় পরিষ্কার বলিলেন,…"It must not be (machine-লেখক) permitted to occupy more than its

legitimate place and power in society, not to have the liberty to desecrate the poetry of life, to deaden our sensitiveness to ideals, bragging of its own coarseness as a sign of virility."

[*Creative Unity*-p. 118]

এ সব কথা পূর্বেই বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে।

এই নাটকেও 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকটির মত অত্যাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রজা বা গণ-বিদ্রোহের ইঙ্গিত আছে। এমন কি 'প্রায়শ্চিত্তের' ধনঞ্জয় বৈরাগীকেই বিদ্রোহী-অধিনায়কের ভূমিকায় আনা হইয়াছে।

"রণজিৎ—···খাজনা দেবে কি না, বলো।

ধনঞ্জয়—না, মহারাজ, দেব না।

রণজিৎ—দেবে না? এত বড়ো আস্পর্ধা?

ধনঞ্জয়—যা তোমার নয় তা তোমাকে দিতে পারব না।

রণজিৎ—আমার নয়?

ধনঞ্জয়—আমার উদ্বৃত্ত অন্ন তোমার, ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়।

রনজিৎ—তুমিই প্রজাদের বারণ কর খাজনা দিতে?

ধনঞ্জয়—ওরা তো ভয়ে দিয়ে ফেলতে চায়, আমি বারণ করে বলি, প্রাণ দিবি তাঁকেই প্রাণ দিয়েছেন যিনি।"

এই কথাই 'প্রায়শ্চিত্তে'র ধনঞ্জয়ও বলে।

এখানে আরও একটি লক্ষ্য করিবার বিষয়, কবি অন্ধ গণবিদ্রোহকে কিংবা 'অবতারবাদ' বা 'ব্যক্তিপূজা'কে সমর্থন করিলেন না। বিদ্রোহীদের লক্ষ্য করিয়া ধনঞ্জয় বলিল,

—"আমার জোরেই কি তোদের জোর? একথা যদি বলিস তাহলে যে আমাকে সুদ্ধ দুর্বল করবি।

গণেশ—ওকথা বলে আজ ফাঁকি দিয়ো না। আমাদের সকলের জোর একা তোমারই মধ্যে।

ধনঞ্জয়—তবে আমার হার হয়েছে। আমাকে সরে দাঁড়াতে হল।"

ধনঞ্জয় রাজাকে বলিল—"ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছে, রাজা।

রণজিৎ—কিসের ভাবনা?

ধনঞ্জয়—তোমার চণ্ডপালের দণ্ড লাগিয়ে যা করতে পার নি আমি দেখছি তাই করে বসে আছি। এতদিন ঠাউরেছিলুম আমি ওদের বলবুদ্ধি বাড়াচ্ছি; আজ মুখের উপর বলে গেল আমিই ওদের বলবুদ্ধি হরণ করেছি।

রণজিৎ—এমনটা হয় কী করে?

ধনঞ্জয়—ওদের যতই মাতিয়ে তুলেছি ততই পাকিয়ে তোলা হয় নি আর কি।···ওরা ভাবে আমি বিধাতার চেয়ে বড়ো, তাঁর কাছে ওরা যা ধারে আমি যেন তা নামঞ্জুর করে দিতে পারি। তাই চক্ষু বুজে আমাকেই আঁকড়ে থাকে।

রণজিৎ—ওরা যে তোমাকেই দেবতা বলে জেনেছে।

ধনঞ্জয়—তাই আমাতেই এসে ঠেকে গেল, আসল দেবতা পর্যন্ত পৌঁছোল না। ভিতরে থেকে যিনি ওদের চালাতে পারতেন বাইরে থেকে তাঁকে রেখেছি ঠেকিয়ে।

রণজিৎ—রাজার খাজনা যখন ওরা দিতে আসে তখন বাধা দাও, আর দেবতার পূজো যখন তোমার পায়ের কাছে এসে পড়ে তখন তোমার বাজে না?

ধনঞ্জয়—ওরে বাপরে। বাজে না তো কী। দৌড় মেরে পালাতে পারলে বাঁচি। আমাকে পূজো দিয়ে ওরা অন্তরে অন্তরে দেউলে হতে চলল, সে দেনার দায় যে আমারও ঘাড়ে পড়বে, দেবতা ছাড়বে না।

রণজিৎ—এখন তোমার কর্তব্য?

ধনঞ্জয়—তফাতে থাকা। আমি যদি পাকা করে ওদের মনের বাঁধ বেঁধে থাকি, তা হলে তোমার বিভূতিকে আর আমাকে ভৈরব যেন এক সঙ্গেই তাড়া লাগান।··· [রবীন্দ্র রচনাবলী-১৪'শ খণ্ড ॥ পৃঃ ২১৫-১৮]

ধনঞ্জয়ের মুখে এই কথাগুলি যেন গান্ধীজী ও দেশের নেতৃবর্গকেই উদ্দেশ্য করিয়া লেখা। 'সত্যের আহ্বানে' তিনি এই কথাই অন্যভাবে বলিয়াছেন,

···"তার (স্বরাজ-লেখক) যথার্থ ভিত্তি আমাদের মনের উপর, সেই মন তার বহুধাশক্তির দ্বারা এবং সেই আত্মশক্তির উপর আস্থা দ্বারা স্বরাজ সৃষ্টি করতে থাকে।···সকল দেশেই কোনো না কোনো অংশে লোভ বা মোহের প্ররোচনায় বন্ধনদশা থেকে গেছে। কিন্তু, সেই বন্ধনদশার কারণ মানুষের চিত্তে। সে-সকল দেশে নিরন্তর এই চিত্তের উপর দাবি করা হচ্ছে। আমাদের দেশেও সেই চিত্তের বিকাশের উপরেই স্বরাজ দাঁড়াতে পারবে। তার জন্যে কোনো বাহ্য ক্রিয়া, বাহ্য ফল নয়, জ্ঞান বিজ্ঞান চাই।···যুক্তির পরিবর্তে উক্তি তো কোনোমতেই চলবে না। মানুষের মুখে যদি আমরা দৈববাণী শুনতে আরম্ভ করি, তা হলে আমাদের দেশে যে হাজার রকমের মারাত্মক উপসর্গ আছে এই দৈববাণী যে তারই মধ্যে অন্যতম ও প্রবলতম হয়ে উঠবে।···"

[কালান্তর ॥ পৃঃ ২০৯-১০)

যৌবনের সূচনাকাল হ'তেই কবি ব্যাপক জনশিক্ষা ও জনচেতনা বৃদ্ধির কর্মসূচী গ্রহণের জন্য দেশনেতাদের উদ্দেশে আবেদন জানাইয়া আসিতে-ছিলেন।

প্রসঙ্গত স্মরণ রাখা দরকার, 'মুক্তধারা' নাটকে কবি গণ-আন্দোলন এবং গণ-বিদ্রোহকেই মহিমান্বিত করিয়াছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিতে এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। অসহযোগ আন্দোলনের সময় দেশের বিভিন্ন স্থানে খাজনা-ট্যাক্স-বন্ধ আন্দোলনের সূচনা হয়; এটাও বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার।

গান্ধীজী ও নেতারা প্রায় সকলেই কারাগারে। দেশের আন্দোলন স্তিমিত প্রায়।

১৮ই মার্চ লেভিদস্পতি গবেষণাকার্যের জন্য নেপাল যাত্রা করেন। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে। দেশের পরিস্থিতিতে তাঁহার মনও বিচলিত। গ্রীষ্মের মন্থর অলস দিনগুলি কাটে কাব্য ও সঙ্গীত রচনায়,—সব কিছু মিলাইয়া এক সময় নিস্পৃহ ঔদাসীন্যে তিনি যেন গা ঢালিয়া দিতে চাহিলেন। এই সময় কালিদাস নাগকে এক চিঠির জবাবে লিখিতেছেন, (১৬ই বৈশাখ, ১৩২৯),—

"পৃথিবীতে একদল লোক আছে যারা কাজ করে আর একদল লোক আছে যারা খেলা করে। তোমরা মনে করো না যে একদলেরই দরকার আছে অন্য দলের নেই বা প্রথম দল শ্রেষ্ঠ এবং শেষের দল নিকৃষ্ট।

"আমার শেষ পত্রে তোমাকে আভাস দিয়েছিলুম যে আমি হচ্চি জগতের খেলাঘরের মানুষ। শুনে তোমার মনে হল আমি বুঝি স্বাভাবিক বিনয়গুণে নিজেকে খাটো করে দেখলুম।…তুমি ত জান আমি বিশ্বজনের সামনে আমার অন্তর্যামিনীকে বলেচি, 'আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।' কথাটা বিশ্বাসই করলে না! কিম্বা হয়ত ঠাওরেচ, দেবী আমার আবেদন নামঞ্জুর করে দিয়েচেন—অতএব আমাকে দেশ উদ্ধার করতেই হবে—এই শেষ বয়সে চরকা এবং খদ্দর প্রচার করে আমার জীবনলীলা সমাধা হবে! বাল্যকাল থেকেই আমার আত্মীয় স্বজন আমার আশা ছেড়ে দিয়েচেন—তুমি কেহে—হঠাৎ আমার উপর তোমার শ্রদ্ধা কি করে হল!…

"তুমি এক সাক্ষী করেচ বিশ্বভারতী। হায় রে তুমি কবি হয়েও ওর স্বরূপটা বুঝতে পারলে না! ওটা কি কাজ? ওটা আমার কাজ কাজ খেলা। সেইজন্যেই ত আমাদের দেশের প্রবীণ কাজের লোকে কেউ ওকে গ্রাহ্যই করলে না।…তারা বলে দেশে আগুন লেগেচে, তোমার বালতি কোথায়? আমি অকিঞ্চন তার জবাবে মাথা চুলকিয়ে বলি; আমার বালতি নেই, কেবল ফুঁ আছে। শুনে তারা বোঝে আমি দলের লোক নই। কিন্তু সে কথা বুঝে তাদের মন শান্ত হয় না। কারণ যারা দল-চর জীব, দলে না-থাকাটাকেই তারা অপরাধ বলে গণ্য করে। এ জন্মে সে অপরাধের ক্ষালন আমার দ্বারা হবে না।…শেষ বয়সে বিশ্বভারতী নাম দিয়ে একটা মস্ত খেলা ধরেচি। যাবার বেলায় হয়ত ও পুতুলটাকেও ভেঙে দিয়ে যেতে হবে—এমন অনেক পুতুলকে ত ভেঙেচি।…আমার দরবারের অধিষ্ঠাত্রী আমাকে কাজে পাঠাতে চান না—কাছে রাখতেই চান।"

[শান্তিনিকেতন পত্রিকা-অগ্রহায়ণ ১৩২৯ ।। পৃঃ ১৩২-৩২]

এর মধ্যে একটা কটাক্ষ ও শ্লেষ আছে। গান্ধীজী কবিকে লেখেন—

'When a house is on fire, all the inmates go out, and each one takes up a bucket to quench the fire.' কবির বক্তব্য ও তাঁহার বিশ্বভারতীর তাৎপর্য নেতারা বুঝিতে না-পারার জন্য একটা চাপা ক্ষোভ ও অভিমানও হয়ত কিছুটা প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু ইহাতে কবি-মানসের বিশেষ দিকটিও কি পরিস্ফুট হইয়া ওঠে নাই ?

এই সময় ডঃ কালিদাস নাগ কবিকে একটি পত্রে দেশের হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান কিসে তাহা জানাইবার জন্য অনুরোধ করেন। কবি জবাবে লিখিলেন (৭ই আষাঢ়-শান্তিনিকেতন পত্রিকা-শ্রাবণ ১৩২৯ ॥ পৃঃ ৮২-৮৪ ,

"পৃথিবীতে দুটি ধর্মসম্প্রদায় আছে অন্য সমস্ত ধর্মমতের সঙ্গে যাদের বিরুদ্ধতা অত্যুগ্র—সে হচ্ছে খৃস্টান আর মুসলমান ধর্ম। তারা নিজের ধর্মকে পালন করেই সন্তুষ্ট নয়, অন্য ধর্মকে সংহার করতে উদ্যত। এইজন্যে তাদের ধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া তাদের সঙ্গে মেলবার অন্য কোনো উপায় নেই।··· অপর পক্ষে হিন্দুজাতিও এক হিসাবে মুসলমানদেরই মতো। অর্থাৎ, তারা ধর্মের প্রাকারে সম্পূর্ণ পরিবেষ্টিত। বাহ্য প্রভেদটা হচ্ছে এই যে, অন্য ধর্মের বিরুদ্ধতা তাদের পক্ষে সকর্মক নয়—অহিন্দু সমস্ত ধর্মের সঙ্গে তাঁদের non-violent, non-co-operation। হিন্দুর ধর্ম মুখ্যভাবে জন্মগত ও আচার-মূলক হওয়াতে তার বেড়া আরো কঠিন। মুসলমানধর্ম স্বীকার ক'রে মুসলমানের সঙ্গে সমানভাবে মেলা যায়, হিন্দুর সে পথও অতিশয় সংকীর্ণ। আহারে ব্যবহারে মুসলমান অপর সম্প্রদায়কে নিষেধের দ্বারা প্রত্যাখ্যান করে না, হিন্দু সেখানেও সতর্ক। তাই খিলাফতের উপলক্ষ্যে মুসলমান নিজের মসজিদে এবং অন্যত্র হিন্দুকে যত কাছে টেনেছে হিন্দু মুসলমানকে তত কাছে টানতে পারেনি। আচার হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের সেতু, সেইখানেই পদে পদে হিন্দু নিজের বেড়া তুলে রেখেছে।···ভারতবর্ষের এমনি কপাল যে, এখানে হিন্দু-মুসলমানের মতো দুই জাত একত্র হয়েছে—ধর্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয়, আচারে প্রবল ; আচারে মুসলমানের বাধা প্রবল নয়, ধর্মমতে প্রবল। ···এরা কী করে মিলবে ?"

তিনি বলিলেন, "সমস্যা তো এই, কিন্তু সমাধান কোথায় ?"

তাহার উত্তরে তিনি লিখিলেন,

"মনের পরিবর্তনে, যুগের পরিবর্তনে। য়ুরোপ সত্যসাধনা ও জ্ঞানের ব্যাপ্তির ভিতর দিয়ে যেমন ক'রে মধ্যযুগের ভিতর দিয়ে আধুনিক যুগে এসে পৌঁচেছে, হিন্দুকে মুসলমানকেও তেমনি গণ্ডির বাইরে যাত্রা করতে হবে। ধর্মকে কবরের মতো তৈরি করে তারই মধ্যে সমগ্র জাতিকে ভুতকালের মধ্যে সর্বতোভাবে নিহিত করে রাখলে উন্নতির পথে চলবার উপায় নেই, কারও সঙ্গে কারও মেলবার উপায় নেই। আমাদের মানসপ্রকৃতির মধ্যে যে অবরোধ রয়েছে তাকে ঘোচাতে না পারলে আমরা কোনো রকমের স্বাধীনতাই পাব না। শিক্ষার দ্বারা, সাধনার দ্বারা সেই মূলের পরিবর্তন ঘটাতে হবে।···হিন্দু-মুসলমানের মিলন যুগপরিবর্তনের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু এ কথা শুনে ভয় পাবার

কারণ নেই, কারণ অন্য দেশে মানুষ সাধনার দ্বারা যুগপরিবর্তন ঘটিয়েছে, গুটির যুগ থেকে ডানা মেলার যুগে বেরিয়ে এসেছে। আমরাও মানসিক অবরোধ কেটে বেরিয়ে আসব; যদি না আসি তবে, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

[কালান্তর ॥ পৃঃ ৩১৬-১৭]

রেনেসাঁস,-রিফমেশনের পরবর্তী যে-যুগান্তকারী দর্শন-চেতনা ইউরোপের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ক্ষেত্রভূমি প্রস্তুত করিয়াছিল, স্পষ্টতই কবি সেই দর্শন ও শিক্ষা-চেতনা জনগণের মধ্যে অবাধ বিস্তারিত করিবার কর্মসূচী গ্রহণ করিতে বলিলেন। 'বেঙ্গল রেনেসাঁসের' সেই মহান আরব্ধ ব্রতকে সম্পন্ন করার জন্য কবি অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃবর্গের কাছে এমনি করিয়াই বারে বারে আবেদন জানাইতেছিলেন।

এই সময় রোলাঁর নিকট হইতে এক পত্রে তিনি জানিতে পারেন, ইতালিতে '*International League of Women for Peace and Liberty*' নামক একটি সঙ্ঘের অধিবেশন হইতেছে এবং ডঃ কালিদাস নাগ ও দিলীপ রায় ভারতের পক্ষ হইতে উহাতে প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন। ডঃ নাগ এই সম্মেলনে '*Greater India—A Study in Indian Internationalism*' বিষয়ের উপর একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। সম্মেলনের খবর দিয়া ডঃ নাগ কবিকে এক পত্রে লিখিতেছেন,

…"যুদ্ধ যখন চল্‌ছে তার মধ্যে রোলাঁ ও তাঁর সহকর্মীরা একটি আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন; তার মধ্যে বিশেষভাবে বিভিন্ন দেশের নারী শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করা হয় নূতন ভাবে নূতন সমাজের উদ্বোধন করবার আশায়;…এর নাম হচ্ছে '*The International League of Women for Peace and Liberty*'—রোলাঁর ভগ্নী এই সঙ্ঘের একজন মস্ত কাজের মানুষ; ইনি আমায় দলে টেনে আনলেন।…এবার জার্মানী ও ইতালীর সীমান্তে Varese বলে একটি স্থানে কংগ্রেস বস্‌বে; অনেক দেশ থেকে প্রতিনিধি আসছেন। ফ্রান্স থেকে রোলাঁর বন্ধুরা. ইংলন্ড থেকে Bertrand Russel এবং অন্যান্য দেশের স্বাধীন বেপরোয়া মানুষরা একত্র হচ্ছেন; এশিয়া থেকে মাত্র একজন জাপানী আছেন তাই এঁদের ইচ্ছা ভারতবর্ষ থেকে একজন ভারতবাসী কিছু পড়েন। এ বছর এঁদের বৈঠকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, *Internationalism in human culture.*' *Symposium*-টি খুবই মনে লেগেছে আমার"…

[শান্তিনিকেতন পত্রিকা-শ্রাবণ-১৩২৯ ॥ পৃঃ ৮০-৮১]

এই সময় অক্সফোর্ডের আইনশাস্ত্রের অধ্যাপক P. Vinogradoff কবিকে এক পত্রে রাশিয়ার বুদ্ধিজীবীদের জন্য কিছু অর্থসংগ্রহ করিয়া দিবার অনুরোধ জানান। কবি বিনীতভাবে তাঁহার অক্ষমতার কথা জানাইয়া দিয়াও ভিনো-গ্রাদফের পত্রখানি প্রকাশিত করিয়া বলিয়াছিলেন, যে সমস্ত লোক যতটুকু সাহায্য করিবেন তাহা পত্রলেখকের ঠিকানায় পাঠাইয়া দেওয়া হইবে।

এই সব নূতন খবরেও কবির সৃষ্টিকার্য ব্যাহত হইতেছে না। বর্ষার আগমনে কবির মনে যেন গানের ধারা নামিয়াছে। এই সময় তিনি বর্ষামঙ্গলের

অজস্র গান রচনা করিতেছেন। ২২শে শ্রাবণ এক মনোরম পরিবেশে 'বর্ষামঙ্গল' অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। পরদিন লেভি দম্পতি কলিকাতা যাত্রা করেন। কলিকাতায় উঁহাদের বিদায়-সম্বর্ধনার পর এক আলোচনাসভায় কবি বলিলেন, (১৩ই আগস্ট ?)

"বর্তমান যুগে ইতিহাস হঠাৎ যেন নূতন দিকে বাঁক নেবার চেষ্টা করচে। কেন? আপনার জাতির একান্ত উৎকর্ষের জন্য যারা নিয়ত চেষ্টা করছে হঠাৎ তাদের মধ্যে মুষল পর্ব কেন দেখা দিলে?...মানুষের সত্য হচ্ছে—আপনাকে অনেকের মধ্যে লাভ করলে তবেই সে আপনাকে লাভ করে। এতদিন ছোট সীমার মধ্যে এই সত্য কাজ করছিল। ভৌগোলিক বেষ্টন যতদিন পর্যন্ত সত্য ছিল, ততদিন সেই বেষ্টনের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার জাতির সকলের সঙ্গে মিলনে নিজেকে সত্য বলে অনুভব করার দ্বারা বড় হয়েছে। কিন্তু বর্তমান যুগে সে বেড়া ভেঙ্গে গেছে; জলে স্থলে দেশে দেশে যে সকল বাধা মানুষকে বাহির থেকে বিভক্ত করেছিল সে সব ক্রমশ অপসারিত হচ্চে।...আকাশযানের উৎকর্ষ ক্রমে ঘটবে, তখন পৃথিবীর সমস্ত স্থূল বাধা মানুষ ডিঙিয়ে চলে যাবে, দেশগত সীমানার কোন অর্থই থাকবে না।

"ভুগোলের সীমা ক্ষীণ হয়ে মানুষ পরস্পরের কাছে এসে দাঁড়িয়েচে। কিন্তু এতবড় সত্যটা আজও বাহিরের সত্য হয়েই রইল। মনের ভিতরে এ সত্য স্থান পেলে না।...

"বর্তমান যুগে যে সত্যের আবির্ভাব হয়েছে তার কাছে সত্যভাবে না গেলে মার খেতে হবে। তাই আজ মারামারি বেধেছে, নানা জাতির মিলনের ক্ষেত্রেও আনন্দ নেই, শান্তি নেই। কাটাকাটি, মারামারি, সন্দেহ, হিংসা যে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে তাতেই বুঝছি যে সত্যের সাধনা হচ্ছে না। যে-সত্য আজ মানব-সমাজদ্বারে অতিথি তাঁর অভ্যর্থনার সাধনা বিশ্বভারতী গ্রহণ করচে।...দেশ-বিদেশের তাপস এই বিশ্বভারতীতে আসন গ্রহণ করুন। আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা এই কথা আমরা আশ্রমে বসে বলব। ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক ঐক্যসাধনার যে তপস্যা করচেন সেই তপস্যাকে এই আধুনিক যুগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে তবেই আমাদের সমস্ত অগৌরব দূর হবে, বাণিজ্য করে নয়, লড়াই করে নয়, সত্যকে স্বীকার করার দ্বারাই তা হবে। মনুষ্যত্বের সেই পূর্ণ গৌরব সাধনের আয়োজনে বিশ্বভারতী আজ হতে নিযুক্ত হোক, এই আমাদের সংকল্প।"

[শান্তিনিকেতন পত্রিকা-১৩২৯ পৌষ ॥ পৃঃ ১৪৩-৪৫]

কিছুকাল পরে কবি দক্ষিণ-ভারত ও সিংহল ভ্রমণে বাহির হইলেন (২০ সেপ্টেঃ ১৯২২)। প্রায় তিন মাস কাল বোম্বাই, মাদ্রাজ ও সিংহলের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণের পর অবশেষে গান্ধীজীর সবরমতী আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিলেন (৪ঠা ডিসেম্বর)। গান্ধীজী, যারবেদা কারাগারে। কবি গান্ধীজীর প্রতি তাঁহার ব্যক্তিগত গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি নিবেদন করিয়া আশ্রমে এক ভাষণে বলিলেন,

"মহাত্মাজি, যখন দুই বৎসর পূর্বে এই আমেদাবাদে আপনাদের সহিত

বাস করিতেছিলেন, তখন আমি একবার এই আশ্রমে আসিয়াছিলাম। তদবধি দিনের পর দিন ধরিয়া আমি সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম যে, কবে আবার মহাত্মার পদরজঃপূত আশ্রম দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইব।...

"আপনারা সকলে এই আশ্রমে স্বার্থবলিদান করিয়া বাস করিতেছেন। আপনারা 'সত্য' কী তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। প্রবৃত্তিতে মানুষকে পশু করিয়া তোলে, নিবৃত্তিই দেবত্ব গঠনের সহায়ক, এই 'সত্য' আপনারা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন।

"ত্যাগ কাহাকে বলে? ত্যাগের অর্থ এই যে, মানুষের দেহটাই প্রকৃত জীবন নহে, আত্মাই প্রকৃত জীবন। পশুর সহিত এই যে পার্থিব জীবন আমরা যাপন করি, এই জড় জগতই কেবল জগত নহে, কিন্তু আমাদের মধ্যে ইহাপেক্ষা আরও উচ্চতর যে জীবন লুক্কায়িত আছে, সেই জীবনের জন্য আরও উচ্চতর জগতের প্রয়োজন। আমাদের এই লুক্কায়িত জীবন অবিনশ্বর—অমর, অক্ষয় ও অব্যয়। যে ব্যক্তি এই জড় জগতের স্বার্থকে জয় করিতে পারিয়াছে কেবল সেই-ই সেই অমর জীবন উপভোগ করিতে পারে।...ত্যাগ যদি সত্যসত্য অবলম্বন করা হয় তবে তাহা অমর জগতে মানুষকে লইয়া যায়। এই ত্যাগ অবলম্বন করিতে গেলে কঠোর তপস্যা চাই। এই আশ্রমে আপনারা সেই তপস্যায় নিমগ্ন আছেন। আপনারা নিশ্চয়ই অমৃতলোকের অধিকারী হইবেন।

"মহাত্মাজি আজ আপনাদের মধ্যে নাই, কিন্তু তাঁহার আত্মা আপনাদের মধ্যেই বিরাজ করিতেছে। মহাত্মাজি আত্মাকে বিশুদ্ধ করিতে বলিয়াছেন। এই আত্মাশুদ্ধিতেই আপনাদের মুক্তি নিহিত। মহাত্মাজির বাণী শুধু আপনাদের মধ্যেই আবদ্ধ নাই; তাহা বিশ্বের সর্বত্র বিস্তৃত হইয়াছে। অতএব মহাত্মাকে 'বিশ্বকর্মা' বলা যাইতে পারে। তিনিই অসীম, তাঁহার জ্যোতি আজ সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। প্রতি বিশ্বমানবের হৃদয়ে মহাত্মার জন্য রত্ন-সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।...ব্রহ্মা স্বয়ং ত্যাগ স্বীকার করিয়া এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ত্যাগের দ্বারাই সৃষ্ট হয়—কখনও ধ্বংস হয় না। আমরা এই সত্যটুকু হৃদয়ংগম করিতে পারিলে মহাত্মার হৃদয়ের সহিত আপন হৃদয় এক যোগ-সূত্রে বাঁধিতে পারিব এবং তখন প্রকৃত মহাত্মার কর্মের অংশী বলিয়া গণ্য হইব।"

[তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-১৮৪৪ শক (১৮২৯) মাঘ ॥ পৃঃ ২৬৩-৬৪]

গান্ধীজীর সহিত তাঁহার রাজনীতিক মত পার্থক্য বিস্তর। কিন্তু অধ্যাত্ম-বিশ্বাসের উভয়ের মতৈক্যও কিছুটা ছিল। আর তাছাড়া, কবির আশ্রম-পরিদর্শন তাঁহার ব্যক্তিগত রাজনীতিক মতাদর্শ ব্যাখ্যা-প্রচারের অনুকূল উপলক্ষও নহে। তাছাড়া, গান্ধীজী কারাগারে। আশ্রমবাসীদের নৈতিক মনোবল ও উৎসাহদান করাই কবি সর্বপ্রথম প্রয়োজনীয় বিষয় বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তবুও একটি জিনিস লক্ষ্য না করিয়া পারা যায় না;—কবি-মানসের মধ্যে আধ্যাত্মিক-মানুষটা একটা কিছু উপলক্ষ পাইলেই যেন আবেগ উচ্ছ্বাসে সহজ ও স্বাভাবিক ভাব রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন না, এবং বিশেষ করিয়া যখন গান্ধীজীর প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। পাশ্চাত্যের হিংসা-দ্বেষ, যুদ্ধ, হানাহানি, বিদ্রোহ, বিপ্লব ও সশস্ত্র সংঘর্ষের

বিরুদ্ধে গান্ধীজী যেন এক মূর্ত চ্যালেঞ্জ। মানুষের জীবন-সংগ্রামকে তিনি হিংসা ও শারীরিক বলপ্রয়োগের ক্ষেত্র হইতে আদর্শ ও নৈতিক ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার সংগ্রাম ও সাধনায় নিমগ্ন। গান্ধীজীর এই মূর্তিকে কবি বারম্বার সশ্রদ্ধ প্রণাম ও অভিনন্দন জানাইয়াছেন।

পৌষ উৎসবের পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলেন। ৮ই পৌষ প্রাতে আম্রকুঞ্জে তাঁহার ভাষণে কবি বলিলেন,

…"মানুষের সঙ্গে মানুষের, জাতির সঙ্গে জাতির ভেদ বিভেদ নিয়ে যারা মাতামাতি করেছে, তারা সত্যের বিরোধী হয়েছে। তারা মনে করেছে ভেদ বুদ্ধিকে জয়ী করেই বুঝি মানুষের শ্রীবৃদ্ধি হয়। আমরাও আজকের দিনে ঈর্ষাভরে ভেবেছি এই ভেদবুদ্ধির সাধনা করেই আমরা ধনী হব, মানী হব, প্রবল হব।…

…"সেই মূলের বিনাশমূর্তি মানুষ আজ উপলব্ধি করচে। জাতিগত বিরোধ বুদ্ধিকে যারা পূজার সামগ্রী করেছিল মানুষ দেখেছে অপঘাতে তাদের অভিভব হল। নিজে বড় হব, নিজের জাতকে বড় করব এ অহমিকার দ্বারা মানুষের ভাল হয় না।"… [শান্তিনিকেতন পত্রিকা-পৌষ .৩২৯ ॥ পৃঃ ১৪২-৪৩]

অল্পকাল পরে গয়া-কংগ্রেস অধিবেশন। অক্টোবরের শেষভাগেই চিত্তরঞ্জন মতিলাল নেহরু প্রমুখ প্রবীণ নেতৃবৃন্দের প্রায় সকলেই মুক্তি পান। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন গয়া-কংগ্রেসের (ডিসেম্বর—১৯২২) সভাপতি। তিনি তাঁহার ভাষণে এক বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদী আদর্শের কথা ঘোষণা করিলেন,

"What is the ideal which we must set before us? The first and foremost is *the ideal of nationalism.* Now what is nationalism? It is, I conceive, a process through which a nation expresses itself and finds itself, not in isolation from other nations, not in opposition to other nations, but as part of a great scheme by which, in seeking its own expression and therefore its own identity, it materially assits the self-expression and self-realisation of other nations as well: Diversity is as real as unity. And in order that unity of the world may be established it is essential that each nationality should proceed on its own lire and find fulfilment in self-expression and self-realisation. The nationality of which I am speaking must not be confused with the conception of nationality as it exists in Europe to-day. Nationalism in Europe, is an aggressive nationalism, a selfish nationalism, a commercial nationalism, of gain and loss. The gain of France is the loss of Germany and the gain of Germany is the loss of France…That is European nationalism; that is not the nationa'ism of which

I am speaking to you to-day. I contend that each nationality constitutes a particular stream of the great unity, b.t no nation can fulfil itself unless and until it becomes itself and at the same time realise its identity with Humanity."...

[*Congress Presidential Addresses-Vol. II.* pp. 568-69]

বলা বাহুল্য মাত্র, রাজনীতিক এ'সব তত্ত্বগত কথা কিছুটা রবীন্দ্রনাথকেই উপলক্ষ ও উদ্দেশ্য করিয়া। এক বৎসর পূর্বে আলিপুর কারাগার হইতে তাঁহার ভাষণে যে-কথা হয়ত খুব পরিষ্কার গুছাইয়া লিখিতে পারেন নাই তাহাই এখন সুসম্বদ্ধ তত্ত্বাকারে রূপদান করিবার চেষ্টা করিলেন। দেশবন্ধু আরও পরিষ্কার ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার মতে ইউরোপের *aggressive nationalism* নয়, যথার্থ সুস্থ *nationalism* চাই আর এই সুস্থ জাতীয়তার আদর্শের সহিত বিশ্বশান্তি ও বিশ্বমানবতার আদর্শের কোনই বিরোধ নাই পরন্তু উহারা পরস্পরের পরিপূরক—এবং শুধু তাহাই নহে, এই সুস্থ জাতীয়তাই বিশ্বশান্তির অতি-অবশ্য পূর্বশর্ত মাত্র। তাই তিনি বলিলেন,

..."I desire to emphasise that there is no hostility between the ideal of nationality and that of world peace. Nationalism is the process through which alone will world peace come. A full and unfettered growth of nationalism is necessary for world peace just as a full and unfettered growth of individuals is necessary for nationality. It is the conception of aggressive nationality in Europe that stands in the way of world peace; but once the truth is grasped that it is not possible for a nation to inflict a loss on another nation without at the same time inflicting a loss on itself, the problem of Humanity is solved. The essential truth of nationality lies in this, that it is necessary for each nation to develop itself, express itself and realise itself, so that Humanity itself may develop itself, express itself and realise itself."...

তাই তিনি অত্যন্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন,

"We have, therefore, to foster the spirit of Nationality. True development of the Indian nation must necessarily lie in the path of 'Swaraj.'...*The question of all questions in India to-day is the attainment of Swaraj.*" (The italics is mine)

[*Congress Presidential Addresses. Vol. II.* pp. 570-71]

কংগ্রেসের সভামণ্ড হইতে ইতিপূর্বে ঠিক এই কথা এই দৃষ্টিভঙ্গিতে আর কোন দেশনেতাকে ঘোষণা করিতে দেখা যায় নাই।

সাম্রাজ্যবাদী দেশ ও পরাধীন দেশগুলির 'জাতীয়তাবাদী' আন্দোলনের মধ্যে

চিত্তরঞ্জন এক সুস্পষ্ট পার্থক্য ও সীমারেখা টানিয়া দিলেন। পরাধীন দেশের 'জাতীয়তাবাদী' আন্দোলনকে তিনি প্রগতিশীল বলিয়া অভ্যর্থনা জানাইলেন। আসলে 'জাতীয়তাবাদ' ও 'জাতীয় আত্ম-স্বাতন্ত্র্য'কে সমার্থক বলিয়া মনে করাতেই চিত্তরঞ্জনের গোল বাধিয়াছিল।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পরাধীন দেশের জাতীয় স্বাধীনতা ও আত্ম-স্বাতন্ত্র্যকে অস্বীকার কিংবা উপেক্ষা করেন নাই। 'শিক্ষার মিলন' শীর্ষক ভাষণে কবি পূর্বেই স্পষ্ট ঘোষণা করিয়াছিলেন পূর্বেই তাহা উল্লেখ করিয়াছি। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করিয়াও আন্তর্জাতিকতার আদর্শ গ্রহণ করা যায়, ইহাই কবির বক্তব্য। জাতীয়তা ও জাতীয় সংস্কৃতির নামে উহার উচ্ছ্বাস-উম্মাদনাকেই কবি সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। ভারতবর্ষ তাহার জাতীয় সাধনায় আন্তর্জাতিক সংস্কৃতিকে গ্রহণ করুক,—কবি এই কথাই বলিতে চাহিলেন। কিন্তু কবি রাজনীতিক মুক্তি অপেক্ষাও গঠনমূলক কার্য ও সাংস্কৃতিক সাধনার উপরই যেন অত্যধিক গুরুত্ব (*over-emphasis*) আরোপ করিতে চাহিয়াছিলেন। এইখানেই ছিল রবীন্দ্রনাথের রাজনীতিক চিন্তার প্রধান বৈশিষ্ট্য। অবশ্য কবির এই গঠনমূলক কার্যে বেশী করিয়া আত্মনিয়োগ করারও কারণ আছে। পূর্বেই তাহা উল্লেখ করিয়াছি।

গয়া-কংগ্রেসের পূর্বেই কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে তীব্র মত পার্থক্য দেখা দেয়। একদল নাগপুর ও বরদৌলি সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করিয়া কাউন্সিলে প্রবেশ করিতে চাহিলেন অপর পক্ষ এই পরিবর্তনের বিরোধিতা করিতে চাহিলেন। অর্থাৎ কাউন্সিল প্রবেশ বা বর্জন লইয়াই আসল মতপার্থক্য দাঁড়ায়। দেশবন্ধু, মতিলাল নেহরু, হাকিম আজমল খাঁ, সর্দার বীঠল ভাই প্যাটেল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ কাউন্সিল প্রবেশ করিতে চাহিলেন। ইঁহারা 'সিন্‌ফিন্' কৌশল অবলম্বন করিয়া কাউন্সিল দখল করিয়া ভিতর হইতে কাউন্সিলকে বানচাল ও অচল করিয়া দিবার কথা বলিলেন। চিত্তরঞ্জন তাঁহার ঐ ঐতিহাসিক ভাষণে বলিলেন,

…"Hitherto we have been boycotting the Councils from outside…But though we have succeeded in doing much, these Councils are still there. It should be the duty of the Congress to boycott the Councils more effectively from within. Reformed Councils are really a mask which the Bureaucracy has put on. I conceive it to be our clear duty to tear this mask from off their face."… [*Ibid*-p. 589]

রাজা গোপালাচারী ও রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ নেতৃবর্গ ইহার তীব্র প্রতিবাদ ও বিরোধিতা করিয়া পূর্ণ-অসহযোগ ও কাউন্সিল বয়কটের প্রস্তাব আনিলেন। তাঁহাদের প্রধান যুক্তি, দেশবন্ধুর ঐ প্রস্তাব গৃহীত হইলে গান্ধীজীর প্রতি অনাস্থা ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হইবে। বিপুল ভোটাধিক্যে রাজা গোপালাচারীর প্রস্তাব গৃহীত হইল। প্রায় সাথে সাথেই মতিলাল নেহরু ও চিত্তরঞ্জন প্রমুখ নেতারা এই নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রায়-বিদ্রোহ করিয়া 'স্বরাজ্যদল' নামে একটি নূতন দল

প্রতিষ্ঠা করিলেন (১লা জানুয়ারী ১৯২৩)।

রবীন্দ্রনাথ স্থির করিয়া বসিয়াছেন, রাজনীতি লইয়া তিনি আর মাথা ঘামাইবেন না। বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতনই যেন তাঁহার সকল চিন্তা অধিকার করিয়াছে।

লেভিদম্পতি চলিয়া যাওয়ার অল্পকাল পরেই আসিলেন বিখ্যাত জার্মান ও চেক্ সংস্কৃতভাষাবিদ্দ্বয়, ডঃ উইণ্টারনীজ ও ডঃ লেসনি (M. Winternitz ও V Lesny)। প্রায় সাথে সাথেই আসিলেন ডঃ স্টেলা ক্রামরিশ শান্তিনিকেতনের আর্ট-ক্রিটিসিজমের অধ্যাপকরূপে। মিস্ ফ্লাউম (Miss Schlomith Flaum) নামে জনৈকা শিশুশিক্ষা-পারদর্শী বিদূষী ইহুদী মহিলা আসিয়া শান্তিনিকেতনের শিশুবিভাগের পরিচালনা কার্যে সহায়তা করিতে লাগিলেন। এ'ছাড়া রুশ পণ্ডিত বগ্দানফ্, 'প্যাট্রিক গেডিস, এণ্ড্রুজ, পিয়ার্সন ও এলম্‌হার্স্ট প্রভৃতি বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিভাগের কার্যে সাহায্য করিতে লাগিলেন। নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার ও সুরেন্দ্রনাথ কর কলাভবনের দায়িত্বভার গ্রহণ করিলেন। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথও মাঝখানে আসিয়া বিশ্বভারতীর পরিচালন কার্যে পরামর্শাদি দিয়া যান। কলিকাতা হইতে সরোজকুমার দাস, অশোক চট্টোপাধ্যায় ও প্রশান্ত মহলানবিশ নিয়মিতভাবে আসিয়া বিভিন্ন বিভাগে অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। বিশ্বভারতীর ইতিহাসে এই পর্বটিকে স্বর্ণযুগ বলা যাইতে পারে। বস্তুত, ইতিপূর্বে ইংরেজশাসিত ভারতের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়েই এতো সব আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মনীষী ও বিশেষজ্ঞকে একযোগে অধ্যাপনা করিতে দেখা যায় নাই। কবির আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা এইভাবে ধীরে ধীরে স্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিতে লাগিল। যেটা বিশেষভাবে লক্ষণীয়, কবি 'বিশ্বভারতী'কে দেশের আর দশটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত মামুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার চেষ্টা করেন নাই। একেবারে শুরু থেকেই তাকে আন্তর্জাতিকতার আদর্শবাদের দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, যেখানে আন্তর্জাতিক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর সকল দেশের ছাত্র-শিক্ষক ও গবেষকরা শিক্ষাগ্রহণ ও গবেষণা-চর্চা করিবেন।

তাছাড়া এলম্‌হার্স্টের নেতৃত্বে শ্রীনিকেতন পল্লী-উন্নয়ন কেন্দ্রে নব-নব পরিকল্পনার পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। এই কার্যে সহায়তা করিতে আসিলেন মিস্ গ্রেটচেন্ গ্রীন্ নামক-জনৈকা মার্কিণ মহিলা। তিনি গ্রামের স্বাস্থ্য ও সেবা বিভাগের কাজে সাহায্য করিতে লাগিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই সময় হইতেই সমবায় আন্দোলনের উপর খুবই গুরুত্ব দিতে শুরু করেন। সম্ভবত এই সময় শ্রীনিকেতনের বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠানের দিনই তিনি 'সমবায়' (২) নামক প্রবন্ধটি পাঠ করেন। পরে উহা বঙ্গবাণী পত্রিকায় প্রকাশিত (বঙ্গবাণী ফাল্গুন ১৩২৯) হয়। স্মরণ রাখা দরকার ইহার প্রায় চার বৎসর পূর্বে 'সমবায়' নামে অপর একটি প্রবন্ধে তিনি সমবায় আন্দোলনের উপর প্রথম গুরুত্ব দেন। পূর্বেই তাহা উল্লেখ করিয়াছি।

এই প্রবন্ধে কবি অধুনাকালের শ্রেণী-সংগ্রাম এবং ধন-উৎপাদন ও বণ্টন

সমস্যার বিস্তারিত পর্যালোচনা করিলেন। তিনি বলিলেন,

"পৃথিবীর প্রায় সকল সমাজেই একটা জায়গায় এই বাধা ঘটে। সে হচ্ছে অর্থোপার্জনের কাজে। এইখানে মানুষের লোভ তার সামাজিক শুভবুদ্ধিকে ছাড়িয়ে চলে যায়। ধনে বা শক্তিতে অন্যের চেয়ে আমি বড়ো হব, এই কথা যেখানেই মানুষ বলেছে সেইখানেই মানুষ নিজেকে আঘাত করেছে; কেননা, পূর্বেই বলেছি কোনো মানুষই একলা নিজেতে নিজে সম্পূর্ণ নয়। সত্যকে যে আঘাত করা হয়েছে তার প্রমাণ এই যে, অর্থ নিয়ে, প্রতাপ নিয়ে, মানুষে মানুষে যত লড়াই, যত প্রবঞ্চনা।...

"ধর্মের উপদেশ ব্যর্থ হয়েছে ব'লেই সকল সমাজেই ধন ও দৈন্যের দ্বন্দ্ব একান্ত হয়ে রয়েছে ব'লেই, যাঁরা এই অকল্যাণকর ভেদকে সমাজ থেকে দূর করতে চান তাঁদের অনেকেই জবর্দস্তির দ্বারা লক্ষ্যসাধন করতে চান। তাঁরা দস্যুবৃত্তি ক'রে, রক্তপাত ক'রে, ধনীর ধন অপহরণ করে সমাজে আর্থিক সাম্য স্থাপন করতে চেষ্টা করেন। এসমস্ত চেষ্টা বর্তমান যুগে পশ্চিম মহাদেশে প্রায় দেখতে পাওয়া যায়। তার কারণ হচ্ছে, পশ্চিমের মানুষের গায়ের জোরটা বেশি, সেইজন্যেই গায়ের জোরের উপর তার আস্থা বেশি; কল্যাণসাধনেও সে গায়ের জোর না খাটিয়ে থাকতে পারে না। তার ফলে অর্থও নষ্ট হয়, ধর্মও নষ্ট হয়। রাশিয়ায় সোভিয়েট রাষ্ট্রনীতিতে তার দৃষ্টান্ত দেখতে পাই।"

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই হিংসা ও বলপ্রয়োগের নীতিতে বিশ্বাস করিতেন না। এইকারণেই তিনি সোভিয়েটের কমিউনিষ্ট নীতির সমর্থন করিতে পারিলেন না। তাই তিনি বলিলেন,

"অতএব ধর্মের দোহাই বা গায়ের জোরের দোহাই এই দুয়ের কোনোটাই মানবসমাজের দারিদ্র্য-মোচনের পন্থা নয়।...সাধারণের দারিদ্র্য-হরণের শক্তি ধনীর ধনে নেই।

"সে আছে সাধারণের শক্তির মধ্যেই। এই কথাটা জানা চাই, এবং তার দৃষ্টান্ত সকলের কাছে সুস্পষ্ট হওয়া চাই। কৃত্রিম উপায়ে ধনবণ্টন করে কোনো লাভ নেই, সত্য উপায়ে ধন উৎপাদন করা চাই। জনসাধারণে যদি নিজের অর্জন-শক্তিকে একত্র মেলাবার উদ্যোগ করে তবে এই কথাটা স্পষ্ট দেখিয়ে দিতে পারে যে, যে মূলধনের মূল সকলের মধ্যে তার মূল্য ব্যক্তি-বিশেষের মূলধনের চেয়ে অসীমগুণে বেশি। এইটি দেখাতে পারলেই তবে মূলধনকে নিরস্ত্র করা যায়, অস্ত্রের জোরে করা যায় না।"...

এই প্রবন্ধে কবি শুধু সোভিয়েট রাশিয়ার শাসন-ব্যবস্থারই সমালোচনা করিলেন না; সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমেরিকা ও ইউরোপের অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশগুলির শাসন-ব্যবস্থার সমালোচনা করিলেন। এই সমস্ত দেশে গণতান্ত্রিক শাসন-নীতি প্রচলিত থাকিলেও—উহা প্রকৃত গণতন্ত্র নহে; অর্থাৎ জনগণের গণতন্ত্র নহে—উহা মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীর গণতন্ত্র। তাই তিনি বলিলেন,

..."এই রাজতন্ত্র উঠে গিয়ে আজ অনেক দেশে গণতন্ত্র বা ডিমক্রাসির প্রাদুর্ভাব হয়েছে। এই ডিমক্রাসির লক্ষ্য এই যে, প্রত্যেক প্রজার মধ্যে যে আত্ম-

শাসনের ইচ্ছা ও শক্তি আছে তারই সমবায়ের দ্বারা রাষ্ট্রশাসনশক্তিকে অভিব্যক্ত করে তোলা। আমেরিকার যুক্তরাজ্য এই ডিমক্রাসির বড়াই করে থাকে।

"কিন্তু যেখানে মূলধন ও মজুরির মধ্যে অত্যন্ত ভেদ আছে সেখানে ডিমক্রাসি পদে পদে প্রতিহত হতে বাধ্য। কেননা, সকল-রকম প্রতাপের প্রধান বাহক হচ্ছে অর্থ। সেই অর্থ-অর্জনে যেখানে ভেদ আছে সেখানে রাজপ্রতাপ সকল প্রজার মধ্যে সমানভাবে প্রবাহিত হতেই পারে না। তাই য়ুনাইটেড স্টেটস্‌'এ রাষ্ট্রচালনার মধ্যে ধনের শাসনের পদে পদে পরিচয় পাওয়া যায়। টাকার জোরে সেখানে লোকমত তৈরি হয়, টাকার দৌরাত্ম্যে সেখানে ধনীর স্বার্থের সর্বপ্রকার প্রতিকূলতা দলিত হয়। একে জনসাধারণের স্বায়ত্তশাসন বলা চলে না।"

[সমবায়নীতি ॥ পৃঃ-১৫-১৮]

এইখানে কবির দৃষ্টিভঙ্গির সহিত বলশেভিক কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গির অদ্ভুত মিল ও সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। লেনিন এই 'বুর্জোয়া-ডিমক্রাসি'র স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া বলিলেন,

…"But this democracy is always restricted by the narrow framework of capitalist exploitation, and consequently always remains, in reality, a democracy for the minority, only for the possessing classes, only for the rich. Freedom in capitalist society always remains about the same as it was in the ancient Greek republics: freedom for the slave-owners. Owing to the conditions of capitalist exploitation the modern wage-slaves are so crushed by want and poverty that 'they cannot be bothered with democracy', 'they cannot be bothered with politics'; in the ordinary peaceful course of events the majority of the population is debarred from participating in social and political life.

"Democracy for an insignificant minority, democracy for the rich—that is the democracy of capitalist society."…

[*Selected Works. Vol. II.*-P. 200]

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ capital-এর প্রভুত্ব ও শ্রেণী-সংগ্রামের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও কমিউনিস্টদের সশস্ত্র-বিপ্লব ও সর্বহারা-একনায়কত্বে বিশ্বাস করিতেন না, এ'কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কবি তাহার পরিবর্তে ইউরোপের কাল্পনিক-সমাজতন্ত্রবাদীদের (*Utopian Socialist*) মত 'সমবায়-নীতি'র মধ্যেই আজিকার যুগ-সমস্যার সমাধান দেখিতেছিলেন। তাই তিনি বলিলেন,

"এইজন্যে, যথেষ্ট পরিমাণ স্বাধীনতাকে সর্বসাধারণের সম্পদ্‌ করে তোলবার মূল উপায় হচ্ছে ধন-অর্জনে সর্বসাধারণের শক্তিকে সম্মিলিত করা। তা হলে ধন টাকা-আকারে কোনো এক জনের বা এক সম্প্রদায়ের হাতে জমা হবে না; কিন্তু লক্ষপতি ক্রোরপতিরা আজ ধনের যে ফল ভোগ করবার অধিকার পায়

সেই ফল সকলেই ভোগ করতে পারে। সমবায়-প্রণালীতে অনেকে আপন শক্তিকে যখন ধনে পরিণত করতে শিখবে তখনই সর্বমানবের স্বাধীনতার ভিত্তি স্থাপিত হবে।"

"এই সমবায়-প্রণালীতে ধন উৎপাদন করার আলোচনা ও পরীক্ষা আমাদের দেশে সম্প্রতি আরম্ভ হয়েছে। আমাদের দেশে এর প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। দারিদ্র্য থেকে রক্ষা না পেলে আমরা সকল-রকম যমদূতের হাতে মার খেতে থাকব। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই ধন নিহিত হয়ে আছে, এই সহজ কথাটি বুঝলে এবং কাজে খাটালে তবেই আমরা দারিদ্র্য থেকে বাঁচব।"

উপসংহারে কবি সমবায় ও পল্লী-উন্নয়নের বিস্তারিত কর্মসূচী গ্রহণ করিবার আহ্বান জানাইয়া বলিলেন,

"দেশের সমস্ত গ্রামকে নিজের সর্বপ্রকার প্রয়োজনসাধনক্ষম করে গড়ে তুলতে হবে। এজন্য কতকগুলি পল্লী নিয়ে এক-একটি মণ্ডলী স্থাপন করা দরকার, সেই মণ্ডলীর প্রধানগণ যদি গ্রামের সমস্ত কর্মের ও অভাব-মোচনের ব্যবস্থা করে মণ্ডলীকে নিজের মধ্যে পর্যাপ্ত করে তুলতে পারে তবেই স্বায়ত্তশাসনের চর্চা দেশের সর্বত্র সত্য হয়ে উঠবে। নিজের পাঠশালা, শিল্পশিক্ষালয়, ধর্মগোলা, সমবেত পণ্যভাণ্ডার ও ব্যাংক্‌স্থাপনের জন্য পল্লীবাসীদের শিক্ষা সাহায্য ও উৎসাহ দান করতে হবে। এমনি ক'রে দেশের পল্লীগুলি আত্মনির্ভরশীল ও ব্যূহবদ্ধ হয়ে উঠলেই আমরা রক্ষা পাব। কিভাবে বিশিষ্ট পল্লীসমাজ গড়ে তুলতে হবে, এই হচ্ছে আমাদের প্রধান সমস্যা।" [ঐ ॥ পৃঃ ১৮-১৯]

আশ্চর্য ঘটনার সমাবেশ! ঠিক ঐ সময় লেনিন তাঁহার বিখ্যাত ঐতিহাসিক নিবন্ধ '*On Co-operation*' রচনা করিতেছেন (জানুয়ারী ৪-৬-১৯২৩ । 'নয়া-আর্থনীতিক বিধি' [NEP] গ্রহণ করিবার পর লেনিন সারা রাশিয়া ব্যাপী সমবায়-সমিতি গঠন করিবার আহ্বান জানাইলেন। তিনি বলিলেন,

…"Not everyone understands that now, since the October Revolution, and quite apart from the NEP, our co-operative movement assumes really exceptional importance. Many of the dreams of the old co-operators were fantastic…

…"Why were the plans of the old co-operators, from Robert Owen onwards, fantastic? Because they dreamt of peacefully transforming present-day society into Socialism without taking into account fundamental questions like that of the class struggle, of the working class capturing political power, of overthrowing the rule of the exploiting class.…

"But see how things have changed now that the political power is in the hands of the working class, now that the political power of the exploiters is overthrown, and all the means of production are owned by the working class."

তাই তিনি বলিলেন,…"the only task that really remains for us to perform is to organize the population in co operative societies.…"

তিনি বলিলেন "If the whole of the peasantry were organized in co-operatives, we would be standing firmly with both feet on the soil of socialism…"

[*Selected Works Vol. II*-,pp-830-35]

পাঠক, এই দুই মহান-চিন্তানায়কের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যটি অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন।

উল্লেখযোগ্য, এই সময় বাংলার গভর্ণর লর্ড লীটন শান্তিনিকেতন পরিদর্শন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে কবি তাঁহাকে সৌজন্যের খাতিরে আমন্ত্রণ জানান। দেশের তৎকালীন ঐ পরিস্থিতিতে কবির লাট সাহেবকে নিমন্ত্রণ করা লইয়া বেশ কিছুটা বিরূপ সমালোচনাও হয়। রামানন্দবাবু আসল ঘটনার বিবরণ দিয়া লোকের ভ্রান্তি অপনোদনের (দ্রঃ প্রবাসী-আশ্বিন ১৩৩১ পৌষ ১৩৩২) চেষ্টা করেন।

অল্পকাল পরেই রবীন্দ্রনাথ 'বসন্ত' গীতি-নাট্য রচনা করিয়া উহা নজরুলকে উৎসর্গ করেন (১০ই ফাল্গুন ১৩২৯ ॥ ২২ ফেব্রুয়ারী ১৯২৩)। নজরুল তখন হুগলী জেলে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন। নজরুল অসহযোগ-আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন, পূর্বেই তাহা উল্লেখ করিয়াছি। ১৯২১ সালের পূজাবকাশের পর অধ্যাপক শাহীদুল্লাহ্ ও নজরুল শান্তিনিকেতনে যান। ১৯২২ সালের প্রথম ভাগেই 'বিজলী' পত্রিকায় নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় (৬ই জানুয়ারী)। সাথে সাথেই কবিতাটি বাংলার যুব-চিত্তে এক দারুণ উত্তেজনা, উম্মাদনা ও আলোড়ন সৃষ্টি করে। এক মুহূর্তে নজরুল হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাংলার যুব চিত্ত জয় করিয়া লইলেন। তাঁহার 'বিদ্রোহী', 'কামাল পাশা' ও 'শাত্-ইল্-আরব' প্রভৃতি কবিতা অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করিল। রবীন্দ্রনাথ বিস্ময়ে বিদ্রোহী-কবির প্রতিভার দিকে তাকাইয়াছিলেন। ১৯২২ সালে ১১ই আগষ্ট নজরুলের সম্পাদনায় 'ধূমকেতু' পত্রিকার প্রথম আত্মপ্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ এই ধূমকেতুকে স্বাগত ও অভিনন্দন জানাইয়া এক আশীর্বাণী পাঠাইলেন। উহা 'ধূমকেতু' পত্রিকায় প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। কবি লিখিয়াছিলেন,

"কাজী নজরুল ইস্‌লাম কল্যাণীয়েষু,

আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ্ অগ্নিসেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয়কেতন!
অলক্ষণের তিলকরেখা
রাতের ভালে হোক্ না লেখা,

জাগিয়ে দে রে চমক মেরে'।
আছে যারা অর্ধচেতন!

২৮শে শ্রাবণ
১৩২৯

'ধূমকেতুর' পূজাসংখ্যায় নজরুলের বিখ্যাত 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটি প্রকাশিত হয় (২২শে সেপ্টেম্বর ১৯২২)। কবিতাটির শুরু,

"আর কতকাল থাকবি বেটী মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল?
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারীর শক্তি-চাঁড়াল।
দেবশিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি,
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা—আসবি কখন সর্বনাশী?"

কবিতাটির শেষ কয় পংক্তি,

"অনেক পাঁঠা-মোষ খেয়েছিস, রাক্ষসী তোর যায়নি ক্ষুধা,
আয় পাষাণী এবার নিবি আপন ছেলের রক্ত-সুধা।
দুর্বলদের বলি দিয়ে ভীরুর এ হীন শক্তিপূজা,
দূর করে দে, বল মা, ছেলের রক্ত মাগে মা দশভুজা।
সেইদিন জননী তোর সত্যিকারের আগমনী,
বাজবে বোধন-বাজনা সেদিন গাইব নব জাগরণী।
'ম্যয় ভুখা হুঁ মায়ি' বলে আয় এবার আনন্দময়ী
কৈলাস হতে গিরি-রাণীর মা-দুলালী কন্যা অয়ি!"

এই কবিতাটির জন্য নজরুল রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার হন। ৮ই জানুয়ারী ১৯২৩ বিচারপতি সুইন হো'র আদালতে নজরুলের এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। কিন্তু জেলখানায়ও নজরুল স্থির থাকিতে পারেন না। হুগলী-জেলে বন্দীদের প্রতি দুর্ব্যবহার ও অত্যাচারের প্রতিবাদে নজরুল এবং অন্যান্য রাজবন্দীরা আন্দোলন করিতে লাগিলেন। এই প্রসঙ্গে ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত লিখিতেছেন,

"শেষ পর্যন্ত যখন অত্যাচার চরমে পেঁছল, তখন নজরুল ও অন্যান্য বন্দীরা অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করলেন। তাঁরা ঘোষণা করলেন যে অবস্থা সম্মানজনক না-হওয়া পর্যন্ত তাঁদের ধর্মঘট থামবে না। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি —কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি নজরুলকে প্রায়োপবেশন ভঙ্গ করার অনুরোধ জানিয়ে পত্র ও টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথের প্রেরিত টেলিগ্রামে নজরুল সম্পর্কে তাঁর ধারণার উজ্জ্বল পরিচয় দীপ্যমান ছিল। নজরুল যখন হুগলী জেলে তখন রবীন্দ্রনাথ টেলিগ্রাম করেছিলেন—'Give up hunger strike, our literature claims you.' টেলিগ্রাম করা হয়েছিল প্রেসিডেন্সী জেলের ঠিকানায়। 'Addressee not found' বলে কর্তৃপক্ষ টেলিগ্রামকে হুগলীতে নজরুলের কাছে না পাঠিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছেই ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।' [ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত নজরুল চরিত মানস॥ পৃঃ ৭১]

[দ্রঃ চিঠিপত্র ২'য় খণ্ড-পৃঃ ৭৪]

বসন্তোৎসবের পর রবীন্দ্রনাথ কাশী যাত্রা করেন (১৬ই ফাল্গুন-১৩২৯)। এই সময় কাশীতে প্রথম প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন হয়। রবীন্দ্রনাথ এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে (৩-৪ মার্চ) বাংলা ভাষাকে উপলক্ষ করিয়া ভাষা সমস্যা ও জাতীয়-ঐক্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন,

"আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, আমরা যেমন মাতৃক্রোড়ে জন্মেছি তেমনি মাতৃভাষার ক্রোড়ে আমাদের জন্ম, এই উভয় জননীই আমাদের পক্ষে সজীব ও অপরিহার্য।'

"সুতরাং প্রত্যেক দেশ যখন তার স্বকীয় ভাষাতে পূর্ণতা লাভ করবে তখনই অন্য দেশের ভাষার সঙ্গে তার সত্যসম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। ভাষার এই সহযোগিতায় প্রত্যেক জাতির সাহিত্য উজ্জ্বলতর হয়ে প্রকাশমান হবার সুযোগ পায়।…

…"ভারতবর্ষে আজকাল পরস্পরের ভাবের আদানপ্রদানের ভাষা হয়েছে ইংরাজি ভাষা। অন্য একটি ভাষাকেও ভারতব্যাপী মিলনের বাহন করবার প্রস্তাব হয়েছে (হিন্দী—লেখক)। কিন্তু, এতে করে যথার্থ সমন্বয় হতে পারে না; হয়তো একাকারত্ব হতে পারে, কিন্তু একত্ব হতে পারে না। কারণ, এই একাকারত্ব কৃত্রিম ও অগভীর, এ শুধু বাইরে থেকে দড়ি দিয়ে বাঁধা মিলনের প্রয়াস মাত্র। যেখানে হৃদয়ের বিনিময় হয়, সেখানে স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য থাকলেই তবে যথার্থ মিলন হতে পারে। কিন্তু, যদি বাহ্য বন্ধন-পাশের দ্বারা মানুষকে মিলিত করতে বাধ্য করা যায়, তবে তার পরিণাম হয় শত্রুতা।"…

প্রসঙ্গত তিনি ইউরোপের রাশিয়া (জার-শাসিত), ইংলণ্ড, বেলজিয়াম প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির রাষ্ট্রীয়-ঐক্যের নামে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর ভাষাগুলির উপর রাজ-ভাষার ষ্টীম-রোলার চালাইবার হীন অপচেষ্টার সমালোচনা করিয়া বলেন,

"রাশিয়া তার অধিকৃত ছোটো ছোটো দেশের ভাষাকে মেরে রাশীয় ভাষার অধিকারভুক্ত করবার চেষ্টা করেছিল, বেলজিয়াম ফ্লেমিশ্‌দের ভাষা ভোলাতে পারলে বাঁচে। কিন্তু, ভাষার অধিকার যে ভৌগোলিক অধিকারের চেয়ে বড়ো, তাই এখানে জবরদস্তি খাটে না। বেলজিয়াম ফ্লেমিশ্‌দের অনৈক্য সইতে পারেনি, তাই রাষ্ট্রীয় ঐক্যবন্ধনে তাদের বাঁধতে চেয়েছে। কিন্তু, সে-ঐক্য অগভীর বলে তা স্থায়ী ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারে না। সাম্রাজ্যবন্ধনের দোহাই দিয়ে যে-ঐক্যসাধনের চেষ্টা তা বিষম বিড়ম্বনা। আজ য়ুরোপের বড়ো বড়ো দাসব্যবসায়ী নেশনরা আপন অধীন গণবর্গকে এক জোয়ালে জুড়ে দিয়ে বিষম কষাঘাত করে তার ইম্পীরিয়ালিজ্‌মের রথ চালিয়ে দিয়েছে।…"

তাই তিনি বলেন,

…"এমন বাহ্য সাম্যকে যারা চায় তারা ভাষা-বৈচিত্র্যের উপর ষ্টীমরোলার চালিয়ে দিয়ে আপন রাজরথের পথ সমভূম করতে চায়। কিন্তু, পাঁচটি বিভিন্ন ফুলকে কুটে দলা পাকালেই তাকে শতদল বলা যেতে পারে না। অরণ্যের বিভিন্ন

পত্রপুষ্পের মধ্যে যে-ঐক্য আছে তা হল বসন্তের ঐক্য।"…

[রবীন্দ্ররচনাবলী-২৩'শ খণ্ড ॥ পৃঃ ৪৭৩-৭৫]

অর্থাৎ ভারতের বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর ভাষাগুলির পূর্ণ বিকাশের উপর ভিত্তি করিয়াই জাতীয়-ঐক্য ও ভাষাগত-ঐক্য গড়িয়া উঠিবে, ইহাই কবির মূল বক্তব্য। আর এই জন্যই তিনি বাঙালীদের, তাহার সাহিত্য-সংস্কৃতি লইয়া আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করা সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিলেন, "আমরা যেন বাঙালির স্বাজাত্য-অভিমানের অতিমাত্রায় মিলনযজ্ঞে বিঘ্ন না বাধাই।"

এই প্রসঙ্গে দুটি জিনিস আমাদের স্মরণ রাখা দরকার। মহাযুদ্ধের সময় (১৯১৩-১৭) সর্বপ্রথম অন্ধ্রদেশেই 'ভাষাভিত্তিক প্রদেশ পুনর্গঠনের' আন্দোলন চলে। ১৯১৭ সালে, কলিকাতা-কংগ্রেসে অ্যানি বেশান্ত ও তিলক এই নীতিতে প্রাদেশিক পুনর্গঠনকেই, প্রাদেশিক-স্বায়ত্ত শাসনের পূর্বশর্ত বলিয়া গ্রহণ করিবার এক আন্দোলন তুলিয়াছিলেন। নাগপুর-কংগ্রেসের পরে এই নীতিকে কংগ্রেসের মূল নিয়ামক নীতি হিসাবে গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত হয়। ১৯১৮ সালের প্রথম ভাগে গান্ধীজী হিন্দীকে সর্বভারতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করিবার প্রশ্নটি উত্থাপন করেন। ঐ সময় গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথকে এই প্রশ্নে তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিবার আহ্বান জানাইয়া এক পত্র লেখেন। কবি তাহার জবাবে লিখিয়াছিলেন, (২৪ জানুয়ারী-১৯১৮),

…"Of course, Hindi is the only possible national language for inter-provincial intercourse in India But about its introduction at the Congress I think we cannot enforce it for a long time to come.…So Hindi will have to remain optional in our national proceedings until a new generation of politicians, fully alive to its importance, pave the way towards its general use by constant practice as a voluntary acceptance of a national obligation."

কাশীর প্রঃ বঃ সাহিত্য সম্মেলনের ভাষণে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা বা সর্বভারতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করিবার প্রশ্নে দেশের অন্যান্য ভাষাগুলির পরিপূর্ণ বিকাশের কথাটি বিশেষভাবে বিবেচনা করিবার জন্য কবি গুরুত্ব আরোপ করিলেন।

১০ই এপ্রিল কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন। এই সময় রোলাঁর এক পত্র পান। এই সময় রোলাঁ গান্ধীজীর সম্পর্কে তাঁহার বিখ্যাত নিবন্ধটি [*On Mahatma Gandhi*] রচনা করেন। অসহযোগ ও চরকা সম্পর্কে গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের বিতর্কটির কথাও উহাতে উল্লেখ করা হয়। রোলাঁ তাহার চিঠিতে লিখিতেছেন (২ রা মার্চ-১৯২৩),

"I have just finished a pretty long essay on Mahatma Gandhi, based on the volume of collected articles in *Young India* ··· Without subscribing to all the ideas of Gandhi, which appear to me somewhat too mediæval, (especially in the case of his disciples, like Prof Kalelkar, whose 'Gospel of Swadeshi' would confine India within the walls of a cloister), I have conceived for the man Gandhi himself and his great heart burning with love an infinite love and veneration.'···

কবি ও গান্ধীজীর মধ্যে বিতর্কটির কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,

"The highest human ideals are confronted therein. It seems as if it were a controversy between a St Paul and a Plato. But transported to India, its horizons have expanded. They embrace the whole earth, and the whole of humanity joins in this august 'Dispute' (in the serene sense given to this word by the famous fresco of Raphael in the stanze of the Vatican.)···

তিনি আরো লিখিলেন,

"It may gratify you to know that your thought is the nearest to mine that I actually feel in the world, ···But I know quite well that in India you also are isolated enough (And I have an impression that it was a comfort even to Gandhi to be imprisoned.)"··· [*Rolland and Tagore*.-P. 36-37.]

এদিকে কংগ্রেসের মধ্যে কাউন্সিল প্রবেশকারী অর্থাৎ 'পরিবর্তনকামী' ও 'পরিবর্তন-বিরোধী'দের মধ্যে দলাদলি ও বাদানুবাদ তীব্র আকার ধারণ করিল। চিত্তরঞ্জন ওয়ার্কিং কমিটি হইতে পদত্যাগ করিয়াছিলেন। ওয়ার্কিং কমিটিতে ডাঃ আনসারী প্রমুখ মধ্যপন্থীদেরও অনেকে পদত্যাগ করিলেন। অপরদিকে বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালাইয়া যাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন পরিবর্তন-বিরোধীরা। এমনি এক পরিস্থিতিতে 'বিজলী' পত্রিকার পক্ষ হইতে মৃণালকান্তি বসু কলিকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের

সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিবার অনুরোধ জানাইলেন (১৯শে আগস্ট-১৯২৩)। কংগ্রেসের মধ্যে মতপার্থক্য ও দলাদলি সম্পর্কে কবি যাহা বলিলেন মৃণালকান্তি বসু তাঁহার চুম্বকে লিখিলেন,

"বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির ঘটনাসূত্রে প্রথমেই তিনি কংগ্রেসের দলাদলির কথা শুরু করলেন। তিনি বল্লেন, দলাদলির জন্য বা দলাদলির ফলে যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছে তার জন্য তিনি কিছুমাত্র দুঃখিত নন। দলের উদ্ভব জীবনেরই লক্ষণ।...তিনি নিজে চিরদিনই মতের ও কাজের স্বাধীনতার বাণী শুনিয়ে এসেছেন,...তার জন্য সংগ্রাম করে এসেছেন,...

"দুই বা ততোধিক দলের সত্যিকার কাজ করবার যথেষ্ট যায়গা এদেশে রয়েছে। তিনি যে জিনিষের জোর প্রতিবাদ করলেন, তা হচ্ছে মতানৈক্য উপস্থিত হলেই দল বিশেষের উপর উদ্দেশ্য আরোপ। যে মুহূর্তেই কারুর সঙ্গে মতের অমিল দেখা যাবে সেই মুহূর্তেই প্রমাণ করতে হবে যে, প্রতিপক্ষ লোক অতি খারাপ আর অজানা কোন স্বার্থসিদ্ধির মতলবেই সে ওই বিশেষ মত পোষণ করছে।...অপরের মনোভাব বুঝতে না পারা দুর্বল মনেরই লক্ষণ।"...

কাউন্সিল-প্রবেশ সম্পর্কে তিনি বলিলেন,

..."ব্যক্তির মতের ও কাজের স্বাধীনতার পক্ষপাতী। কাউন্সিলে যাবার উদ্দেশ্য নিয়ে কোন দল যদি প্রবল হয়ে থাকে, তাহলে তাদের কাউন্সিলে যেতে দেওয়াই ঠিক এবং সেখানে গিয়ে তাঁরা যা করতে পারেন তাই করতে দেওয়াই উচিত।

"তিনি নিজে মনে করেন, কাউন্সিলে ঢুকে তা ভেঙে দেবার চেষ্টার চেয়ে নিজেদের স্বতন্ত্র অনুষ্ঠান গড়ে তোলবার চেষ্টা করা ভালো।...কিন্তু কাউন্সিল ভাঙবার চেষ্টার চেয়েও পল্লীর পুনর্গঠন অনেক বেশী প্রয়োজনীয়।"

তাঁহার গ্রাম-পুনর্গঠন পরিকল্পনার উপর জোর দিয়া তিনি আরো বলিলেন,

..."আমাদের গোড়া থেকেই সবটা গড়ে তুলতে হবে। আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খাড়া করতে হবে, আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা আমাদের নিজেদেরই করতে হবে, গাঁয়ে গাঁয়ে আমাদের নিজেদেরই কো-অপারেটিভ ব্যাংক ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। দেশে যে সব সরকারী অনুষ্ঠান রয়েছে, তাতে করে দেশের লোকের উপর সরকারী প্রভুত্বই বেশী করে স্থাপিত হচ্ছে...সাধারণে অগোচরে কিন্তু সুনিশ্চিত ভাবে, লোকের মনের উপর সরকারের এই যে প্রভাব বিস্তারিত হচ্ছে, এ দূর করে আমাদেরই প্রভাব বিস্তার করতে হবে।

..."তা করবার প্রকৃষ্ট উপায়ই হচ্ছে আমাদের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং তাদের কর্মকুশলতা দিয়ে সরকারী অনুষ্ঠানগুলিকে এমন অ-কেজো করে ফেলতে হবে, যাতে করে সরকার সেগুলি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়।"

হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান কোথায় ও কি ভাবে, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইলে কবি বলিলেন,

.."একমাত্র অর্থনীতিক ব্যাপার আশ্রয় করে একটা সত্যিকার স্থায়ী মিলন

সম্ভবপর করে তোলা যায় অন্য কোন ভাবে যা যায় না। এইখানে আমাদের স্বার্থ এক, আমরা একে অন্যের সাহায্যে পুষ্ট।

"ক্ষুধা মুসলমানকেও কাতর করে, প্রতিবেশী হিন্দুকেও কাতর রেহাই দেয় না। ক্ষুন্নিবারণ দুই সম্প্রদায়ই সমানে উপভোগ করে। এই ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যই আমরা একসঙ্গে কাজ করতে পারি। হিন্দু আর মুসলমানের সমবেত চেষ্টায় পল্লীতে পল্লীতে যে অর্থনীতিক অনুষ্ঠানগুলি গড়ে উঠে হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই কল্যাণ সাধন করবে, সেগুলিই ক্রমশ দুই সম্প্রদায়ের ভিতরকার ব্যবধান কমিয়ে দেবে এবং মিলনের বেদী গড়ে তুলবে যা আর কোন মতে সম্ভবপর হবে না।" [বিজলী-১৪ই ভাদ্র ১৩৩০ ॥ পৃঃ ৫-৭]

'হিন্দুমহাসভা' দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, 'আমরা সঙ্ঘবদ্ধ হতে চাইলে মুসলমানেরা কেন তাতে বাধা দেবে ?'

যাহাই হোক, দেশের রাজনৈতিক উত্তেজনা ও দলাদলির মধ্যেও কবি এক সুদূরপ্রসারী গঠনমূলক পরিকল্পনা গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। কবি তাঁহার মতামত আরও পরিষ্কার ব্যাখ্যা করিয়া *"The Way to Unity"* নামে ইংরাজীতে একটি প্রবন্ধ লিখিলেন। উহা জুলাই সংখ্যা *'Visva Bharati Quarterly*-তে' (১৯২৩) প্রকাশিত হয়। কিন্তু বিশেষ রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলি উহাতেও সন্তুষ্ট নহেন। ইতিমধ্যে রাজনীতিক ঘটনাপ্রবাহের দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। কংগ্রেসের 'পরিবর্তনকামী' ও 'পরিবর্তন-বিরোধী'দের মধ্যে একটি আপোষ-মীমাংসা হয়। সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যভাগে (১৫ই—১৯শে সেপ্টেঃ) দিল্লীতে কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশনে স্থির হয় যে, অতঃপর যাঁহারা কাউন্সিলে প্রবেশ করিতে চাহিতেছেন তাঁহাদের বাধা দেওয়া হইবে না, পক্ষান্তরে কংগ্রেসের অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচীও বলবৎ থাকিবে। কোন কোন অত্যুগ্র রাজনীতিকমহল প্রশ্ন করিতে থাকেন, দেশের এই গভীর উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ কী করিবেন,—তিনি কি শুধু বাঁশীই বাজাইবেন ? কিছুকাল পূর্বে 'বর্ষামঙ্গল' ও 'বসন্তোৎসব' অনুষ্ঠানের জন্যও কবি একশ্রেণীর লোকের সমালোচনার সম্মুখীন হন। কবি এইসব অপ্রীতিকর সমালোচনার গুঞ্জনে খুবই বিরক্ত ও উত্যক্ত বোধ করিতেছিলেন। মানসিক এমনই এক পরিস্থিতিতে, কবি তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন ও কার্যকলাপের সুদীর্ঘ এক 'কৈফিয়ৎ' লিখিলেন (১২ই আশ্বিন-১৩৩০)। উহা 'বিজলী' পত্রিকায় কিছুদিন পর প্রকাশিত হয় (২৫শে আশ্বিন)। তিনি লিখিলেন,

"কবি হোন বা কলাবিৎ হোন তাঁরা লোকের ফরমাস টেনে আনেন ; রাজার ফরমাস, প্রভুর ফরমাস, বহু প্রভুর সমাবেশরূপী সাধারণের ফরমাস। ফরমাসের আক্রমণ থেকে তাঁদের সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি নেই।...

..."আজকের দিনে জনসাধারণ জেগে উঠেচে ; তার ক্ষুধা বিরাট তার দাবী বিস্তর। সেই বহুরসনাধারী জীব তার বহুতর ফরমাসে মানব-সংসারকে রাত্রিদিন উদ্যত করে রেখেচে ;—কত তার আসবাব আয়োজন, তার 'চাই চাই' শব্দের গর্জনে স্বর্গমর্ত্য বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠ্‌ল। এই গর্জনটা লীলার আসরেও

প্রবেশ করে ; দাবী প্রচার করতে থাকে যে, তোমাদের বীণা, তোমাদের মৃদঙ্গও আমাদের জয়যাত্রার ব্যাণ্ডের সঙ্গে মিলে আমাদের কল্লোলকে ঘনীভূত করে তুলুক। সে জন্যে সে খুব বড় মজুরী আর জাঁকালো শিরোপা দিতেও রাজী আছে।··· সেই জন্যে ঢাকীর পক্ষে এ' সময়টা সুসময় কিন্তু বীণকারের পক্ষে নয়।

···"লোভে পড়ে স্বধর্ম বিকিয়ে সে যদি পরধর্মের ডঙ্কা বাজাতে যায়, তবে হাটে বাজারে তার নাম হবে। কিন্তু বিধাতার দরবারে তার নাম খোয়া যাবে।

"এই ভূমিকার মধ্যে আমার নিজের কৈফিয়ৎ আছে।···সেই অপরাধের লোকসান ও পরিতাপ তীব্র বেদনায় অনুভব করচি বলেই সাবধান হই। ঝড়ের সময় ধ্রুবতারাকে দেখা যায় না বলে দিক্‌ভ্রম হয়। এক এক সময়ে বাহিরের কল্লোলে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে স্বধর্মের বাণী স্পষ্ট করে শোনা যায় না। তখন 'কর্তব্য' নামক দশমুখ-উচ্চারিত একটা শব্দের হুঙ্কারে মন অভিভূত হয়ে যায়, ভুলে যাই যে 'কর্তব্য' বলে একটা অবিচ্ছিন্ন পদার্থ নেই—'আমার কর্তব্যই' হচ্চে আমার পক্ষে কর্তব্য।···ডিমক্রেসির যুগে এই গায়ে-পড়া পড়ে'-পাওয়া কর্তব্যের ভয়াবহতা চারিদিকে দেখতে পাই। মানব-সংসার চল্‌বে, তার চলাই চাই ; কিন্তু তার চলার রথের নানা অঙ্গ ;—কর্মীরাও একরকম করে' তাকে চালাচ্চে, গুণীরাও একরকম করে তাকে চালাচ্চে, উভয়ের স্বানুবর্তিতাতেই পরস্পরের সহায়তা এবং সমগ্র রথের গতিবেগ—উভয়ের কর্ম একাকার হয়ে গেলেই মোট কর্মটাই পঙ্গু হয়ে যায়।"

এই প্রসঙ্গে তিনি একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, লোকমান্য তিলকের সেই প্রাজ্ঞোচিত পরিমিতি বোধ ছিল। তিনি বলিলেন,

—"তখন লোকমান্য টিলক বেঁচে ছিলেন। তিনি তাঁর কোনো এক দূতের যোগে আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে বলে পাঠিয়েছিলেন, আমাকে য়ুরোপে যেতে হবে। সে সময় নন্‌-কো-অপারেশন আরম্ভ হয়নি বটে কিন্তু পোলিটিকাল আন্দোলনের তুফান বইচে। আমি বল্‌লুম, রাষ্ট্রিক আন্দোলনের কাজে যোগ দিয়ে আমি য়ুরোপে যেতে পারব না। তিনি বলে পাঠালেন, আমি রাষ্ট্রিক চর্চায় থাকি এ তাঁর অভিপ্রায়-বিরুদ্ধ। ভারতবর্ষের যে বাণী আমি প্রচার করতে পারি সেই বাণী বহন করাই আমার পক্ষে সত্য কাজ—এবং সেই সত্য কাজের দ্বারাই আমি ভারতের সত্য সেবা করতে পারি।—আমি জানতুম জনসাধারণ টিলককে পোলিটিকেল নেতারূপেই বরণ করেছিল এবং সেইকাজেই তাঁকে টাকা দিয়েছিল। এই জন্য আমি তাঁর পঞ্চাশ হাজার টাকা গ্রহণ করতে পারি নি। তারপর বোম্বাই সহরে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি আমাকে পুনশ্চ বললেন, 'রাষ্ট্রনীতিক ব্যাপার থেকে নিজেকে পৃথক রাখলে তবেই আপনি নিজের কাজ সুতরাং দেশের কাজ করতে পারবেন—এর চেয়ে বড় কিছু আপনার কাছে প্রত্যাশা করিনি।' আমি বুঝতে পারলুম, টিলক যে গীতার ভাষ্য করেছিলেন সে কাজের অধিকার ছিল তাঁর—সেই অধিকার মহৎ অধিকার।'

তারপর তিনি তাঁহার বার্ধক্যজনিত শারীরিক অবস্থা ও তাঁহার ব্যক্তিগত বিভিন্ন বিচিত্র সব কর্মপন্থা এবং দেশে-বিদেশের বহু মানুষের বিচিত্র সব

ফরমাস, অনুরোধ-উপরোধ মিটাইবার দাবীর কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন,

…"এই সমস্ত উত্তেজনায় প্রতিনিয়ত যে সকল কর্ম জমিয়ে তুলচি আবর্জনা-মোচনে কালের সম্মার্জনী সুপটু বলেই বিধাতার কাছে সে জন্যে মার্জনা আশা করি। সভা কর্তৃত্বের কাজেও মাঝে-মাঝে আমার ডাক পড়ে। যখন একান্ত কাব্যরসে নিমগ্ন ছিলুম তখন এ বিপদ আমার ছিল না। রাখালকে কেউ ভুলেও রাজসিংহাসনে আমন্ত্রণ করে না, এই জন্যেই বটতলায় সে বাঁশি বাজাবার সময় পায়। কিন্তু যদি দৈবাৎ কেউ করে' বসে তাহলে পাঁচনিকে রাজদণ্ডের কাজে লাগাতে গিয়ে রাখালী এবং রাজত্ব দুয়েরই বিঘ্ন ঘটে। কাব্যসরস্বতীর সেবক হয়ে গোলেমালে আজ গণপতির দরবারের তক্‌মা পরে বসেচি—তার ফলে কাব্যসরস্বতী আমাকে প্রায় জবাব দিয়েচেন, আর গণপতির বাহনটি আমার সকল কাজেরই ছিদ্র অন্বেষণ করচেন।"

কিন্তু তবুও দেশের ডাক,—জনসাধারণের ডাক উপেক্ষা করিয়া তিনি স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন কই! এইখানেই তাঁহার তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মানসিক যন্ত্রণা। সেই কথাটিই করুণ বিনীত কণ্ঠে নিবেদন করিয়া তিনি উপসংহারে বলিলেন,

…"যেখানে দশে মিলে কাজ সেখানে আমার অবকাশের সব গরু বাছুর বেচে খাজনা জোগাবার তলবে কেন আমি সিভিল অথবা আন্‌সিভিল ডিস্‌-ওবীডিয়েন্সের নীতি অবলম্বন করতে চেষ্টা করি তার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া গেল। সব সময় অনুরোধ-উপরোধ এড়িয়ে উঠ্‌তে পারিনি—তার কারণ আমার স্বভাব দুর্বল। পৃথিবীতে যাঁরা বড় লোক তাঁরা রাশভারি শক্ত লোক; মহৎ সম্পদ অর্জন করবার লক্ষ্যপথে, যথাযোগ্য স্থানে যথোচিত দৃঢ়তার সঙ্গে 'না' বলবার ক্ষমতাই তাঁদের পাথেয়; মহৎ সম্পদকে রক্ষা করবার উপলক্ষ্যে রাশভারি লোকেরা 'না' মন্ত্রের গণ্ডিটা নিজের চারিদিকে ঠিক জায়গায় মোটা করে টেনে দিতে পারেন। আমার সে মহত্ত্ব নেই, পেরে উঠিনে; হাঁ—না দুই নৌকার উপর পা দিয়ে দুল্‌তে দুল্‌তে হঠাৎ অগাধ জলের মধ্যে গিয়ে পড়ি। তাই একান্তমনে আজ প্রার্থনা করি, 'ওগো 'না'-নৌকোর নাবিক, আমাকে জোরের সঙ্গে তোমার নৌকোয় টেনে নিয়ে একেবারে মাঝদরিয়ায় পাড়ি দাও—অকাজের ঘাটে আমার তলব আছে, দো-টানায় পড়ে' যেন বেলা বয়ে না যায়!"

[বিজলী-২৫শে আশ্বিন ১৩৩০ ॥ পৃঃ ১-৩]

এই অন্তর্দ্বন্দ্ব কবির সারা জীবনভোর। কিন্তু তবুও জীবনের শেষ মুহূর্ত অবধি দেশের ও সারা বিশ্বের আর্ত-নিপীড়িত মানুষের পক্ষে তাঁহাকে প্রায় অবিরাম লেখনী ধারণ করিতেই হইল! যথাস্থানে আমরা সে আলোচনায় আসিব।

এই সময় সংবাদ আসে, পিয়ার্সন ইতালিতে রেল দুর্ঘটনায় নিহত হইয়াছেন (২৪শে সেপ্টেম্বর)। এই সংবাদে রবীন্দ্রনাথ কী নিদারুণ মর্মান্তিক আঘাত পাইলেন তাহা অনুমান করা শক্ত নহে। পিয়ার্সন ও এণ্ড্রুজ শুধু বিশ্বভারতীর সাংগঠনিক কাজেই নিয়োজিত ছিলেন না। মালয়, ফিজি, ফিলিপাইন ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে ভারতীয় চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের (indentured

labourers) দুঃখ-দুর্দশার কারণগুলি লইয়া তাঁহারা ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে অবিরাম আন্দোলন করিয়া দেশের নেতৃবর্গের উহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশ্য পিয়ার্সন এণ্ড্রুজের মত ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে অতখানি মাতিয়া উঠেন নাই। নীরবে তিনি শান্তিনিকেতনের পার্শ্ববর্তী সাঁওতালপল্লীতে জনশিক্ষা বিস্তারের কাজে নিমগ্ন ছিলেন। 'পৌষ-উৎসবের' সময় শান্তিনিকেতনে পিয়ার্সনের উদ্দেশে যে স্মরণ-সভা হয় কবি তখন তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া বলেন,

"পিয়ার্সন ছিলেন ইংরেজ কিন্তু ভারতবর্ষে সম্পূর্ণভাবে তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করতে পেরেছিলেন। তার দুঃখে অপমানে ব্যথিত হয়ে তিনি নিজের জাতিকে নিন্দা বা আঘাত করতে লেশমাত্র কুণ্ঠিত হন নি। যাকে আমরা আজকাল দেশাত্মবোধ নাম দিয়েচি সেই দেশাত্মবোধকেই তিনি সকলের চেয়ে বড় মর্য্যাদা দেন নি। এমন কি একদা তিনি ভারতের হিতকামনায় সেই দেশাত্মবোধকে এমন আঘাত করেছিলেন যে তাঁর দেশের রাজদণ্ড তাঁকে চীন থেকে তাড়া করে নিয়ে ইংলণ্ডে নজর বন্দী করে রেখেছিল।

…"আমি তাঁকে দেশ-বিদেশে নানা অবস্থায় দেখেচি—চীনে হোক্ জাপানে হোক্, অন্যত্র হোক্ যেখানেই তিনি দুঃখ বা অপমান দেখেচেন এবং এও অনুভব করেচেন যে, সেই দুঃখ অপমানের মূলে আছে তাঁর স্বজাত—সেখানে তিনি মুহূর্ত্তকালের জন্য এবং লেশমাত্র পরিমাণেও স্বদেশের রাষ্ট্রীয় স্বার্থের কথা চিন্তা করেন নি। তিনি জানতেন যে ইংলণ্ডের সভ্যতা ও উন্নতি এসিয়া ও আফ্রিকার প্রাণ-পোষণের উপর একান্ত নির্ভর করে, তার ধনসম্পদ প্রতাপের চারণক্ষেত্র এই সকল মহাদেশে; তৎসত্ত্বেও তিনি তাঁর শুভ চিন্তা ও সাধু লক্ষ্য বিশুদ্ধভাবে, নিঃস্বার্থভাবে ও সম্পূর্ণভাবে সর্বমানবের অভিমুখে প্রেরণ করেছিলেন।

"কিন্তু যখন পিয়ার্সনকে আমরা ভারতবন্ধু বলে' আদর করি তখন তাঁর জীবনের এই বড় সত্যটিকে এক রকম চাপা দিয়ে রাখি। তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যেখানে আমাদের স্বাজাত্য অভিমানকে তৃপ্ত করে সেইখানেই তাঁকে যথার্থ-ভাবে গ্রহণ করি ক্ষণকালের জন্যে চিন্তাও করিনি যে এই স্বাজাত্য অভিমানকে জলাঞ্জলি দিয়ে তবে তিনি আমাদের কাছে এসেছেন, এবং সেই মহিমাতেই তাঁর জীবন দীপ্যমান।"…

উপসংহারে কবি বলিলেন,

"সেই বড় সত্যকে স্বীকার করবার জন্য বিশ্বভারতীর সাধনা। যাঁরা বিশ্বের জন্য তপস্যা করেছেন এখানে তাঁদের আসন পাতা হোক্। আমরা 'বন্দেমাতরম্' বলে জয়ধ্বনি করলে কেবল স্বদেশকে ক্ষুদ্র করা হবে, আমরা এই কার্পণ্যের দ্বারা বড় হতে পারব না।"… [শান্তিনিকেতন পত্রিকা-ফাল্গুন ১৩৩০ ॥ পৃঃ ২৩-২৪]

লক্ষণীয়, জাতিতে ইংরেজ হওয়া সত্ত্বেও পিয়ার্সন কি ভাবে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছিলেন, কবি তাহাই স্মরণ করিয়া দিতে চাহিলেন।

বিভ্রান্তি, প্রতিক্রিয়া ও সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ

১৯২৩ সালের শেষভাগের কথা। অসহযোগ আন্দোলন সিদ্ধান্তের আকারে বলবৎ থাকিলেও গণ-আন্দোলন বস্তুতপক্ষে স্থগিত রাখা হয়। নেতারা সকলে কাউন্সিল-প্রবেশ লইয়া কলহ করিতে ব্যস্ত। সারা দেশ জুড়িয়া এক তীব্র রাজনীতিক প্রতিক্রিয়া, বিভ্রান্তি ও হতাশা দেখা দেয়। ফলে, শেষ পর্যন্ত দেশে আত্মঘাতী ও অন্তর্ঘাতী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। জওহরলাল তাঁহার 'আত্মজীবনী'তে এই প্রতিক্রিয়ার কারণগুলির সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়া লিখিতেছেন,

…"সহসা আন্দোলনের গতি রুদ্ধ হওয়ায় প্রতিক্রিয়ার মুখে উহাই সম্ভবত দেশে এক নূতন বিপত্তির সৃষ্টি করিল। রাজনৈতিক সংঘর্ষে নিষ্ফল ও আকস্মিক হিংসা বন্ধ হইলেও অবরুদ্ধ হিংসা বাহির হইবার পথ খুঁজিতে লাগিল এবং সম্ভবত পরবর্তী কয়েক বৎসরে সাম্প্রদায়িক অসন্তোষ ইহার ফলেই তীব্র হইয়াছে। রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রগতিবিরোধী বিভিন্ন শ্রেণীর সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা বিশাল জনসংঘ-সমর্থিত অসহযোগ ও নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনের চাপে লুকাইয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল, এই সুযোগে তাহারা বাহিরে আসিল।…যদি নিরুপদ্রব প্রতিরোধ স্থগিত করা না হইত এবং যদি গভর্ণমেণ্ট আন্দোলন দমন করিয়া ফেলিতেন তাহা হইলে হয়তো এত সাম্প্রদায়িক তিক্ততা দেখা দিত না এবং পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্য এত উৎসাহ অবশিষ্ট থাকিত না।"

[আত্মজীবনী ॥ পৃঃ ৯২]

১৯২৩ সালের শুরু হইতেই (এবং বিশেষ করিয়া ঐ সময় মহরম উৎসব উপলক্ষে) দেশে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা-হাঙ্গামা ক্রমশই প্রবল আকার ধারণ করিতে থাকে।

ইতিমধ্যে মুস্তাফা কামাল পাশার নেতৃত্বে নব্য তুরস্কে এক দারুণ আলোড়ন ও বৈপ্লবিক রূপান্তর চলিতে থাকে। একদা যে খিলাফতের দাবীতে ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায় ইংরেজের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে যোগ দিয়াছিলেন, সেই খিলাফতের দেশ তুরস্কই খিলাফতের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিল। ১৯২৩ সালে জুলাই মাসে 'ল্যুসেন-এর সন্ধি' (Treaty of Lausanne) স্বাক্ষরিত হয়। তুরস্ক পূর্বেকার অটোমান সাম্রাজ্যের দাবী পরিত্যাগ করিয়া শুধু তুরস্কের জন্যই একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করিবার অধিকার ও স্বীকৃতি পাইল। তুরস্কে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। সুলতান ওয়াহিদ্‌উদ্দীন পলাইয়া ব্রিটিশের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কামাল 'প্যান্‌ ইসলামিজম্‌'-এর ঘোর বিরোধী ছিলেন। কামাল খালিফের পদ অবলুপ্ত করিয়া দিয়াই ক্ষান্ত থাকিলেন না,—ইসলাম ধর্ম রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদালাভ হইতে বঞ্চিত হইল। মুসলমান ধর্মমন্দিরগুলির সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইল। আরবী হরফের বদলে ল্যাটিন বর্ণমালা প্রবর্তিত

হইল। নারী মুক্তি আন্দোলনের ঢেউ উঠিল ; এমন কি মুসলিমদের ফেজ টুপি পরাও নিষিদ্ধ করা হইল।

এই সংবাদে ভারতীয় মুসলিম সমাজ নিদারুণ আঘাত পাইলেন। তাঁহাদের পায়ের তলা হইতে যেন মাটি সরিয়া গেল। জওহরলাল তাঁহার '*The Discovery of India*' গ্রন্থে এই প্রতিক্রিয়ার বিবরণ দিয়া লিখিতেছেন,

..."ক্রমে যখন আতাতুর্কের শাসননীতির সম্পূর্ণ রূপ প্রকাশ পেতে লাগল, দেখা গেল তিনি ধর্মের ধার ধারেন না, সুলতানের শাসন এবং খিলাফত দুইই তিনি নির্মম হস্তে অবলুপ্ত করে দিলেন, রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থায় তিনি ধর্ম-বিশ্বাস জড়িত করলেন না, ধর্মের নামে যে সব সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল সেগুলি তিনি ভেঙে দিলেন। তাঁর এই কালাপাহাড়ী আচরণে পুরাতনপন্থী মুসলমানেরা ক্ষুব্ধ হলেন, তাঁদের কাছে কামালের জনপ্রিয়তা কমে গেল। বরঞ্চ কামালের এই উগ্র আধুনিকতার বিরুদ্ধে একটা নীরব আক্রোশ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠতে লাগল।...

..."আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল ভারতের বাহিরে তুরস্কে। সেই দেশে আতাতুর্ক যখন আন্দোলনের লক্ষ্যবস্তু খিলাফতকেই বাতিল করে দিলেন, তখন সমস্ত ইমারত যেন এক মুহূর্তে ধ্বসে পড়ল। এই ধ্বংস স্তূপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মুসলিম জনসাধারণ দিশেহারা হয়ে পড়ল, এরপর রাজনীতির পথে পা বাড়াতেই যেন তাদের মনে একটা অনিচ্ছা এসে গেল। সামন্ততান্ত্রিক নেতারা এতদিন গা ঢাকা দিয়েছিলেন, এই অনিশ্চয়তার মুহূর্তে আবার তাঁরা বেরিয়ে এলেন সুড়সুড় করে।"...

[ভারতসন্ধানে ॥ পৃঃ ৩৯২]

যাহাই হউক, এইসব নানা বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সুযোগে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি সাম্প্রদায়িক উস্কানি ও বিভেদ-বিদ্বেষের বিষ ছড়াইতে লাগিল। অনতি-কালের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় পরিস্থিতি ক্রমেই খুব উদ্বেগজনক হইয়া উঠিতে লাগিল। অবশ্য ইহার পিছনে ইংরেজ সরকারের অদৃশ্য হস্তটি কম কাজ করে নাই। হিন্দুমহাসভা ও মুসলীম লীগ—উভয় দলই তাহাদের আপন আপন সাংগঠনিক তৎপরতায় কর্মচঞ্চল হইয়া উঠিল। এই সময় হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা-বাদীরা 'শুদ্ধি' ও 'সংগঠনের' দ্বারা জাতিচ্যুত হিন্দুদের পুনরায় হিন্দু ধর্মান্ত-করণের চেষ্টা এবং অপর পক্ষ 'তাঞ্জিম' ও 'তব্‌লীগ' আন্দোলনের দ্বারা মুসলিম সাম্প্রদায়িক শক্তিকে সংহত করিতে লাগিল।

দেশের এই পরিস্থিতি ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা রবীন্দ্রনাথকেও অত্যন্ত বিচলিত করিয়া তুলিল। 'সমস্যা' ও 'সমাধান' নামক পর পর দুইটি প্রবন্ধে (১৩৩০ অগ্রহায়ণ), তিনি হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও দেশের সমসাময়িক রাজনীতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিলেন।

'সমস্যা' প্রবন্ধে তিনি আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার লক্ষ্য ও পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বলিলেন যে, বিশ্বমানব হইতে বিচ্ছিন্ন একান্ত জাতীয় স্বাধীনতার কোন অর্থ ও সার্থকতা নাই। বহির্বিশ্বের সহিত সংযোগ রক্ষার প্রশ্নেই হউক আর আভ্যন্তরীণ জাতীয়-ঐক্য রক্ষার প্রশ্নেই হউক,—বিশ্বজনীন একাত্মবোধ এবং পারস্পরিক বিরোধ-বিদ্বেষ ও ভেদ-বুদ্ধির অবসানের

মধ্যেই আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার মূল লক্ষ্যসিদ্ধি ও যথার্থ সার্থকতা। তিনি বলিলেন,

…"বিশ্বের সঙ্গে যোগেই মানুষ সত্য—এইজন্যে সেই সত্যের মধ্যেই মানুষ যথার্থ স্বাধীনতা পায়। আমরা একান্ত স্বাধীনতার শূন্যতাকে চাই নে; আমরা ভেদ ঘুচিয়ে দিয়ে সম্বন্ধের পরিপূর্ণতাকে চাই, তাকেই বলি মুক্তি। যখন দেশের স্বাধীনতা চাই তখন নেতিসূচক স্বাধীনতা চাই নে, তখন দেশের সকল লোকের সঙ্গে সম্বন্ধকে যথাসম্ভব সত্য ও বাধামুক্ত করতে চাই। সেটা হয় ভেদের কারণ দূর করে দিয়ে; কিন্তু সে কারণ ভিতরেও থাকতে পারে, বাইরেও থাকতে পারে।…আমাদের এই কথাটি স্পষ্ট করে বুঝতে হবে যে, য়ুরোপ যখন বলেছে 'স্বাধীনতা চাই' তখন বিশেষ অবস্থায় বিশেষ কারণে তার সমাজদেহের মধ্যে ভেদের দুঃখ ঘটেছিল; সমাজবর্তী লোকদের মধ্যে কোনো না কোনো বিষয়ে, কোনো না কোনো আকারে সম্বন্ধের বিচ্ছেদ বা বিকৃতি ঘটেছিল—সেইটেকে দূর করার দ্বারাই তারা মুক্তি পেয়েছে। আমরাও যখন বলি 'স্বাধীনতা চাই', তখন ভাবতে হবে কোন্ ভেদটা আমাদের দুঃখ-অকল্যাণের কারণ; নইলে স্বাধীনতা শব্দটা কেবল ইতিহাসের বুলি-রূপে ব্যবহার করে কোনো ফল হবে না। যারা ভেদকে নিজেদের মধ্যে ইচ্ছা ক'রে পোষণ করে, তারা স্বাধীনতা চায় এ কথার কোনো অর্থই নেই।"…

প্রসঙ্গত কবি বলেন, ইউরোপে আজ যে কলমালিক ও শ্রমিক, ধনী ও গরীব, শোষক ও শোষিতের মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রাম চলিতেছে উহার মূল তাৎপর্য ও লক্ষ্যটি হইতেছে, এই শ্রেণীগত বিরোধ ও ভেদবুদ্ধির অবসান ঘটান।

ভারতবর্ষের সমস্যার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, "আমরা সর্বদাই বলে থাকি, বিদেশী আমাদের রাজা, এই দুঃখ ঘুচলেই আমাদের সব দুঃখ ঘুচবে। বিদেশী রাজা আমি পছন্দ করিনে।"—কিন্তু ইংরেজ দূর হইলেই আমাদের সকল দুঃখ বা সমস্যার সমাধান হইবে না। কারণ আমাদের দেশে ও সমাজ-জীবনের চতুর্দিকে অজস্র ভেদবুদ্ধি ও অসাম্য রহিয়াছে। সেই ভেদ জাতিতে জাতিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে। সেই ভেদ বর্ণে বর্ণে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে। এই সব ভেদবুদ্ধির অবসান না ঘটিলে আমাদের সত্যকারের মুক্তি নাই। তিনি ভারতবর্ষের জাতিভেদ ও বর্ণভেদ সমস্যার সহিত সুইজারল্যাণ্ডের জাতীয় ঐক্য সমস্যার তুলনা করিয়া বলিলেন যে, সুইজারল্যাণ্ডে তিনটি জাতি পাশাপাশি রহিয়াছে তবু তো তাহারা নেশন্। কিন্তু সেখানে এই দেশের মত সামাজিক বিরোধ ও ভেদবুদ্ধি নাই বলিয়া তাহারা পরস্পর শান্তিতে বাস করিতেছে। তাই তিনি বিশেষ জোর দিয়া বলিলেন,

…"সুইজর্ল্যাণ্ডে ভেদ যতগুলোই থাক্, ভেদবুদ্ধি তো নাই। সেখানে পরস্পরের মধ্যে রক্তবিমিশ্রণে কোনো বাধা নেই ধর্মে বা আচারে বা সংস্কারে। এখানে সে বাধা এত প্রচণ্ড যে, অসবর্ণ বিবাহের আইনগত বিঘ্ন দূর করবার প্রস্তাব হবা মাত্র হিন্দুসমাজপতি উদ্বেগে ঘর্মাক্তকলেবর হয়ে হর্তাল করবার ভয় দেখিয়েছিলেন। সকলের চেয়ে গভীর আত্মীয়তার ধারা নাড়ীতে বয়,

মুখের কথায় বয় না। যাঁরা নিজেদের এক মহাজাত ব'লে কল্পনা করেন তাঁদের মধ্যে সেই নাড়ীর মিলনের পথ ধর্মের শাসনে চিরদিনের জন্যে যদি অবরুদ্ধ থাকে, তা হলে তাঁদের মিলন কখনোই প্রাণের মিলন হবে না, সুতরাং সকলে এক হয়ে প্রাণ দেওয়া তাঁদের পক্ষে সহজ হতে পারবে না। তাঁদের প্রাণ যে এক প্রাণ নয়।"··· [কালান্তর ॥ পৃঃ-২২১-২৭]

তিনি বলেন, ইহার কারণই হইতেছে যে, আমরা সত্যিকারের জ্ঞান-বিজ্ঞান, যুক্তি ও শুভ-বুদ্ধিকে নির্বাসন দিয়া অবুদ্ধির পূজা করিতেছি। ইহার কারণ আমাদের অজ্ঞতা, মূর্খতা, সংকীর্ণতা ও ধর্মীয়-কুসংস্কার। এই সব অবুদ্ধি ও কুসংস্কারকে জীয়াইয়া রাখিয়া, সাময়িক লক্ষ্যাসিদ্ধির জন্য যতসব ফাঁকিবাজী ও কৌশল অবলম্বন করিয়া জিতিবার চেষ্টা করিতেছি, সেইগুলি ততই উল্টা ফিরিয়া আসিয়া আমাদের জাতীয় ও সমাজ-দেহে আঘাত করিয়া জর্জরিত করিয়া তুলিতেছে। দেশের সাম্প্রদায়িক বিরোধ-হাঙ্গামাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। গান্ধীজী খিলাফত আন্দোলনকে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের একটি অপূর্ব সুযোগ-সম্ভাবনার উপলক্ষ বলিয়া বর্ণনা করিয়া বলিয়াছিলেন, "We have both now an opportunity of a life time. The Khilafat question will not recur for another hundred years"···রবীন্দ্রনাথ এই ঠেকা-দেওয়া কলা-কৌশলে বিশ্বাস করিতেন না। যুক্তিবুদ্ধি ও সত্যকার জনচেতনার মধ্যেই এই মিলন সম্ভব। আজ তাহা প্রমাণিত হইল। তাই সে কথারই উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন,···"খেলাফতের ঠেকো-দেওয়া সন্ধিবন্ধনের পর আজকের দিনে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ তার একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মূলে ভুল থাকলে কোনো উপায়েই স্থূলে সংশোধন হতে পারে না।"···দেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যায় তিনি গভীরভাবে বিচলিত। তিনি বলেন.

"আমাদের আর-একটি প্রধান সমস্যা হিন্দু-মুসলমান সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান এত দুঃসাধ্য, তার কারণ দুই পক্ষই মুখ্যত আপন আপন ধর্মের দ্বারাই অচলভাবে আপনাদের সীমানির্দেশ করেছে।"···

···"বিধির বিধানে এমন দুই দল ভারতবর্ষে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে প্রধান স্থান অধিকার ক'রে নিয়েছে—আত্মীয়তার দিক থেকে মুসলমান হিন্দুকে চায় না, তাকে কাফের বলে ঠেকিয়ে রাখে; আত্মীয়তার দিক থেকে হিন্দুও মুসলমানকে চায় না, তাকে ম্লেচ্ছ ব'লে ঠেকিয়ে রাখে।"

স্বদেশী-আন্দোলনের সময় এই সমস্যার সঠিক উপলব্ধি করিতে না-পারার কথা তিনি উল্লেখ করিয়া বলেন,

···"বাংলাদেশে স্বদেশী-আন্দোলনে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান মেলে নি। কেননা, বাংলার অখণ্ড অঙ্গকে ব্যঙ্গ করার দুঃখটা তাদের কাছে বাস্তব ছিল না। আজ অসহকার-আন্দোলনে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান যোগ দিয়েছে, তার কারণ রুম-সাম্রাজ্যের অখণ্ড অঙ্গকে ব্যঙ্গীকরণের দুঃখটা তাদের কাছে বাস্তব। এমনতরো মিলনের উপলক্ষটা কখনোই চিরস্থায়ী হতে পারে না। আমরা সত্যতঃ মিলি নি; আমরা এক দল পূর্বমুখ হয়ে, অন্য দল পশ্চিমমুখ হয়ে কিছু ক্ষণ

পাশাপাশি পাখা ঝাপটেছি।…রাষ্ট্রনৈতিক অধিনেতারা চিন্তা করছেন, আবার কী দিয়ে এদের চণ্ডুদুটোকে ভুলিয়ে রাখা যায়। আসল ভুলটা রয়েছে অস্থিতে মজ্জাতে, তাকে ভোলাবার চেষ্টা ক'রে ভাঙা যাবে না।…

"হিন্দুতে মুসলমানে কেবল যে এই ধর্মগত ভেদ তা নয়, তাদের উভয়ের মধ্যে একটা সামাজিক শক্তির অসমকক্ষতা ঘটেছে। মুসলমানের ধর্মসমাজের চিরাগত নিয়মের জোরেই তার আপনার মধ্যে একটা নিবিড় ঐক্য জমে উঠেছে, আর হিন্দুর ধর্মসমাজের সনাতন অনুশাসনের প্রভাবেই তার আপনার মধ্যে একটা প্রবল অনৈক্য ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে…"

কিন্তু এই সমস্যার সমাধান কোথায় ? কবি তাহার উত্তরে বলেন,

…"ভারতবর্ষের কল্যাণ যদি চাই তা হলে হিন্দু-মুসলমানে কেবল যে মিলিত হতে হবে তা নয়, সমকক্ষ হতে হবে। সেই সমকক্ষতা তাল-ঠোকা পালোয়ানির ব্যক্তিগত সমকক্ষতা নয়, উভয় পক্ষের সামাজিক শক্তির সমকক্ষতা।

"মালাবারে মোপ্‌লাতে হিন্দুতে যে কুৎসিত কাণ্ড ঘটেছিল সেটা ঘটেছিল খিলাফৎ-সূত্রে হিন্দু-মুসলমানের সন্ধির ভরা জোয়ারের মুখেই। যে দুই পক্ষে বিরোধ তারা সুদীর্ঘ কাল থেকেই ধর্মের ব্যবহারকে নিত্যধর্মনীতির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে এসেছে। নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণের ধর্ম মুসলমানকে ঘৃণা করেছে, মোপলা মুসলমানের ধর্ম নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করেছে। আজ এই দুই পক্ষের কন্‌গ্রেসমণ্ড-ঘটিত ভ্রাতৃভাবের জীর্ণ মসলার দ্বারা তাড়াতাড়ি অল্প কয়েক দিনের মধ্যে খুব মজবুত ক'রে পোলিটিকাল সেতু বানাবার চেষ্টা বৃথা। অথচ আমরা বরাবরই ব'লে আসছি, আমাদের সনাতন ধর্ম যেমন আছে তেমনিই থাক্, আমরা অবাস্তবকে দিয়েই বাস্তব ফল লাভ করব, তার পরে ফললাভ হলে আপনিই সমস্ত গলদ সংশোধন হয়ে যাবে। বাজিমাত করে দিয়ে তার পরে চালের কথা ভাবব ; আগে স্বরাট্ হব, তার পরে মানুষ হব।"

তাই তিনি বলেন,

…সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে আমরা অবুদ্ধিকে রাজা করে দিয়ে তার কাছে হাত জোড় করে আছি।…আমাদের লড়াই ভূতের সঙ্গে, আমাদের লড়াই অবুদ্ধির সঙ্গে, আমাদের লড়াই অবাস্তবের সঙ্গে। সেই আমাদের চারি দিকে ভেদ এনেছে ; …সেই আমাদের এত দূর অন্ধ করে দিয়েছে।"…

[কালান্তর ॥ পৃঃ ২২৮-২৪৩]

লক্ষ্য করিবার বিষয়, হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সমস্যায় তাঁহার পূর্বাপর আলোচনাগুলি হইতে খুব একটা নূতন কথা কিছু তিনি বলিলেন না। স্বদেশী-আন্দোলনের সময় হইতেই হিন্দু-মুসলমান সমস্যায় তিনি কেবল একটি প্রশ্নেই বার বার অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া আসিতেছেন, রাজনৈতিক লক্ষ্যবস্তুকে উপলক্ষ ও ভিত্তি করিয়া যে সাম্প্রদায়িক ঐক্য, উহা কখনই স্থায়ী হইতে পারে না এবং উহাতে যথার্থ কোন সাম্প্রদায়িক মিলন-ঐক্য স্থাপিত হয় না। উহার জন্য ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামী, অশিক্ষা ও সামাজিক কুসংস্কারকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া প্রকৃত শিক্ষা ও জনচেতনার প্রসার ঘটাইতে হইবে। এই কথা এখন গান্ধীজী

ও অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃবর্গকেই বিশেষ করিয়া বলিবার সুযোগ পাইলেন। কেননা খিলাফতের দাবির উপলক্ষে তাঁহারা যে সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিবার কথা ভাবিয়াছিলেন এই অতি অল্প কালের মধ্যেই কেমন যেন তাহা তাসের-ঘরের মত ভাঙ্গিয়া পড়িল। আন্দোলনের অনতিকাল পরেই ভারতের জনমানসে এই যে ঘোরতমসাচ্ছন্ন প্রতিক্রিয়া,—ইহা পূর্বাহ্ণেই তিনি যেন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। 'শিক্ষার মিলন' ও 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধে তিনি জনশিক্ষা ও গণ-চেতনার বিস্তারের কথা বলিয়াছিলেন 'সমাধান' (১৩৩০-অগ্রহায়ণ) প্রবন্ধে তাহারাই পুনরাবৃত্তি করিয়া তিনি বলিলেন,

…"অবুদ্ধির প্রভাবে আমাদের মন দুর্বল; অবুদ্ধির প্রভাবে আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন—শুধু বিচ্ছিন্ন নই, পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধ—অবুদ্ধির প্রভাবে বাস্তব জগৎকে বাস্তবভাবে গ্রহণ করতে পারি নে ব'লেই জীবনযাত্রায় আমরা প্রতিনিয়ত পরাহত, অবুদ্ধির প্রভাবে স্ববুদ্ধির প্রতি আস্থা হারিয়ে আন্তরিক স্বাধীনতার উৎসমুখে আমরা দেশজোড়া পরবশতার পাথর চাপিয়ে বসেছি। এইটেই যখন আমাদের সমস্যা তখন এর সমাধান শিক্ষা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না—

…"আজকালকার দিনে আমরা সেই রাষ্ট্রনীতিকেই শ্রেষ্ঠ বলি যার ভিতর দিয়ে সর্বজনের স্বাধীন বুদ্ধি, স্বাধীন শক্তি, নিজেকে প্রকাশ করবার উপায় পায়। …কিন্তু আধুনিক য়ুরোপে আমেরিকায় এই আদর্শের অভিমুখে প্রয়াস দেখতে পাই। এই প্রয়াস কখন থেকে পাশ্চাত্যদেশে বললাভ করেছে? যখন থেকে সেখানে জ্ঞান ও শক্তি-সাধনার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি বহুল পরিমাণে সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়েছে। যখন থেকে সংসারযাত্রার ক্ষেত্রে মানুষ নিজের বুদ্ধিকে স্বীকার করতে সাহস করেছে তখন থেকেই জনসাধারণ রাজা, গুরু জড়প্রথা ও অন্ধসংস্কার-গত শাস্ত্রবিধির বিষম চাপ কাটিয়ে উঠে মুক্তির সর্বপ্রকার বাধা আপন বুদ্ধির যোগে দূর করতে চেষ্টা করছে।"…

উপসংহারে তাই তিনি বলেন,

"দেশকে মুক্তি দিতে গেলে দেশকে শিক্ষা দিতে হবে, এ কথাটা হঠাৎ এত অতিরিক্ত মস্ত ব'লে ঠেকে যে, এ'কে আমাদের সমস্যার সমাধান ব'লে মেনে নিতে মন রাজি হয় না।

"দেশের মুক্তি কাজটা বড়ো অথচ তার উপায়টা খুব ছোটো হবে, এ প্রত্যাশা করার ভিতরেই একটা গলদ আছে। এই প্রত্যাশার মধ্যেই রয়ে গেছে ফাঁকি 'পরে বিশ্বাস; বাস্তবের 'পরে নয়, নিজের শক্তির 'পরে নয়।"

[কালান্তর ॥ পৃঃ ২৪৫-৫১]

অর্থাৎ কবির মূল বক্তব্য ঃ যত কঠিন কাজই হোক, আমাদের এখন 'mass consciousness' বা গণ-চেতনার প্রসারের জন্য এক সুবিস্তৃত সাংগঠনিক কর্মসূচী গ্রহণ করিতে হইবে। প্রায় এক বৎসর পূর্বে কালিদাস নাগকে তিনি এই কথাই লিখিয়াছিলেন। কিন্তু এইসব প্রবন্ধে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলন অপেক্ষা ধর্মসংস্কার, সমাজসংস্কার ও শিক্ষাসংস্কার আন্দোলনের উপরই অধিক

গুরুত্ব আরোপ করিতে চাইলেন না কী ?

এদিকে স্বরাজ্য দল কাউন্সিল নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাধিক্যে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে জয়লাভ করে। গান্ধীজী তখন গুরুতর অসুস্থ। পুণা 'সেসুন' হাসপাতালে তাঁহার 'এপেন্ডিসাইটিস্' অস্ত্রোপচার করা হয়। স্বরাজ্যদল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় গান্ধীজীর মুক্তির জন্য এক প্রস্তাব আনিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ ৫ই ফেব্রুয়ারী গভর্ণমেণ্ট গান্ধীজীর মুক্তির আদেশ দিলেন। গান্ধীজী তখনও সম্পূর্ণ সুস্থ নহেন কিন্তু হিন্দু-মুসলমান সমস্যা তাঁহার চিন্তা অধিকার করিয়া আছে। মুক্তির পর এক বাণীতে তিনি বলিলেন,

…"Will the thanksgiving of the nation over my release be turned into a solid unity between the communites ?…I ask all those who cherish love towards me, to utilize it in furtherance of the union we all desire…"

অপরদিকে আন্দোলন প্রত্যাহৃত হওয়ার পর সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন পুনরায় দানা বাঁধিতে থাকে। ১৯২৩ সালের মধ্যভাগে কয়েকটি রাজনৈতিক ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয়। ১৯২৪ সালে ১২ই জানুয়ারী চার্লস্ টেগার্ট ভ্রমে মিঃ ডে' নামক জনৈক ইংরেজকে কলিকাতায় চৌরঙ্গীতে গোপীনাথ সাহা গুলি করিয়া হত্যা করেন। এই অপরাধে ৬ই ফেব্রুয়ারী গোপীনাথ সাহার ফাঁসি হইয়া গেল।

১৯২৩ সালের প্রথমভাগে রবীন্দ্রনাথের চীন-ভ্রমণের আমন্ত্রণ আসে। চীনের পিকিং-এর '*Lecture Association*' এই ভ্রমণের এবং বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এসোসিয়েসেনের পক্ষ হইতে সভাপতি লিয়াং চী-চাও কবিকে নিমন্ত্রণ পাঠান।

রবীন্দ্রনাথের চীন ভ্রমণের স্বপ্ন বহুকালের। এই চীন ভ্রমণকালে কবি ডঃ কালিদাস নাগকে বলিয়াছিলেন,—ভ্রমণ, বিশেষত চীন ভ্রমণের স্পৃহা তাঁহার নাকি উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। তিনি আরও বলেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নাকি ব্রহ্মদেশ হইতে চীনে গিয়াছিলেন। চীন সম্পর্কে কবির অন্তরের কোথায় যেন একটি বিশেষ কোমল দুর্বলতা ছিল। অতি অল্প বয়সে 'চীনে মরণের ব্যবসায়' প্রবন্ধে তিনি চীনে জঘন্য অহিফেন ব্যবসায়ে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধির তীব্র নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে 'সমাজভেদ' (বঙ্গদর্শন-১৩০৮) ও 'বাতায়নিকের পত্র' (সবুজপত্র-১৩২৬) প্রভৃতি প্রবন্ধে চীনের পক্ষ লইয়া ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-নীতির তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন। ১৯১৬ সালে জাপান-ভ্রমণকালে তিনি চীনের বুকে জাপানের সাম্রাজ্যবাদী-হামলারও তীব্র সমালোচনা করেন। বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠার পর ফরাসী সংস্কৃতবিদ্ পণ্ডিত সিলভ্যাঁ লেভি ভারত-চীন সংস্কৃতিক সম্পর্কের ঐতিহাসিক তাৎপর্যের উপর এক নূতন আলোক-সম্পাত করেন। স্মরণ রাখা দরকার, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই রবীন্দ্রনাথ, ওকাকুরা, বিবেকানন্দ,নিবেদিতা, জগদীশচন্দ্র, প্রমুখ চিন্তা-নায়কেরা এশিরার বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক ঐক্য প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন। লোস ডিকিনসনের দৃষ্টিভঙ্গিও রবীন্দ্রনাথকে কম প্রভাবিত করে নাই। স্মরণ রাখা দরকার, ১৯০৩ সালেই রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র শান্তি-নিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া এশিয়ার সাংস্কৃতিক সম্পদ ও সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করিবার পরিকল্পনা করেন। ঐ সময় জগদীশচন্দ্র কবিকে এক পত্রে লেখেন,

"তোমার স্কুলের কথা সর্বদাই ভাবিতেছি। যতই ভাবি ততই ভবিষ্যতে ইহা হইতে যে এক জাতীয় মহাবিদ্যালয় উৎপন্ন হইবে তাহার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে। এ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, আসিলে হইবে।

"তবে একটি বিষয় শীঘ্রই করিতে হইবে। এইটিই সহজসাধ্য—পরে বৃহৎ আকারে হইবে। কিন্তু বর্তমান সুবিধা ছাড়িয়া দিতে নাই।

"যবদ্বীপ ত সতীশ যাইবে। কিন্তু চীন ও জাপান হইতে পুঁথির কপি সংগ্রহ অতি সত্বর করিতে হইবে।

"একজনকে চীন ভাষায় দিগ্‌গজ করিতে এখনও সময় সাপেক্ষ। কিন্তু তাহার পূর্বে কতকগুলি preliminary কাজ করিলে এ সম্বন্ধে একটা নূতন উৎসাহ হইবে,...

"আমার plan এই।

"এখন একজন সংস্কৃত ও ইংরাজীবিদ্ ছাত্র সন্ধান করিয়া ৬ মাস Asiatic Societyতে বুদ্ধধর্ম সম্বন্ধে Tibet-এর mss ও অন্যান্য লিপি যাহা আছে তাহা অভ্যস্ত করিতে হইবে। তারপর তোমার Mr. Hory'কে সঙ্গে করিয়া তিনি চীন দেশের ও জাপানের নানা বিহারে বাঙ্গলা ও দেবনাগরী পুঁথির কপি করিবেন ; এ সম্বন্ধে হোরির মত করাইতে হইবে। আর খরচ আমাদিগকে দিতে হইবে। এরূপ মহৎ কার্যে হোরির সহানুভূতি পাইতে পার। আর জাপান ও চীন দেশের খ্যাতনামা লোকের সহিত আলাপের সুবিধা এখন হইতেই করিতে হইবে।"

[বিশ্বভারতী পত্রিকা (জগদীশচন্দ্র-বিপিনচন্দ্র সংখ্যা)-কার্তিক-পৌষ-১৮৮০ শক ॥ পৃঃ-১৪০-৪১]

বিশ্বভারতীকে যখন কবি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিতে ব্যস্ত, এমন সময় চীন ভ্রমণের আমন্ত্রণে কবি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। স্থির হয়, বিশ্বভারতীর পক্ষ হইতে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল কবির সহিত চীন ভ্রমণে যাইবেন। ভারতের সহিত চীনের সেই মহান ঐতিহ্যমণ্ডিত সাংস্কৃতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত করাই হইবে ইহার লক্ষ্য। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন, শিল্পী নন্দলাল বসু, ডঃ কালিদাস নাগ, এলমহার্স্টকে লইয়া একটি সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল গঠিত হয়। যাত্রার প্রাক্কালে শান্তিনিকেতনে উপাসনান্তে কবি তাঁহার ভাষণে বলিলেন,

"আমাদের এই দেশের গণ্ডির মধ্যে আশ্রমের পরিচয় যতই মনোরম হোক, তার যথার্থ যে বড়ো চেহারা, তার ভিতরকার বড়ো শক্তির পরিচয় নেই। যদি শান্তিনিকেতনের দূত হয়ে ভারতবর্ষের বাইরে এখানকার বাণী বহন করে যেতে পারি, যদি কোনও বিশ্ববাণীকে অন্তরে বহন করে আনতে পারি, তবে আশ্রমের বড়ো পরিচয়টি পাব।" [শান্তিনিকেতন পত্রিকা-৫'ম বর্ষ ১৩৩১ ॥ পৃঃ ১৩৮]

২১শে মার্চ (১৯২৪) 'ইথিওপিয়া' জাহাজে রবীন্দ্রনাথ সদলবলে চীন যাত্রা করেন।

২৪শে মার্চ জাহাজ রেঙ্গুন পৌঁছাইল। বন্দরে ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের সম্মিলিত এক বিপুল জনতা কবিকে অভ্যর্থনা জানাইতে আসিয়াছিলেন। ইহার পর বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া তাহাদের রেঙ্গুনের এক সুরম্য ভবনে লইয়া যাওয়া হয়। ব্রহ্মদেশের গভর্ণর স্যর হারকট বাটলার কবিকে এক মধ্যাহ্নভোজে আপ্যায়িত করিলেন। সন্ধ্যায় স্থানীয় 'জুবিলী হলে' কবির সম্বর্ধনাসভা হয়। রেঙ্গুনবাসীর পক্ষ হইতে মিঃ এম. এম ঘীণে একটি সুন্দর অভিনন্দনপত্র পাঠ করিলেন। কবি তাঁহার ভাষণে বহির্বিশ্বের সহিত অতীত ভারতের প্রেম ও মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপনের গৌরবোজ্জ্বল তাৎপর্যটি ব্যাখ্যা করিয়া পরিশেষে, বিশ্বভারতীর তাৎপর্য ও ভূমিকাটির উল্লেখ করিয়া সকলকে উহার সহিত সহযোগিতা করিবার আহ্বান জানাইলেন।

২৬শে মার্চ রেঙ্গুনের চীনা সমাজ রবীন্দ্রনাথকে এক সম্বর্ধনাসভায় অভিনন্দন জানাইলেন। ইহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন, রেঙ্গুনের কেমেনডাইন

স্কুলের অধ্যক্ষ Dr. Lin Wo Chiang. পরবর্তী কালে তিনি শান্তিনিকেতনে চীনা ভাষার অধ্যাপকরূপে কয়েক বৎসর কাজ করিয়াছিলেন।

পেনাং, কুআলা-লাম্পুর, সিঙ্গাপুর হইয়া অবশেষে ১০ই এপ্রিল তাঁহারা হংকঙে আসিয়া পেঁছাইলেন। প্রথম অহিফেন যুদ্ধের পর হইতে হংকং ইংরেজদের অধিকারে আছে। হংকং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যানসেলার রবীন্দ্রনাথকে একটি বক্তৃতা দিবার অনুরোধ জানান। রবীন্দ্রনাথের চীন ভ্রমণের সংবাদ পাইয়া ডাঃ সান ইয়াৎ সেন এক পত্রে কবিকে স্বাগত জানাইয়া তাঁহাকে ক্যান্টনে আসিবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। ডাঃ সান ইয়াৎ সেন তাঁহার পত্রে লেখেন,

Canton : 7th April 1924.

Dear Mr. Tagore,

I should greatly wish to have the privilege of personally welcoming you on your arrival in China. It is an ancient way of ours to show honour to the scholar. But in you I shall greet not only a writer who has added lustre to Indian letters but a rare worker in those fields of endeavour wherein lie the seeds of man's future welfare and spiritual triumphs.

May I then have the pleasure of inviting you to Canton ?

Yours sincerely,

(Sd.) Sun Yat Sen."

রবীন্দ্রনাথ যখন চীনে যান, তখন চীনের শাসনব্যবস্থা দুটি ভাগে বিভক্ত, —দক্ষিণ-চীন সরকার ও উত্তর-চীন সরকার। দক্ষিণ-চীনে ডাঃ সান-ইয়াৎ সেনের নেতৃত্বে রিপাবলিকান গবর্ণমেণ্ট প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ভাবধারায় অগ্রসর হইতেছিল। উহার রাজধানী ছিল, ক্যান্টন।

কিন্তু উত্তর-চীনে যুদ্ধবাজ ছোটো-বড়ো বহু প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা তুচুনেরা (Tuchun) ক্ষমতা দখল করিয়াছিল। জাপান ও ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি এই সব তুচুনদের মধ্যে নিয়তই ঝগড়া-বিবাদ লাগাইয়া রাখিয়া তাহাদের রাজনৈতিক অভিসন্ধি চরিতার্থ করিতেছিল। বস্তুত এই সব তুচুনেরা ছিল বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির হাতের ক্রীড়নক মাত্র। এক কথায় উত্তর-চীনে অরাজকতা ও প্রতিক্রিয়ার শক্তি ঘাঁটি গাড়িয়া বসিয়াছিল। মহাযুদ্ধের সময় জাপান কি ভাবে উত্তর-চীনের বিরাট এলাকা জুড়িয়া তাহার প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া বসে, পূর্ব খণ্ডেই তাহা বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে। যুদ্ধশেষে ভার্সাই সন্ধি সম্মেলনে চীনের প্রতিনিধি চীনে ঔপনিবেশিক শোষণের অবসান ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দাবী করিলেন। কিন্তু ভার্সাই সন্ধিরচয়িতা বৃহৎ শক্তিবর্গের সঙ্গে জাপান পূর্বেই গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহারা চীনে জাপানের সাম্রাজ্যবাদী অধিকারগুলি বজায় রাখিলেন। ফলে সারা চীনে জাপান ও সমস্ত বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক দারুণ ক্রোধ ও ঘৃণার ভাব উদ্রিক্ত করে। জাপানী পণ্যদ্রব্য বয়কট ও স্থানে স্থানে

জাপানীদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলিতে লাগিল। ১৯২২ সালে ওয়াশিংটনে বৃহৎ চতুঃশক্তি এক চুক্তি আলোচনায় জাপানকে চীনের শাণ্টুং প্রদেশ ফিরাইয়া দিবার নির্দেশ দেয়। কিন্তু কার্যতঃ জাপান উহা অগ্রাহ্য করে। এদিকে সোভিয়েট রাশিয়া তাহার গৃহযুদ্ধের অন্তে চীনের সহিত মৈত্রী ও একটি সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হইবার আমন্ত্রণ জানায়। জারের আমল হইতে তাহারা এতকাল চীনে যে সব সাম্রাজ্যবাদী সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছিল, সে-সমস্তই নাকচ করিয়া চীনের স্বাধীন সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া বন্ধুত্ব ও সমতার ভিত্তিতে সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইতে চাহিলেন। চীনকে এতবড়ো মর্যাদা ও স্বীকৃতি তখনও পর্যন্ত কোন বৈদেশিক শক্তি দেয় নাই। ১৯২৪ সালে সোভিয়েট ও উত্তর-চীনের পিকিং সরকারের মধ্যে এই সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

অপরদিকে দক্ষিণ-চীনে ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের নেতৃত্বে ক্যাণ্টন গবর্ণমেণ্টও এক দারুণ অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও সংকটের মধ্যে চলিতেছিল। ডাঃ সেন এক অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের পরিকল্পনা লইলেন ও বড় বড় বৈদেশিক শক্তিগুলির সাহায্যভিক্ষা করিলেন। কিন্তু একমাত্র সোভিয়েট রাশিয়া ছাড়া সকলেই তাঁহাকে নিরাশ করিলেন। তখন তিনি রাশিয়ার সহিত এক মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন (১৯২৪)। রাশিয়া এই ব্যাপারে সাহায্য করিবার জন্য বিখ্যাত বলশেভিক নেতা বরোডিনকে চীনে পাঠাইলেন। কিন্তু রাশিয়া হইতে বস্তুগত বা material help-ই শুধু আসিল না — চীনের যুব-চিত্তে সাথে সাথে কমিউনিষ্ট চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ ঘটে। এককথায় দীর্ঘকালের গৃহযুদ্ধ ও অন্তর্বিপ্লবের মধ্যে সারা চীনের জনমানসে এক দারুণ আলোড়ন ও পরিবর্তন চলিতে থাকে। চীনের বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাশীল মানুষ মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। একদল প্রাচীন ও প্রতিক্রিয়ার দিকে মুখ ফিরাইলেন। অপরদল আধুনিক ও প্রগতিশীল চিন্তাধারাকে অভ্যর্থনা জানাইলেন।

এইরকম এক পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ উত্তর-চীনের পিকিং-এর বুদ্ধিজীবীদের আমন্ত্রণে চলিলেন। রবীন্দ্রনাথ ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের একান্ত-সচিবকে অত্যন্ত বিনীতভাবে বলিলেন যে, উত্তর-চীন ভ্রমণের অন্তে ফিরিবার পথে তিনি ক্যাণ্টনে ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইবেন। কিন্তু নানাকারণে এই সাক্ষাৎকার ঘটিয়া উঠে নাই। ১৯২৫ সালের ১২ই মার্চ ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের মৃত্যু হয়।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রজীবনীকার লিখিতেছেন,

"কবির সঙ্গীরা ও হংকঙের হিতাকাঙ্ক্ষীরা বোধ হয় কবিকে বুঝাইলেন যে তিনি পিকিঙবাসীদের নিমন্ত্রণে উত্তর-চীনে যাইতেছেন ; কানটনে যে রিপাবলিক চীনসরকার গঠিত হইয়াছে, তাহা পেকিঙসরকার কর্তৃক স্বীকৃত নহে, উহা চীনের বিকল্প গবর্মেণ্ট। মোটামুটিভাবে কবি বুঝিলেন বা তাঁহাকে বুঝানো হইল যে উত্তর-চীন ও দক্ষিণ-চীনে সদ্ভাব নাই—কানটনের রিপাবলিক সরকার পেকিঙসরকারের বিরুদ্ধে গঠিত ; এক্ষেত্রে তাঁহাকে পাশ কাটাইয়া যাওয়াই উচিত।" [রবীন্দ্রজীবনী তৃতীয় খণ্ড (নূতন সং) ॥ পৃঃ ১৬৫]

১২ই এপ্রিল কবি সদলবলে সাংহাই বন্দরে নামিলেন। বন্দরে চীনের আরও অনেকে রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য আসিয়াছিলেন। তরুণ কবি শু চু মো রবীন্দ্র-কাব্যের পরম ভক্ত ছিলেন। কবির চীন ভ্রমণকালে বরাবর তিনি কবির সঙ্গে থাকিয়া দোভাষীর কাজ করিয়াছিলেন।

পরদিন অপরাহ্ণে সাংহাইয়ের বিশিষ্ট নাগরিক ও সুধীজনের পক্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে এক সম্বর্দ্ধনাসভার আয়োজন হয়। সেদিন কবি তাঁহার ভাষণে অত্যন্ত বিনীতভাবে বলিলেন,

....'I am not a philosopher: therefore keep for me room in your heart, not a seat on the public platform. I want to win your heart, now that I am close to you, with the faith that is in me of a great future for you, and for Asia when your country rises and gives expression to its own spirit,—a future in the joy of which we shall all share.

"Amongst you my mind feels not the least apprehension of any undue sense of race feeling, or difference of tradition. I am rather reminded of the day when India claimed you as brothers and sent you her love That relationship is. I hope, still there, hidden in the heart of all of us,—the people of the East.···

উপসংহারে তিনি দৃঢ়তার সহিত এই মত ব্যক্ত করিয়া বলিলেন,

...."I hope that some great dreamer will spring from among you and preach a message of love and, there with overcoming all differences, bridge the chasm of passions which has been widening for ages. Age after age, in Asia great dreams have made the world sweet with the showers of their love. Asia in again waiting for such dreamers to come and carry on the work, not of fighting, not of profit-making, but of establishing bonds of spiritual relationship."

[*Talks in China*-pp. 19-20.]

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যের প্রকৃত তাৎপর্য সেদিন অনেকেই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তাছাড়া বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী মহল তাঁহার চীন ভ্রমণ ও ঐ ভাষণের একটি গূঢ় উদ্দেশ্যও আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইসব আকার-ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য রবীন্দ্রনাথ শুনিলেন। সাংহাই-এ থাকিতেই হ্যাংচাউ হইতে কবির নিমন্ত্রণ আসে। কবি হ্যাংচাউ-এ ছাত্রদের এক সভায় তাঁহার বক্তব্য বিষয় আরও পরিষ্কার ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন,

···"Science has made it easy for nations to come closer, but the same science has made it easy for us to kill, to exploit; not

to know each other, and yet to believe that we know.

"The fact of our closer neighbourhood thus remains an external fact of which mankind has no cause to be proud. It always causes evil when we come nearer each other and yet do not established close relations. We from a crowd, but not a community. The time has come when we must do our best to wipe out this shame from which the whole human race is suffering.

..."My friends, this is my mission. I have come to ask you to re-open the channel of communion which I hope is still there ; for though overgrown with weeds of oblivion, its lines can still be traced. I shall consider myself fortunate if, through this visit, China comes nearer to India and India to China,—for no political or commercial purpose, but for disinterested human love and for nothing else"

[*Ibid*-pp. 23-24]

হ্যাংচাউতে দুইদিন কাটাইবার পর তাঁহারা পুনরায় সাংহাইতে ফিরিলেন। সাংহাই-এর প্রবাসী জাপানী সম্প্রদায় রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে সম্বর্দ্ধনা সভার আয়োজন করেন। এই সভায় কবি যে ভাষণ দেন তাহাতে তিনি আধুনিক জাপানের ধনলোলুপতা ও ক্ষমতা-মদমত্ততার তীব্র নিন্দাবাদ করেন। অবশ্য কবির ঐ অভিযোগ শুধু জাপানের বিরুদ্ধে নয়,—এ অভিযোগ মূলত পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী দেশগুলির বিরুদ্ধে। তিনি বলিলেন,

..."I do not blame only Japan for this. It is the same in other countries where a great part of humanity has become mechanical and dead, with monotonus uniformity which dead things have in common.

"So I should not be surprised if I, in my turn, were to be excluded, and prevented from receiving your hospitality by by the political spirit of your country, just as I should not be surprised if in England, or America, or anywhere else in the West, the politicians and prosperous people should shut their doors in my face, because they know that ideals have their explosive power. Is it not their age-long custom to treat idealists in this manner, and even to put them in prison ? They would have crucified Christ just the same to-day, for would not Christ have preached pacifism had he come even in the middle of the most terrible fight in human history."

তিনি বলিলেন,

…"We are waiting to-day for a revival of that moral ideal, of a spiritual standard of life, to save us from this demon worship of power." [*Ibid*-pp. 104-07]

কবির এই বক্তৃতার বিরুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন পত্রিকাগুলি সমালোচনা করিতে থাকে। সাংহাই-তে রবীন্দ্রনাথ পরে আরও কয়েকটি জায়গায় বক্তৃতা করেন।

সাংহাই হইতে তাঁহারা নৌকাযোগে ইয়াংসী নদী ধরিয়া নানকিং-য়ে পৌঁছিলেন। নানকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে কবির সম্বর্ধনা ও বক্তৃতার আয়োজন হয়। ঐ সভায় কবি তাঁহার ভাষণের উপসংহারে বলিলেন,

"Let the morning of this new age dawn in the East, from which the great streams of idealism have sprung in the past, making the fields of life fertile with their influence. I appeal to you to make trial of this moral power through martyrdom. Prove how, through the heroism of suffering and sacrifice,—not weak submission,—we can demonstrate our best wealth and strength.…

"The great human societies are the creation not of profiteers, but of dreamers. The millionaires, who produce their bales of merchandise in enormous quantities, have never yet built a great civilization. It is they who are about to destroy what others have built. Come to the rescue and free the human soul from the dungeon of the Machine. Proclaim the Spirit of Man and prove that it lies not in machineguns and cleverness, but in a simple faith"

[*Idid*—p, 32]

নানকিং-এর সমর-তুচুন জেনারেল 'Tsi'র সহিত চীনের আভ্যন্তরীণ কলহ ও গৃহবিবাদ সম্পর্কে কবির দীর্ঘ আলোচনা হয়। এই আলোচনার বিবরণ দিয়া এলমহার্স্ট লিখিতেছেন,

…"He expressed an earnest desire that the Tuchun should do his best to prevent internal dissensions and violence of all kinds which was growing daily in intensity, adding that China had a great responsibility because here was a great civilisation, and to menace this with internal discord and war was a crime that would never be forgiven in the history of the world. Before it is too late the Tuchun should try to stop all this for the sake not only of China but of Asia and all humanity." [*Visva Bharati Bulletin*-June 1924-p. 12]

নানকিং হইতে কবি সদলবলে পিকিং'-এর পথে যাত্রা করেন। ২৩শে এপ্রিল সন্ধ্যাবেলায় তাঁহারা পিকিং স্টেশনে পৌঁছিলেন। স্টেশনে পিকিং-এর গণ্যমান্য সকলেই এবং এক বিপুল জনতা তাঁহাদের অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য আসিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে কোন বিদেশী অতিথিকে চীনে এত বিপুল সম্বর্ধনা জানান হয় নাই।

পরদিন ২৪শে এপ্রিল পিকিংবাসীর পক্ষ হইতে এক বিরাট রাজকীয় সম্বর্ধনা সভায় কবিকে অভিনন্দন জানান হয়। বিখ্যাত সুপণ্ডিত অধ্যাপক লিয়াং-চি-চাও পিকিংবাসীর পক্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথকে স্বাগত জানাইয়া এক দীর্ঘ অভিনন্দন বাণী পাঠ করিলেন। তিনি তাঁহার ভাষণে ভারত-চীন সাংস্কৃতিক সম্পর্কের এক সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক ধারা-বিবরণী দিয়া উপসংহারে কবির ভ্রমণ উপলক্ষে ঐ সম্পর্কের পুনরুদ্ধার করিবার আহ্বান জানাইয়া বলিলেন,

..."We hope that on this occasion the love between China and India will not terminate with the one or two months which Mr. Tagore is able to spend in this country. The responsibility that we bear to the whole of mankind is great indeed, and there should be, I think, a warm spirit of co-operation between India and China, The coming of Mr. Tagore will, I hope, mark the beginning of an important history.

"If we can avail of this occasion to renew the intimate relationship which we had with India and to establish a really constructive scheme of co-operation, then our welcome to Mr. Tagore will have real significance."

[*Talks in China*-p. 15]

পরদিন পিকিং-এর Wagonslits হোটেলে সেখানকার *Anglo-American-Association* এর পক্ষ হইতে কবিকে এক সম্বর্ধনা জানান হয়। সাংহাইয়ে জাপানীদের সম্বর্ধনা সভায় কবি যাহা বলিয়াছিলেন এখানে ভাষণে প্রায় তাহারই পুনরাবৃত্তি করিলেন। তিনি জাপান ও পাশ্চাত্য দেশের উগ্র জাতীয়বাদ ও সাম্রাজ্যলোলুপতার তীব্র সমালোচনা করিয়া উপসংহারে বলিলেন,

"World ideals Must be large in order that there be no danger from race hatred and pride. Messages that come from the heart and drawing together the present age idealists by a common thread. Visva-Bharati is a station gathering ideals from the world over. It is my fondest hope that gradually world ideals will grow in strength until at last they have fulfilled their highest mission—the unification of mankind.

[*Visva-Bharati Bulletin*-1924 p. 19]

বলা বাহুল্য, কবির এইসব বক্তৃতায় শুধু চীনের ইঙ্গ-মার্কিন সম্প্রদায়ই ক্ষুব্ধ হয় নাই, নবীন চীনের এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর মধ্যেও ইহাতে নানা প্রতিক্রিয়া ও চাঞ্চল্য দেখা দেয়। ইহার পশ্চাতে তৎকালীন রাজনীতিক ও ভাবাদর্শগত দ্বন্দ্ব-সংঘাতজনিত নানা প্রতিক্রিয়া কাজ করিতেছিল। এই প্রসঙ্গে জনৈক চীনা সাহিত্যিক সেন না-লান লিখিতেছেন,

"রবীন্দ্রনাথ যখন চীন ভ্রমণে এলেন তখন চীনের সাহিত্যিক সম্প্রদায় দ্বিধাবিভক্ত। সাহিত্য-সৃষ্টির পন্থায় তত্ত্ব ও নীতি নিয়ে মতবিরোধ থাকায় চীনের কবি ও লেখকগণ তখন ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী সৃষ্টি করে নিজেদের মতবাদ প্রচার করছিলেন। ডাঃ হু হু, লিয়াং ছি-ছাও, শু চু-মো প্রভৃতি 'শিল্পের জন্যই শিল্প সৃষ্টি' এই মতবাদ প্রচার করেছিলেন। আর লু শুন্, কুও মো ডো, মাও তুন, ওয়েন য়ি-তো প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ প্রচার করছিলেন 'বাস্তবধর্মী ও বিপ্লবী সাহিত্য সৃষ্টিই সাহিত্যিকের ধর্ম।' এরা সকলে অবশ্যই প্রথম যুগে একযোগে কাজ করেন নি। সাহিত্যের এই মূল তত্ত্বগত প্রশ্ন নিয়ে চীনের সাহিত্যিক মহলে যখন তুমুল আলোড়ন চলেছে তখনই রবীন্দ্রনাথের চীনে আগমনের কথা ঘোষিত হল।

"রবীন্দ্রনাথকে চীনে যারা আহবান জানালেন তারা ছিলেন উপরোক্ত প্রথম দলের নেতৃবর্গ। কবি শু চু-মো (রবীন্দ্রনাথ যার নাম দিয়েছিলেন 'সুসীমা') ছিলেন রবীন্দ্রনাথের দোভাষী। এঁরা ভাবলেন রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি ও সাহিত্যসৃষ্টিতে এই বিশ্ববিখ্যাত কবির অভিমত তাদেরই মতবাদের সহায়ক হবে। অপরপক্ষ তখন রবীন্দ্রনাথের মতবাদ চীনের গ্রহণযোগ্য নয় বলে প্রচার করতে শুরু করেন। ফলে তৎকালীন চীনের সংবাদপত্র ও সাহিত্য পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে আলোচনার অবতারণা তারা করলেন তাতে আক্রোশটা কিন্তু রবীন্দ্রনাথে প্রতি ততটা ছিল না যতটা ছিল প্রতিপক্ষকে এই সুযোগ থেকে নিরত করবার প্রয়াস। আসলে কিন্তু এই দুই দলের কোন সাহিত্যিকেরই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তখন সঠিক কোন ধারণা ছিল না। এরা সকলেই রবীন্দ্রনাথকে শুধু 'প্রকৃতির কবি' বা 'প্রেমের কবি' বলেই জেনেছিলেন।..."

[আন্তর্জাতিক পত্রিকা-রবীন্দ্রশতবর্ষ সংখ্যা ॥ পৃঃ ১০১৮-১০১৯]

তৎকালীন চীনা সাহিত্যিকদের রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞানের স্বল্পতা ও সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি আরো লিখিয়াছেন,

"রবীন্দ্রনাথের চীনে আগমনের কিছু পূর্বেই কবি ওয়েন য়ি-তো 'রবীন্দ্র সমালোচনা' নামে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'বাস্তবকে স্পর্শ করেনি' এইটাই ওয়েন য়ি-তো'র মূল বক্তব্য। তিনি বলেন, 'সাহিত্য জীবনেরই প্রতিফলন ; আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ কবিতার ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। ব্যাপকতাই সাহিত্যের গুণের লক্ষণ, আর জীবনের মধ্যে জানা যাবে সব চেয়ে ব্যাপকতর জিনিষ কি। সুতরাং সাহিত্যের প্রাসাদ জীবনের ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।...'

"বলা বাহুল্য ওয়েন য়ি-তোর রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞান 'গীতাঞ্জলি',

'*Fruit gathering*', '*Gardener*' ও '*Crescent Moon*' এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।…"
[ঐ ॥ পৃঃ ১০২০]

রবীন্দ্রনাথের চীন ভ্রমণের কয়েকমাস আগে সাহিত্যিক কুও মো-ডো এক প্রবন্ধে লিখিলেন, (১১ই অক্টোবর ১৯২৩),

…"আমার বিশ্বাস ঐতিহাসিক জড়বাদের দৃষ্টিতে দেখলে আমরা সংসারের যাবতীয় ঘটনার একমাত্র নির্ধারিত যাত্রাপথ যে কি তা নিরূপণ করতে পারবো, জগতে এখনও যখন অর্থশাস্ত্রের নিয়ম কানুন বদলায় নি, সেই সময় ব্রহ্মার প্রকাশ, 'আত্মন্'-এর গরিমা, 'প্রেম'-এর বাণী কেবলমাত্র কর্মবিরল মানুষদের অহিফেন বা তাড়ি; নিঃস্বদের পক্ষে অনবরত শরীরের ঘাম আর রক্ত ক্ষয় করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। সমন্বয়ের প্রচার হচ্ছে পৃথিবীর সব চেয়ে সাংঘাতিক বিষ, সমন্বয়ের প্রচার হচ্ছে বিত্তবানদের ছলনার আশ্রয়, নিঃস্বদের লৌহশৃঙ্খল। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত ইচ্ছায় চীন দেশে আসছেন বললে আহ্বানকারীর মধ্যে আমাদের যথেষ্ট অভিযোগ থেকে যায়। যে ব্যবস্থাপকরা আপ্যায়িত করে রবীন্দ্রনাথকে চীন দেশে নিয়ে আসছেন সে তাঁর চিন্তাধারার কোন্ দিকটি দেখে? ওঁর কাছ থেকে কি প্রকার উপদেশ তাঁরা আশা করেন? আমাদের এই মতামত সম্পর্কে মন্তব্য শুনবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলাম।"

[ভারত-চীন পত্রিকা-অনুবাদক অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর—মাঘ-চৈত্র—১৮৮০-৮১ ।। পৃঃ ৩০৬]

ইহা হইতেই বুঝা যায় চীনের সাহিত্যিকদের গোষ্ঠীগত কোন্দল সেদিন অনেকখানি কাজ করিয়াছিল যাহার জন্য কবির বক্তব্য স্থির মস্তিকে চিন্তা করিবার মত মানসিক অবস্থা তাঁহাদের ছিল না। রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কে ইঁহাদের জ্ঞানের সংকীর্ণ সীমাবদ্ধতা তো ছিলই;—তাছাড়া কবির রাজনীতিক-অর্থনীতিক চিন্তা ও সাধনা সম্পর্কে বিন্দুমাত্রও ধারণা তাঁহাদের ছিল না। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ সঠিক অর্থে 'বস্তুবাদী' ছিলেন না,—মূলত তিনি ছিলেন এক মহান অধ্যাত্মবাদী ও ভাবুক মানবতাবাদী কবি। কিন্তু তাঁহার অধ্যাত্মবাদ ও ভাববাদ কখনও উৎপীড়ক ও অত্যাচারীর সহায়ক ছিল না পরন্তু জগতের যত কিছু অন্যায় উৎপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে তিনি সারা জীবন লেখনী ধারণ করিয়া আসিতেছিলেন। পাশ্চাত্যের উপনিবেশবাদ, যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ ও বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে তিনি বিরামহীন লেখনী ধারণ করিয়া আসিতেছিলেন, সে-খবরও চীনা সাহিত্যিকরা কেহ রাখিতেন না। তাঁহার চিন্তা, রচনা ও সাধনায় জনগণের স্বার্থরক্ষাই যে মুখ্য কথা ছিল,ইহাও তাঁহারা জানিতেন না।

অবশ্য এবার চীন ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ভাষণ ও বক্তৃতাগুলিতে ভারত-চীনের প্রাচীন আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শেরই বেশী মহিমা প্রচার করা হইয়াছিল;—দ্বিতীয়ত, পাশ্চাত্য সভ্যতার উপর নৈতিমূলক সমালোচনা ও আক্রমণের ঝোঁকটাই আপেক্ষিকভাবে তীব্র ও প্রকট ছিল। যে-কবি স্বদেশে অসহযোগ আন্দোলনের সময় পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের মহিমা প্রচারে উচ্ছ্বসিত

হইয়া উঠিয়াছিলেন, উহার অনতিকাল পরেই চীন ভ্রমণকালে তিনি উহার উপর উপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করিতে ভুলিয়া গেলেন। তাহার কারণ রবীন্দ্রনাথ কবি। যখন যে ভাবটি তাঁহার মনে উদয় হয়, তখনই তাহার উপর তিনি যেন একটু অধিক গুরুত্ব (over-emphasis) আরোপ করিয়া বসেন।

প্রাচীন ভারত চীনের মধ্যে যে অধ্যাত্ম ভাব-সম্পদের বিনিময় হইয়াছিল তাহারই ঐতিহ্যমণ্ডিত চিত্রটি তখন তাঁহার মনকে যেন সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। যাহার জন্য বার বার সেখানে তিনি তাঁহার ভাষণ ও বক্তৃতাগুলিতে উহার উল্লেখ করিয়া ভারত-চীনের মধ্যে সেই সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার আহ্বান জানাইতেছিলেন। কিন্তু চীনের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা দূরীকরণ ও জাতিগঠনের ক্ষেত্রে যে ইউরোপের গণতান্ত্রিক চেতনা, যন্ত্রশিল্প ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথোপযুক্ত পরিমাণ বিস্তার ও বিকাশ হওয়া প্রয়োজন, এই কথা তিনি সেদিন খুব গুরুত্ব দিয়া বলিতে ভুলিয়া গেলেন।

২৮শে এপ্রিল পিকিং-এর বিখ্যাত '*Temple of the Earth*'-এ প্রায় সহস্রাধিক ছাত্রের এক সমাবেশে কবি তাঁহার ভাষণের এক জায়গায় বলিলেন,

"We must rise from our stupor, and prove that we are not beggars. This is our responsibility. Search in your own homes for things that are of undying worth. Then you will be saved and will be able to save all humanity. Some of us, of the East, think we should copy and imitate the West. I do not belive it. What the West has produced is for the West, being native to it. But we of the East cannot borrow the Western mind nor the Western temperament. The West is becoming demoralized through being the exploiter, through testing of the fruits of exploitation. We want to find our own birrhright.

"We must fight with our faith in the moral and spiritual power of men. We of the East have never reverenced death-dealing generals, nor lie-dealing diplomats, but spiritual leaders. Through them we shall be saved, or not at all. Physical power is not the strongest in the end. That power destroys itself. Machineguns and bomb-dropping aeroplanes crush living men under them, and the West is sinking to its dust. We are not going to follow the West in competition, in selfishness, in brutality." [*Talks in China*-p. 44.]

এখানে কবির বক্তব্য বিষয় বুঝিতে অসুবিধা হয় না, কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার অপর তাৎপর্যপূর্ণ দিকটির প্রতিও যে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে তিনি নির্দেশ করিতে পারেন নাই, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। নবীন চীনের নেতৃবৃন্দ

এই কারণেই কবির প্রতি কিছুটা বিরূপ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের সম্মানিত অতিথি রবীন্দ্রনাথের প্রতি কোন অশিষ্ট আচরণও করেন নাই। অবশ্য এই সব বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন চীনের জনগণের এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। চীনের প্রায় সর্বত্রই রবীন্দ্রনাথ বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হইয়াছিলেন।

৮ই মে (২৫শে বৈশাখ) পিকিঙের 'ক্রেসেণ্ট-মুন' সোসাইটির উদ্যোগে কবির জন্মদিন উপলক্ষে মহাসমারোহে এক উৎসবের আয়োজন করা হয়। ডক্টর হু-সি এই উৎসবের পৌরোহিত্য করেন। এই উৎসব সভায় পিকিঙের শ্রেষ্ঠ মনীষীবৃন্দ রবীন্দ্রনাথকে 'চু-চেন্-তান্' উপাধিতে ভূষিত করেন—উহার প্রকৃত অর্থ হইল 'ভারতের মেঘমন্দ্রিত প্রভাত'। কবি সেদিন ধুতি পাঞ্জাবি পরিয়া সম্পূর্ণ বাঙালী বেশে এই উৎসব অনুষ্ঠানে যোগ দেন। ঐদিন উৎসবান্তে কবির 'চিত্রা'র ('চিত্রাঙ্গদা'র) অভিনয় হয়।

আর একটি জিনিস উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ চীন ভ্রমণকালে চীনের আভ্যন্তরীণ কলহ ও গৃহযুদ্ধ মিটাইয়া লইবার আবেদন জানাইয়াছিলেন বটে তবে প্রত্যক্ষভাবে তিনি উহাদের কোন পক্ষই অবলম্বন করেন নাই বা কাহার বিরুদ্ধেও কোন কথা বলেন নাই। তিনি উত্তর-চীনের কয়েকজনই প্রতিপত্তি-শালী সমর-তুচুনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। চীনের নির্বাসিত মাঞ্চু সম্রাটের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা হইলে কবি যথোচিত সৌজন্য ও মর্যাদার সহিত সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। রাজোচিত সম্মানের সহিত সেদিন কবি ও তাঁহার সঙ্গীদের রাজপ্রাসাদে অভ্যর্থনা জানান হইয়াছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ চীনের সম্মানিত অতিথি। চীনের আভ্যন্তরীণ রাজনীতির সম্পর্কে তিনি প্রত্যক্ষভাবে কোন মন্তব্য করা সমীচীন বোধ করেন নাই বলিয়া অনুমিত হয়। তুচুনদের নিকট এবং সমগ্র চীনবাসীর নিকট তাঁহার একটি মাত্র সনির্বন্ধ অনুরোধ ছিল, যেমন করিয়া হউক এই গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটান হউক। চীনের অখণ্ড দৃঢ় জাতীয়-ঐক্য ছাড়া বিদেশী শক্তির আক্রমণ প্রতিহত ও প্রতিরোধ কোন রকমেই সম্ভবপর নয়, ইহাই ছিল তাঁরার আবেদনের মূল বক্তব্য।

আর একটি খুবই উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, রবীন্দ্রনাথ সেদিন শুধু ভারত-চীন আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের আবেদনই জানান নাই,—কৃষি ও কারিগরী-বিদ্যার বিনিময়ের উপরও তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। পিকিং হইতে ফিরিবার পথে রবীন্দ্রনাথ Shansi'র রাজধানী Taiyunfu'তে যান। এখানে Shansi'র শাসনকর্তা বা তুচুন Yen shi-san'র সহিত আর্থিক পুনর্গঠনের প্রশ্নে উভয় দেশের মধ্যে কৃষি ও কারিগরী-বিদ্যার বিনিময়ের প্রস্তাব লইয়া কবি দীর্ঘকাল আলাপ-আলোচনা করেন। উঁহাদের কথোপকথনের বিবরণ পরবর্তীকালে 'বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (October, 1924)।

কবি বলিলেন,

"I have come, Your Excellency, to propose to you some way of blending our ideals so that some great civilisation may

again be the outcome of this meeting of the ideals of India with those of China…

"Unless the whole people is happy no individual can have true happiness. Unless all are wealthy no man, however rich, can have real wealth…This ideal is waiting for our acceptance. The multi-millionaire posseses power in his own hands and raises his tower of strength at the expense of the world. But I want to give the people of the responsibility for their own destiny, so that through their self-respect they may help themselves. In this let us work together. I have been asking Mr. E. (Elmherst) to come with some members of his staff to take-up some such work in China, just as I hope the day will come when you will send men to help us. I feel that India did once send of her best to China, and once more she must come both to learn and to give. I shall ask your co-operation in return…"

এইভাবে তাঁহাদের দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর কবি বিদায়কালে তাঁহার বাণীতে বলিলেন,

"I depart than with the hope that you will make it possible for us to help in this work, the work of building up the life of the soil, and through this spirit of mutual sympathy and co-operation help us to exchange friends students. It will be beautiful sight when Indians come to your Chinese villages and Chinese come to our Indian villages, not in order that they may get rich, but to work together as brothers. It is a great work to produce life together, to come down from our conventional altitude to the soil, not to acquire there learning or science but to find inspiration, to unite in helping to produce the material and spiritual neccssities of life…Please accept this ideal not merely for your own people in this particular province but as a service to humanity."…

[*Visva Bharati Quarterly*-October 1924-pp. 293-95]

এই আলাপ আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে এলম্‌হার্স্ট দেশে একটি চিঠিতে লিখিতেছেন (২৫ মে ১৯২৪),

"We have got a promise from Governor Yen in Sansi of a headquarter for an experiment along the lines of Sriniketan and a committee in peking is to make all arrangements,

supply funds and men if I can come bringing a couple of men from Surul for a few months, March to September inclusive. I think the Peking people will accept General Yen's offer about the Rural Reconstruction schme and one of the most beautiful sports in China will be placed at our disposal where the summer climate is good dry and not too hot."

[*Visva Bharati Bulletin*-June 1924 p. 45.]

যাহাই হউক, দীর্ঘ প্রায় দেড়মাসকাল চীনের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করিয়া কবি ও তাঁহার সঙ্গীরা জাপানের পথে রওনা হইলেন।

রবীন্দ্রনাথের এই চীন ভ্রমণের সুদূর প্রসারী ফল ও তাৎপর্যের কথা উল্লেখ করিয়া এলমহার্স্ট *Modern Review* পত্রিকায় এক দীর্ঘ প্রবন্ধের শেষে মন্তব্য করিতেছেন, (জুন ৮-১৯২৪)

"The future of the world already lies in the hands of Asia. *Russia, China and India will have to decide* what the future is to be. The old ideal of exploiting imperialism is struggling for breath upon its death bed. Disregarding the warning of the catastrophy of five years ago, it has set its face once more upon the same road to destruction. Are we, the nations of East and West, to be swept a second time into this maelstrom of selfish aggrandisement and thereby to build our own tombs? Or, meeting in friendship, based on a mutual understanding and appreciation, can we rescue humanity and give to the world a new lease of life."

[*Modern Review*-Aug. 1924-p. 165]

রবীন্দ্রজীবনীকার এই উক্তি প্রসঙ্গে মন্তব্য করিতেছেন, 'ইহার ভাষা ইংরেজি, লেখক ইংরেজ কিন্তু ভাবধারা যে রবীন্দ্রনাথের তাহা অতি সুস্পষ্ট।'

চীন হইতে রবীন্দ্রনাথ সদলবলে জাপানে গেলেন। রবীন্দ্রনাথ জাপানে আসিবার কিছুকাল আগে, সেখানে এক প্রবল ভূমিকম্প হয়। ইহার ফলে লক্ষ লক্ষ ঘরবাড়ি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ও বহু লোকের প্রাণহানি ঘটে। তাছাড়া এই সময় আমেরিকায় জাপানীদের প্রবেশাধিকার খর্ব ও সংকুচিত করিবার জন্য নানা বিধিবিধানের কড়াকড়ি হইতে থাকে। ইহার ফলে জাপানে খুবই অসন্তোষ ও রাজনৈতিক উত্তেজনা দেখা দেয়।

রবীন্দ্রনাথ জাপানবাসীদের এই ক্ষোভ ও উত্তেজনার আবেগ শমিত ও অবদমিত করিবার অনুরোধ জানান। 'International Relations' নামে তাঁহার একটি ভাষণে তিনি জাপানবাসীদের প্রতি সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলেন,

"You have discovered one thing, that this earthquake, though but physical, and therefore causing you only material loss, has yet a great similarity to the disturbance of your relations with a western country, for the latter is also external, having in it no acknowledgement of moral law…

"It is unfortunate that such disillusionment always gives rise to our baser passions. We feel angry and vengeful and eager to retaliate. Only then it becomes a complete defeat. I know if this insult had been offered by you to any western country, there would have been furious outbreaks of violence, of Ku Klux Klanism, of atrocious lynching against your people, and even its scientists and scholars would have had no shame in repudiating the claims of science and scholarship in your country. But is it right that you should copy that? Is it right that you, along with your political defeat, should accept moral defeat? I hope that your people, through your spiritual generosity, through your true pride of civilisation and through that sense of hospitality, which has been your birthright for centuries, will exercise your mind that has been trained and gifted with a wonderful self-control."

[*Visva Bharati Quarterly*-January 1925-p.309.]

কবি তাঁহার ঐ ভাষণে জাপানবাসীদের লক্ষ্য করিয়া আরও বলিলেন,

"পাশ্চাত্য দেশে জনসাধারণই তাহাদের সাহিত্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত এবং নৃত্যকলার সৃষ্টি করিয়াছে। গ্রীসের প্রধান নাট্যকার ও চিত্রকরদের মধ্য দিয়াই জনসাধারণের মনোভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে; দান্তে, শেক্সপিয়র ও গ্যেটের মধ্য দিয়াও ঐ মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে; আপনাদের দেশেও সর্বসাধারণের চিত্ত আপনাদের গৃহে তার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, গৃহগুলিকে শান্ত সৌন্দর্যে মণ্ডিত করিয়াছে;—আপনাদের ব্যবহারে যে সমুন্নত আত্মসংযম তাহাতে তাহার প্রভাব; আপনাদের উৎপাদিত সকল দ্রব্যে প্রয়োজনীয়তার সহিত সৌন্দর্যের যে-সমন্বয় তাহা ঘটাইতে তাহার প্রভাব; আপনাদের অননুকরণীয় চিত্রকলা ও নাট্যাভিনয়ে তাহার প্রভাব।

"কিন্তু নেশনের এই সমস্ত সৃষ্টি—ধ্বংসসাধনের ও ধনবৃদ্ধির যন্ত্রপাতি—কূট-রাজনীতির প্রকাশ্য ও গোপন আচরণ—এই সবের মূল্য কি? এগুলির সম্মুখে নৈতিক বন্ধন পরাহত এবং পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃভাব বিনষ্ট হইতেছে। এগুলি গ্রহণ করিতে আপনারা প্রলুব্ধ হইয়াছেন অথবা আপনাদিগকে প্রায় বাধ্য করা হইয়াছে।...

তাই তিনি জাপানকে পুনরায় সতর্ক করিয়া দিয়া বলিলেন,

"আমি জাপানবাসী আপনাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতে আসিয়াছি,—যে-জাপানে বসিয়া আমি ন্যাশন্যালিজ্মের বিপক্ষে বক্তৃতা লিখিয়াছিলাম এবং এমন সময়ে লিখিয়াছিলাম যখন লোকে আমার মতামত উপহাস করিয়াছিল। তাহারা মনে করিয়াছিল আমি শব্দটির অর্থ জানি না, এবং জাতি ও রাষ্ট্র এই দুইটি শব্দের গোল পাকাইয়া ফেলিয়াছি। আমি কিন্তু আমার বিশ্বাস ত্যাগ করি নাই। আর এই যুদ্ধের পরে জাতির এই মনোভাবের, এই সর্বচিত্ত-কঠোরকারী সমষ্টিভূত আত্মম্ভরিত্বের নিন্দা কি চারিদিকে আপনারা শুনিতে পাইতেছেন না?

"আর একবার আমি আপনাদিগকে সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিতে আসিয়াছি।...জাপান তাহার প্রকৃত স্বরূপ খুঁজিয়া বাহির করুক,—সে-স্বরূপ কেবল পরের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিবে না, নিজের জগৎ সৃষ্টি করিবে,—সে-জগৎ মানুষকে যাহা দিবার তাহা দিতে ঔদার্য দেখাইবে। আপনাদের মহত্ত্ব স্বীকার করিয়া এসিয়ার সমস্ত জাতি গর্বান্বিত হউক; সে-মহত্ত্ব পরাজিতকে দাস করিয়া রাখার উপর যেন প্রতিষ্ঠিত না হয়, কেবলমাত্র নিজেদের সুখের জন্য অর্থ-আহরণের উপর যেন তাহার ভিত্তি না থাকে,—সে অর্থ সর্বকালের মানব কর্তৃক গৃহীত হয় না এবং ঈশ্বর তাহা প্রত্যাখান করেন।"

[জাতি ও জনসাধারণ—প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩২, ।। পৃঃ ৮৪-৮৫]

রবীন্দ্রনাথ এবারও জাপানে প্রবাসী বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসুর সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

এবার জাপানে রবীন্দ্রনাথ প্রায় একমাসকাল ছিলেন। ২১শে জুলাই কবি চীন ও জাপান ভ্রমণ শেষ করিয়া দেশে ফিরিলেন।

ঐদিন অপরাহ্নে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে কবিকে এক

বিরাট সম্বর্ধনা জানান হয়। চীন ও জাপান ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করিয়া কবি এক দীর্ঘ ভাষণ দেন। (প্রবাসী-কার্তিক, ১৩৩১)।

রবীন্দ্রনাথের চীন-জাপান ভ্রমণের অল্পকাল পরেই এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সংহতি ও ঐক্য রক্ষার প্রথম প্রয়াস হিসাবে সাংহাইতে '*Asiatic Association* গঠিত হয়। বলা বাহুল্য, উহার মূল প্রেরণা আসিয়াছিল রবীন্দ্রনাথের চীন ও জাপানের ভাষণ ও বক্তৃতাগুলি হইতে। এই প্রসঙ্গে আমেরিকার বিখ্যাত *Christian Science Monitor* এক সংবাদে লিখিতেছে, (৩ রা অক্টোবর-১৯২৪)

"There is on foot an important movement to establish Asiatic concord through the common culture of Asiatic nation. ···

···"It has been accentuated by the recent Japanese exclusion legislation in the United States and stimulated by the recent visit to the Far East of Rabindranath Tagore, who preached the doctrine of idealism opposed to western materialism

"The new feeling is shown in the formation of Asiatic association in the principal centres, the first of which is located in Shanghai Its formation affected all the Far East, especially Japan. At the inaugaration representatives of all Asiatic countries were present. With the Japanese, Dr. Y. Tongu as president, and an Indian, Dr. H. P Shastri as Vice-President there were representatives of China, Japan, India and the Philipines.

"Inspiration for the movement is acknowledged to Tagore, whose teachings permeate the issued declarations."···

ইহার প্রায় দীর্ঘ ২৩ বৎসর পর ১৯৪৭ সালে দিল্লীতে *Asian Relatian Conference* হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ১৯২২ সালে গয়া-কংগ্রেসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন "*The Great Asiatic Federation*' গড়িয়া তুলিবার প্রস্তাব করেন। তিনি তাঁহার ভাষণে বলেন,

···"We must keep ourselves in touch with world movements and be in constant communication with the lovers of freedom all over the world.

"Even more important than this is participation of India in the great Asiatic Federation, which I see in the course of formation···It is the union of the oppressed nationalities of

Asia. Is India remain outside this union? I admit that our freedom must be won by ourselves but such a bond of friendship and love of sympathy and co operation, between India and the rest of Asia, nay, between India and all the liberty-loving people of the world is destined to bring about world peace."...

[*Congress Presidential Addresses-Vol II*-pp-579-80]

যাহাই হউক চিত্তরঞ্জনের আন্দোলনের ফলে ১৯২৮-২৯ সালে *The Great Asiatic Federation* গঠনের উদ্যোগে ও কার্যকরী পন্থা অবলম্বনের জন্য জাতীয়-কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অবশ্য নানাকারণে সেদিন ঐ সিদ্ধান্ত বাস্তবে কার্যকরী করা সম্ভবপর হয় নাই।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শুধু পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের মারমুখী আক্রমণের প্রতিরোধের জন্যই এসিয়ার সংহতি ও ঐক্য আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার কথা বলেন নাই। তিনি এশিয়ার বিভিন্ন দেশগুলির আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক বিনিময় ও ঐক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করিতেছিলেন। চীন, জাপান ও পূর্ব-এশিয়া ভ্রমণের পশ্চাতে উহাই ছিল কবির প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কবির সহিত মালয় ও জাভা দ্বীপ ভ্রমণকালে এই তাৎপর্যপূর্ণ দিকটির উদ্ঘাটন করিয়া তাঁহার 'দ্বীপময় ভারত' গ্রন্থে লিখিতেছেন,

"কবি চীনে গিয়ে সেখানকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সম্মান আকর্ষণ করেছেন। চীনা ভাষায় তাঁর বইও অনেক অনূদিত হয়েছে, চীনেদের মধ্যে তাঁর ভক্ত পাঠক অনেক আছে। তাছাড়া, ভারত আর চীন, এই দুই প্রাচীন জাত, যারা এক সময়ে ঘনিষ্ঠভাবে সৌহার্দ্য সূত্রে গ্রথিত ছিল, তাদের মধ্যে আবার যাতে উৎকর্ষের ঐক্য আর মনের মিল নোতুন ক'রে হয়, তার জন্য কবির যে একান্ত আগ্রহ আছে, তার প্রতি চীনাদেরও পুরা সহানুভূতির সৃষ্টি হয়েছে। কবি চান, যাতে, আধুনিক ভারতে চীনা ভাষার, চীনা সাহিত্যের আর চীনা সংস্কৃতির আলোচনা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর বিশ্বভারতীতে ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম ভালো ক'রে চীনা ভাষার আলোচনার প্রতিষ্ঠা তিনিই করেছেন; বিখ্যাত ফরাসী চীন-বিদ্যাবিৎ আচার্য সিল্‌ভ্যাঁ লেভির (Sylvain Levi) সাহায্যে, লেভির উৎসাহে আর শিক্ষায়, আর পরে রোম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত যুবক অধ্যাপক জুসেপ্পে তুচ্চির (Giuseppe Tucci) এবং চীন দেশীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ঙো চিওঙ্‌-লিম (Ngo Cheong Lim)-এর সহযোগিতায়, এখন চীনাভাষা নিয়ে আলোচনা করছেন এইরকম পণ্ডিত একাধিক জন হয়েছেন।"...

[দ্বীপময় ভারত ।। পৃঃ ৪৩-৪৪]

আরও কথা এই, রাজনীতিবিদ্‌রা যে অর্থে 'নিখিল-এশিয়া সংহতি'র (Pan-Asiatic Federation) স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, কবি তেমন কোন রাজনৈতিক-সংস্থার কথা ভাবেন নাই। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর ইউনিভার্সিটি

ইন্‌স্টিটিউট হল-এ সম্বর্ধনা সভায় কবি পরিষ্কারভাবে উহা ব্যাখ্যা করিয়া বলেন (২২ জুলাই—১৯২৪),

'আপনাদের ভিতর কেউ-কেউ এমন আছেন যাঁরা বোধ করি ভাবছেন যে, সমস্ত এসিয়া মহাদেশকে এক করলে আমাদের শক্তিবৃদ্ধি হতে পারে এবং সে-প্রয়োজন-সাধনের পক্ষে আমার ভ্রমণ কিছু সহায়তা করেছে কি না, সে-সম্বন্ধেও আপনাদের হয়ত একটা জিজ্ঞাস্য আছে। কিন্তু আমি আপনাদের এ কথা বলতে চাই যে, আমি কোন-রকম বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে যাইনি এবং আপনার দেশের গৌরবকে চতুর্দিকে প্রখ্যাত করবার প্রয়োজন আমি ততটা মনে করিনি।...

"আমি বার বার আবার বলছি. আপনারা ভুল করবেন না। প্যান-এসিয়াটিক্ মিলনের দুঃস্বপ্ন আমি দেখিনে, ওটা নাইট-মেয়ার, প্যান্-শব্দকে আমি ভয় করি, এটা অবাস্তব কথা, তা'তে সত্যিকার মিলন হবে না। সত্যিকার ইউনিটি হ'লে এর একটা অর্থ আছে, কিন্তু দড়ির যোগ নিরর্থক। যন্ত্র-দ্বারা জোর করে' মিলন কেবল নিরর্থক তা নয়, তা'তে ক্ষতি আছে।...অভেদ শরীর বললে ইম্পিরিয়ালিজমকে, দেহকে, ভিত্তি করা হবে। সেটা সর্বনাশের কথা, সেখানে দুইটি হৃৎপিণ্ডের এক হৃৎপিণ্ড কাজ করে না। যারা তা করায় তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।...চীনবাসীরা আমাকে বার-বার বলেছে, আপনাদের সঙ্গে আমরা মিলব, হৃদয়ের মিলন হবে, আমাদের পূর্বাপর যে-মিলন আছে, ধর্মগত ঐক্য আছে, সেটাকে সঞ্জীবিত করব। পোলিটিক্যাল শক্তি লাভ করবার জন্যে বলছিনে, তা'তে আমি বিশ্বাস করিনে।...আমাদেরও অনেক জিনিষ দেবার আছে, পরস্পরের এই আদান-প্রদানের ভিতর মানুষের সঙ্গে মানুষের সত্য সম্বন্ধ রয়েছে। এই সম্বন্ধ, ইণ্টারডিপেণ্ডেন্স্—এ-সম্বন্ধ চীন-জাপানের সঙ্গে আমাদের হবে।"...

[প্রবাসী-কার্তিক ১৩৩১ ।। পৃঃ ৯০-৯৯]

বলাবাহুল্য, প্যান্-এসিয়াটিক্ আন্দোলনের পশ্চাতে জাপ-সাম্রাজ্যবাদীদের বড় ভূমিকা ছিল। কবি তাহা জানিতেন বলিয়াই এ-সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দেন।

এই প্রসঙ্গে কবি বলেন, চীনে যে সম্মান ও বিপুল আন্তরিক অভ্যর্থনা তিনি পাইয়াছেন, তাহা আমেরিকা ও অন্যান্য পশ্চিমী দেশগুলিতে ইতিপূর্বে পান নাই। অবশ্য সেখানেও একদল লোক তাঁহার সমালোচনা করেন বটে তবে তাঁহারা কোথাও কবির প্রতি অসম্মান বা অশোভনীয় আচরণ করেন নাই। তিনি বলিলেন,

..."নিছক সম্মান পাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি। সেখানেও এক-দল লোক আছে, তা'ও বলি তাদের দল খুব ভারী নয়, তা'রা বলে, 'এ-লোকটি ভারতবর্ষ থেকে এসেছে আমাদের মাথা খারাপ করতে, আমরা এখন এই সমস্ত কথা, ভারতবর্ষের বাণী, বৌদ্ধ-ধর্ম যা দিয়েছেন, শুনতে পারিনে। তা'তে ক্ষতি হয়েছে, গায়ের জোর কমিয়ে দিয়েছে, হিংসা প্রভৃতি খর্ব করেছে। এ লোকটি একে কবি, তা'তে ভারতবাসী, এ আমাদের মাথা খারাপ করতে পারে।'...

…"একটি কথা আপনাদের কাছে বল্‌ব, এরা কিম্বা আর যে-কোন বিরুদ্ধবাদী কেউ থাকুক না, আমাকে কেউ অসম্মানসূচক কিছু বলেনি, personality নিয়ে কিছু বলে নি। বারবার বলছে, 'আমরা এঁকে অপমান করতে চাইনে, ওঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আছে।' আতিথ্যের বিরোধী কোন কাজ তা'রা করে নি, ভদ্রতা রক্ষা করেছে। তা'রা বলেছে' এতে তাদের ক্ষতি হবে। ব্যক্তিগত-ভাবে আমার প্রতি তাদের কোন বিরোধ নেই, যদিও বক্তৃতার ফলাফল লক্ষ্য ক'রে তা'রা বিচলিত হয়েছে। কটু কথা বলেনি, চিরাচরিত হৃদ্যতা বিস্মৃত হয়নি। সুতরাং বহু-যুগের যে-সাধনা সেইটেই মর্মগত,—চীন-জাপানে তা দেখেছি।"…

[ঐ ॥ পৃঃ ৯৮]

কবি তাঁহার ভাষণে চীন, মালয় প্রভৃতি দেশের শ্রমজীবী শ্রেণীর সমস্যা সম্পর্কে তাঁহার অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন। ঐ-সব দেশে ভারতীয় শ্রমজীবীদের সম্পর্কে বলিলেন,

"মাদ্রাজীরা সকলেই আজ্ঞাভাজন। তাদের জন্য সেখানে ভারতীয়দের নামই হ'য়ে গেছে কুলি। যদি কোন মাদ্রাজী মজুর কাজ করে ৭০ সেণ্ট পায়, তার সর্দার নেয় ৪০ সেণ্ট, সে পায় তিরিশ। সেইজন্যে কোন রকমে জীবন ধারণ করে ছেলেদের শিক্ষা দীক্ষা দেবার মত উদ্বৃত্ত কিছুই থাকে না। তাই তারা পুরুষানুক্রমে দাস।"

তিনি আরও বলিলেন,

"মালয় উপদ্বীপে শ্রমজীবীদের যে দৃশ্য দেখেছি, চীন দেশে ঠিক তার উল্টো। মালয়বাসীরা যেরূপ শ্রমবিমুখ, চীনেরা ঠিক বিপরীত। এমন শ্রমশীল ও কর্মঠ জাত পৃথিবীতে বোধহয় আর দুটি নাই।…সেইজন্য আমেরিকা চীনদের ঢুকতে দিতে ভয় পায়।…কয়লা, কেরোসিন তেল, পেট্রোল এই সমস্ত মানুষের কাজে লাগে। যেখানে এইসব খনি আছে, সেখানকার প্রাকৃতিক সম্পদের লোভে ধনীরা এসে হাজির হয়। চীনের মানুষের শ্রমশক্তিও ঠিক তেল-কয়লার মত সঞ্চিত পুঞ্জীভূত জিনিষ, মানুষের লোভের জিনিষ, তাই আমেরিকান ও ইউরোপীয় ধনীরা ওখানে এসে জুটেছে। আমেরিকায় ইউরোপে শ্রমজীবীদের সঙ্ঘ আছে। একটা সুগঠিত দাবী আছে—ওখানে ত সে সব কিছু নাই, তাই শোষণের সুবিধা হয়।…

[ভূমিলক্ষ্মী-(নবপর্যায়) ১ম-বর্ষ-১ম সংখ্যা ॥ পৃ ২২]

দেশে ফেরার অনতিকাল পরই কবি শ্রীনিকেতনের কৃষি, সমবায় ও পল্লী উন্নয়নমূলক কাজের উপর গুরুত্ব দেন। 'ভূমিলক্ষ্মী' পত্রিকাটি নবকলেবরে ইহার মুখপত্রস্বরূপ আত্মপ্রকাশ করে। এতদিন 'বীরভুম কৃষক সমিতির' হাতে এটি ছিল, এবং গুরুসদয় দত্ত আই সি এস ইহার অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এখন হ'তে শান্তিনিকেতনের ইতিহাস অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীনিকেতনের অন্যতম নেতৃস্থানীয় কর্মী কৃষিবিৎ সন্তোষবিহারী বসুর সম্পাদনায় ইহা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় মুখবন্ধস্বরূপ

কবি একটি আশীর্বাণী লিখিয়া দেন। কবি কৃষি ও গ্রাম সমস্যার দিকে দেশকর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া লেখেন,

"মানুষের সভ্যতা প্রকৃতির প্রাণপূর্ণ সঙ্গ থেকে যতই দূরে চলে যাবে ততই তার মরণদশা ঘনিয়ে আসবে, এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। মানুষ এতকাল বুদ্ধির জোরে ও ব্যবস্থার নৈপুণ্যে যে লোকালয় গড়ে তুলেছিল তার সঙ্গে প্রকৃতির একান্ত বিচ্ছেদ ঘটে নি; তাদের পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতাই ছিল, প্রতিযোগিতা ছিল না। কিন্তু আধুনিক কালের কলের রাজত্ব প্রবল ও জটিল হয়ে উঠ্‌চে, তাতে মানুষ আর প্রকৃতির মধ্যে কেবল ভেদ নয় বিরুদ্ধতা বেড়ে চলেছে। এর সাংঘাতিক ফল আমাদের অন্তরে বাহিরে ক্রমশ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে প্রকাশ পাবেই। এই যন্ত্র-রাজক সভ্যতার প্রধান দুর্গ হচ্ছে এ-কালের সহর। যে পল্লী প্রকৃতির সন্তান তারি প্রাণ শোষণ করে' সহরগুলো স্ফীত হয়ে উঠ্‌ছে। এই শোষণ ব্যাপার মানুষের আত্মঘাতের প্রক্রিয়া।

"মানুষ বিনাশ হতে রক্ষা পেতে যায় যদি তবে, তা'কে আবার সেবাকুশলা ভূমির আতিথ্য গ্রহণ করতে হবে। সেইখানেই তার স্বাস্থ্য সুখ শান্তি সৌন্দর্য। কিন্তু এতকাল এই ভূমিলক্ষ্মীর সদাব্রত যেখানে ছিল সেই তাঁর অতিথিশালা আজ ভেঙে পড়েচে। বাংলা দেশে যে সাধকেরা তাকে গড়ে তোলবার ভার নিয়েচেন ভূমিলক্ষ্মী পত্রিকায় তাঁদের বাণী সার্থক হোক্‌।"

[ভূমিলক্ষ্মী-আশ্বিন, ১৩৩১ ॥ পৃ-১-২]

বলা বাহুল্য, বার বার কবি দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এই আহ্বান জানাইয়াছেন।

রক্তকরবী

১৩৩০ সালে শিলঙে গ্রীষ্মাবকাশ যাপনকালে রবীন্দ্রনাথ 'যক্ষপুরী' নামে একটি নাটক রচনা করেন। পরবৎসর উহা 'রক্তকরবী' নামে সংশোধিত আকারে প্রবাসী পত্রিকায় (১৩৩১ আশ্বিন সংখ্যা) প্রকাশিত হয়।

'রক্তকরবী'র বিস্তারিত আলোচনার স্থান অন্যত্র। কিন্তু রক্তকরবীর মর্মার্থ বা মর্মকথাটি কী ?

'রক্তকরবী'র মর্মার্থ সম্পর্কে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দৃষ্টি-কোণ হইতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নাটকটির রচনার কয়েক মাস পর তিনি উহার প্রস্তাবনা ও ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যাহা বলিলেন, (প্রবাসী-১৩৩২ বৈশাখ) এই প্রসঙ্গে তাহা লক্ষণীয়। কবি বলিলেন,

"স্বর্ণলঙ্কার মতোই আমার পালার ঘটনাস্থলের একটি ডাকনাম আছে। তাকে কবি যক্ষপুরী বলে জানে। তার কারণ এই নয় যে সেখানে পৌরাণিক কুবেরের স্বর্ণসিংহাসন। যক্ষের ধন মাটির নীচে পোঁতা আছে। এখানকার রাজা পাতালে সুড়ঙ্গ খোদাই করে সে ধন হরণে নিযুক্ত। তাই আদর করে এই পুরীকে সমঝদার লোকেরা যক্ষপুরী বলে। লক্ষ্মীপুরী কেন বলে না ? কারণ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বৈকুণ্ঠে, যক্ষের ভাণ্ডার পাতালে।

"রামায়ণের গল্পের ধারার সঙ্গে এর যে একটা মিল দেখছি, তার কারণ এ নয় যে, রামায়ণ থেকে গল্পটি আহরণ করা।···

"কর্ষণ-জীবী এবং আকর্ষণ-জীবী এই দুই জাতীয় সভ্যতার মধ্যে একটা বিষম দ্বন্দ্ব আছে, এ সম্বন্ধে বন্ধুমহলে আমি প্রায়ই আলাপ করে থাকি। কৃষিকাজ থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে কলিযুগ কৃষিপল্লীকে কেবলি উজাড় করে দিচ্ছে। তাছাড়া শোষণজীবী সভ্যতার ক্ষুধাতৃষ্ণা দ্বেষহিংসা বিলাসবিভ্রম সুশিক্ষিত রাক্ষসেরই মতো। আমার মুখের এই বচনটি কবি তাঁর রূপকের ঝুলিতে লুকিয়ে আত্মসাৎ করেছেন, সেটা প্রণিধান করলেই বোঝা যায়। নবদূর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের বক্ষসংলগ্ন সীতাকে স্বর্ণপুরীর অধীশ্বর দশানন হরণ করে নিয়েছিল সেটা কি সেকালের কথা, না একালের ? সেটা কি ত্রেতাযুগের ঋষির কথা, না আমার মতো কলিযুগের কবির কথা ? তখনো কি সোনার খনির মালিকরা নবদূর্বাদলবিলাসী কৃষকদের ঝুঁটি ধ'রে টান দিয়েছিল ?

"আরো একটা কথা মনে রাখতে হবে। কৃষী-যে দানবীয় লোভের টানেই আত্মবিস্মৃত হচ্ছে, ত্রেতাযুগে তারি বৃত্তান্তটি গা-ঢাকা দিয়ে বলবার জন্যেই সোনার মায়ামৃগের বর্ণনা আছে। আজকের দিনের রাক্ষসের মায়ামৃগের লোভেই তো আজকের দিনের সীতা তার হাতে ধরা পড়ছে ; নইলে গ্রামের

পঞ্চবটচ্ছায়াশীতল কুটির ছেড়ে চাষীরা টিটাগড়ের চটকলে মরতে আসবে কেন। বাল্মীকির পক্ষে এ-সমস্তই পরবর্তী কালের, অর্থাৎ পরশ্ব।"

আধুনিক যুগ-সমস্যাকে এই দৃষ্টিকোণ হইতে দেখার পক্ষের যুক্তি দিতে গিয়া কবি আরও বলিলেন,

..."আধুনিক সমস্যা বলে কোনো পদার্থ নেই, মানুষের সব গুরুতর সমস্যাই চিরকালের। রত্নাকরের গল্পটার মধ্যে তারই প্রমাণ পাই। রত্নাকর গোড়ায় ছিলেন দস্যু, তারপর দস্যুবৃত্তি ছেড়ে ভক্ত হলেন রামের। অর্থাৎ ধর্ষণবিদ্যার প্রভাব এড়িয়ে কর্ষণবিদ্যায় যখন দীক্ষা নিলেন তখনই সুন্দরের আশীর্বাদে তাঁর বীণা বাজল।..."

[রবীন্দ্ররচনাবলী-১৫'শ খণ্ড ।। পৃ ৫৪৪-৪৬]

আবার ইহার অল্পকাল পরেই (২৮ সেপ্টঃ ১৯২৪) অন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গী থেকে 'রক্তকরবী'র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিলেন,

"নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনা যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে সঞ্চারিত হবার বাধা পায়, তা হলেই তার সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে। তখন মানুষ আপনার সৃষ্ট যন্ত্রের আঘাতে কেবলি পীড়া দেয়, পীড়িত হয়।

"এই ভাবটা আমার রক্তকরবী নাটকের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। যক্ষপুরে পুরুষের প্রবল শক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ ছিন্ন করে করে আনছে। নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুব্ধ চেষ্টার তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য সেখান থেকে নির্বাসিত। সেখানে জটিলতার জালে আপনাকে আপনি জড়িত করে মানুষ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই সে ভুলেছে, সোনার চেয়ে আনন্দের দাম বেশী; ভুলেছে, প্রতাপের মধ্যে পূর্ণতা নেই, প্রেমের মধ্যেই পূর্ণতা। সেখানে মানুষকে দাস করে রাখবার প্রকাণ্ড আয়োজনে মানুষ নিজেকেই নিজে বন্দী করেছে।

"এমন সময় সেখানে নারী এল, নন্দিনী এল; প্রাণের বেগ এসে পড়ল যন্ত্রের উপর, প্রেমের আবেগ আঘাত করতে লাগল লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বন্ধন-জালকে। তখন সেই নারীশক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনায় কী করে পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল, এই নাটকে তাই বর্ণিত আছে।"

[ঐ ।। পৃ-৫৪৭]

প্রায় বৎসর খানেক পরে, বিলাতের '*Manchester Guardian*' পত্রিকায় আর একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ হইতে 'রক্তকরবী'র (*Red Oleanders*) ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন (২৮ আগষ্ট ১৯২৫),

..."But I think, in justice to myself, I should make it clear that it has a definite meaning which can legitimately claim literary expression."

"There was a time when, in the human world, most of

our important dealings with our fellow-beings were personal dealings, and the professional element in society was never hugely disproportionate to the normal constitution of its life. Therefore, naturally, in the tradition of literature, which is the ideal expression of man's life, interactions of human relationship have so long occupied the most important position.

"To-day another factor has made itself immensely evident in shaping and guiding human destiny. It is the spirit of organisation, which is not social in character, but utilitarian. ......Naturally, in all organisations, variation of personality is eliminated, and the individual members, in so far as they represent the combination to which they belong, give expression to a common type and very little to their uniqueness of individuality.

"But the personal man is not dead, only dominated by the organised man. The world has become the world of Jack and Giant—the Giant who is not a gigantic man, but a multitude of men turned into a gigantic system.

"I am not competent to say how Europe herself feels about this phenomenon produced by her science..."

"It is an organised passion of greed that is stalking abroad in the name of European civilisation. I know that this does not represent the whole truth as to its character, and therefore the pity of it is all the greater when mainly this aspect of it is forcibly presented to us, causing the spread of dumb sadness over a vast portion of the world and the dread of a devastation of its future into an utterly bankrupt life. Such an objectified passion lacks the true majesty of human nature, it only assumes a terrifying bigness, its physiognomy blurred through its cover of an intricate net-work—the scientific system. It barricades itself against all direct human touch with barriers of race pride and prestige of power. The impersonal pressure which, from its aloofness, it applies to our living soul is enormous, ever narrowing our prospect of growth, smothering the power of initiative in our mind..."

"Therefore it should cause no surprise to anybody if a

poet, belonging to a continent swallowed by the menacing shadow of Europe, gives a prominent place among the *dramatis personae* of his play to an apparition which now so powerfully occupies the imagination of a vast world consisting of non-Western races. It is not an individual but a doom; and therefore it should never be compared to such characters as Lady Macbeth by those who wish to find a literary precedent. I am told that science has become a principal subject for some notable poets in Europe. That is natural, for science has permeated Western life:···In a similar manner, the hungry purpose, having science for its steed, running about unchecked, trampling our life's harvest, is not an intellectual generalisation unfit for imaginative literature. It is intensely real; its hot breath is upon us; its touch is all over our shrinking soul. It is the principal hero to-day in this drama of human history; and I trust I have the right to invoke it in my own play, not in the spirit of a politician, but of a poet, possibly a lyrical poet."

[*Visva-Bharati Quarterly*-October 1925-pp. 283-85]

প্রশ্ন এই, আমরা কবির কোন ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করিব ?

সবগুলিই গ্রহণ করা যায়। তবে নাটকটি রচনার পশ্চাতে যেসব ভাবগুলিই নিহিত থাক না কেন, নাটকটির মধ্যে ঐ শেষোক্ত ভাবটিই বেশী পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কৃষির সহিত যন্ত্রশিল্প-সভ্যতার দ্বন্দ্ব-বিরোধটি খুব পরিষ্কার ফুটিয়া উঠে নাই। যন্ত্রশিল্প-সভ্যতায় যন্ত্র ও জীবনের,—যান্ত্রিক-সংগঠন ও মানুষের সজীব ব্যক্তিসত্তার দ্বন্দ্ব সংঘাতটিই সব চেয়ে বেশী প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে। যান্ত্রিক সংগঠনের কারাগার হইতে মানুষের ব্যক্তিসত্তা ও প্রাণশক্তির বিদ্রোহ ও মুক্তির বিজয়-বারতাই শেষ পর্যন্ত নাটকখানি হইতে ঘোষিত হইয়াছে। যক্ষপুরীর কারাগার যে ইউরোপ-আমেরিকার পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা, নাটকখানিতে তা' স্পষ্টই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু 'রক্তকরবী'র রূপক ও প্রতীক নির্বাচনে রবীন্দ্রনাথ অসামান্য দক্ষতা ও সাফল্যলাভ করিয়াছেন।

প্রথমেই রাজপ্রাসাদের মধ্যে রাজাকে দেখা যাক। যক্ষপুরীর রাজা একটা অত্যন্ত জটিল আবরণের আড়ালে বাস করে। রাজাকে কোথাও কোনদিন কেউই দেখিতে পায় না। নন্দিনীর ভাষায়, "জালের কুয়াশায় ঢাকা তোমাদের রাজা।"

ইহাই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকাঠামোর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। পুঁজিবাদী সমাজে ব্যক্তিগতভাবে রাজা বলিয়া কেউ নাই;—র‍্যাথচাইল্ড্ বা ফোর্ডের

মত কোন ধনকুবেরও ব্যক্তিগতভাবে রাজা নয়, এমনকি পুঁজিবাদীরাও নয়। পুঁজি বা 'capital'-ই হইতেছে সেই রাজা। ইহাকেও চোখে দেখা যায় না;—সারা দেশের কল-কারখানা, খনি-বাগিচা, জমি-জমা, পুকুর-জলাশয়, নদী-মাটি, আকাশে-বাতাসে অদৃশ্যভাবে ইহার প্রভুত্বের লোহ বেড়াজাল (financial net-work। বিস্তৃত। মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি—যাহারা প্রত্যক্ষত রাষ্ট্রযন্ত্রটি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে—তাহারাও এই বেড়াজালে বন্দী। এই পুঁজির ধর্ম হইতেছে (motive force) ক্রমাগত আপনাকে সহস্রগুণিত করিয়া বৃদ্ধি করা;—এক মুহূর্তও ইহার থামিবার উপায় নাই। এই পুঁজিই রাষ্ট্রের আসনে (national state) বসিয়া 'জাতীয়-ইচ্ছা' ও 'জাতীয়-স্বার্থের' নামে দেশের আপামর জনসাধারণকে এক যাদুমন্ত্রবলে তাহার আপন স্বার্থে কাজ করাইয়া লয়। এঙ্গেলস্ পুঁজিবাদী সমাজে এই জাতীয়-রাষ্ট্রের স্বরূপ ও ভূমিকাটির একটি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়াছেন,

…"The modern state, no matter what its form, is essentially a capitalist machine, the state of the capitalists, the ideal personification of the total national capital. The more it proceeds to the taking over of productive forces, the more does it actually become the national capitalist, the more citizens does it exploit"…

[*Socialism Utopian and Scientific*-p.-106]

রবীন্দ্রনাথ ইহাকেই কখনও 'machine' বলিয়াছেন, কখনও 'organisation' বলিয়াছেন আবার কখনও বা বলিয়াছেন 'nationalism'। পূর্বেই আমরা ইহার বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

কিন্তু পুঁজির ক্রমাগত আয়তন ও পরিমাণগত বৃদ্ধি যখন জাতীয় স্বার্থ ও 'জাতীয় ইচ্ছার' রূপ লয় তখন শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষেরাও উহার কাছে আত্মসমর্পণ না করিয়া পারে না। অর্থাৎ পুঁজিবাদী-সংস্কৃতির ভূত সকলকেই আচ্ছন্ন করে, উহাই পুঁজিবাদী-সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সাধারণ সময়ে সোনা ও ধনলাভের তাড়না হইতে—ব্যক্তিগতভাবে ধনী হইবার লোভ-বাসনা হইতে একজন শ্রমিকও পরিত্রাণ পায় না। যক্ষপুরীর শ্রমিকেরাই কী পাইয়াছে নাকি?

"চন্দ্রা—যাই বল বিশুবেয়াই, যক্ষপুরীতে এসে তোমরাই মজেছ। আমাদের মেয়েদের তো কিছু বদল হয় নি।

বিশু—হয় নি তো কী। তোমাদের ফুল গেছে শুকিয়ে, এখন 'সোনা সোনা' করে প্রাণটা খাবি খাচ্ছে।

চন্দ্রা—কখ্খনো না।

বিশু—আমি বলছি হাঁ। ওই যে ফাগু হতভাগা বারো ঘণ্টার পরে আরো চার ঘণ্টা যোগ ক'রে খেটে মরে, তার কারণটা ফাগুও জানে না, তুমিও জান

না।···তোমার সোনার স্বপ্ন ভিতরে-ভিতরে ওকে চাবুক মারে, সে চাবুক সর্দারের চাবুকের চেয়েও কড়া।

চন্দ্রা—আচ্ছা বেশ, তা চলো-না কেন, এখান থেকে দেশে ফিরে যাই।

বিশু—সর্দার কেবল-যে ফেরবার পথ বন্ধ করেছে তা নয়, ইচ্ছেটা সুদ্ধ আটকেছে। আজ যদি-বা দেশে যাও টিঁকতে পারবে না, কালই সোনার নেশায় ছুটে ফিরে আসবে, আফিমখোর পাখি যেমন ছাড়া পেলেও খাঁচায় ফেরে।"

[রবীন্দ্ররচনাবলী-১৫'শ খণ্ড ॥ পৃ-৩৫৭]

পুঁজির এই দানবীয় লোভ-বাসনার উন্মাদনা ও উত্তেজনার ঘূর্ণাবর্তে জীবন আজ পিষ্ট, ক্লিষ্ট ও চূর্ণিত হইয়া আর্তনাদ করিতেছে। এমন কি পুঁজিবাদীরাও রেহাই পায় নাই। অর্থ ও সোনার কোন ব্যবহারিক মূল্যও তাহার কাছে নাই,—তাহার ব্যক্তিগত ভোগলালসা চরিতার্থ করার জন্য যতটুকু অর্থের প্রয়োজন ততটুকুতেও সে শান্ত নয়। সোনার গুণগত কোন মূল্যও তাহার কাছে নাই;—সোনা তাহার কাছে অঙ্কশাস্ত্রের পরিমাণগত অগণিত সংখ্যার যোজনা ও দশমিক পৌনঃপুনিকতা মাত্র। ইহাকেই বলে 'gold fetishism' বা 'money-fetishism': রূপে-রসে-গন্ধেভরা বসুন্ধরায় জীবনকে স্বাভাবিক ও বলিষ্ঠভাবে ভোগ করিবার সময় ও অবকাশ তাহার নাই। ধনতান্ত্রিকসভ্যতায় জীবনের এই মূল লক্ষ্য হইতে বিচ্যুতি ও বিকৃতির বীভৎসতা রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে পীড়িত করিয়াছিল। আমেরিকা-ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসিবার অনতিকাল পরে 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে গভীর দুঃখে এই খেদোক্তি করিলেন,

······"অনবচ্ছিন্ন সাত মাস আমেরিকায় ঐশ্বর্যের দানবপুরীতে ছিলেম। দানব মন্দ অর্থে বলছি নে, ইংরাজিতে বলতে হলে হয়তো বলতেম, টাইট্যানিক ওয়েল্‌থ্‌। অর্থাৎ, যে ঐশ্বর্যের শক্তি প্রবল, আয়তন বিপুল। হোটেলের জানলার কাছে রোজ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশতলা বাড়ির ভ্রূকুটির সামনে বসে থাকতেম আর মনে মনে বলতেম, লক্ষ্মী হলেন এক, আর কুবের হল আর—অনেক তফাত। লক্ষ্মীর অন্তরের কথাটি হচ্ছে কল্যাণ, সেই কল্যাণের দ্বারা ধন শ্রীলাভ করে। কুবেরের অন্তরের কথাটি হচ্ছে সংগ্রহ, সেই সংগ্রহের দ্বারা ধন বহুলত্ব লাভ করে। বহুলত্বের কোনো চরম অর্থ নেই। দুই দুগুণে চার, চার দুগুণে আট, আট দুগুণে ষোলো, অঙ্কগুলো ব্যাঙের মতো লাফিয়ে চলে—সেই লাফের পাল্লা কেবলই লম্বা হতে থাকে।···

"তেমনি ক'রেই আট্‌লান্টিকের ওপারে ইঁটপাথরের জঙ্গলে ব'সে আমার মন প্রতিদিনই পীড়িত হয়ে বলেছে, তালের খচমচর অন্ত নেই, কিন্তু সুর কোথায়? আরো চাই, আরো চাই, আরো চাই—এ বাণীতে তো সৃষ্টির সুর লাগে না। তাই সে দিন সেই ভ্রূকুটিকুটিল অভ্রভেদী ঐশ্বর্যের সামনে

দাঁড়িয়ে ধনমানহীন ভারতের একটি সন্তান প্রতিদিন ধিক্কারের সঙ্গে বলেছে, ততঃ কিম্ !"

[কালান্তর ॥ পৃ ১৭১-৭২]

এই কথাই পরে তিনি বহুবার বিভিন্নভাবে বলিয়াছেন। রক্তকরবীর যক্ষপুরী যে ইউরোপ-আমেরিকার পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা,—এ'কথা নাটকখানিতে অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়াছে।

মুক্ত প্রাণের যাদুকরীশক্তি নন্দিনীর স্পর্শে সারা যক্ষপুরী একদিন জাগিয়া উঠিয়া আপনিই আপনাকে আবিষ্কার করিল,—এমন কি যক্ষপুরীর রাজাও। আর রঞ্জন ধনতান্ত্রিক সভ্যতার ঐ দানবীয় বর্বরতার দুর্গপ্রাচীর ভাঙ্গিবার এক মৃত্যুঞ্জয়ী মহাপ্রাণের উন্দাম তরঙ্গোল্লাস সৃষ্টি করিয়া গেল। যন্ত্রশিল্প সভ্যতা যেখানে জীবনের মুক্তধারাকে অবরুদ্ধ করিতেছে, অভিজিৎ ও রঞ্জন সেই অবরোধের বাঁধ-ভাঙার-লড়াইয়ে নিজের জীবন দিয়া বাঁচিতে শিখাইয়াছে।

রক্তকরবীর বাণী অত্যাচারীর কাছে পদানত হইয়া থাকা নয়, আপোষ নয়, —পরাজিতের কণ্ঠে শান্তির ললিত বাণীও নয়। রক্তকরবীর বাণী, লড়াইয়ের —সংগ্রামের বাণী। বিক্ষুব্ধ জনতাকে রাজা জিজ্ঞাস করে,

"রাজা—কী হয়েছে তোমাদের। কী করতে বেরিয়েছ।

ফাগুলাল—বন্দীশালার দরজা ভাঙতে, মরি তবু ফিরব না

রাজা—ফিরবে কেন। ভাঙার পথে আমিও চলেছি। ওই তার প্রথম চিহ্ন। আমার ভাঙা ধ্বজা, আমার শেষ কীর্তি।

* * * * *

ফাগুলাল—···আমরা তোমারি বন্দীশালা ভাঙতে বেরিয়েছি।

রাজা—হাঁ, আমারি বন্দীশালা। তোমাতে আমাতে দুজনে মিলে কাজ করতে হবে। একলা তোমার কাজ নয়।

ফাগুলাল—সর্দাররা খবর পেলেই ঠেকাতে আসবে।

রাজা—তাদের সঙ্গে আমার লড়াই।

ফাগুলাল—সৈন্যেরা তো তোমাকে মানবে না।

রাজা—একলা লড়ব, সঙ্গে তোমরা আছ।

ফাগুলাল—জিততে পারবে ?

রাজা—মরতে তো পারব। এতদিনে মরবার অর্থ দেখতে পেয়েছি—বেঁচেছি।

ফাগুলাল—রাজা, শুনতে পাচ্ছ গর্জন ?

রাজা—ওই-যে দেখছি, সর্দার সৈন্য নিয়ে আসছে।

* * * * *

"বিশু—আমাদের কারিগররা বন্দীশালা ভেঙে ফেলেছে। তারা ওই চলেছে লড়তে। আমি নন্দিনীকে খুঁজতে এলুম। সে কোথায়।

ফাগুলাল—সে গেছে সকলের আগে এগিয়ে।

বিশু—কোথায়।

ফাগুলাল—শেষ মুক্তিতে।—বিশু, দেখতে পাচ্ছ ওখানে কে শুয়ে আছে?

বিশু—ও-যে রঞ্জন!

ফাগুলাল—ধুলায় দেখছ ওই রক্তের রেখা?

বিশু—বুঝেছি, ওই তাদের পরমমিলনের রক্তরাখি। এবার আমার সময় এল একলা মহাযাত্রার।......আয় রে ভাই, এবার লড়াইয়ে চল্‌।”

[রবীন্দ্ররচনাবলী-১৫'শ খণ্ড ।। পৃঃ ৩৯৬-৯৮]

এইখানেই নাটকের যবনিকাপাত। মানবের রক্তপিচ্ছিল শাশ্বত যাত্রাপথের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করিয়া নাটকের যবনিকাপাত কি গভীর অর্থব্যঞ্জক নয়? রক্তকরবীর বাণী, মানবের মহাসংগ্রামের বাণী। রক্তকরবীর গান, মানবের অন্তহীন শাশ্বত-যাত্রাপথের গান।

দক্ষিণ আমেরিকায় ও ইতালিতে

এবার জাপানে থাকিতেই দক্ষিণ-আমেরিকার পের্ রাজ্য তাহাদের স্বাধীনতার শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছিল (১৯২৪)।

এশিয়া-আফ্রিকার মত দক্ষিণ-আমেরিকাও ছিল ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির ঔপনিবেশিক শোষণের লীলাক্ষেত্র। দক্ষিণ-আমেরিকার অধিকাংশ দেশই ছিল (ব্রাজিল বাদে) পুরাতন স্প্যানীশ সাম্রাজ্যের উপনিবেশ। ১৮০৮ খৃঃ নেপোলিয়নের স্পেন অধিকারের পর হইতে দক্ষিণ-আমেরিকার ঐ সব দেশ স্প্যানিশ প্রভুত্ব অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিতে থাকে। ১৮১৪ খৃঃ নেপোলিয়নের পতনের পর স্পেনের পুরাতন রাজবংশ ক্ষমতায় আসে। কিন্তু দক্ষিণ-আমেরিকার ঐ-সব দেশ স্পেনের প্রভুত্ব আর স্বীকার করিতে রাজী হয় না। পরন্তু তাহাদের স্বাধীনতা আন্দোলন আরো শক্তিশালী হইয়া উঠিতে থাকে। দীর্ঘ আরো দশ/এগার বৎসর পর্যন্ত এই স্বাধীনতা সংগ্রাম অব্যাহত থাকে। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মেক্সিকো, চিলি, আর্জেণ্টিনা, বলিভিয়া, ভেনেজুয়েলা, গুয়াতেমালা, উরুগুয়ে প্রভৃতি দক্ষিণ-আমেরিকার ৮'টি দেশে স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

এশিয়া আফ্রিকা এবং পৃথিবীর প্রতিটি পরাধীন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের ছিল অকুণ্ঠ আন্তরিক সমর্থন। পের্ দেশের স্বাধীনতা শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ তিনি তাই গভীর আগ্রহ ও আনন্দের সহিত গ্রহণ করেন।

দেশের সমসাময়িক রাজনীতিক পরিস্থিতিটিও লক্ষ্য রাখা দরকার। গান্ধীজী মুক্তিলাভের পর স্বাস্থ্যোদ্ধারের মানসে 'জুহু'তে কিছুদিনের জন্য যান। অল্পদিন পরেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও মতিলাল নেহরু একটি আপোষ-মীমাংসার জন্য সেখানে উপস্থিত হন (এপ্রিল-১৯২৪)। কিন্তু কোনই ফল হইল না; গান্ধীজী তাঁহার নীতিতে অটল রহিলেন অর্থাৎ কাউন্সিল প্রবেশ-নীতি অনুমোদন করিলেন না। ২৭-শে জুন, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এক অধিবেশনে পুনর্বার আপোষ-মীমাংসার চেষ্টা হয়। কাউন্সিল-প্রবেশ ও গোপীনাথ সাহার ফাঁসির উপলক্ষে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের প্রস্তাব লইয়া দাশ-নেহরু, এবং গান্ধীজীর পক্ষের তুমুল তর্ক-বিতর্ক হয়। ভোটগ্রহণে গান্ধীজীরই জয়লাভ হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কার্যত তিনি দাশ-নেহরুর সহিত একটি আপোষ-মীমাংসায় সীমাবদ্ধভাবে তাঁহাদের কাউন্সিল প্রবেশের নীতি স্বীকার করিয়া লইলেন। তবে 'গোপীনাথ সাহা প্রস্তাব'টি উপলক্ষে হিংসামূলক সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের তিনি তীব্র সমালোচনা করিলেন। স্মরণ রাখা দরকার, এই সময় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। অনতি-

কালের মধ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা শুরু হইয়া যায়। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমভাগে কোহাটে একা ভয়াবহ-দাঙ্গা হয়। প্রায় ৩৬'জন নিহত ও প্রায় ১৪৫ জন আহত হয় এবং হিন্দুদের ধনসম্পত্তিও লুণ্ঠিত হয়। আতংকে সমস্ত হিন্দু অধিবাসী কোহাট পরিত্যাগ করে।

এই সংবাদে গান্ধীজী প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। এই মহাপাপাচারের প্রায়শ্চিত্ত ও হিন্দু-মুসলিম ঐক্যস্থাপনের জন্য ১৮ই সেপ্টেম্বর হইতে ২১ দিনের জন্য এক অনশন শুরু করিলেন। ইহার তিন/চার দিন পরেই রবীন্দ্রনাথ দঃ-আমেরিকা যাত্রা করেন।

এ-যাত্রায় কবির সঙ্গে চলিলেন এলম্‌হার্স্ট, সুরেন্দ্রনাথ কর, রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী ও তাঁহাদের তিন বৎসরের পালিত কন্যা নন্দিনী। ২২শে সেপ্টেম্বর, কলম্বোতে একদল সাংবাদিক দেশের বর্তমান পরিস্থিতি ও করণীয় বিষয় সম্পর্কে কবিকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। জনৈক সাংবাদিক মহাত্মাজীর অনশন সম্পর্কে কবির অভিমত জানিতে চাহিলে কবি তাহার জবাবে বলেন,

"I have no faith in fasts. But Mr. Gandhi is sincere, as everyone knows. He is trying to bring about Hindu-Moslem unity. That unity cannot be achieved in a day Hindus and Moslems have been cutting each other's throats for several centuries I am not blaming either Hindus or Moslems. There is poison in both communities. This poison has been allowed to grow. Moreover, the tendency towards isolation has done much mischief. The present outbreak of the Moslems against the Hindus is the reaction, consequent on the Khilafat agitation. I prophesied at the time of the Khilafat agitation that a reaction would soon come, and that when it came it would be severe.

"India has nothing to do with the Khilafat and no-body paid any heed to my warning. Moreover, the poison that is in us Hindus is directed not only towards Moslems but also towards men of our own community (The poet is of course referring to the depressed classes)."

[*Ceylon Observer*-Sept 23, 1924]

সাংবাদিক আরো প্রশ্ন করেন, দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি হিন্দু-মুসলমান সমস্যা লইয়া কিছু করিবেন কিনা? কবি বিনীত কণ্ঠে বলিলেন যে, তিনি কবি, উহা তাঁহার এক্তিয়ার বহির্ভূত; তাছাড়া ঐ কার্যের যোগ্যতাও তাঁহার নাই।

২৪শে সেপ্টেম্বর কলম্বো হইতে কবি সদলবলে ইউরোপগামী জাহাজ 'হারুণামারু'তে উঠিলেন। একটি বাঙালী মেয়ের, এই ভ্রমণবৃত্তান্তের ডায়ারি

লেখার অনুরোধে 'না-না' করিয়াও শেষ পর্যন্ত ('পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি') যাত্রার শুরুতেই জাহাজে বসিয়া লিখিতে শুরু করেন। কবির কর্তব্য, নর-নারীর সম্পর্ক, দেশের অবস্থা, রাজনীতি, সমাজনীতি—প্রভৃতি যখন যে সব বিষয় কবির মনে উদয় হইয়াছে, উহাই তিনি লিপিবন্ধ করিয়াছেন।

গতবারের (১৯২১) আমেরিকা ভ্রমণের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা তাঁহার মনে উদয় হওয়াতে এক জায়গায় লিখিতেছেন, (হারুণামারু—৫ই অক্টোবর ১৯২৪),

"দায়িত্বের বোঝা মাথায় করে ষাটের আরম্ভে একবার আমেরিকায় গিয়েছিলুম। তখন য়ুরোপের যুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে, কিন্তু তারই নেশায় তখনও আমেরিকার চোখ যে-রকম রক্তবর্ণ য়ুরোপেরও এমন নয়। তার উপর তখন ইংরেজ নানা উপায়ে আমেরিকার শ্রবণেন্দ্রিয়ের পথ জুড়ে নিজের ভেঁপুটা বাজাচ্ছে। ডিমক্রাসির গুণ এই যে, নিজে ভাববার না আছে তার উদ্যম, না আছে তার শক্তি। যে-চতুর লোক কানে মন্ত্র দেবার ব্যবসা আয়ত্ত করেছে সে নিজের ভাবনা তাকে ভাবায়। ঠিক এখনকার খবর জানি নে, তখন ইংরেজ আমেরিকার বিপুলকায় ডিমক্রাসিকে কান ধরে নিজের ভাবনা ভাবাচ্ছিল। সেই কানে মন্ত্র দেবার যন্ত্রটা আমার বিরুদ্ধে তার চাকা চালিয়ে দিলে। ভয় ছিল পাছে, আমি ইংরেজের অপযশ রটাই। তার আগেই জালিয়ান-ওয়ালাবাগের ব্যাপার ঘটেছিল।

'যাই হোক, যে কয়টা মাস আমেরিকায় কাটিয়েছি, হাওয়ার মধ্যে যেন একটা বিরোধের ঠেলা ছিল।······যেদিন ভাবুকতার ঔদার্য থেকে রিক্ত আমেরিকাকে দেখলুম সেদিন দেখি সে ভয়ংকর ধনী, ভয়ংকর কেজো, সিদ্ধির নেশায় তার দুই চক্ষু রক্তবর্ণ। তারই পাশে দাঁড়িয়ে নিজের দিকে চেয়ে দেখি, আমি নিতান্ত কাঁচা, জন্ম-গরিব, একেবারে অস্থিতে-মজ্জাতে বেহিসাবি।···

[রবীন্দ্ররচনাবলী-১৯'শ খণ্ড ॥ পৃ ৪০২-৩]

১১ই অক্টোবর জাহাজ ফ্রান্সের মার্সাই বন্দরে লাগিল। রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে প্যারিসে গেলেন। কয়েকদিন পর রথীন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ ইংলণ্ড যাত্রা করেন, প্রতিমাদেবী, প্যারিসে আঁদ্রে কার্পেলেসের বাড়িতে থাকিয়া গেলেন। ১৮ই অক্টোবর রবীন্দ্রনাথ ও এলম্‌হার্স্ট, 'আণ্ডেস্‌' জাহাজে দঃ-আমেরিকার পথে যাত্রা করেন।

৭ই নভেম্বর কবি দক্ষিণ আমেরিকায় আর্জেণ্টাইন দেশের প্রধান বন্দর-নগরী বুইনস্‌-এয়ারিস্‌এ আসিয়া পেঁীছিলেন। এখানে কবিকে বিপুল অভ্যর্থনা জানান হয়। কিন্তু আর্জেণ্টাইনে আসিয়াই তিনি খুব অসুস্থ হইয়া পড়িলেন; পেরু আর যাওয়া হয় নাই। শারীরিক অসুস্থতার কারণে চিকিৎসকগণ পেরু-যাত্রা নিষেধ করেন। তাছাড়া কবিকে ইহাও বুঝান হয় যে পেরুর ঐ শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠানের পশ্চাতে কোন মহান আদর্শ নাই—শুধু একটি যুদ্ধের দিনকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্যই নাকি এত সব আড়ম্বর আয়োজন। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় সন্দেহ করেন,

"এই সব ঘটনার মধ্যে ইংরেজের রাজনীতিক কোনো চাল ছিল কিনা, সে বিষয়ে অনুসন্ধান প্রয়োজন।"

ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো নামে কবির ভক্ত ধনী মহিলা খুবই আন্তরিক আদর-যত্ন ও সেবা-শুশ্রূষায় কবিকে সুস্থ করিয়া তুলিলেন। এই কালের অধিকাংশ কবিতাগুলি 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়। কবি উহা 'বিজয়া'র (এই নামে কবি ভিক্টোরিয়াকে ডাকিতেন) নামে উৎসর্গ করেন। বুইনস্ এয়ারিস্-এ কবি প্রায় দুই মাস কাটান। মাঝে মাঝে দেশের খবরও দু' একটা পা'ন, বাংলা দেশের পুলিসী-নির্যাতনের খবরও পাইলেন।

স্মরণ রাখা দরকার, বাংলাদেশ তখন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। ২৫শে অক্টোবর (১৯২৪), বাংলা সরকার এক অর্ডিনেন্স জারি করিয়া ব্যাপক ধরপাকড় ও খানা-তল্লাসী শুরু করিয়া দেয়। পুলিসের আক্রমণের লক্ষ্য শুধু সন্ত্রাসবাদীরাই নহে, এই দলের সহিত চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ্য দলের গভীর ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপের সম্পর্ক আছে, এই অনুমান করিয়া স্বরাজ্য দলের উপরও পুলিস আক্রমণ চালায়। সুভাষচন্দ্রের সহিত কিছু স্বরাজ্য দলের কর্মী গ্রেপ্তার হইলেন। সুভাষচন্দ্র তখন কলিকাতা কর্পোরেশনের চিফ্-এক্‌জিকিউটিভ্-অফিসার এবং দেশবন্ধুর দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ ছিলেন। এই সংবাদে আর্জেন্টাইনে কবির কি মানসিক প্রতিক্রিয়া হয় তা এই সময়ে দিনেন্দ্রনাথকে লেখা একটি কবিতার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে (২০শে ডিসেম্বর)। তাহার অংশ বিশেষ :

…"ঘরের খবর পাই নে কিছুই, গুজোব শুনি নাকি
কুলিশপাণি পুলিস সেথায় লাগায় হাঁকাহাঁকি।
শুনছি নাকি বাংলাদেশের গান হাসি সব ঠেলে
কুলুপ দিয়ে করছে আটক আলিপুরের জেলে।

*　　　*　　　*

টুটল কত বিজয়-তোরণ, লুটল প্রাসাদ-চুড়ো,
কত রাজার কত গারদ ধুলোয় হ'লো গুঁড়ো।
আলিপুরের জেলখানাও মিলিয়ে যাবে যবে
তখনো এই বিশ্ব-দুলাল ফুলের সবুর সবে।
রঙিন কুর্তি সঙিন মূর্তি রইবে না কিচ্ছুই,
তখনো এই বনের কোণে ফুটবে লাজুক জুঁই।
ভাঙবে শিকল টুকরো হয়ে ছিঁড়বে রাঙা পাগ,
চূর্ণ-করা দর্পে মরণ খেলবে হোলির ফাগ।
পাগলা আইন লোক হাসাবে কালের প্রহসনে,
মধুর আমার বঁধু রবেন কাব্য-সিংহাসনে।

*　　　*　　　*

"প্রতাপ যখন চেঁচিয়ে করে দুঃখ দেবার বড়াই,
জেনো মনে, তখন তাহার বিধির সঙ্গে লড়াই।

দুঃখ সহার তপস্যাতেই হ'ক বাঙালির জয়,
ভয়কে যারা মানে তারাই জাগিয়ে রাখে ভয়।
মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে মৃত্যু তারেই টানে,
মৃত্যু যারা বুক পেতে লয় বাঁচতে তারাই জানে।
পালোয়ানের চেলারা সব ওঠে যেদিন খেপে,
ফোঁসে সর্প হিংসা-দর্প সকল পৃথ্বী ব্যেপে,
বীভৎস তার ক্ষুধার জ্বালায় জাগে দানব ভায়া,
গর্জি বলে 'আমিই সত্য ; দেবতা মিথ্যা মায়া' ;
সেদিন যেন কৃপা আমায় করেন ভগবান,
মেশীন-গান-এর সম্মুখে গাই জুঁই ফুলের এই গান।"

[রবীন্দ্ররচনাবলী-১৪'শ খণ্ড ।। পৃ ১৩২-৩৪]

ঐ কবিতায় বাংলার বিপ্লবী তরুণদের উদ্দেশে 'মা ভৈঃ'-বাণী আছে ; কিন্তু অত্যাচারী ইংরেজের মেসিন-গানের সম্মুখে জুঁই ফুলের জয়গান গাহিবার মত স্পর্ধা ও দম্ভোক্তি রবীন্দ্রনাথের মত মহান কবির পক্ষেই সম্ভব ছিল। আর এ' মহান দম্ভোক্তি তাঁহারই কণ্ঠে শোভনীয়।

৪ঠা জানুয়ারী (১৯২৫, রবীন্দ্রনাথ বুয়েনস্ এয়ারিস্ পরিত্যাগ করিয়া ইতালির পথে যাত্রা করেন। ২১শে জানুয়ারী, তাঁহারা ইতালির জেনোয়া বন্দরে আসিয়া পেঁছাইলেন। রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমাদেবী এইখানে আসিয়া কবির সহিত মিলিত হন। ইতালির খ্যাতনামা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত অধ্যাপক ফর্মিকি আসিয়া কবিকে অভ্যর্থনা জানাইলেন। তিনি সারাক্ষণ রবীন্দ্রনাথের সহিত থাকিয়া, দোভাষীর কাজ করেন।

সেখান হইতে তাঁহারা ইতালির বিখ্যাত মিলান নগরীতে আসিয়া পেঁছাইলেন। এখানেও তাঁহাকে বিপুল সম্বর্ধনা জানান হয়। এখানে পর পর দুইদিন কবিকে দুইটি বক্তৃতা দিতে (২২-২৩ জানুয়ারী) হয়। মিলানের ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় আসিয়া কবির আন্তর্জাতিক মানবতাবাদ সম্পর্কে বিস্তারিত পরিচিত হইতে চাহিলেন। মিলানের জনৈক ছাত্রের নানা প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসাকে উপলক্ষ করিয়া তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনে '*People and Nation*' নামক একটি লিখিত বিবৃতি পাঠ করেন। এই বিবৃতিতে তিনি ন্যাশনালিজম সম্পর্কে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার-বিশ্লেষণ করিলেন' উহা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। [*Manchester Guardian*-23, Feb. 1925]

'নেশন' বলিতে তিনি কী অর্থ বুঝেন, তাহার জবাবে কবি বলেন, যে মানুষের মধ্যে দুটি সত্তা আছে ; একটি তাহার জাতীয় সত্তা অপরটি তাহার ব্যক্তিসত্তা,

"I regard the difference between people and nation as the same as that between the natural and the professional man—that is, between man the father, the husband, the friend, and man the physician, the lawyer, the soldier, or the man of

business. We often find real and fundamental differences between these two aspects in the same individual, between the natural and the professional. The one can be kind and hospitable, and so forth ; the other grasping, deceitful, and cruel, So when I judge a people I judge them, not only from that completely human aspect, for as people they may have their love of humanity and of nature, but also as a nation, for in their national aspect they can be selfish and cruel.

"The man who is generally willing to help others at once becomes a different being when he puts on his professional personality. I find that this professional aspect in people has became predominant in the West, and their humanity has become subordinated. It is this professional aspect which is the national aspect. The people are naturally creative, from them come art, religion, poetry and song, but In their professional only the machinery and the organisation for producing things……and because they are mechanical the artificial side of their nature tends to assert itself and they can gradually lose the deeper love of humanity, of justice, and of truth. As their wealth increases their power increases."

তাহা হইলে 'নেশন' কী শুধু চরম অকল্যাণ (unmitigated evil) মাত্র ? উহার কী কোন ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা ও ভূমিকা নাই। কবি উহার জবাবে বলিলেন,

'Of course, professional help is needful. If your house is menaced you must keep guard over it and you must employ watchmen who will fight the robbers. …But is this the normal state of mind ? It is only when you lack faith in your neighbours that you turn into professional watchmen and cease to behave like an ordinary householder who opens his door and calls his neigbour into share with him,"

তিনি বলিলেন, সমস্ত পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলেই এই গলদ। পরস্পরের প্রতি সন্দেহ, অবিশ্বাস ও ভীতিতে তাহারা বিরাট বিরাট সামরিক বাহিনী গড়িয়া প্রতিবেশী রাজ্যের দিকে শাণিত অস্ত্র উঁচাইয়া রাখিতেছে।

"Western civilisation may have created circumstances which have urged you to cultivate the spirit of professionalism. Once one nation becomes strong and gives itself over the cultivation of muscle, of army and navy, and to the game

of high finance, you also are compelled to cultivate that because of this unhealthly, unnatural condition. This course may have been necessary, yet it ought to be condemned. Collective egoism is that feeling of the nation which must never be encouraged.…

…"Germany, is cultivating this megalomania lost her balance; Britain has been cultivating it; America now has her own huge idea of greatness. It is this spirit of bigness which leads you to be always lengthening your dreadnoughts, to multiply your army, your soliders, your wealth, your possessions.…You are accurate, you are scientific, you are professionally efficient when you wish to strike a blow or to resist. This I admit, but where is your soul?…Where is yeur great man?"

পাশ্চাত্য সভ্যতার বিজ্ঞানের মহত্তম অবদানগুলি কবি সশ্রদ্ধচিত্তে স্বীকার করিলেন। কিন্তু বিজ্ঞানকে তাহারা যে পুরোপুরি মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিতে পারিতেছেন না, ইহাই তাঁহার চিরদিনের অভিযোগ,

…"Can you use science solely for the sake of humanity? You could in the West have become great if, with the help of science, you had taken your stand beside humanity, and all humanity would have halied you. But you have used it for the purpose of killing, as the Spanish made use of gunpowder to obliterate completely that wonderful civilisation of the Incas in Peru. Is gunpowder such a great thing?…

"In the modern world men do not see the spark of truth that is hidden behind all the latest developments of our age, because in the beginning it is shut up, just as you do not see the whole forest in a single seed, although the spirit of the forest is all the time at work in the seed. So with the nation, and the idea of the nation, there is within it that kernel of truth which shows itself in willing sacrifice for a cause. This truth will win in the end. It will come out and blossom, but at the moment I must denounce the egoism and cruelty of this professional, the nation."

[*The Advertiser* (Adelaide): 5 April, 1925]

মিলানের সম্বর্ধনা সভায়, তাঁহার ভাষণে এই কথাগুলিই আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিলেন (*The Voice of Humanity—Visva Bharati Quarter-*

ly, April, 1925)। পর পর দুইদিন বক্তৃতা দেওয়ার পর কবি পুনরায় খুব অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। এদিকে ইতালির চারিদিক হইতে কবির নিমন্ত্রণ আসিতেছে। কিন্তু বিশেষ করিয়া শারীরিক কারণে তখন আর তাঁহার পক্ষে অন্য কোথাও যাওয়া সম্ভব হইল না। কবি দেশে ফিরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। ২৯শে জানুয়ারী তাঁহারা সুন্দরী ভিনিস নগরীতে আসিলেন। এখানেও তাঁহাকে বিপুল অভ্যর্থনা জানান হয়। কিন্তু কবি তখন অসুস্থ। উল্লেখযোগ্য ইতালির জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কবিকে উচ্ছ্বসিত সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিতেছিলেন কিন্তু তখনও পর্যন্ত ইতালির ফ্যাসিস্ট সরকারের পক্ষ হইতে অভ্যর্থনার উদ্যোগ-আয়োজন দেখা গেল না। ইতালিতে তখন ফ্যাসিস্ট সরকার কায়েম হইয়াছে; মুসোলিনী তখন ইতালির সর্বময় অধিনায়ক বা ডিক্টেটর। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রজীবনীকার লিখিতেছেন,

"রবীন্দ্রনাথকে ইতালিয়ানরা খুবই আগ্রহের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিল; কিন্তু এবার সরকারী মহল কবি সম্বন্ধে অত্যন্ত উদাসীন ছিলেন। কবির শান্তিবাদ, তাঁহার আন্তর্জাতিকতা, য়ুরোপীয় গুণ্ডামির নিন্দাবাদ প্রভৃতি ইতালীয় সরকারের জবরদস্তি শাসননীতির বিরোধী। সুতরাং লোকে যতটা উৎসাহান্বিত ছিল সরকার ততটাই সেবার নীরব ছিলেন।"...

[রবীন্দ্রজীবনী-তৃতীয় খণ্ড ।। পৃঃ ১৬১]

পরবৎসর ইতালি ভ্রমণের পর কবি এই ফ্যাসিস্ট সরকারের স্বরূপ ভালোভাবেই চিনিতে পারেন, যথাস্থানে তাহা আলোচিত হইবে। কিন্তু তখনও পর্যন্ত কবি এসবের বিশেষ কিছু জানিতেন না। রবীন্দ্রনাথের কাছে ইতালি, দাঁন্তের (Dante) ইতালি; লিওনার্দো-মাইকেল এঞ্জেলো-র‍্যাফেল-টীশিয়নের ইতালি;—ইউরোপের শিল্পী ও কবিদের স্বপ্নের ইতালি। মিলানে বসিয়া ভারতের কবি ইতালির মহিমা গান রচনা করিলেন,

"কহিলাম, 'ওগো রানী,
কত কবি এল, চরণে তোমার উপহার দিল আনি।
এসেছি শুনিয়া তাই,
উষার দুয়ারে পাখির মতন গান গেয়ে চ'লে যাই।"

২রা ফেব্রুয়ারী (১৯২৫) রবীন্দ্রনাথ দেশের পথে যাত্রা করেন। জাহাজে বসিয়া ডায়ারি লিখিতেছেন, দেশের ও বিশ্বের রাজনীতিক পরিস্থিতি তাঁহার চিন্তা অধিকার করিয়া বসিয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কে একসময় লিখিতেছেন (৭ই ফেব্রুয়ারী-১৯২৫),

"সিদ্ধি, যাকে ইংরেজিতে বলে সাক্সেস্, তার বাহন যত দৌড়ে চলে ততই ফল পায়। য়ুরোপের দেশে দেশে রাষ্ট্রনীতির যুদ্ধনীতির বাণিজ্যনীতির তুমুল ঘোড়দৌড় চলছে জলে স্থলে আকাশে। সেখানে বাহ্য প্রয়োজনের গরজ অত্যন্ত বেশি হয়ে উঠল, তাই মনুষ্যত্বের ডাক শুনে কেউ সবুর করতে পারছে না। বীভৎস সর্বভুক পেটুকতার উদ্যোগে পলিটিক্স্ নিয়ত ব্যস্ত। তার গাঁট-কাটা ব্যবসায়ের পরিধি পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে। পূর্বকালের

যুদ্ধবিগ্রহের পদ্ধতিতে ধর্মবুদ্ধি যেখানে মাঝে মাঝে বাধা খাড়া করে রেখেছিল, ডিপ্লমাসি সেখানে আজ লাফ মারা হার্ডল্‌ রেস্‌ খেলে চলেছে। সবুর সয় না যে। বিষবায়ুবাণ যুদ্ধের অস্ত্ররূপে যখন এক পক্ষ ব্যবহার করলে তখন অন্য পক্ষ ধর্মবুদ্ধির দোহাই পাড়লে। আজ সকল পক্ষই বিষের সন্ধানে উঠে পড়ে লেগেছে; যুদ্ধকালে নিরস্ত্র পুরবাসীদের প্রতি আকাশ থেকে অগ্নিবাণ বর্ষণ নিয়ে প্রথমে শোনা গেল ধর্মবুদ্ধির নিন্দাবাণী। আজ দেখি, ধার্মিকেরা স্বয়ং সামান্য কারণে পল্লীবাসীদের প্রতি কথায় কথায় পাপবজ্র সন্ধান করছে। গত যুদ্ধের সময় শত্রুর সম্বন্ধে নানা উপায়ে সজ্ঞানে সচেষ্টভাবে সত্যগোপন ও মিথ্যাপ্রচারের শয়তানি অস্ত্র ব্যবহার প্রকাণ্ডভাবে চলল। যুদ্ধ থেমেছে কিন্তু সেই শয়তানি আজও থামেনি। এমন কি, অক্ষম ভারতবর্ষকেও প্রবলের প্রোপাগাণ্ডা রেয়াত করে না। এই সব নীতি হচ্ছে সবুর-না-করা নীতি; এরা হল পাপের দ্রুত চাল; এরা প্রতি পদেই বাহিরে জিতছে বটে কিন্তু সে জিত অন্তরের মানুষকে হারিয়ে দিয়ে। মানুষ আজ নিজের মাথা থেকে জয়মাল্য খুলে নিয়ে কলের গলায় পরিয়ে দিলে; রসাতল থেকে দানব বলছে 'বাহবা'!—

[রবীন্দ্ররচনাবলী-১৯'শ খণ্ড ॥ পৃঃ ৪১২]

ভারতে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী শোষণ সম্পর্কে এক সময় লিখিতেছেন, (৯ই ফেব্রুয়ারী),

......"ভারতবর্ষকে ইংরেজ যেমন করে হারিয়েছে এমন আর য়ুরোপের কোনো জাত নয়।...তার ফৌজের গাঁঠের মধ্যে যে-বস্তুটাকে কষে বাঁধতে পারলে সেইটেকেই সে সম্পূর্ণ ভারতবর্ষ বলে বুক ফুলিয়ে গদীয়ান হয়ে বসে রইল। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তার বিস্ময় নেই, অবজ্ঞা যথেষ্ট আছে। রাষ্ট্রীয় স্বার্থের বাইরে ইংরেজ ভারত সম্বন্ধে যত অল্প আলোচনা করেছে এমন ফ্রান্স করেনি, জর্মনি করেনি।...

......"ইংরেজের লোভ যে-ভারতবর্ষকে পেয়েছে ইংরেজের আত্মা সেই ভারতবর্ষকে হারিয়েছে।...ইংরেজ-ধনী বাংলাদেশের রক্ত-নেংড়ানো পাটের বাজারে শতকরা চার-পাঁচশো টাকা মুনাফা শুষে নিয়েও যে-দেশের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে এক পয়সাও ফিরিয়ে দেয় না, তার দুর্ভিক্ষে বন্যায় মারী-মড়কে যার কড়ে আঙুলের প্রান্তও বিচলিত হয় না, যখন সেই শিক্ষাহীন স্বাস্থ্যহীন উপবাসক্লিষ্ট বাংলাদেশের বুকের উপর পুলিশের জাঁতা বসিয়ে রক্তচক্ষু কর্তৃপক্ষ কড়া আইন পাস করেন তখন সেই বিলাসী ধনী স্ফীত মুনাফার উপর আরামের আসন পেতে বাহবা দিতে থাকে; বলে, 'এই তো পাকা চালে ভারতশাসন'।

"এইটেই স্বাভাবিক। কেন না, ঐ-ধনী বাংলাদেশকে একেবারেই দেখতে পায় নি, তার মোটা মুনাফার ওপারে বাংলাদেশ আড়াল পড়ে গেছে। বাংলাদেশের প্রাণের নিকেতনে যেখানে ক্ষুধাতৃষ্ণার কান্না, বাংলাদেশের হৃদয়ের মাঝখানে যেখানে তার সুখ-দুঃখের বাসা, সেখানে মানুষের প্রতি

মানুষের মৈত্রীর একটা বড়ো রাস্তা আছে, সেখানে ধর্মবুদ্ধির বড়ো দাবি বিষয়বুদ্ধির গরজের চেয়ে বেশি, এ কথা জানবার ও ভাববার মতো তার সময়ও নেই শ্রদ্ধাও নেই। তাই যখনই দেখে দরোয়ানির ব্যবস্থা কঠোরতর করা হচ্ছে তখনই মুনাফা-বৎসলেরা পুলকিত হয়ে ওঠে। ল অ্যাণ্ড্ অর্ডার রক্ষা হচ্ছে দরোয়ানিতন্ত্র, পালোয়ানের পালা; সিম্প্যাথি অ্যাণ্ড্ রেস্পেক্ট্ হচ্ছে ধর্মতন্ত্র, মানুষের নীতি।"

তিনি আরো বলিলেন,

"যে-দুঃখের কথাটা বলছি এটা জগৎ জুড়ে আজ ছড়িয়ে পড়েছে; আজ মুনাফার আড়ালে মানুষের জ্যোতির্ময় সত্য রাহুগ্রস্ত। এইজন্যে মানুষের প্রতি কঠিন ব্যবহার করা, তাকে বঞ্চনা করা, এত সহজ হল। তাই পাশ্চাত্যে পলিটিক্সই মানুষের সকল চেষ্টার সর্বোচ্চ চূড়া দখল করে বসেছে। অর্থাৎ, মানুষের ফুলে-ওঠা পকেটের তলায় মানুষের চুপ্সে-যাওয়া হৃদয় পড়েছে চাপা। সর্বভুক্ পেটুকতার এমন বিস্তৃত আয়োজন পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোনো দিন এমন কুৎসিত আকারে দেখা দেয়নি।"

[ঐ পৃঃ ৪১৬-১৮]

১৭ই ফেব্রুয়ারী তাঁহারা দেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

শান্তিনিকেতনে পুনরায় রবীন্দ্রনাথ-গান্ধীজী সাক্ষাৎকার ও চরকা-বিতর্ক

১৯২৪ সালে অক্টোবরের শেষভাগে বেঙ্গল অর্ডিনান্সের বলে সরকার দলে দলে বাংলার যুবকর্মীদের গ্রেপ্তার করিয়া জেলে পুরিতে থাকে। শুধু সন্ত্রাসবাদীরাই নহে, সরকারের আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্য বাংলাদেশের স্বরাজ্য-দল, একথা বুঝিতে পারিয়া গান্ধীজী তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। মতিলালজী ও চিত্তরঞ্জনের সহিত দীর্ঘ আলোচনার পর গান্ধীজী স্বরাজ্যদলের সহিত এক আপোষ-মীমাংসায় উপস্থিত হইলেন। গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়া লইলেন। ৬ই নভেম্বর উহাদের যুক্ত স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে সরকারের মারমুখী আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার জন্য দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দলের সংহতি ও সহযোগিতার জন্য আবেদন জানান হয়। অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের কথাও ঘোষিত হয় এবং স্বরাজ্যদলকে কাউন্সিল প্রবেশের অধিকার দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে, গান্ধীজীর প্রধান দাবি হিসাবে কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন করিয়া কংগ্রেসকর্মীদের চরকা ও সুতাকাটা প্রায় বাধ্যতামূলক হিসাবে গৃহীত হয়। এখন হইতে কংগ্রেস কর্মীদের চারি আনার পরিবর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ হাতে কাটা সুতা দিতে হইবে (২,০০০ গজ)।

ইহাতে পরিবর্তন-বিরোধীরা অর্থাৎ গান্ধীজীর অনুগামীরা খুবই মর্মাহত হইলেন। তাঁহাদের বক্তব্য এই সিদ্ধান্তের ফলে বস্তুত স্বরাজদলের নিকট গান্ধীজীর আত্মসমর্পণ ও নতি স্বীকার করা হইয়াছে। গান্ধীজীর একমাত্র সান্ত্বনা—অহিংসা ও চরকা কংগ্রেসের সর্বজনস্বীকৃত আদর্শরূপে স্বীকৃত বা গৃহীত হইয়াছে। নভেম্বরের শেষ ভাগে নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির (A. I. C. C-র) এক সভায় ঐ আপোষ-চুক্তি অনুমোদিত হয়। ইহার কয়েকদিন পরেই চিত্তরঞ্জন তাঁহার সর্বস্ব ধনসম্পত্তি, (—এমন কি তাঁহার প্রায় ৮ লক্ষটাকা মূল্যের বসতবাটিটিও) দেশের জনহিতকর কার্যের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া সর্বত্যাগী হইয়া দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন।

ডিসেম্বরের শেষভাগে বেলগাঁও-এ কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন (৩৯-তম) হয়। গান্ধীজী সভাপতি। বেলগাঁও-কংগ্রেসে 'গান্ধী-দাস-নেহরু চুক্তি'টি চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়। গান্ধীজী তাঁহার ঐতিহাসিক ভাষণে বিদেশীবস্ত্র বয়কট ও চরকার উপরই প্রধান গুরুত্ব আরোপ করিতে গিয়া বলিলেন,

…"As regards cloth, it is not merely British cloth that harms us, but all foreign cloth and for that matter to a lesser extent even mill-made cloth injures us. Boycott brought about

anyhow of British cloth cannot yield the same results as such boycott brought about by hand-spinning and Khaddar······

"But, say the critics, the spinning wheel has not taken, it is not exciting enough, it is an occupation only for women, it means a return to the middle ages, it is a vain effort against the majestic march of scientific knowledge for which machinery stands. In my humble opinion, India's need is not excitement but solid work. For the millions, solid work itself is excitement and tonic at the same time. The fact is that we have not given the spinning wheel enough trial; I am sory to have to say that many of us have not given it a serious thought···To say that it is merely an old woman's occupation is to ignore facts. Spinning mills are a multiplication of spinning wheels. They are managed by men···But the State of the future will always have to keep some men at the spinning wheel so as to make improvements in it within the limitations which as a cottage industry it must have······"

তারপর 'যন্ত্র' বা 'machinery' সম্পর্কে তাহার অভিমত ব্যক্ত করিয়া বলিলেন,

"I wish, too, you would dismiss from your minds the views attributed to me about machinery. In the first instance, I am no more trying to present for national acceptance all my views on machinery, than I am presenting the whole of my belief in non-violence. The spinning wheel is itself an exquisite piece of machinery. My head daily bows in reverence to its unknown inventor. What I do resent is the wanton and wicked destruction of the one cottage industry of India that kept the wolf from the doors of thousands of homes scattered over a surface 1,900 miles long, 1,500 miles broad.

"I have thus dilated upon the spinning wheel because I have no better or other message for the nation. I know no other effective method for the attainment of Swaraj if it is to be by 'peaceful and legitimate means.'···"

[*Congress Presidential Addresses.-Vol' II*-pp. 737-39.]

তিনি তাঁহার রাজনীতিক আদর্শ ও নীতির আরও ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন,

"But the spinning wheel, Hindu-Muslim unity and removal of untouchability are only means to an end. The end we do

not know. For me it is enough to know the means. Means and end are converitable terms in my philosophy of life…"

স্বরাজের আদর্শ সম্পর্কে বলিলেন,

"I would therefore strive for Swaraj within the Empire but would not hesitate to sever all connection, if severence became a necessity through Britain's own fault."…

[*Ibid*-pp. 743-45]

বেলগাঁও কংগ্রেসের পর দুই তিন মাস গান্ধীজী কাথিয়াবাড়, মধ্যভারত বাংলাদেশ, মালাবার, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি এলাকায় ব্যাপক পরিভ্রমণ করিয়া চরকা, হিন্দু-মুসলিম-ঐক্য, ও অস্পৃশ্যতা নিরোধের উপর বক্তৃতা ও প্রচার অভিযান চালাইলেন। গান্ধীজীর অসামান্য ব্যক্তিত্বের প্রভাবে বটে, তা'ছাড়া নূতন গঠনতন্ত্রের জন্যও কংগ্রেসের ও স্বরাজ্য দলের সমস্ত সংগঠন চরকা বা তকলি কাটার জন্য সারা দেশব্যাপী প্রচার অভিযান শুরু করে।

এই সময়ই রবীন্দ্রনাথ বিদেশ পরিভ্রমণ করিয়া দেশে ফিরিলেন। কবি ফিরিয়াই দেখেন, তাঁহার শান্তিনিকেতনেও এই চরকার উন্মাদনা বেশ ব্যাপকতর হইয়াছে। রবীন্দ্রজীবনীকার লিখিতেছেন,

"…কবি পাঁচমাস পরে দেশে আসিয়া দেখেন শান্তিনিকেতনেই ৯০ খানা চরকা ও তকলি চলিতেছে,—বিধুশেখর, নন্দলাল প্রভৃতি সকলেই চরকা কাটিতেছেন। রবীন্দ্রনাথ সমস্তই দেখিলেন, শুনিলেন—কিন্তু কোনো মতামত প্রকাশ করিলেন না।"

[রবীন্দ্রজীবনী-তৃতীয় খণ্ড ।। পৃঃ ১৬২]

কবি যে কী পরিমাণ মর্মাহত হইলেন, তাহা অনুমান করা শক্ত নহে। সাধারণ আশ্রমবাসীদের কথা দূরে থাক, বিধুশেখর-নন্দলাল প্রমুখ প্রধান-দিগকেও তাঁহার আদর্শ প্রভাবিত করিতে পারে নাই, ইহা তিনি স্পষ্টই বুঝিলেন। বস্তুত, একদিক হইতে ইহাতে তাঁহার পরাজয়। কিন্তু এক কঠিন আত্মসংযমে তিনি অন্তরের ক্ষোভ ও নিরুদ্ধ অভিমান এতটুকুও প্রকাশ পাইতে দিলেন না। কবি যেন ইচ্ছা করিয়াই সব কিছু ভুলিয়া কাব্য ও সংগীত-রচনায় আপনাকে নিয়োজিত রাখিতে চাহিলেন।

২রা মে ফরিদপুরে দেশবন্ধুর সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন হয়। দেশবন্ধু তাঁহার ভাষণে কয়েকটি সর্ত-সাপেক্ষ ইংরাজের সহিত আপোষ-আলোচনার প্রস্তাব রাখেন। গান্ধীজী এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের উদ্বোধনে কবি নজরুল স্বরচিত 'চরকার গান' গাহিয়া গান্ধীজীকে অভ্যর্থনা জানান। সম্মেলনের পর গান্ধীজী চরকার ব্যাপক প্রচারকল্পে পূর্ববঙ্গ পরিক্রমায় বাহির হন। এই পরিক্রমা শেষ করিয়া তিনি ২৯শে মে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হন। তাঁহার সঙ্গে আসিলেন মহাদেব দেশাই ও সতীশ দাশগুপ্ত। চরকা লইয়া এবারও কবির সহিত তাঁহার দীর্ঘ দুই দিন আলোচনা হইল, কিন্তু

কোনই ফল হইল না। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিতেছেন,

"......গান্ধীজী জানিতেন কবি তাঁহার সহিত চরকা সম্বন্ধে একমত নহেন, তবুও বোধ হয় বিশ্বাস ছিল যে, নিজের ঐকান্তিকতার বলে তিনি কবিকে তাঁহার পথে আনিতে পারিবেন। দুইদিন তাঁহাদের দীর্ঘ আলোচনা চলে; বলা বাহুল্য কেহ কাহাকেও নিজ মতে আনিতে পারেন নাই। তৎসত্ত্বেও এখানে বলিয়া রাখি উভয়ের প্রীতি পূর্ববৎই অক্ষুন্ন রহিল।"

[ঐ ।। পৃঃ-১৬৪]

গান্ধীজী 'বড়োদাদা'-দ্বিজেন্দ্রনাথের সহিতও দেখা করেন এবং দীর্ঘ দুই তিন দিন ধরিয়া তাঁহাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলে। স্মরণ রাখা দরকার, শুরু হইতেই দ্বিজেন্দ্রনাথ গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করিয়া আসিতেছিলেন এবং পরোক্ষত তাঁহারই সমর্থন ও আনুকূল্যে শান্তিনিকেতনে অসহযোগ আন্দোলনের উৎসাহ ও অনুপ্রবেশ লাভ করে। এই সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে টেণ্ডুলকর লিখিতেছেন,

..."The meeting with Borodada was touching. Even as Gandhi sat at the feet of Dadabhai, some thirty-five years ago, he now sat down at the feet of Borodada. 'Whatever I may be to others, I must descend from my heights here at least and shed my mahatmaship,' he said to Borodada who insisted on Gandhi's sitting on the chair. For three days he listened to Borodada who opened his heart to him 'Even if there is discomfiture all around and fire and sword dealing destruction everywhere, I am sure that you will stand unscathed and uninjured like the fabled bird Phoenix rising over again from its own ashes. Buddha lived 2,500 years ago and though Buddhism was swept out of the land later, even today, the ahimsa that we have inherent in us from generation to generation, is Buddha's legacy. Work on in faith.'

"You have taken away my gloom,' said Borodada, 'and I hope that the memory of these days may pull me safe through the dreary journey, through he desert that may still be before me. All those that oppose you will disappear like the bubbles of time. Truth will conquer.' [*Mahatma-Vol. II*-P.-188]

গান্ধীজী চলিয়া গেলেন। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে কিন্তু তখনই কোন রাজনীতিক বিতর্কে প্রবেশ করিতে চাহিলেন না। ইহার অল্প কিছুদিন পরেই দার্জিলিং'এ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু হয় (২রা আষাঢ় ১৩৩২, ১৬ই জুন-১৯২৫)। সারা দেশ শোকে মুহ্যমান।

ইহার অল্পকাল পরেই রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা আসিলেন।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় দেশবন্ধুর স্মৃতিতে কবিকে কিছু লিখিয়া দিবার অনুরোধ লইয়া আসিলেন। কবি দেশবন্ধুর এক প্রতিকৃতির নীচে লিখিয়া দিলেন,

"এনেছিলে সাথে ক'রে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।"

কলিকাতা আসার পূর্বেই তিনি 'চরকা' নামক (আষাঢ় ১৩৩২) প্রবন্ধটি রচনা করেন। শান্তিনিকেতনে আলাপ-আলোচনার পর গান্ধীজী চরকা সম্বন্ধে কবিকে তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত জানাইবার অনুরোধ করিয়া পত্র দেন। অপরদিকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ বাংলা দেশের কিছু বৈজ্ঞানিক ও বুদ্ধিজীবী গান্ধীজীর চরকাতত্ত্বে খুবই প্রভাবিত হইয়া আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। এই সময় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার কোন রচনায় রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে, তাঁহাদের চরকাবিরোধী মতবাদের জন্য তিরস্কার করেন। রবীন্দ্রনাথ আচার্য রায়কেই উপলক্ষ করিয়া তাঁহার বিখ্যাত 'চরকা' প্রবন্ধটিতে পুনর্বার চরকা সম্বন্ধে তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিলেন। ইহার অল্পকাল পরেই লিখিলেন 'স্বরাজসাধন' প্রবন্ধটি।

এই প্রবন্ধ দুইটিতে খুব নূতন কিছু কথা নাই;—ইতিপূর্বে 'শিক্ষার মিলন' 'সত্যের আহ্বান', 'সমস্যা', 'সমাধান' প্রভৃতি প্রবন্ধে যে সব কথা বলিয়াছিলেন তাহাই অন্যভাবে ও ভঙ্গিতে আলোচ্য প্রবন্ধ দুইটিতে লিখিলেন। 'চরকা' প্রবন্ধেও তিনি পাশ্চাত্যসভ্যতার অবদান বিজ্ঞান ও যন্ত্র-শিল্পের যথার্থ মূল্যায়ন করিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিলেন,

..."য়ুরোপীয় সভ্যতায় বিজ্ঞানচর্চার সামনে যদি কোনো বড়ো নৈতিক সাধনা থাকে সে হচ্ছে বাহ্য প্রকৃতির হাতের সব রকম মার থেকে মানুষকে বাঁচানো, আর হচ্ছে মানুষেরই মনটাকে যন্ত্রে না বেঁধে প্রাকৃতিক শক্তিকেই যন্ত্রে বেঁধে সমাজের কাজ আদায় করা। এ কথা নিশ্চিত যে, বিজ্ঞানকে এক পাশে ঠেলে রেখে কেবল হাত চালিয়ে দেশের বিপুল দারিদ্র্য কিছুতে দূর হতে পারে না। মানুষের জানা এগিয়ে চলবে না, কেবল তার করাই চলতে থাকবে, মানুষের পক্ষে এত বড়ো কুলিগিরির সাধনা আর কিছুই নেই।"

চরকার উৎপত্তি হইতে অধুনা-কালের যান্ত্রিক ও কারিগরী-উদ্ভাবনীশক্তির ক্রমবিকাশের তাৎপর্য সম্পর্কে তিনি বলিলেন,

..."একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, মানুষ যে দিন প্রথম চাকা আবিষ্কার করেছিল সে দিন তার এক মহা দিন। অচল জড়কে চক্রাকৃতি দিয়ে তার সচলতা বাড়িয়ে দেবা মাত্র, যে বোঝা সম্পূর্ণ মানুষের কাঁধে ছিল তার অধিকাংশই পড়ল জড়ের কাঁধে।......এই-সব মানুষকে মুখে dignity দিয়ে কেউ কখনোই dignity দিতে পারবে না। চাকা অসংখ্য শূদ্রকে শূদ্রত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছে। এই চাকাই চরকায়, কুমোরের চাকে, গাড়ি তলায়, স্থূল সূক্ষ্ম নানা আকারে মানুষের প্রভুত ভার লাঘব করেছে। এই ভার লাঘবতার মতো ঐশ্বর্যের উপাদান আর নেই, এ কথা মানুষ বহুযুগ পূর্বে প্রথম বুঝতে

পারলে যে দিন প্রথম চাকা ঘুরল। ইতিহাসের সেই প্রথম অধ্যায়ে যখন চরকা ঘুরে মানুষের ধন-উৎপাদনের কাজে লাগল ধন তখন থেকে চক্রবর্তী হয়ে চলতে লাগল, সেদিনকার চরকাতেই এসে থেমে রইল না।…এমন উপদেশ যদি মেনে বসি যে, সুতো কাটার পক্ষে আদিম কালের চরকাই শেষ তা হলে বিষ্ণুর পূর্ণ প্রসন্নতা কখনোই পাব না, সুতরাং লক্ষ্মী বিমুখ হবেন। বিজ্ঞান মর্ত্যলোকে এই বিষ্ণুচক্রের অধিকার বাড়াচ্ছে এ কথা যদি ভুলি, তা হলে পৃথিবীতে অন্য যে-সব মানুষ চক্রীর সম্মান রেখেছে তাদের চক্রান্তে আমাদের মরতে হবে।"

[কালান্তর ॥ পৃ ২৬৫-৬৬]

বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দায়িত্ব অর্পিত ছিল তৎকালীন জাতীয় নেতৃবৃন্দের স্কন্ধে আর সেই দায়িত্ব হইতেছে দেশে ব্যাপক বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যা এবং জাতীয় পুঁজি ও শিল্পের অব্যাহত বিকাশের অনুকূল সমাজ-আর্থনীতিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আন্দোলন করা। কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময়ের কথা, দেশের তৎকালীন মহা-মহা রথীরাও পর্যন্ত চরকার গানে গান্ধীজীর সুরে সুর মিলাইয়াছেন। কিন্তু গান্ধীজীর কথা স্বতন্ত্র। গান্ধীজীর সামগ্রিক জীবনদর্শনের দিক হইতে বিচার করিলে চরকার হয়ত একটা যুক্তি ও কৈফিয়ৎ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কিন্তু যে-সব নেতৃবৃন্দ গান্ধীজীর আদর্শ ও জীবন-দর্শন আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেন নাই অথচ ভারতের জনমানসে তাঁহার বিরাট প্রভাব প্রতিপত্তিকেও অস্বীকার করিতে পারেন নাই, তাঁহারা যে শুধু নিছক সুবিধা ও কৌশলের খাতিরেই তাঁহার সহিত আপোষ করিয়া চরকার প্রচারে নামিলেন, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু তবুও বলিতে হইবে, বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশ সত্য সত্যই গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া চরকা অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষের জাতীয় মানসিকতায় কিছু কালের জন্য সে-এক বিষম সংকটের যুগ। নতুবা দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও বিজ্ঞান ছাড়িয়া চরকার মহিমাকীর্তনে নামিয়াছেন আর রবীন্দ্রনাথের মত 'মহাভাবুক এক কবি' (কল্পনার রঙীন ডানায় ভর করিয়া আকাশে বিচরণ করাই নাকি যাঁহাদের ধর্ম!) দেশের সুলভ জনমতকে উপেক্ষা করিয়া বিজ্ঞান ও যুক্তিবুদ্ধির পক্ষে সওয়ালে নামিয়াছেন,—উত্তরকাল ইহাতে বিস্মিত না-হইয়া পারে না।

কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার, এতোবড়ো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রগতিশীল প্রশ্নে কংগ্রেসের মডারেট নেতৃবৃন্দ অবিরাম আন্দোলন করিয়া আসিতেছিলেন। ঊনিশ শতকের শেষভাগ হইতে তাঁহারা বিদেশী পুঁজির আক্রমণ হইতে জাতীয় শিল্পের রক্ষা ও ব্যাপক বিস্তারের জন্য এক বলিষ্ঠ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চালাইয়া আসিতেছিলেন, এসব কথা পূর্ব খণ্ডেই আলোচিত হইয়াছে। জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে, এইদিক হইতে মডারেট নেতৃবৃন্দের অবদান অসামান্য ও অতুলনীয়। ১৯১৮ সালে দিল্লী-কংগ্রেসে '*Industrial Commission*' এর তদন্ত-সুপারিশ সম্পর্কে যে সব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, এই প্রসঙ্গে তাহা স্মরণীয়।

দীর্ঘদিন হইতে কবি বলিয়া আসিতেছেন, সস্তায়, ফাঁকি দিয়া স্বরাজলাভের

চেষ্টা আত্মপ্রতারণা মাত্র। স্বরাজসাধনার আদর্শ বিরাট এবং সুমহান আর সেইজন্য তাহা কঠিন দুঃখ ও সর্বস্ব পণ করিয়া জাতিকে অর্জন করিতে হইবে। তিনি 'চরকা' প্রবন্ধেও তাহার পুনরুক্তি করিয়া বলিলেন,

"সব চেয়ে সহজ দেবতার কাছে সব চেয়ে কম দেওয়ার দাবি মানুষের প্রতি সব চেয়ে অন্যায় দাবি। স্বরাজসাধনের নাম করে তেত্রিশ কোটি লোককে চরকা কাটতে বলা জগন্নাথকে বিলিতি বেগুন দেওয়া।...

..."এমন দেশে দেশ-উদ্ধারের নাম করে এল চরকা। ঘরে ঘরে বসে বসেচরকা ঘোরাচ্ছি আর মনে মনে বলছি, স্বরাজ-জগন্নাথের রথ এগিয়ে চলছে।"

গান্ধীজী মানুষের দারিদ্র্য, অন্ন-সংস্থান ও কুটির-শিল্প রক্ষার প্রয়োজনীয়তার দিক হইতে চরকার উপরই প্রধান গুরুত্ব আরোপ করিতেছিলেন। পক্ষান্তরে বহুকাল হইতে রবীন্দ্রনাথ দেশের কৃষি ও কুটির শিল্পের রক্ষার প্রশ্নে সমবায়-নীতির উপরই প্রধান গুরুত্ব আরোপ করিতেছিলেন। 'চরকা' প্রবন্ধে তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া বলিলেন,

"রাষ্ট্রনীতি যেমন একান্ত নেশন-স্বাতন্ত্র্যে, জীবিকাও তেমনি একান্ত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে আবদ্ধ। এখানে তাই এত প্রতিযোগিতা, ঈর্ষা, প্রতারণা, মানুষের এত হীনতা। কিন্তু, মানুষ যখন মানুষ তখন তার জীবিকাও কেবল শক্তি-সাধনার ক্ষেত্র না হয়ে মনুষ্যত্বসাধনার ক্ষেত্র হয়, এইটেই উচিত ছিল। জীবিকার ক্ষেত্রেও মানুষ কেবল অন্ন পাবে তা নয়, আপন সত্য পাবে, এই তো চাই। কয়েক বছর পূর্বে যে দিন সমবায়মূলক জীবিকার কথা প্রথম শুনি, আমার মনে জটিল সমস্যার একটা গাঁঠ যেন অনেকটা খুলে গেল। মনে হল যে, জীবিকার ক্ষেত্রে স্বার্থের স্বাতন্ত্র্য মানুষের সত্যকে এতদিন অবজ্ঞা করে এসেছিল, সেখানে স্বার্থের সম্মিলন সত্যকে আজ প্রমাণ করবার ভার নিয়েছে।...

"আমার কোনো কোনো আত্মীয় তখন সমবায়তত্ত্বকে কাজে খাটাবার আয়োজন করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় আমার মন আন্দোলিত হচ্ছিল, এমন সময় আয়র্লণ্ডের কবি ও কর্মবীর A. E.-রচিত *National Being* বইখানি আমার হাতে পড়ল। সমবায়জীবিকার একটা বৃহৎ বাস্তব রূপ স্পষ্ট চোখের সামনে দেখলুম। তার সার্থকতা যে কত বিচিত্র, মানুষের সমগ্র জীবনযাত্রাকে কেমন করে সে পূর্ণ করতে পারে, আমার কাছে তা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অন্নব্রহ্মও যে ব্রহ্ম, তাকে সত্য পন্থায় উপলব্ধি করলে মানুষ যে বড়ো সিদ্ধি পায়—অর্থাৎ কর্মের মধ্যে বুঝতে পারে যে, অন্যের সঙ্গে বিচ্ছেদেই তার বন্ধন, সহযোগেই তার মুক্তি—এই কথাটি আইরিশ কবি-সাধকের গ্রন্থে পরিস্ফুট।"

তাই তিনি, চরকায় অন্নসংস্থান কিংবা স্বরাজ মিলিবার যুক্তির খণ্ডনে তীব্র বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন,

..."দেশসুদ্ধ লোক মিলে গোরাদের গায়ে যদি থুথু ফেলে তবে কামান বন্দুক সমেত তাদের ভাসিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এই থুথু ফেলাকে বলা যেতে পারে দুঃখগম্য তীর্থের সুখসাধ্য পথ। আধুনিক কালের বিজ্ঞানা-

ভিমানী যুদ্ধপ্রণালীর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশের পক্ষে এমন নিখুঁত অথচ সরল উপায় আর নেই, এ কথা মানি। আর এও নাহয় আপাতত মেনে নেওয়া গেল যে, এই উপায়ে সরকারি থুৎকার-প্লাবনে গোরাদের ভাসিয়ে দেওয়া অসম্ভব নয়, তবু মানুষের চরিত্র যারা জানে তারা এটাও জানে যে, তেত্রিশ কোটি লোক এক সঙ্গে থুথু ফেলবেই না। দেশের দৈন্য-সমুদ্র সেঁচে ফেলবার উদ্দেশে চরকা-চালনা সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা চলে।"

কিন্তু তবুও গান্ধীজীর প্রতি তাঁহার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি বলিলেন,

……"ব্যক্তিগত অনুরাগের টানে মহাত্মাজির কাছ থেকে চরকায় দীক্ষা নেবার প্রবল ইচ্ছা বারে বারে আমার মনে এসেছে! কিন্তু, আমার বুদ্ধিবিচারে চরকার যতটুকু মর্যাদা তার চেয়ে পাছে বেশি স্বীকার করা হয়, এই ভয়ে অনেক দ্বিধা করে নিরস্ত হয়েছি। মহাত্মাজি আমাকে ঠিক বুঝবেন জানি, এবং পূর্বেও বার বার আমার প্রতি যেমন ধৈর্য রক্ষা করেছেন আজও করবেন; আচার্য রায়মশায়ও জনাদরনিরপেক্ষ মতস্বাতন্ত্র্যকে শ্রদ্ধা করেন, অতএব মাঝে মাঝে বক্তৃতাসভায় যদিচ মুখে তিনি আমাকে অকস্মাৎ তাড়না করে উঠবেন, তবু অন্তরে আমার প্রতি নিষ্করুণ হবেন না। আর, যাঁরা আমার দেশের লোক যাঁদের চিত্তস্রোত বেয়ে উপকার আর অপকার উভয়েরই কত স্মৃতি অতলের মধ্যে তলিয়ে গেল, তারা আজ আমাকে যদি ক্ষমা না করেন কাল সমস্তই ভুলে যাবেন। আর যদি বা না ভোলেন, আমার কপালে তাঁদের লাঞ্ছনা যদি কোনো দিন নাও ঘোচে, তবে আজ যেমন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথকে লাঞ্ছনার সঙ্গী পেয়েছি কালও তেমনি হয়তো এমন কোনো কোনো স্বদেশের অনাদৃত লোককে পাব যাঁদের দীপ্তি দ্বারা লোকনিন্দা নিন্দিত হয়।"

[কালান্তর ॥ পৃঃ ২৭০-৭৭]

ইহাতেই বুঝা যায় রবীন্দ্রনাথ কতখানি নির্ভীক ও বলিষ্ঠ বিবেকবুদ্ধির পূজারী ছিলেন। সত্য ও বিবেকবুদ্ধির নির্দেশে সুলভ জনপ্রীতি বা লোক-নিন্দাকে তিনি বড়ো একটা গ্রাহ্যও করিতেন না।

এই প্রবন্ধ রচনার পর কলিকাতা আসিলে তাঁহাকে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হয়। কলিকাতায় তখন দেশবন্ধুর স্মৃতিরক্ষা ও স্মৃতিসৌধ নির্মাণের আয়োজন চলিতেছে। গান্ধীজীও উহাতে অগ্রণী হইয়া ঐ উদ্দেশ্যে দেশের জনগণের নিকট একটি আবেদনপত্রের খসড়া রচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথের ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের নিকট স্বাক্ষরের জন্য পাঠাইয়া দেন। উহাতে লেখা ছিল,

"We cannot conceive a more fitting memorial than the universal propagation of the spinning wheel and khaddar and, therefore, invite funds for the purpose."…

দেশবন্ধুর আদর্শ ও রাজনীতির কথা চিন্তা করিয়াই কবি উহাতে স্বাক্ষর করেন। উহা ২৩শে জুলাই *'Young India'* পত্রিকায় গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ,

মতিলাল ও আজাদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের যুক্তস্বাক্ষরিত আবেদন রূপে প্রকাশিত হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীকে পত্রের মাধ্যমে জানাইয়াছেন যে, চরকা সম্বন্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত ধারণা ও মতামত 'চরকা' প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। দেশ ও জাতির সেবায় চিত্তরঞ্জনের ভূমিকা যথার্থ ও অবদানের কথা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য কবি লিখিলেন,

"Man truly reveals himself through his gift, and the best gift that Chittaranjan has left for his countrymen is not any particular political or social programme, but the creative force of a great aspiration that has taken a deathless form in the sacrifice which his life represented."

[*Visva Bharati Quarterly*-July 1925-P. 181]

চরকা প্রবন্ধটির ইংরাজী তর্জমা *Modern Review* পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে, গান্ধীজীর নজরে আসে।

গান্ধীজী উহার জবাবে *Young India* পত্রিকায় দীর্ঘ সমালোচনা লেখেন (5 Nov. 1925) ; গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথের প্রবল ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীন চিন্তাধারার প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াও বলিলেন যে, কবি 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' বা সঠিক তথ্যমূলক কিছু পাঠ না-করিয়াই শুধু 'খোশ গল্পের' (table talk) উপর ভিত্তি করিয়াই চরকা সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা তৈরী করিতেছেন। উদাহরণস্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলিলেন,

"He thinks, for instance, that I want everybody to spin the whole of his or her time to the exclusion of all other activity, that is to say, that I want the poet to forsake his muse, the farmer his plough, the lawyer his brief and the doctor his lancet. So far is this from truth, that I have asked no one to abandon his calling but, on the contrary, to adorn it by giving every day only thirty minutes to spinning as sacrifice for the whole nation. I have, indeed, asked the famishing man or woman, who is idle for want of any work whatsoever, to spin for a living and the half starved farmer to spin during his leisure hours to supplement his slender resource. If the poet span half an hour daily, his poetry would gain in richness. For it would then represent the poor man's wants and woes in a more forcible manner than now."

যন্ত্র সম্পর্কে তিনি বলিলেন,

..."Machinery has its place ; it has come to stay. But it must not be allowed to displace the necessary human labour.

An imported plough is a good thing. But if by some chance one man could plough up by some mechanical invention of his the whole of the land of India and control all the agricultural produce and if the millions had no other occupation, they would starve, and being idle, they would become dunces, as many have already become. There is hourly danger of many more being reduced to that unenviable state. I would welcome every improvement in the cottage machine, but I know that it is criminal to displace the hand labour by the introduction of power-driven spindles, unless one is at the same time ready to give millions of farmers some other occupation in their homes."

আর্থনীতিক পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ আয়র্লণ্ডের স্যর হোরেস্ প্ল্যাঙ্কেটের অনুসৃত সমবায়-নীতিকে গ্রহণ করিবার কথা বলেন। গান্ধীজী তাহার জবাবে বলিলেন,

"The Irish analogy does not take us very far. It is perfect in so far as it enables us to realize the necessity of economic co-operation. But Indian circumstances being different, the method of working out co-operation is necessarily different. For Indian distress every effort at co-operation has to centre round the charkha, if it is to apply to the majority of the inhabitants of this vast peninsula,···A Sir Gangaram may give us a model farm which can be no model for the penniless Indian farmer who has hardly two or three acres of land which every day runs the risk of being still further cut up."

কৃষিতে সমবায়-প্রথা কার্যকর করার পথে প্রধানতম বাধা, কৃষিতে তৎকালীন সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-শাসন। এই সামন্ততান্ত্রিক শোষণের পূর্ণ অবসান ও গণতান্ত্রিক ভূমিসংস্কার নীতি কার্যকরী না-করা পর্যন্ত সমবায়-প্রথা বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে। রবীন্দ্রনাথ এই বাস্তব সমস্যাটি খুব ভালো বুঝিতেন না। গান্ধীজী অস্পষ্টভাবে এই বাস্তব সমস্যাটির কথা তুলিয়া কৃষিতে সমবায় নীতিকে বস্তুত অবাস্তব বলিয়া বর্জন বা পরিহার করিলেন। কিন্তু জমিদারী-জায়গীরদারী ব্যবস্থার বা কৃষিতে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের অবসান ঘটাইবার জন্য তখনও তিনি একটি কথাও বলিলেন না। গান্ধীজী কবির প্রগতিশীল চিন্তার মূল তাৎপর্যটি স্বীকার করিয়া লইয়াও ঐ প্রবন্ধের উপসংহারে বলিলেন,

···"there is nothing in the poet's argument which I cannot endorse and still maintain my position regarding the charkha.

The many things about the charkha which he has ridiculed, I have never said. The merits I have claimed for the charkha, remain undamaged by the poet's battery"

[*Mahatma-Vol-II*-pp. 215-17]

কিন্তু 'চরকা' প্রবন্ধে কবি কোথাও—"সমস্ত মানুষকে সমস্ত সময়ের জন্য চরকা কাটিতে হইবে'—ইহাকে গান্ধীজীর নির্দেশ বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। কবির অজস্র যুক্তি ও প্রশ্নের মধ্যে একটা প্রধান জিজ্ঞাসা এই, 'শুধু চরকাই কেন, —সমস্ত কুটির শিল্প ও কৃষির ক্ষেত্রে কেন সামগ্রিক আর্থনীতিক পুনর্গঠনের কর্মসূচী গ্রহণ না করিব' ? এই কথাটাই উহার কিছুদিন পরে 'স্বরাজসাধন' (আশ্বিন, ১৩৩২) প্রবন্ধে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করিলেন। কবি বলিলেন,

..."প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হয়, স্বরাজ জিনিসটা কী। আমাদের দেশনায়কেরা স্বরাজের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করেন নি। স্বাধীনতা শব্দটার মানে বিস্তৃত। নিজের চরকায় নিজের সুতো কাটার স্বাধীনতা আমাদের আছে। কাটি নে তার কারণ কলের সুতোর সঙ্গে সাধারণত চরকার সুতো পাল্লা রাখতে পারে না। হয়তো পারে, যদি ভারতের বহু কোটি লোক আপন বিনামূল্যের অবসরকাল সুতো কাটায় নিযুক্ত ক'রে চরকার সুতোর মূল্য কমিয়ে দেয়।...

"দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে, দেশে সকলে মিলে চরকা চালালে অর্থকষ্ট কিছু দূর হতে পারে, কিন্তু সেও স্বরাজ নয়। না হোক, সেটা অর্থ বটে তো।...

"স্বীকার করে নেওয়া যাক, এও একটা বিশেষ সমস্যা বটে। চাষিদের উদ্বৃত্ত সময়টাকে কাজে লাগাতে হবে। কথাটা শুনতে যত সহজ তত সহজ নয়। ...সংক্ষেপে বলে দিলেই হল না—ওরা চরকা কাটুক।

"চাষি চাষ করা কাজের নিয়ত অভ্যাসের দ্বারা আপনার মনকে ও দেহকে একটা বিশেষ প্রবণতা দিয়েছে। চাষের পথই তার সহজ পথ। যখন সে চাষ করে তখনি সে কাজ করে, যখন চাষ করে না তখন কাজ করে না। কুঁড়ে বলে কাজ করে না, এ অপবাদ তাকে দেওয়া অন্যায়। যদি সম্বৎসর তার চাষ চলতে পারত, তা হলে বছর ভরেই সে কাজ করত।"...

তারপরে বাংলা দেশের দুইটি জেলার সম্পর্কে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বর্ণনা করিয়া কবি বলিলেন, একটি জেলার চাষীরা শুধুমাত্র ধান-চাষই করে, সব্জি ফসল দেয় না। কবির বহু উৎসাহদানেও কোন ফল হয় নাই। 'যারা ধান-চাষের জন্য প্রাণপণ করতে পারে, তারা সবজি-চাষের জন্য একটুও নড়ে বসতে চায় না।' আর একটি জেলার সম্পর্কে তিনি বলিলেন যে, সেই "জেলায় চাষি ধান পাট আখ সর্ষে প্রভৃতি সকল রকম চাষেই লেগে আছে। কিন্তু, যে জমিতে এ-সব শস্য সহজে হয় না সে জমি তাদের বৃথা পড়ে থাকে, তার খাজনা বহন করে চলে। অথচ বৎসরে বৎসরে পশ্চিম-অঞ্চল থেকে চাষি এসে এই জমিতেই তর্মুজ খর্মুজ কাঁকুড় প্রভৃতি ফলিয়ে যথেষ্ট লাভ

করে নিয়ে দেশে ফিরে যায়। তবু স্থানীয় চাষি এই অনভ্রান্ত ফসল ফলিয়ে অবস্থার উন্নতি করতে বিমুখ। তাদের মন সরে না। যে চাষি পাটের ফলন করে তাকে স্বভাবত অলস বলে বদনাম দেওয়া চলে না।"···

···চরকা কাটায় নয়,—চাষীর এই উদ্‌বৃত্ত সময়কে কিভাবে কৃষি-উৎপাদন তথা জাতীয় সম্পদবৃদ্ধির কাজে লাগান যায় তাহার কথাই চিন্তা করিবার জন্য দেশনায়কদের প্রতি কবি আহ্বান জানাইয়া বলিলেন,

"তাহলে দেশনায়কদের ভাবতে হবে, চাষিদের অবকাশকালকে সম্যক্‌রূপে কী উপায়ে খাটানো যেতে পারে। বলা বাহুল্য, চাষের কাজে খাটাতে পারলেই ঠিক রাস্তাটা পাওয়া যায়।···

"চাষিকে চাষের পথে উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে চরিতার্থ করবার চেষ্টা অন্যান্য কোনো কোনো কৃষিক্ষেত্রবহুল দেশে চলেছে। সে-সব জায়গায় বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি খাটিয়ে মানুষ চাষের বিস্তর উন্নতি করেছে। আমাদের দেশের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, তারা তাদের জমি থেকে আমাদের চেয়ে দ্বিগুণ চারগুণ বেশি ফসল আদায় করছে। এই জ্ঞানালোকিত পথ সহজ পথ নয়, সত্য পথ। এই পথ-আবিষ্কারে মনুষ্যত্বের প্রমাণ হয়। চাষের উৎকর্ষ-উদ্ভাবনের দ্বারা চাষির উদ্যমকে ষোল-আনা খাটাবার চেষ্টা না করে তাকে চরকা ঘোরাতে বলা শক্তিহীনতার পরিচয়। আমরা চাষিকে অলস বলে দোষ দিই, কিন্তু তার অবস্থার উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যে আমরা যখন তাকে চরকা ধরতে পরামর্শ দিই তখন সেটাতে আমাদেরই মানসিক আলস্যের প্রমাণ হয়।"

[কালান্তর ॥ পৃঃ-২৮০-৮৫]

সেইজন্য কবি সামগ্রিক গ্রামপুনর্গঠনের কর্মসূচী গ্রহণ করিবার আহ্বান জানাইয়া বলিলেন,

"স্বদেশের দায়িত্বকে কেবল সুতো কাটায় নয়, সম্যকভাবে গ্রহণ করবার সাধনা ছোট ছোট আকারে দেশের নানা জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করা আমি অত্যাবশ্যক মনে করি। সাধারণের মঙ্গল জিনিসটা অনেকগুলি ব্যাপারের সমবায়। তারা পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তাদের একটাকে পৃথক করে নিলে ফল পাওয়া যায় না। স্বাস্থ্যের সঙ্গে, বুদ্ধির সঙ্গে, জ্ঞানের সঙ্গে, কর্মের সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারলে তবেই মানুষের সব ভালো পূর্ণ ভালো হয়ে ওঠে। স্বদেশের সেই ভালো রূপটিকে আমরা চোখে দেখতে চাই।···যে জিনিসটাকে সমস্ত ভারতবর্ষে পেতে চাই ভারতবর্ষের কোনো-একটা ক্ষুদ্র অংশে তাকে যদি স্পষ্ট করে দেখা যায়, তা হলে সার্থকতার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জন্মাবে।··· ভারতবর্ষের একটিমাত্র গ্রামের লোকও যদি আত্মশক্তির দ্বারা সমস্ত গ্রামকে সম্পূর্ণ আপন করতে পারে তাহলেই স্বদেশকে স্বদেশরূপে লাভ করবার কাজ সেইখানেই আরম্ভ হবে।···"

"যে গ্রামের লোক পরস্পরের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অন্ন-উপার্জনে আনন্দবিধানে সমগ্রভাবে সম্মিলিত হয়েছে সেই গ্রামই সমস্ত ভারতবর্ষের স্বরাজলাভের পথে প্রদীপ জ্বেলেছে। তার পরে একটা দীপের থেকে আর-একটা দীপের শিখা

জ্বালানো কঠিন হবে না ; স্বরাজ নিজেই নিজেকে অগ্রসর করতে থাকবে, চরকার যান্ত্রিক প্রদক্ষিণপথে নয়, প্রাণের আত্মপ্রবৃত্ত সমগ্রবৃদ্ধির পথে।"

[কালান্তর ॥ পৃঃ ২৮৭-৯০]

স্মরণ রাখা দরকার, স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতেই রবীন্দ্রনাথ দেশ-নায়কদের সম্মুখে এই গ্রাম পুনর্গঠনের কর্মসূচী বার বার উত্থাপন করিয়া আসিতেছেন এবং শ্রীনিকেতনে কিছুকাল পূর্বেই উহার বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষাও শুরু করিয়া দিয়াছেন।

আর একটি জিনিস লক্ষ্য করিবার মত। 'চরকা' প্রবন্ধেও তিনি ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যন্ত্রশক্তির মহিমা গান করিয়া ছিলেন বটে কিন্তু যন্ত্রশিল্প-সভ্যতাকে গ্রহণ করিবার প্রশ্নে তখনও তাঁহার মনে নানা প্রশ্ন, ও অন্তর্দ্বন্দ্ব চলিতে থাকে। তাই তখনই সারা ভারতবর্ষব্যাপী আধুনিক ও ভারী যন্ত্রশিল্পের (Heavy industries) প্রসারের উপর তিনি পরিষ্কার কোন নির্দেশ বা গুরুত্ব দিতে পারিলেন না। যথাস্থানে আমরা এ আলোচনায় আসিব।

কিন্তু কৃষি এবং সামগ্রিকভাবে কৃষি-অর্থনীতির উন্নয়নকে উপেক্ষা করিয়া শুধুমাত্র চরকা দ্বারা চাষীর ক্ষুধার নিবৃত্তি কিংবা জাতীয় আর্থনীতিক সমস্যার সমাধান করা যায় না,—কবির এই মত—গান্ধীজীর অপেক্ষা অনেক বেশী যুক্তিসম্মত ও অর্থনীতি শাস্ত্রসম্মত। কিন্তু হাজার হইলেও রবীন্দ্রনাথ কবি আর গান্ধীজী একজন অসাধারণ জনপ্রিয় ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাজনীতিক নেতা, যাঁহার আহ্বানে আসমুদ্র হিমাচল মানুষের হৃদয় মন আবেগে রোমাঞ্চিত হয় : 'গান্ধীজী যে এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজ আনিয়া দিবেন।'

যেটা বিশেষভাবে লক্ষণীয়, গান্ধীজী তখনও পর্যন্ত কুটির শিল্পের মধ্যে শুধুমাত্র চরকার উপরই গুরুত্ব দিতেছিলেন, দেশের ঐতিহ্যমণ্ডিত কারু ও কুটিরশিল্পের সামগ্রিক উন্নয়ন ও পুনর্গঠনের বিষয়টা তখনও তাঁহার চিন্তার মধ্যে আসে নাই। এবার শ্রীনিকেতনের বিভিন্ন কারুশিল্পগুলি দেখার পর তিন খুবই প্রভাবিত হ'ন। প্রায় ১০ বৎসর পর, তিনি নিখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সংঘ (*All India Village Industries Association*) গঠনের সময় পরিষ্কার সে-কথা স্বীকার করেন। অবশ্য কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষি পুনর্গঠন সমস্যা লইয়া তারও বহু পরে গান্ধীজী চিন্তা ভাবনা শুরু করেন—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দুর্ভিক্ষের ও খাদ্য সংকটের পর।

শান্তিনিকেতনে ফিরিবার পর রমাঁ রোলাঁর ষষ্ঠিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে কবি যন্ত্র-শিল্প-সভ্যতা সম্পর্কে যাহা বলিলেন এই প্রসঙ্গে তাহা উল্লেখযোগ্য, (৫ই অক্টোবর, ১৯২৫),

"While in America, I had occasion to talk about the rapid and enormous growth of organisations which attain their irresistible efficiency by eliminating the personal man and concentrating the mechanical one in a huge lump of system. I spoke of the spread of callousness and the deadening of the moral sense of responsibility in consequence of the machine representing man in most of his activities. Cruelty and injustice of an appalling kind have today been made easily possible, because they can be done through an organised elemental force which ruthlessly takes a direct path towards the fulfilment of its purpose, trampling down all other considerations. We have seen how the church can be blood-thirsty while the religion it represents is humane ; how it is possible to cheat on a wholesale scale in the name of business, while the respectability of the sharers of profit remains untouched ; how gross falsehoods are deliberately used for poisoning their victims by governments whose members have gentlemanly manners and traditions. When in loyalty to such gigantic institutions men commit terrible wrongs, they feel something like a religious exultation which smothers their conscience. It is the modern form of fetish worship with its numerous rituals of human sacrifice, in the shadow of which all other religions have faded into unreality."

লক্ষ্য করিবার বিষয় এখানেও কবির আক্রমণের মূল লক্ষ্য ঠিক যন্ত্র নহে,—ইউরোপ-আমেরিকার পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থা। কিন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজের এই যান্ত্রিকতার কারাগার হইতে কী ভাবে মানুষ মুক্তি পাইবে, এই প্রশ্নের খুব পরিষ্কার সমাধান কবির জানা ছিল না। ইউরোপের সমাজবিজ্ঞানী ও সমাজতন্ত্রবাদীরা যেখানে গণবিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে উহার সমাধান দেখিতেছেন রবীন্দ্রনাথ তেমন কিছু সমাজ-বিপ্লবের বা গণবিদ্রোহের পরিষ্কার আহবান জানাইতে পারেন নাই অবশ্য যদিও তাঁহার বহু কাব্যে ও রূপক-নাট্যগুলিতে সংগ্রামের ও সমাজবিপ্লবের পরিষ্কার নির্দেশ আছে। তাছাড়া

ইউরোপের পোলিটিকেল রঙ্গমঞ্চে যে শোষিত জনগণের অভ্যুদয় হইয়াছে, এই দুর্বার গণবিদ্রোহকে ঠেকাইতে পারে জগতে এমন কোন শক্তি নাই, একথা কবিও বহুবার অঙ্গুলিনির্দেশে দেখাইয়াছেন। জনগণের অপরিসীম শক্তি ও সৃজনশীলতার উপরও তাঁহার শ্রদ্ধা ও প্রত্যয় ছিল বটে। কিন্তু তবুও মহান ব্যক্তিত্ব (Great Individuals) ও ব্যক্তিগত নৈতিক সংগ্রামের প্রতিই তাঁহার অন্তরের প্রবল আকর্ষণ ছিল। তাই যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, ঐ যান্ত্রিকতার নিষ্পেষণ হইতে মুক্তি কোথায়, তখন উহার জবাবে তিনি বলিলেন,

…"My answer was that my reliance is on those individuals who have made human ideals living in their personality…I believe that when anti-human forces spread their dominion, individuals with firm faith in humanity are born, who become acutely conscious of the menace to man and fearlessly fulfil their destiny through insult and isolation. We came to know such a man in England in the person of E. D. Morel who is dead now, but who can never die…Human civilizations have their genesis in individuals, and they also have their protectors in them. One of the few proofs that the present day is not utterly barren of them is the life and work of Romain Rolland. And that the present day needs him most is proved by the scourging he has received from it, which is a true recognition of his greatness by his fellow-beings"

[*Rolland and Tagore*-pp.1-2.]

বিবেকী বুদ্ধিজীবীদের, বিশেষত শিল্পী ও মনীষীদের নৈতিক সংগ্রামের একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা আছে, সকলেই উহা একবাক্যে স্বীকার করেন। কিন্তু শুধুমাত্র বুদ্ধিজীবীদের নৈতিক সংগ্রামে পুঁজিবাদী শোষণ-ব্যবস্থার অবসাদ ঘটান যায় না। তাছাড়া তখন রোলাঁ-বারবুস্ প্রমুখ ইউরোপীয় শিল্পীদের অহোরাত্র চিন্তা ও সাধনার বিষয়, কী ভাবে এই যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদীদের মারমুখী-ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবী শ্রেণীর সম্মিলিত প্রতিরোধ-আন্দোলন সৃষ্টি করা যায়। রবীন্দ্রনাথ তখনও উহার বিস্তারিত খবর এবং উহার সঠিক তাৎপর্যও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। কবি সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে এই প্রতিরোধ-আন্দোলনকে শুধু যেন নৈতিক সংগ্রামের স্তরেই সীমাবদ্ধ রাখিতে চাহিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই সংগ্রামচিন্তা, এই সময়কার তাঁহার '*Judgment*' নামক ভাষণে অত্যন্ত সুন্দর-ভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে কবি তাঁহার ভাষণে বলিলেন,

…"Nevertheless we must have the courage to judge. For the standard of moral judgment is the true helm of our life.…"

"Fight there must be in this world. We cannot make truce with impunity. Our evolution towards the perfect has been and has to be through a series of fights. Our moral judgment is the best weapon we have in the warfare for the preservation of humanity. With it we have to resist, and even to hurt, for the cause of justice...."

"The surrender of moral judgment is also a defeat through which the invasion of the West is laying its stony road across the soul of the East, leading most of its traffic of ideas to the gambling den of commerce and politics, to the furious competition of suicide in the arena of military lunacy...

"But we must not allow this to go on. We must find our voice to be able to say to the West: 'You may force your things into our homes, you may obstruct our prospects of life, —but '*we judge you*'. You may ignore our judgment. Materially it will not injure you, nor check you in your climbing up the dizzy precipice of profit and power, but it will save us from moral degradation. We refuse to humiliate ourselves by saying that you are worthy of obedience because you are strong, worthy of respect because you are rich."

পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার তীব্র সমালোচনা করিয়া তিনি আরও বলিলেন,

..."Bespattering the whole world with their diplomatic lies, continually adding to the number of victims for their man-eating prosperity, scientifically crushing the human rights of large continents of races, spreading a contagion of ugly carbuncles all over the earth with the impurity of their utilitarian touch, keeping their snarling nastiness bared at the entrance of their miserly national mansion,—they have, in all these, an ever increasing gravitational pull against the top of their greatness. The fall will be terrific.

"...That such a philosophy of survival, fit for the world of tigers, cannot but bring a fatal catastrophe in the human world, they do not see. They become violently angry at those who protest against it, fearing that such a protest might weaken in them the animal that should be allowed to survive for eternity."

[*Visva-Bharati Quarterly*-Octo. 1925-pp.204-08]

অবশ্য পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মহত্তর অবদানগুলিকে কবি কোনদিনও অস্বীকার করেন নাই, এখনও করিলেন না। তিনি বলিলেন, উহা পাশ্চাত্যের 'নেশনের' সৃষ্টি নহে, উহা পাশ্চাত্যের জনগণের বা 'পিপ্‌লের' (people) সৃষ্টি এবং উহাকে আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে।

নভেম্বরের শেষভাগে মুসোলিনী অধ্যাপক জোসেপ তুচি (Guiseppe Tucci) ও ফর্মিকিকে ইতালির সাংস্কৃতিক-দূত হিসাবে বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনার জন্য প্রেরণ করেন (২১ 'নভেম্বর ১৯২৫) এবং বিশ্বভারতীর জন্য বহু সংখ্যক পুস্তকও পাঠাইলেন। রবীন্দ্রনাথ ইতালি পরিত্যাগের পূর্বে ফর্মিকিকে বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনার কাজে সহযোগিতার জন্য আহ্বান জানান। বিশ্বভারতী আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং কবি বিদেশ ভ্রমণকালে প্রায় প্রতিটি দেশেই সাধারণভাবে উহার কাজে সহযোগিতার জন্য আবেদন জানান। সুতরাং উহার মধ্যে কোন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল না। তবে ইতালির সহিত সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কবিমনের একটি আগ্রহ ছিল এবং তাহা প্রাচীন ইতালির মহান সভ্যতা ও ঐতিহ্যর কথাই স্মরণ করিয়া। কবি ধন্যবাদ ও যথোচিত সৌজন্য প্রকাশ করিয়া মুসোলিনীকে যে টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন তাহাতে এই ভাবটিই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। তিনি লিখিয়াছিলেন,

"Allow me to convey to you our gratitude in the name of the Visva-Bharati for sending us, through Prof. Formichi, your cordeal appreciation of Indian civilization, and deputing Prof. Tucci of the University of Rome for acquainting our students with Italian history and culture and working with us in various departments of oriental studies, and also for the generous gift of books in your name, showing a spirit of magnanimity worthy of the tradition of your great country."

[রবীন্দ্রজীবনী-তৃতীয় খণ্ড ।। পৃঃ ১৭১]

বলা বাহুল্য, কবি তখনও ইহার পশ্চাতে কোন গূঢ় অভিসন্ধির আভাস মাত্রও পান নাই।

ফর্মিকিরা শান্তিনিকেতন আসিবার কয়েক দিন পরই লর্ড লীটন পুনরায় শান্তিনিকেতন পরিদর্শন করিতে আসেন (২৪ শে নভেম্বর)। দেশের কিছু পত্র-পত্রিকা ও বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলে এই লইয়া বেশ কিছুটা বিরূপ সমালোচনা চলে। রবীন্দ্র-জীবনীকার লিখিতেছেন,

..."তিনি (লর্ড লীটন) সিউড়িতে দরবার করিতে যাইতেছেন, পথে রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গেলেন—ইহা তাঁহার private visit। কবি যথারীতি অতিথি সৎকার করিলেন। ...এবারও আশ্রমে লীটন আসা লইয়া কোনো কোনো কাগজ-পত্রে কবির নিন্দাবাদ হয়। এমনকি রবীন্দ্রনাথ লিটনের সহিত একত্র আহার করিয়াছেন বলিয়াও তাহাদের কেহ কেহ কবির উপর বিরক্ত। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এ বিষয়ে লিখিতেছেন, 'রবিবাবুর সহিত

কলিকাতায় কথাপ্রসঙ্গে লাট-সাহেবের শান্তিনিকেতন দর্শন সম্বন্ধে তিনি যাহা বলেন, তাহা লিপিবন্ধ করিবার অনুমতি আমরা চাই নাই। অনুমতি থাকিলে প্রমাণ করা সহজ হইত যে, ঐ দর্শন-ব্যাপারটা তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু ছিল না। ইহার বেশি কিছু লিখিব না'।"

[ঐ-পৃঃ ১৭২]

লীটন শান্তিনিকেতন পরিদর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে কবি সাধারণ ভদ্রতা ও সৌজন্যের খাতিরে তাঁহাকে আমন্ত্রণ জানান। ইহাতে কবির উদার ও বলিষ্ঠ সৌজন্যবোধের পরিচয় পাইয়াছে, দেশের স্বদেশপাগল মানুষ সেদিন উহা ঠিক অনুধাবন করিতে পারে নাই। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার, লীটনের মত ক্ষুদ্র ইংরেজ কর্মচারীর তোষণ তো দূরের কথা, এই সময়ই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যনীতির তীব্র নিন্দা করিয়া কবি 'শূদ্রধর্ম" নামক প্রবন্ধটি (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৩২) রচনা করেন।

১৯২৫ সালের মে মাস হইতে চীনের জাপান, ইংরেজ প্রভৃতি বিদেশী অধিকৃত শিল্পাঞ্চলগুলিতে ব্যাপক শ্রমিক আন্দোলন দেখা গেল। মাসখানেক পরে দক্ষিণ-চীনে কুখ্যাত ও ভয়াবহ Shameen massacre অনুষ্ঠিত হয়। একজন ব্রিটিশ পুলিস অফিসারের আদেশে ভারতীয় শিখ সৈন্যবাহিনী সেদিনের এই নিরস্ত্র ছাত্র ও শ্রমিকদের বিক্ষোভ মিছিলের উপর নৃশংসভাবে গুলিবর্ষণ করে। সমগ্র চীনে জাপানী ব্রিটিশ পণ্য বয়কট ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং ভারতীয় সৈন্যদের সম্পর্কেও সেখানে তীব্র ঘৃণা ও নিন্দাবাদ হইতে থাকে। ব্রিটিশ সামরিক শক্তিও এই আসন্ন সংঘর্ষের সহিত মোকাবিলা করিবার জন্য রণতরীগুলিকে চীনের উপকূলে সমাবেশ ও সংগঠিত করিতে থাকে। এই সংবাদে রবীন্দ্রনাথ অধীর হইয়া ভারতীয় সৈন্যদের এই ঘৃণ্য দাসবৃত্তির তীব্রনিন্দাবাদ করিয়া 'শূদ্রধর্ম" প্রবন্ধটি রচনা করেন।

'শূদ্রধর্ম" বলিতে কবি ভারতীয়দের দাসবৃত্তি ও দাস-মনোবৃত্তিকেই বুঝাইতেছেন। এই দাসবৃত্তির বিস্তারিত সমালোচনা করিতে গিয়া তিনি লিখিতেছেন,

"এই শূদ্রপ্রধান ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড়ো দুর্গতির যে ছবি দেখতে পাই, সেই পরম আক্ষেপের কথাটা বলতে বসেছি।

"প্রথমবারে যখন জাপানের পথে হংকঙের বন্দরে আমাদের জাহাজ লাগল দেখলুম, সেখানে ঘাটে একজন পাঞ্জাবি পাহারাওয়ালা অতি তুচ্ছ কারণে একজন চৈনিকের বেণী ধরে তাকে লাথি মারলে। আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল। নিজের দেশে রাজভৃত্যের-লাঞ্ছনধারী কর্তৃক স্বদেশীর এ রকম অত্যাচার-দুর্গতি অনেক দেখেছি, দূর সমুদ্রতীরে গিয়েও তাই দেখলুম। দেশবিদেশে এরা শূদ্রধর্ম পালন করছে। চীনকে অপমানিত করবার ভার প্রভুর হয়ে এরা গ্রহণ করেছে, সে সম্বন্ধে এরা কোনো-বিচার করতেই চায় না, কেননা এরা শূদ্রধর্মের হাওয়ায় মানুষ। নিমকের সহজ দাবি যত দূর পৌঁছয় এরা সহজেই তাকে বহু-দূরে লঙ্ঘন করে যায়; তাতে আনন্দ পায়, গর্ব বোধ করে।

"চীনের কাছ থেকে ইংরেজ যখন হংকঙ কেড়ে নিতে গিয়েছিল, তখন এরাই চীনকে মেরেছে। চীনের বুকে এদেরই অস্ত্রের চিহ্ন অনেক আছে—সেই চীনের বুকে যে-চীন আপন হৃদয়ের মধ্যে ভারতবর্ষের বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন ধারণ করেছিল, সেই ইৎসিং হিউয়েনসাঙের চীন।"

পূর্ব এশিয়ার ও চীনের গণজাগরণকে নিষ্পেষিত করিবার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণের বিপুল সমরায়োজন ও ষড়যন্ত্রের তীব্র নিন্দাবাদ করিয়া কবি বলিলেন,

"মানববিশ্বের আকাশে আজ যুদ্ধের কালো মেঘ চার দিকে ঘনিয়ে এসেছে। এ দিকে প্যাসিফিকের তীরে ইংরেজের তীক্ষ্ণচঞ্চু খরনখরদারুণ শ্যেনতরণীর নীড় বাঁধা হচ্ছে। পশ্চিম মহাদেশে দিকে দিকে রব উঠেছে যে, এসিয়ার অস্ত্রশালায় শক্তিশেল তৈরি চলেছে, য়ুরোপের মর্মের প্রতি তার লক্ষ্য। রক্তমোক্ষণক্লান্ত পীড়িত এসিয়াও ক্ষণে ক্ষণে অস্থিরতার লক্ষণ দেখাচ্ছে। পূর্বমহাদেশের পূর্বতম প্রান্তে জাপান জেগেছে, চীনও তার দেওয়ালের চার দিকে সিঁধ কাটার শব্দে জাগবার উপক্রম করছে।...চীনের থলিঝুলি যারা ফুটো করতে লেগেছিল তারা চীনের এই চৈতন্যলাভকে য়ুরোপের বিরুদ্ধে অপরাধ বলেই গণ্য করবে। তখন এসিয়ার মধ্যে এই শূদ্র ভারতবর্ষের কী কাজ। তখন সে য়ুরোপের কামারশালায় তৈরি লোহার শিকল কাঁধে ক'রে নির্বিচারে তার প্রাচীন বন্ধুকে বাঁধতে যাবে। সে মারবে, সে মরবে।...ইংরেজসাম্রাজ্যের কোথাও সে সম্মান চায়ও না, পায়ও না; ইংরেজের হয়ে সে কুলিগিরির বোঝা ব'য়ে মরে, যে-বোঝার মধ্যে তার অর্থ নেই, পরমার্থ নেই; ইংরেজের হয়ে পরকে সে তেড়ে মারতে যায়, যে পর তার শত্রু নয়;...নিধনের অভাব হচ্ছে না; কিন্তু তার চেয়েও মানুষের বড়ো দুর্গতি আছে যখন সে পরের স্বার্থের বাহন হয়ে পরের সর্বনাশ করাকেই অনায়াসে কর্তব্য ব'লে মনে করে। অতএব এতে আশ্চর্যের কথা নেই যে, যদি দৈবক্রমে কোনো দিন ব্রিটানিয়া ভারতবর্ষকে হারায় তা হলে নিশ্বাস ফেলে বলবে: I miss my best servant."

[কালান্তর ॥ পৃঃ ২৫৪-২৫৬]

এই প্রবন্ধের উপসংহারে কবি চীনের ভারতীয় পুলিসের হাতে চীনবাসীদের অকথ্য লাঞ্ছনার একটি বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,

"সাংঘাই সহরে চীনীয়দের যে ধর্মঘট চল্‌ছে তা'র সম্বন্ধে একজন আমেরিকান লেখক আমেরিকার *The Nation* পত্রে একটি প্রতিবেদন পাঠিয়েছেন। তাতে একজন চীন ভদ্রলোকের যে সাক্ষ্য প্রকাশিত হয়েছে তা নিম্নে উদ্ধৃত করি:

"*A Chinese Graduate of Glasgow. His English is faultless. His labour library is the best I have seen in the East. His pictures are hung in international exhibitions.*

"I am a pacifist. But I shall tell you a story that will show you how I feel about this strike. It will show you how

hard it is to be a pacifist in China today.

"There is a park here in Shanghai which is paid for chiefly by Chineee tax-payers, but no Chinese person is allowed to enter it. One day I was walking by this park when I saw a Sikh policeman chase away a group of ricksha men from the gate, curse them and deliberately tip over one of the rickshas. He had lost his temper because one of the men had come too close to the forbidden territory. He took the license of one the ricksha men away from him while the poor fellow stood here in the road with the tears streaming down his face. I walked over to the Sikh policeman and said :

'If I were hired by the British to police India for them, I would never treat your countrymen as you are treating these ricksha men.'

He cooled down very quickly and was about to give the license back to the ricksha man when two Englishmen came up. They said to me :

'What are you doing here interfering with this policeman ? Don't argue with us. You have no business here. You're nothing but a damned Chinaman. Get out of here.'

They said to me in China."

[প্রবাসী-অগ্রহায়ণ, ১৩৩২, পৃ-২১৫]

চীন ভ্রমণান্তে কলিকাতায় ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলের সম্বর্ধনাসভায় কবি চীনে ভারতীয় শিখ পুলিসদের এই ধরণের ঘৃণ্য আচরণের তীব্র নিন্দাবাদ করেন (দ্রঃ প্রবাসী-কার্তিক-১৩৩১)। জুলাই মাসের শেষভাবে চীনের কাণ্টন-সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগের কমিশনার এক তার বার্তায় ভারতীয় সৈন্যদের চীনাদের বিরুদ্ধে নিয়োগ করিবার প্রতিবাদ জানাইবার জন্য গান্ধীজীকে অনুরোধ জানান। গান্ধীজী জবাবে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলেন, উহা খুবই দুঃখবহ ও অবমাননাকর এবং ভারতীয়দের আত্মকর্তৃত্ব থাকিলে তাহারা কখনও এমন অন্যায় বরদাস্ত করিত না (*Young India*-July 30-1925)। কিছুদিন পর এণ্ড্রুজ উহার প্রতিবাদে এক বিবৃতি দেন। তাহার অংশ বিশেষ এইরূপ :

"Editor of Unity,

Lately I have seen in the Chinese Newspapers, accounts of the massacre of young students which took place at Shanghai not on one day merely, but again and again. These have brought back to my memory the burning records of Amritsar and Jallianwalla Bag. The thing that burns most of all,

however, is the fact that British officers, were in charge of those who fired these bullets into the backs of a fleeing crowd of unarmed students, and that British officers in perpetrating this deed of shame. What can young China think, either of my own country, or of India, when such things are done with impunity ?"

[*Unity*-15 March 1926-p. 45]

এদিকে দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর স্বরাজ্যদলের মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিরোধ ও ভাঙন দেখা দেয়। ভিতর হইতে বাধাদানের উদ্দেশ্য ঘোষণা করিয়া স্বরাজ্যদল কাউন্সিলে প্রবেশ করে। কিন্তু তাম্বে, কেলকার, জয়াকর ও ডাঃ মুঞ্জে প্রমুখ স্বরাজ্যদলের একটি অংশ সরকারের সহিত সহযোগিতা ও মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পক্ষে ইচ্ছা প্রকাশ করিতে থাকেন। সাদা কথায়, এই নীতিকে বলা হইল 'Responsive Co-operation'

১৯২৫ সালের ডিসেম্বরের শেষভাগে, কানপুরে কংগ্রেসের ৪০-তম অধিবেশন। সভাপতিত্ব করেন, সরোজিনী নাইডু। রবীন্দ্রনাথ দেশকর্মীদের উদ্দেশে এক বাণী পাঠাইলেন,

"Direct your love and service to the cradle of your people where nature's milk has run dry—where joys are extinct and where life is on the wane ?"

শ্রীমতী নাইডু তাঁহার ভাষণে কবির এই বাণীর উদ্ধৃতি দিয়া অত্যন্ত আবেগময়ী ভাষায় দেশের দুঃখ-দৈন্য দূর করিবার জন্য দেশকর্মীদের আহ্বান জানান। কিন্তু কানপুর কংগ্রেসে স্বরাজ্যদলের ভাঙন চূড়ান্ত আকার ধারণ করিল। কেলকার-মুঞ্জে প্রমুখ 'রেস্‌পন্‌সিভিস্টরা' স্বরাজ্যদল ত্যাগ করিয়া নূতন এক উপদল সৃষ্টি করেন। মতিলালজী ইহাতে খুবই বিচলিত হইলেন। গান্ধীজী কংগ্রেসের এই আভ্যন্তরীণ বিরোধ হইতে দূরে থাকিয়া নিখিল ভারত চরকা সঙ্ঘের সাংগঠনিক কাজে মনোনিবেশ করিলেন। সরোজিনী তাঁহার ভাষণে, দেশবন্ধু উত্থাপিত 'এশিয়াটিক-ফেডারেশন' গঠনের, এবং বিশ্ব মৈত্রী ও বিশ্ব-শান্তির আদর্শের কথা ঘোষণা করিলেন বটে কিন্তু তবুও—'মানববিশ্বের আকাশে আজ যুদ্ধের কালো মেঘ চারদিকে ঘনিয়ে এসেছে',—কানপুর-কংগ্রেস বা তখনো পর্যন্ত কংগ্রেসের কোন সভামঞ্চে রবীন্দ্রনাথের মত এই সতর্কবাণী কোন নেতাকেই করিতে দেখা যায় না।

নন্‌-কো-অপারেশন ও বয়কট কবি সমর্থন করিতে পারেন নাই বলিয়া তিনি বিভিন্ন রাজনীতিক মহলের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। রোলাঁ উহার কারণ বুঝিতেন। তাই তিনি এক পত্রে কবির প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি জানাইয়া লিখিলেন, (২২ ডিসেম্বর ১৯২৫),

"This is undoubtedly the fate of those who speak to the universe, of those who do not shut themselves up within the

bounds of the enclosure (of the small country). You are too vait for it. Your very presence troubles the dwellers of this enclosure Who knows it better than I, an old Frenchman, held in my own country as a stranger !···For having defended during the war the highest soul of France, her genius for humanity, France denies me ; the Theatre Francais has just declared that they would never stage a work of the man who had written '*Au-dessus de la Meleé*'. (Above the battle]. Such is the law, ironical and tragic. He who wishes to save his people is an enemy of the people, as is said in the beautiful play by Ibsen.

"I think that we, the men 'above the battles', we are the greatest fighters, the eternal fighters. Our war knows no compromise, no truce, no treaty !"···

[*Rolland and Tagore*-pp. 55-56.]

১৯২৬ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা দিবার আমন্ত্রণ আসে। ঐ সঙ্গে অধ্যাপক তুচি ও ফর্মিকিকেও আমন্ত্রণ জানান হয়। ৫ই ফেব্রুয়ারী কবি সদলবলে পূর্ববঙ্গের পথে যাত্রা করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কবি পর পর তিনদিন বক্তৃতা করেন। ইহার মধ্যে '*The Philosophy of Art*' ও '*The Rule of the Giant*' উল্লেখযোগ্য ভাষণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতার পর কবি পূর্ববঙ্গের কয়েকটি এলাকায় পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে কুমিল্লার 'অভয়াশ্রমে' আসিলেন। এখানে তিনি গঠনমূলক গ্রামোন্নয়ন কার্য পরিদর্শন করিয়া আশ্রমের কয়েকটি অনুষ্ঠানেও উপস্থিত থাকেন। মার্চের প্রথমভাগে কবি পূর্ববঙ্গ পরিক্রমা শেষ করিয়া কলিকাতা হইয়া শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন।

অল্পকাল পরেই সামান্য একটি ঘটনা উপলক্ষ করিয়া কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ২রা এপ্রিল মসজিদের সম্মুখে আর্যসমাজীদের ধর্মীয় উৎসবমিছিলের বাজনা বাজানলইয়া এই দাঙ্গা শুরু হয়। কয়েকদিন পরেই কৃষ্ণনগরে (নদীয়া) বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে দেশবন্ধুর 'হিন্দু মুসলিম-প্যাক্ট' বাতিল হইয়া যায়। উল্লেখযোগ্য, এই সম্মেলনেই কবি নজরুল স্বয়ং 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাপার' গানটি উদ্বোধন সঙ্গীত গাহিয়াছিলেন।

কলিকাতায় দাঙ্গার সংবাদে কবি বিচলিত হইয়া শান্তিনিকেতন হইতে প্রমথ চৌধুরীকে এক পত্রে লিখিতেছেন, (৬ই এপ্রিল ১৯২৬)

"হিন্দু মুসলমান সমস্যার কূল পাওয়া যায় না। লাঠালাঠির দ্বারা কোন জিনিষের সমাধান হয় না। যে রীতিমত জ্ঞান-শিক্ষার দ্বারা ধর্মান্ধতার আরোগ্য

ঘটে তা ছাড়া উপায় নেই। য়ুরোপেও এককালে এই বিপদ ছিল, তারা কেবল শিক্ষা দ্বারা মনের বিকার ঘুচিয়ে তবে উদ্ধার পেয়েছে। আমাদের ৩৩ কোটিকে তেমন শিক্ষা কবে দেবে, কে দেবে ?”

[চিঠিপত্র-৫'ম খণ্ড ॥ পৃ ২৮১]

কয়েকদিন পরে শান্তিনিকেতন আশ্রমে এক ভাষণে কবি গভীর দুঃখে ও আক্ষেপে বলিলেন,

“আমরা নাকি ধর্মপ্রাণ জাতি !…

…তাইতো আজ দেখচি ধর্মের নামে পশুত্ব দেশ জুড়ে বসেছে। বিধাতার নাম নিয়ে একে অন্যকে নির্মম আঘাতে হিংস্র পশুর মতো মারচে। এই কি হ'ল ধর্মের চেহারা !…

এই মোহমুগ্ধ ধর্মবিভীষিকার চেয়ে সোজাসুজি নাস্তিকতা অনেক ভালো। …আজ তার এই মিছে ধর্মকে পুড়িয়ে ফেলে ভারত যদি খাঁটিধর্ম, খাঁটি আস্তিকতা পায় ; তবে ভারত সত্যিই নবজীবন লাভ করবে। নাস্তিকতার আগুনে তার সব ধর্মবিকারকে দগ্ধ করা ছাড়া, একেবারে নূতন ক'রে আরম্ভ করা ছাড়া আর কী পথ আছে, বুঝতে তো পাচ্ছিনে।”…

[প্রবাসী-১৩৩৩ আষাঢ় ॥ পৃ-৪১৬-১৭]

বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন বেদনাহত কবি রচনা করিলেন তাঁহার অমর শান্তি-সঙ্গীত, 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী' (২৫ বৈশাখ-১৩৩৩)

“ক্রন্দনময় নিখিলহৃদয় তাপদহনদীপ্ত।
বিষয়বিষ বিকারজীর্ণ খিন্ন অপরিতৃপ্ত।
দেশ দেশ পরিল তিলক রক্তকলুষগ্লানি,
তব মঙ্গলশঙ্খ আন' তব দক্ষিণপাণি—
তব শুভসংগীতরাগ, তব সুন্দর ছন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর' কলঙ্কশূন্য।”

'হিংসা উন্মত্ত পৃথিবর' রক্ত-কলুষ-গ্লানির নিরতিশয় দুঃখ ও বেদনার অভিঘাতে কবি এই সময়ই 'নটীর পূজা' নৃত্য-নাট্যটি রচনা করেন। শান্তিনিকেতনেই উহার প্রথম গীতাভিনয় হয়। উহার কয়েকদিন পরই 'ধর্মমোহ' কবিতাটি লিখিলেন, (৩১শে বৈশাখ, ১৩৩৩),

“ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সে-জন মারে আর শুধু মরে।
* * * *
বিধর্ম বলি মারে পরধর্মেরে,
নিজ ধর্মের অপমান করি ফেরে,
পিতার নামেতে হানে তাঁর সন্তানে,

আচার লইয়া বিচার নাহিকো জানে,
পূজাগৃহে তোলে রক্তমাখানো ধ্বজা,—
দেবতার নামে এ যে শয়তান ভজা।
*   *   *   *
যে-পূজার বেদি রক্তে গিয়েছে ভেসে
ভাঙো ভাঙো, আজি ভাঙো তারে নিঃশেষে,—
ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো,
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।"
[রবীন্দ্ররচনাবলী-১৫'শ খণ্ড ॥ পৃ ২৮৪-৮৫]

স্মরণীয়, এই সময় এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে নজরুলের কাব্যেও প্রচণ্ড বিদ্রোহাত্মক সংগ্রামের সুর ধ্বনিত হইতে থাকে। কলিকাতার এই দাঙ্গার সময় নজরুল 'পথের দিশা' ও 'হিন্দু মুসলিম যুদ্ধ' শীর্ষক কবিতা দুইটি রচনা করেন। ইহার প্রায় তিন বৎসর পূর্বে নজরুল 'জাতের বজ্জাতি' গানটি রচনা (শ্রাবণ, ১৩৩০) করেন।

"জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেল্‌ছ জুয়া
ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয় তো মোয়া ॥
হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি, ভাব্‌লি এতেই জাতির জান,
তাইত বেকুব, কর্‌লি তোরা এক জাতিকে একশ' খান!
এখন দেখিস্ ভারত-জোড়া
প'চে আছিস্ বাসি মড়া,
মানুষ নাই আজ, আছে শুধু জাত-শেয়ালের হুক্কাহুয়া ॥

'পথের দিশা'য় লিখিলেন,

"নরনারী আজ কণ্ঠ ফেড়ে কুৎসা-গানের কোরাস্ ধ'রে,
ভাবছে তারা সুন্দরেরই জয়ধ্বনি কর্‌ছে জোরে?
এর মাঝে কি খবর পেলি নব-বিপ্লব-ঘোড়সওয়ারী
আসছে কেহ? টুটল তিমির, খুল্‌ল দুয়ার পূব-দুয়ারী?
ভগবান আজ ভূত হ'ল যে প'ড়ে দশ-চক্র ফেরে,
যবন এবং কাফের মিলে হায় বেচারায় ফির্‌ছে তেড়ে!
বাঁচাতে তায় আস্‌ছে কি রে নতুন যুগের মানুষ কেহ
ধুলায় মলিন, রিক্তাভরণ, সিক্ত আঁখি, রক্তদেহ?
মস্‌জিদ আর মন্দির ঐ শয়তানদের মন্ত্রণাগার,
রে অগ্রদূত, ভাঙতে এবার আসছে কি জাঠ কালাপাহাড়?
জানিস যদি, খবর শোনা বন্ধ খাঁচার ঘেরাটোপে,
উড়ছে আজো ধর্ম-ধ্বজা টিকির গিঁঠে দাড়ির ঝোপে!"

এই দাঙ্গার বিষাক্ত পরিবেশেও নজরুল আশার আলো দেখিতে পান। তাই 'হিন্দু মুসলিম যুদ্ধ' কবিতার উপসংহারে বলিলেন,

"যে-লাঠিতে আজ টুটে গম্বুজ পড়ে মন্দির চূড়া,
সেই লাঠিতে কালি প্রভাতে করিবে শত্রু-দুর্গ গুঁড়া!
প্রভাতে হবে না ভায়ে ভায়ে রণ,
চিনিবে শত্রু চিনিবে স্বজন।
করুক কলহ—জেগেছে ত তবু—বিজয়-কেতন উড়া!
ল্যাজে তোর যদি লেগেছে আগুন, স্বর্ণলংকা পুড়া!"

কানপুর কংগ্রেস অধিবেশনে গান্ধীজী কোন বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন নাই। ১৯২৬ সালের শুরু হইতেই তিনি শুধুমাত্র নিখিল ভারত চরকা সঙ্ঘের সাংগঠনিক কার্যে নিয়োজিত থাকিবার সংকল্প ঘোষণা করিলেন। এপ্রিলের শেষভাগে সবরমতী আশ্রমে গান্ধীজীর মধ্যস্থতায় স্বরাজ্যদলের ও রেস্‌পনসিভিষ্ট-নেতৃবৃন্দের মধ্যে সাময়িক একটি আপোষের চেষ্টা হয়।

অপরদিকে বাংলায় সন্ত্রাসবাদ ও কমিউনিষ্ট আন্দোলন পাশাপাশি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৯২৫ সালের শেষভাগে 'কাকোরী-ষড়যন্ত্র মামলা' ও 'দক্ষিণেশ্বর-বোমার মামলা' শুরু হয়। ১৯২৪ সালে 'কানপুর কমিউনিষ্ট ষড়যন্ত্র মামলা' হয়। রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের সাফল্যে এদেশে ইতিমধ্যেই কমিউনিষ্ট চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ লাভ করিতে থাকে। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও এস এ ডাঙ্গে প্রমুখের নেতৃত্বে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। ১৯২৫ সালের শেষভাগে বাংলাদেশে হেমন্তকুমার সরকার, কুতবউদ্দীন আহ্‌মদ্‌, শামসুদ্দীন হোসায়ণ, ও বিদ্রোহী কবি নজরুলের উদ্যোগে 'লেবার স্বরাজ পার্টি' (*The Labour Swaraj Party of the Indian National Congress*) গঠিত হয়। কানপুর ষড়যন্ত্র মামলায় কারাদণ্ডভোগের অবসানের পরে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ইঁহাদের সহিত মিলিত হ'ন। বলা বাহুল্য উঁহারা অনেকেই ছিলেন প্রচ্ছন্ন কমিউনিস্ট অথবা কমিউনিস্ট পার্টির খুব কাছের লোক। ২৫ শে ডিসেম্বর এই সঙ্ঘের মুখপত্র 'লাঙল' পত্রিকা প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম সংখ্যাতেই নজরুলের বিখ্যাত 'সাম্যবাদী' কবিতাটি এবং দ্বিতীয় সংখ্যায় 'কৃষকের গান' কবিতাটি বাহির হয়। উল্লেখযোগ্য, এই 'লাঙল' পত্রিকায় নজরুলের অনুরোধক্রমে রবীন্দ্রনাথ ঐ পত্রিকার জন্য দুই পংক্তি লিখিয়া দেন,

"ধর হাল বলরাম আন তব মরু-ভাঙা হল
বল দাও ফল দাও স্তব্ধ হোক ব্যর্থ কোলাহল।"

উহা ঐ পত্রিকার প্রচ্ছদপটে প্রকাশিত হয়। কৃষ্ণনগরে প্রাদেশিক কংগ্রেস (১৯২৬) সম্মেলনের পরই 'লেবার স্বরাজ পার্টির' এক অধিবেশন হয়। বিখ্যাত সাহিত্যিক ডঃ নরেশ সেনগুপ্ত উহার সভাপতিত্ব করেন। এই সম্মেলনে 'লেবার স্বরাজ পার্টির' নাম পরিবর্তন করিয়া 'বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিকদল' রাখা হয়। পরে উহা 'ওয়ার্কাস এ্যাণ্ড পেজাণ্ট্‌স্‌ পার্টি অব বেঙ্গল' নামে পরিচিত হয়। বলা বাহুল্য নানা প্রচার পুস্তিকা ও মুখপত্রের মাধ্যমে বাংলার উৎপীড়িত শ্রমিক ও কৃষকদের সচেতন ও সঙ্ঘবদ্ধ করিবার চেষ্টা চলিতে থাকে।

কিন্তু শুধু কমিউনিস্টরাই নহে, সম্মুখে নভেম্বর মাসে কাউন্সিল নির্বাচন থাকায় স্বরাজ্যদল ও মুস্‌লিম সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলি কৃষকদের দুঃখ দৈন্য

দূর করিবার কথা বলিতে থাকে। এই সময় 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের' (১৮৮৫ খৃঃ) কিছু সংস্কারের কথা উঠে। কয়েকমাস পূর্বে 'প্রজাস্বত্ব' ৮ আইনের সংশোধন পূর্বক কয়েকটি ধারা সংযোজিত হইয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা হইতে 'সিলেক্ট কমিটিতে' প্রেরিত হয়। উহার ৩ ধারা ৩ উপধারায় বর্গাদারদের জোত স্বত্ব-দেওয়ার আশ্বাস-ইঙ্গিত থাকে। ফলে জোতদার ও কায়েমীস্বত্বভোগীরা উহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও আপত্তি করিতে থাকে।

উল্লেখযোগ্য কয়েক বৎসর পূর্বে প্রমথ চৌধুরী 'রায়তের কথা' নামক মূল নিবন্ধটি 'সবুজপত্র'এ (ফাল্গুন চৈত্র ১৩২৬) প্রকাশিত হয়।

প্রমথ চৌধুরী তাঁহার 'রায়তের কথা' পুস্তিকার টীকায় বলেন,

…"আমি 'রায়তের কথা'য় বাংলার রায়তরা যাতে peasant proprietor হয়ে উঠতে পারে সেই প্রস্তাবই করেছি। এতে শুধু প্রজার নয় সমাজেরও মঙ্গল হবে। আমি রায়তের পক্ষ থেকে যে-সব ছোটোখাটো অধিকারের দাবি করেছি সে-সব অধিকার লাভ করলে বাংলার রায়তের দল peasant proprietorship-এর দিকে আর-একটু অগ্রসর হবে।…

…"আমি অবাধ হস্তান্তরের পক্ষপাতী এই কারণে যে হস্তান্তর করবার অধিকার হচ্ছে ইংরেজিতে যাকে বলে proprietary right এবং সে right আমার মতে যে জমি চষে তার থাকা উচিত। সে চাষী ক অথবা খ তাতে কিছু যায় আসে না।"…

কিন্তু প্রশ্ন উঠে, দেশের তৎকালীন পরিস্থিতিতে রায়তকে জমির স্বত্বাধিকার প্রদান করিলে সে জমি ঋণভারগ্রস্ত চাষীর নিকট হইতে মহাজন-জোতদারের কবলায়িত হইবার সম্ভাবনা নাই কি? প্রমথ চৌধুরী উহার জবাবে লিখিলেন,

"যদি কেউ বলেন যে, চাষী প্রজা যে জোত হস্তান্তর করে সে দেনার দায়ে আর সেই সূত্রে মহাজন জোতদার হয়ে ওঠে, তাহলে বলি জোত খালি মহাজনের দেনার দায়ে বিক্রি হয় না, জমিদারের বাকি খাজানার দায়েও বিক্রি হয়, আর তখন তা হয় সম্পূর্ণ নির্দয়রূপে। সুতরাং জমির কেনাবেচা যেমন চলছে তেমনি চলবেই,—মহাজন নামক ক্যাপিটালিস্টের হাত থেকে রায়তী জোত আইনত রক্ষা করতে চেষ্টা করলেও জমিদার নামক ক্যাপিটালিস্টের হাত থেকে তাকে রক্ষা করা যাবে না।

"এ ক্ষেত্রে আমি মনে করি, সেই রকম আইন হওয়া উচিত যাতে জমিদারের হাত থেকে জোতদারের হাতে গেলে রায়তের স্বত্ব-স্বামিত্ব খর্ব না হয়। মধ্য-স্বত্বকে খর্ব করাই তার উপায়। কী করে তা করা যাবে তার সন্ধান উকিল-বাবুদের কাছে পাওয়া যাবে।"

[রায়তের কথা ।। পৃঃ-১৯-২৫]

এই সময় তিনি রবীন্দ্রনাথকে মূল নিবন্ধটি সম্পর্কে মতামত জানাইবার অনুরোধ করিলে কবি 'রায়তের কথা' নামক প্রবন্ধে ঐসম্পর্কে বিস্তারিত সমালোচনা করিয়া তাঁহার মতামত ব্যক্ত করেন (১৮ই বৈশাখ-১৩৩৩—সবুজপত্র-আষাঢ় ১৩৩৩)। প্রবন্ধের ভূমিকাতেই কবি লিখিলেন,

"আমাদের শাস্ত্রে বলে, সংসারটা ঊর্ধ্বমূল অবাক্‌শাখ। উপরের দিক থেকে এর শুরু, নীচে এসে ডালপালা ছড়িয়েছে ; অর্থাৎ নিজের জোরে দাঁড়িয়ে নেই, উপরের থেকে ঝুলছে। তোমার 'রায়তের কথা' পড়ে আমার মনে হল যে, আমাদের পলিটিকস্‌ও সেই জাতের। কন্‌গ্রেসের প্রথম উৎপত্তিকালে দেখা গেল, এই জিনিসটি শিকড় মেলেছে উপরওয়ালাদের উপর-মহলে—কি আহার কি আশ্রয় উভয়েরই জন্যে এর অবলম্বন সেই ঊর্ধ্বলোকে।

"যাঁদের আমরা ভদ্রলোক বলে থাকি তাঁরা স্থির করেছিলেন যে, রাজপুরুষে ও ভদ্রলোকে মিলে ভারতের রাজগদি ভাগাভাগি করে নেওয়াই পলিটিক্‌স্‌। সেই পলিটিক্‌সে যুদ্ধবিগ্রহ সন্ধিশান্তি উভয় ব্যাপারই বক্তৃতামঞ্চে ও খবরের কাগজে, তার অস্ত্র বিশুদ্ধ ইংরেজি ভাষা—কখনো অনুনয়ের করুণ কাকলি, কখনো বা কৃত্রিম কোপের উত্তপ্ত উদ্দীপনা। আর দেশে যখন এই প্রগল্‌ভ বাগ্‌বাত্যা বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বস্তরে বিচিত্র বাষ্পলীলা রচনায় নিযুক্ত তখন দেশের যারা মাটির মানুষ তারা সনাতন নিয়মে জন্মাচ্ছে মরছে, চাষ করছে, কাপড় বুনছে, নিজের রক্তে মাংসে সর্বপ্রকার শ্বাপদ-মানুষের আহার জোগাচ্ছে, যে দেবতা তাদের ছোঁয়া লাগলে অশুচি হন মন্দিরপ্রাঙ্গণের বাইরে সেই দেবতাকে ভুমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করছে, মাতৃভাষায় কাঁদছে, হাসছে, আর মাথার উপর অপমানের মুষলধারা নিয়ে কপালে করাঘাত করে বলছে 'অদৃষ্ট'। দেশের সেই পোলিটিশান্‌ আর দেশের সর্বসাধারণ উভয়ের মধ্যে অসীম দূরত্ব।"

কবি আরও বলিলেন

…"অর্থাৎ, আমাদের আধুনিক পলিটিক্‌সের শুরু থেকেই আমরা নির্গুণ দেশপ্রেমের চর্চা করেছি, দেশের মানুষকে বাদ দিয়ে।

"এই নিরুপাধিক প্রেমচর্চার অর্থ যাঁরা জোগান তাঁদের কারও বা আছে জমিদারি, কারও বা আছে কারখানা ; আর শব্দ যাঁরা জোগান তাঁরা আইন-ব্যবসায়ী। এর মধ্যে পল্লীবাসী কোনো জায়গাতেই নেই ;…যদি দেওয়ানি অবাধ্যতা চলত তা হলে তাদের ডাকতে হত বটে, সে কেবল খাজনা বন্ধ করে মরবার জন্যে ; আর যাদের অদ্যভক্ষ্য-ধনুর্গুণ তাদের এখনো মাঝে মাঝে ডাক পাড়া হয় দোকান বন্ধ করে হরতাল করবার জন্যে, উপরওয়ালাদের কাছে আমাদের পোলিটিকাল বাঁকা ভঙ্গিটাকে অত্যন্ত তেড়া করে দেখাবার উদ্দেশ্যে।

"এই কারণেই রায়তের কথাটা মুলতুবিই থেকে যায়। আগে পাতা হোক সিংহাসন, গড়া হোক মুকুট, খাড়া হোক রাজদণ্ড, ম্যাঞ্চেস্টার পরুক কোপ্‌নি —তার পর সময় পাওয়া যাবে রায়তের কথা পাড়বার। অর্থাৎ দেশের পলিটিকস্‌ আগে, দেশের মানুষ পরে।…

[কালান্তর ॥ পৃ ২৯১-৯৩]

কংগ্রেসের রাজনীতি ও নেতৃত্বের শ্রেণী-চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এতখানি নির্ভীক সত্যভাষণ তদানীন্তন বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদ্‌দের আর কয়জনের পক্ষে সম্ভব হইয়াছে ! দুর্ভাগ্যের বিষয়, ভারতের জাতীয় আন্দোলনে দেশের সমাজ-অর্থনীতির প্রধান কথা—সেই কৃষক—সেই রায়তের সমস্যা সম্পর্কে

কংগ্রেসী-রাজনীতির উপেক্ষা ও চরম ঔদাসীন্য তো খুবই সুবিদিত ঘটনা। এমনকি অসহযোগ আন্দোলনেও এই বিপুল গ্রামবাসী কৃষক জনসাধারণকে যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-সাধনের অস্ত্র বা যন্ত্র হিসাবেই ব্যবহার করিয়া লইবার প্রচেষ্টা চলে, কবি তাহাও উল্লেখ করিতে ছাড়িলেন না। এমন কি গান্ধীজীর রাজনীতিতেও তখনও পর্যন্ত রায়তের জমির স্বত্বস্বামীত্ব সমস্যা (সঠিক অর্থে) কোন স্থান পায় নাই। উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথ যখন এই প্রবন্ধ লিখিতেছেন ঠিক সেই সময়ই গান্ধীজী 'জাতীয় সপ্তাহ' উদ্‌যাপন উপলক্ষে চরকার অভিযান ব্যাপকতর করিবার আহ্বান জানাইয়া ছাত্রদের বলিতেছেন,

"Certainly the spinning wheel is greater than myself. With it, in my opinion, is mixed up the well-being of the whole mass of Indian humanity. The pupils should, therefore, learn something about the deep poverty of the masses. They should have an ocular demonstration of some villages that are crumbling down to pieces ···They should learn to identify themselves with the poor and the downtrodden in the land. They should be taught to deny themselves, so far as possible, the things that the poorest cannot have. Then they will understand the virtue of hand-spinning.···The cause of the spining wheel is too great and too good to have to rest on mere hero-worship. It lends itself to scientific economic treatment." [*Mahatma-Vol.* II-pp.-228-29.]

ইহা হইতেই গান্ধীজীর তৎকালীন আর্থনীতিক-চিন্তার বৈশিষ্ট্যটি পরিষ্কার বোঝা যায়। গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের আর্থনীতিক চিন্তার মূল উৎস ও পার্থক্য কোথায়, পূর্বেই উহা বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ কৃষকের এবং কৃষি সমস্যাকেই আমাদের রাজনীতির মূল ভিত্তি করিবার কথা বলিতেছিলেন; তাই প্রমথ চৌধুরীকে রহস্যচ্ছলে বলিলেন,

"এই-সব কারণে আমাদের পলিটিক্‌সে তোমার 'রায়তের কথা' স্থানকাল-পাত্রোচিত হয়েছে কি না সন্দেহ করি। তুমি ঘোড়ার সামনের দিকে গাড়ি জোৎবার আয়োজনে যোগ দিচ্ছ না; শুধু তাই নয়, ঘোড়াটাকে জোৎবার উদ্‌যোগ বন্ধ রেখে খবর নিতে চাও সে দানা পেলে কি না, ওর দম কতটুকু বাকি।···তোমার 'রায়তের কথা' সেই ঘোড়ার কথা, যাকে বলা যেতে পারে গোড়ার কথা।"

কবি ইউরোপের বিভিন্ন রাজনীতিক ভাবাদর্শ ও তত্ত্বকে যান্ত্রিকভাবে অনুকরণের বিরোধী ছিলেন। 'লেবার স্বরাজ পার্টি' ও 'ওয়ার্কার্স এ্যাণ্ড পেজেণ্টস্‌ পার্টি'র' কমিউনিস্টদের উদ্যোগে এই সময় মার্কসবাদী, লেনিনবাদী রাজনীতিক ভাবাদর্শের প্রচার শুরু হয় এবং তাঁহাদের প্রচারপত্র ও মুখপত্রের মাধ্যমে শ্রেণী সংগ্রাম ও বিপ্লবাত্মক ভাবধারার প্রচার চলে।

মার্কসবাদ বা সোস্যালিজম, কমিউনিজম রবীন্দ্রনাথ যথাযথভাবে পড়েন নাই—জানিতেনও না ঠিকভাবে, কী জিনিস। তবে ঐসব দলের নেতাদের দু-এক জনের সহিত কবির পরিচয় ও যোগাযোগ ছিল। উহাদের প্রচার-পুস্তিকা কিছু কিছু হয়ত ঘটনাক্রমে তাঁহার নজরে পড়ে। বলা বাহুল্য, তৎকালীন কমিউনিস্টদের অতি-উগ্র জঙ্গী ভাব কবি গ্রহণ করিতে পারেন নাই এবং তাঁহাদের তৎকালীন ও যান্ত্রিক চিন্তাধারাও কবিকে সন্তুষ্ট বা প্রভাবিত করিতে পারে নাই। তাই কবি ইঁহাদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,

"কিন্তু ভাবনার কথা এই যে, বর্তমান কালে এক দল জোয়ান মানুষ রায়তের দিকে মন দিতে শুরু করেছেন। সব-আগে তাঁরা হাতের গুলি পাকাচ্ছেন।…আমাদের মন যখন অত্যন্ত আড়ম্বরে স্বাদেশিক হয়ে ওঠে তখনো দেখা যায়, সেই আড়ম্বরের সমস্ত মালমসলার গায়ে ছাপ মার আছে 'Made in Europe'। য়ুরোপে প্রকৃতিগত ও অবস্থাগত কারণের স্বাভাবিক বেগে মানুষ সোস্যালিজ্‌ম, কম্যুনিজ্‌ম, সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্‌ প্রভৃতি নানাপ্রকার সামাজিক পরিবর্তনের পরখ করছে। · এবার পূর্ববঙ্গে গিয়ে দেখে এলুম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুশাঙ্কুরের মতো ক্ষণভঙ্গুর সাহিত্য গজিয়ে উঠছে। তারা সব ছোটো ছোটো এক-একটি রক্তপাতের ধ্বজা। বলছে, 'পিষে ফেলো, দলে ফেলো।' অর্থাৎ ধরণী নির্জমিদার নির্মহাজন হোক।…

"…আজ তাই যখন শুনে এলুম সাহিত্যে ইশারা চলছে 'মহাজনকে লাগাও বাড়ি, জমিদারকে ফেলো পিষে,' তখনি বুঝতে পারলুম, এই লালমুখো বুলির উৎপত্তি এদের নিজের রক্তের থেকে নয়। এ হচ্ছে বাঙালির অসাধারণ নকলনৈপুণ্যের নাট্য, ম্যাজেন্টা রঙে ছোবানো।" ‥

[কালান্তর ॥ পৃ ২৯৩-৯৭]

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের মত কবির পক্ষে কমিউনিস্ট-রাজনীতির শ্রেণী সংঘর্ষ ও রক্তাক্ত বিপ্লবের আদর্শ গ্রহণ বা স্বীকার করা সম্ভব নয়। খুব সম্ভবত এই সময় নজরুলের 'রুদ্র-মঙ্গল' গ্রন্থখানি কবির নজরে পড়ে। 'রুদ্র-মঙ্গলের' ভাষা ও রচনাভঙ্গীর একটি নমুনা দিই,

"জাগো জনশক্তি! হে আমার অবহেলিত পদপিষ্ট কৃষক, আমার মুটে-মজুর ভাইরা! তোমার হাতের ঐ লাঙল আজ বলরাম-স্কন্ধে হলের মত ক্ষিপ্ত তেজে গগনের মাঝে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠুক, এই অত্যাচারীর বিশ্ব উপড়ে ফেলুক—উলটে ফেলুক! আন তোমার হাতুড়ি, ভাঙ ঐ উৎপীড়কের প্রাসাদ—ধুলায় লুটাও অর্থপিশাচ বলদর্পীর শির। ছোড়ো হাতুড়ি, চালাও লাঙল, উচ্চে তুলে ধর তোমার বুকের রক্তমাখা লালে-লাল ঝাণ্ডা।"

নজরুলের রচনার এই ভাব-ভাষা ও ভঙ্গী তৎকালীন প্রগতিশীল যুব-সম্প্রদায়ের আদর্শ-স্থানীয় হইয়া উঠে এবং স্থানীয় ও আঞ্চলিক পত্র-পত্রিকায় উহার ব্যর্থ-অনুকরণেরও প্রয়াস দেখা যায়। পূর্ববঙ্গে এই সব পত্র-পত্রিকারও কয়েকটি হয়ত রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়ে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জমিদারী প্রথাকে কখনও সমর্থন করেন নাই। এই

প্রবন্ধেও সুস্পষ্টভাবে তিনি জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করিয়া বলিলেন,

—"জমিদার প্যারাসাইট্।"

রায়তের হাতে জমির স্বত্বাধিকার দেওয়ার প্রশ্নেও তিনি প্রমথ চৌধুরীর সহিত একমত। কিন্তু তাঁহার প্রশ্ন, রায়তের হাতে জমির স্বত্বাধিকার দিলে বিশেষত, দেশের তৎকালীন অবস্থার পরিপেক্ষিতে সে জমি রায়ত রাখিতে পারিবে তাহার নিশ্চয়তা কোথায় ?

…"তুমি বলেছ, জমি চাষ করে যে জমি তারই হওয়া উচিত। কেমন করে তা হবে জমি যদি পণ্যদ্রব্য হয়, যদি তার হস্তান্তরে বাধা না থাকে ?…

"জমি যদি খোলা বাজারে বিক্রি হয়ই তা হলে যে ব্যক্তি স্বয়ং চাষ করে তার কেনবার সম্ভাবনা অল্পই ; যে লোক চাষ করে না কিন্তু যার আছে টাকা, অধিকাংশ বিক্রয়যোগ্য জমি তার হাতে পড়বেই। জমির বিক্রয়ের সংখ্যা কালে কালে ক্রমেই যে বেড়ে যাবে, একথাও সত্য। কারণ, উত্তরাধিকারসূত্রে জমি যতই খণ্ড খণ্ড হতে থাকবে, চাষির সাংসারিক অভাবের পক্ষে সে জমি ততই অল্পস্বত্ব হবেই ; কাজেই অভাবের তাড়ায় খরিদ-বিক্রি বেড়ে চলবে। এমনি করে ছোটে ছোটো জমিগুলির স্থানীয় মহাজনের বড়ো বড়ো বেড়াজালের মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে ধরা পড়ে। তার ফলে জাঁতার দুই পাথরের মাঝখানে গোটা রায়ত আর বাকি থাকে না।…

…"মনে করো, আজ কোনো কারণে বাংলার উৎপন্ন ফসলের প্রতি যদি মাড়োয়ারি দখল-স্থাপনের উদ্দেশে ক্রমশ প্রজার জমি ছিনিয়ে নিতে ইচ্ছা করে, তা হলে অতি সহজেই সমস্ত বাংলা তারা ঘানির পাকে ঘুরিয়ে তার সমস্ত তেল নিংড়ে নিতে পারে।"

তাই তিনি বলিলেন,

"মূল কথাটা এই—রায়তের বুদ্ধি নেই, বিদ্যা নেই, শক্তি নেই, আর ধন-স্থানে শনি। তারা কোনোমতে নিজেকে রক্ষা করতে জানে না। তাদের মধ্যে যারা জানে তাদের মতো ভয়ংকর জীব আর নেই। রায়তখাদক রায়তের ক্ষুধা যে কত সর্বনেশে তার পরিচয় আমার জানা আছে।…জাল-জালিয়াতি, মিথ্যা-মকদ্দমা, ঘর-জ্বালানো, ফসল-তছরূপ—কোনো বিভীষিকায় তাদের সংকোচ নেই। জেলখানায় যাওয়ার মধ্যে দিয়ে তাদের শিক্ষা পাকা হয়ে উঠতে থাকে। আমেরিকায় যেমন শুনতে পাই ছোটো ছোটো ব্যবসাকে গিলে ফেলে বড়ো বড়ো ব্যবসা দানবাকার হয়ে ওঠে, তেমনি করেই দুর্বল রায়তের ছোটো ছোটো জমি ছলে বলে কৌশলে আত্মসাৎ করে প্রবল রায়ত ক্রমে জমিদার হয়ে উঠতে থাকে।"…[ঐ ॥ পৃঃ ২৯৮-৩০০]

রবীন্দ্রনাথের বাস্তবজ্ঞান,—অর্থাৎ গ্রামের কৃষকজীবনের খুঁটিনাটি জটিল সমস্যার সঙ্গে কত বিস্তারিত পরিচয় ও অভিজ্ঞতা ছিল, এই প্রবন্ধই তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। বাংলাদেশের মহাজন ও জোতদার শ্রেণীর হাতে কীভাবে ছোটো রায়তের সমস্ত জমি দ্রুত কেন্দ্রীভূত হইতেছে তাহা তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ-

আর সঙ্গে বিশ্লেষণ করিয়া সতর্কবাণী করিলেন, এই সব বৃহৎ রায়ত ও মহাজনদের হাত হইতে রায়তদের রক্ষা করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। কবি বলিলেন, জমিদার ও মহাজন জোতদার যেন জাঁতার দুই পাথর, এরই মাঝখানে পড়িয়া ক্ষুদ্র রায়ত চাষী পিষ্ট হইয়া মরিতেছে। কিন্তু তবুও মহাজনের শোষণের রূপ আরো কদর্য, আরো নৃশংস ও ভয়াবহ। তাই তিনি বলিলেন "চাষির পক্ষে জমিদারের মুষ্টির চেয়ে মহাজনের মুষ্টি অনেক বেশি কড়া"—। তিনি নীতিগতভাবে জমিতে রায়তের স্বত্বাধিকার স্বীকার করিয়া লইতেছেন, "এক সময়ে সেই অধিকার তাদের দিতেই হবে, কিন্তু এখন দিলে কি সেই অধিকারের কিছু বাকি থাকবে?"—অর্থাৎ কবির বক্তব্য এই যে, চাষীকে ঐ সাথে মহাজনের হাত হইতে রক্ষা করিবার যদি আইনানুগ কোন ব্যবস্থার সুযোগ-সাহায্য না-দেওয়া হয় তবে সেই অধিকার দেওয়া না-দেওয়া সমান কথা। অবশ্য প্রজাস্বত্ব আইনের মারাত্মক সব ত্রুটির সুযোগে জমিদার ও অধঃস্তন মধ্যস্বত্বভোগীরা তখনও পর্যন্ত রায়তদের উপর যে-সব অন্যায় জুলুম ও শোষণ করিয়া আসিতেছিল তিনি তাহারও সংস্কার-সাধনের উপর জোর দিয়া বলিলেন,

"রায়তের জমিতে জমাবৃদ্ধি হওয়া উচিত নয়, এ কথা খুব সত্য। রাজসরকারের সঙ্গে দেনা-পাওনায় জমিদারে রাজস্ববৃদ্ধি নেই, অথচ রায়তের স্থিতিস্থাপক জমায় কমা সেমিকোলন চলবে, কোথাও দাঁড়ি পড়বে না, এটা ন্যায়বিরুদ্ধ। তা ছাড়া এই ব্যবস্থাটা জমির উন্নতিসাধন সম্বন্ধে স্বাভাবিক উৎসাহের একটা মস্ত বাধা; সুতরাং কেবল চাষি নয়, সমস্ত দেশের পক্ষে এটাতে অকল্যাণ। তাছাড়া গাছ কাটা, বাসস্থান পাকা করা, পুষ্করিণী খনন প্রভৃতির অন্তরায়গুলো কোনো মতেই সমর্থন করা চলে না।"

কিন্তু কবি এইখানেই থামিতে চান না কেননা এইসব সংস্কারসাধন হইলেও চাষীর দুঃখ দৈন্য দূর হইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত চাষীর সামগ্রিক মুক্তি ও প্রাণ-প্রতিষ্ঠা না করা যায়। তাই উপসংহারে কবি বলিলেন,

"কিন্তু এ-সব গেল খুচরো কথা। আসল কথা, যে মানুষ নিজেকে বাঁচাতে জানে না কোনো আইন তাকে বাঁচাতে পারে না।…তা বিশেষ আইনে নয়, চরকায় নয়, খদ্দরে নয়, কন্‌গ্রেসে ভোট দেবার চার আনা-ক্রীত অধিকারে নয়। পল্লীর মধ্যে সমগ্রভাবে প্রাণসঞ্চার হলে তবেই সেই প্রাণের সম্পূর্ণতা নিজেকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করবার শক্তি নিজের ভিতর থেকেই উদ্ভাবন করতে পারবে।

"কেমন করে সেটা হবে সেই তত্ত্বটাই কাজে ও কথায় কিছু কাল থেকে ভাবছি।…তবু আমি পারি বা না পারি, এই মোটা জবাবটাই খুঁজে বের করতে হবে।… [কালান্তর ॥ পৃঃ ৩০১-৩০৩]

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ইহার বেশ কয়েক বৎসর পরে বাংলাদেশে ফজলুল হক মন্ত্রীত্বের সময় প্রজাস্বত্ব আইনের সংস্কার করিয়া চাষীদের কিছুটা আইনানুগ সুযোগ দেওয়া হয় এবং 'মহাজনী আইনের' *The Bengal Agricultural Debtors Act* এবং *Bengal Moneylender's Act 1939*-এর সাহায্যে বাংলার লক্ষ লক্ষ রায়তকে আসন্ন মৃত্যুর মুখ হইতে উদ্ধার করা হয়।

কিন্তু তাহাতেই কী চাষীর মুক্তি আসিয়াছে,—জমির হস্তান্তর ও কেন্দ্রীকরণ কি বন্ধ হইয়াছিল? পরবর্তী কালে 'ফ্লাউড্-কমিশনের রিপোর্টে' ১৯৪১ ইহার ভয়াবহ নগ্নরূপটি যখন উদ্ঘাটিত হইল তখন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের কিছুটা টনক নড়িল।

কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার, আমাদের আলোচ্য-পর্বে প্রজাস্বত্ব আইনের সংস্কারের কথা উঠিলেও, নীতিগতভাবে জমিদারী-প্রথার উচ্ছেদ কিংবা কৃষিতে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের অবসানের পক্ষে কংগ্রেস নেতৃত্বের তরফে একটিও কথা বলা হয় নাই। অবশ্য এই সময় কমিউনিস্টরা বলশেভিক বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের অবসান ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আদর্শে জনসংগঠনের প্রয়াস পান। ১৯২৬ সালে ১২ই আগস্ট 'বেঙ্গল ওয়ার্কার্স এ্যাণ্ড পেজেণ্টস্ পার্টি'র সাপ্তাহিক মুখপত্র 'গণবাণী' প্রথম আত্মপ্রকাশ লাভ করে। এই সংখ্যাতেই নজরুলের 'রক্তপতাকার গান', জাগর-তূর্য' ও বিখ্যাত 'ইণ্টারন্যাশনাল সঙ্গীত'-এর তর্জমা প্রকাশিত হয়। ঐ তর্জমাটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল,

"জাগো—
জাগো অনশন-বন্দী, ওঠরে যত
জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত!
যত অত্যাচারে আজি বজ্র হানি
হাঁকে নিপীড়িত-জন-মন-মথিত বাণী,
নব জনম লভি অভিনব ধরণী
ওরে ঐ আগত ॥"

উহার শেষ স্তবকটি এইরূপ,

"নব ভিত্তি 'পরে
নব নবীন জগৎ হবে উত্থিত রে!
শোন্ অত্যাচারী! শোন রে সঞ্চয়ী।
ছিনু সর্বহারা, হব সর্বজয়ী ॥
ওরে সর্বশেষের এই সংগ্রাম-মাঝ
নিজ নিজ অধিকার জুড়ে দাঁড়া সবে আজ!
এই 'অন্তর-ন্যাশনাল-সংহতি' রে
হবে নিখিল-মানব-জাতি সমুদ্ধত।" [ফণি মনসা]

উল্লেখযোগ্য, ১৯২০ সালের শেষভাগে তাসকন্দে ভারতের প্রবাসী বিপ্লবীদের লইয়া ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম গোড়াপত্তন হয়। ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে উহার কেন্দ্র সাময়িকভাবে মস্কোতে স্থানান্তরিত করা হয়। তখন হইতেই প্রবাসী বিপ্লবীরা 'তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে'র সহিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'র সংযুক্তিকরণের (affiliation) পক্ষে জোর দিয়া আসিতেছিলেন।

পুনরায় ইতালিতেঃ রবীন্দ্রনাথ-মুসোলিনী সাক্ষাৎকার

১২ই মে (১৯২৬), পূর্ব-প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার ইতালি পরিভ্রমণে বাহির হন। এবার সঙ্গে চলিলেন রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী, নন্দিনী, প্রশান্তচন্দ্র ও রাণী মহলানবিশ এবং শ্রীনিকেতনের সচিব প্রেমচাঁদ লাল, অধ্যাপক গৌরগোপাল ঘোষ প্রভৃতি আরো অনেকেই।

ইতালিতে তখন ফ্যাসিজম্ পূর্ণশক্তিতে কায়েম হইয়া বসিয়াছে। ফ্যাসিজমের অভ্যুদয় এক বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। পৃথিবীর ইতিহাসে, দুর্যোগের রাত্রে বিরাট এক বিভীষিকাময়-দুঃস্বপ্নের মত ইহার আবির্ভাব।

যুদ্ধোত্তরযুগের তীব্র অর্থনীতিক সংকটে সারা ইউরোপে শ্রমিক ধর্মঘট ও শ্রেণী সংঘর্ষ দেখা দিল। বিশেষ করিয়া রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য ইউরোপের দেশে দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রেরণা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার করে। যুদ্ধের পর ইতালিতেও দেখা দিল তীব্র অর্থনীতিক সংকট। ১৯১৮-২২ সালে সেখানে শ্রমিক ধর্মঘট ও গণআন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করিল। ফলে ইতালিতে দ্রুত কমিউনিস্ট চিন্তাধারার প্রসার ঘটিতে থাকে। এমন সময় বেশ কিছু সংখ্যক ছাঁটাই সৈনিক ও গুণ্ডা প্রকৃতির লোকদের লইয়া মুসোলিনী তাঁহার ফ্যাসিস্ট দলটির (*Fasci-di combattimenti*) পত্তন করিলেন। মুসোলিনী এককালে নিজেই সোস্যালিস্ট ছিলেন। যুদ্ধের শেষার্ধে হঠাৎ মত পরিবর্তন করিয়া তিনি মিত্রপক্ষে ইতালির অংশগ্রহণের পক্ষে বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। যুদ্ধের পর ইতালিতে যখন শ্রমিক ও গণ-আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করিল, মুসোলিনী তখন অরাজকতা দমনের অজুহাতে পুঁজিপতিদের পক্ষ লইয়া তাহার ফ্যাসিস্ট বাহিনীর সাহায্যে সরাসরি এই আন্দোলনের উপর জঘন্য আক্রমণ চালাইতে থাকে। ইতালির পুঁজিপতি ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি মহোল্লাসে মুসোলিনীকে তাহাদের অধিনায়ক-রূপে বরণ করিয়া লইল। মুসোলিনী প্রকাশ্যেই ঘোষণা করিলেন, শ্রমিক ধর্মঘট ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলিকে ধ্বংস করাই হইবে ফ্যাসিস্টদলের আশু লক্ষ্য। তিনি ঘোষণা করিলেন, ইতালিতে পার্লামেণ্টারী শাসন-ব্যবস্থা ক্ষতিকর আর ইতালিকে বাঁচাইতে হইলে ফ্যাসিস্ট-একনায়কত্ব প্রয়োজন। ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে মুসোলিনী তাঁহার বিরাট সামরিক বাহিনী লইয়া রোম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজা ইমানুয়েল, ভয়ে প্রতি-রোধের সাহস করিলেন না; প্রধান মন্ত্রী Facta পলাইয়া বাঁচিলেন। রাজা মুসোলিনীকেই প্রধান মন্ত্রীর পদে বরণ করিয়া লইলেন (৩০শে অক্টোবর)। নামেই পার্লামেণ্ট চলে, বস্তুত মুসোলিনীর অঙ্গুলি-সংকেতেই সব কিছু চলিতে থাকে অর্থাৎ তিনিই হইলেন সর্বময়-অধিকর্তা। প্রায় সাথে সাথেই ধর্মঘট ও গণ-আন্দোলন নিষিদ্ধ হইল। সংবাদপত্র, মুদ্রাযন্ত্র, ব্যক্তিস্বাধীনতা, ট্রেড-

ইউনিয়ন, রাজনৈতিক দল বা সংগঠন এবং সরকার বিরোধী সমালোচনা—সমস্তই কঠোর হস্তে নিষিদ্ধ ও অবদমিত হইল। সোস্যালিস্ট ও কমিউনিস্টদের উপর ফ্যাসিস্ট 'Black shirt' বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণ, গুম, খুন-জখম অবাধে চলিতে থাকিল। ১৯২৪ সালে ১০ই জুন সমাজতন্ত্রী নেতা ও পার্লামেণ্টের সদস্য মাত্তিওতি (Giacomo Matteoti) নিহত হইলেন। আমেন্-ডোলা নামক উদারমতাবলম্বী নেতাকে পিটাইয়া মারা হইল। ভূতপূর্ব এক প্রধানমন্ত্রী নিত্তি (Nitti), কোনরকমে পলায়ন করিতে সমর্থ হন। এইভাবে সারা ইতালিতে এক ভয়াবহ সন্ত্রাস-রাজত্ব চলিতে থাকে।

সমস্ত গণতান্ত্রিক জগতের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি তখন ইতালির উপর। এ'হেন সময়ে রবীন্দ্রনাথের মত বিশ্বমৈত্রী ও বিশ্বশান্তির সাধকের ইতালি পরিদর্শনের সংবাদে গণতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবীমহল সচকিত হইয়া ব্যাপারটি অনুধাবন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ইউরোপের পত্র-পত্রিকায় এমন কি ভারতবর্ষেও 'অমৃতবাজার', 'পাইওনিয়র' প্রভৃতি পত্রিকাগুলি এই ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করিল।

প্রশ্ন থাকিয়া যায়, রবীন্দ্রনাথ কী ইতালির শাসন-ব্যবস্থা ও সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে কিছুই জানিতেন না? ইউরোপের বিশেষত ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকায় বেশ কিছুকাল হইতে মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ট কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা হইতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ উহার কিছু কিছু পাঠ করিয়া থাকিলেও ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকাগুলির সত্যনিষ্ঠা ও সাংবাদিক-সততা সম্পর্কে খুবই সন্দেহভাব পোষণ করিতেন। কেননা ইতিপূর্বে ফর্মিকি ও তুচির বিশ্ব-ভারতীতে যোগদানের উপলক্ষে ইংরেজ পত্রিকাগুলি অতিরঞ্জিত ও আজগুবি সব খবর প্রকাশ করিতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ এই সময়কার বিলাতের *'Sundy Chronicle'* পরিবেশিত একটি সংবাদের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'ভারতে ফ্যাসিস্ট কর্মকেন্দ্র' শিরোনামায় ঐ পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়,

"Fascism is taking a grip on India. The cause is Italian propaganda, the object of which is obscure, but the results of which are incalculable."

"Some months ago Sgr. Carlo Formichi an Italian professor was sent, for some obscure reason, to study Indian philosophy at the Visvabharati Institute of Dr. Sir Rabindranath Tagore in Santiniketan of Bengal.

"During his stay he came into contact with the young Zemindars of Bengal in Calcutta and the Talukdars of U. P. in Benaras, both belonging to the aristocracy and landowning classes, and the result has been that Fascist centres are to be formed in those cities."

বলা বাহুল্য, ইহা ঐ পত্রিকার সাংবাদিকটির স্বকপোল-কল্পিত ঘটনামাত্র। ফর্মিকির শান্তিনিকেতন আসার পশ্চাতে নিশ্চয়ই গূঢ় অভিসন্ধি ছিল, কিন্তু তিনি বাংলা ও যুক্তপ্রদেশের জমিদারদের সহিত সংযোগস্থাপন করিয়া ফ্যাসিস্ট কর্মকেন্দ্র স্থাপনের ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন, ইহা মোটেই সত্য নহে। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ পত্রিকাগুলির এই অশালীন মন্তব্যে খুবই বিরক্ত ও অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের ইতালি ভ্রমণের ব্যাপারটি কিভাবে সংঘটিত হইল এই সম্পর্কে কোনরূপ জল্পনা-কল্পনার আশ্রয় না-লইয়া স্বয়ং কবির বিবৃতির শরণাপন্ন হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত। ইতালি ভ্রমণের পর জুরিখে অধ্যাপক সালভেদরির (Salvadori) স্ত্রীর সহিত পরিচয়কালে তিনি এই সম্পর্কে খুব পরিষ্কার খুলিয়া বলেন,

"Let me tell you why I came to Italy this time. As you know I had been invited by your people in Milan last year. I was strongly moved when I found that the people loved me and wanted me to be with them for some time. I fell ill, however, and had to return to India before fulfilling my engagements in other towns. I promised to come back in the following summer.

"In India the reports of Fascist atrocities reached me from time to time, and I had serious misgivings about coming back to Italy. About this time Professor Formichi came to Santiniketan, brining with him from Mussolini a wonderful gift of books and a valuable collection of art reproductions for my institution. He also brought an appreciative letter from Mussolini himself.···The services of Professor Formichi and Dr. Tucci which have been lent to us also helped in our work. In my message to Mussolini I expressed my thanks to him for all this, but this was purely in connection with my own work, and had no reference to his political activities.

"Professor Formichi and Dr. Tucci encouraged me to come to Italy, but my misgivings were not dispelled, and at one time I had practically decided to give up my projected tour in Italy. However, I had my promise to fulfil. I also had a strong desire to meet and spend a few days with Romain Rolland and this seemed the last chance of doing so. So at last I came to Italy and was taken to Rome."

[*Visva-Bharati Quarterly*-October 1926-pp. 299-300]

৩০ মে রবীন্দ্রনাথ নেপলস্-এ আসিয়া পোঁছাইলেন। সেইদিনই স্পেশাল ট্রেনযোগে তাঁহাদের রোমে লইয়া যাওয়া হয়। ইতালি সরকারের রাজ-অতিথিরূপে কবিকে অভ্যর্থনা করিয়া রোমের বিখ্যাত গ্র্যান্ড হোটেলে থাকিবার ব্যবস্থা করা হয়।

পরদিন ৩১শে মে রবীন্দ্রনাথ ও মুসোলিনীর প্রথম সাক্ষাৎকার হয়। মুসোলিনী কবিকে নাটকীয় ভঙ্গীতে অভিবাদন জানাইয়া বলিলেন, 'ইতালির ভাষায় অনূদিত আপনার পুস্তকগুলি পাঠ করিয়াছেন বলিয়া যাঁহারা গর্ব অনুভব করেন আমি তাঁহাদের মধ্যে একজন। আমিও আপনার একজন প্রধান ভক্ত।' বিশ্বভারতীর জন্য গ্রন্থসমূহ ও দুইজন বিখ্যাত অধ্যাপককে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনার কাজে প্রেরণ করার জন্য কবি মুসোলিনীকে ধন্যবাদ জানাইলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কয়েকটি মন্তব্য ও ভাষণে প্রধানত ইতালির ঐতিহ্য-মণ্ডিত মহান সংস্কৃতির উল্লেখ করিলেন। এই সাথে মুসোলিনীর কঠিন ব্যক্তি-চরিত্রেরও প্রশংসা করেন। মুসোলিনীর অনুচরবর্গ অত্যন্ত সুকৌশলে কবিকে উপর উপর সব কিছু ঘুরাইয়া দেখাইতে লাগিল যাহার ফলে ফ্যাসিস্ট-ইতালির আসল রূপটিই কবির নিকট সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞাত থাকিয়া গেল। এমনিতে রবীন্দ্রনাথ নিন্দনীয় কিছু দেখিতে পাইলেন না। কেননা পূর্বাহ্ণেই সব জিনিসগুলিকে এমনভাবে সাজাইয়া-গুছাইয়া কবিকে দেখান হয় যাহার ফলে ইতালি বেশ উন্নতির পথেই চলিতেছে বলিয়া তাঁহার ধারণা হয়। এই সব দেখিয়া রোমে তিনি একবার মন্তব্য (বস্তুত কবি ঠিক কি বলিয়াছেন জানার উপায় নাই) করিলেন,

It is for me to study and not criticise from outside. I am glad of this opportunity to see for myself the work of one, who is assuredly a great man and a movement that will certainly be remembered in history."

[*Daily News*, London-11 June, 1926.]

রবীন্দ্রনাথের এই অসতর্ক বিক্ষিপ্ত মন্তব্যগুলি ইতালির ফ্যাসিস্ট পত্র-পত্রিকাগুলি এমনভাবে সাজাইয়া ফলাও করিয়া প্রকাশ করে যাহাতে কবি ফ্যাসিস্ট ইতালির ও মুসোলিনীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ বলিয়া মনে হয়। রবীন্দ্র-জীবনীকার লিখিতেছেন,

"রবীন্দ্রনাথের এই সামান্য প্রশংসাবাণী পৃথিবীর সর্বত্র তারে, বেতারে বিতরিত হইয়া গেল, মুসোলিনী ইহাই চাহিয়াছিলেন। কিন্তু লোকে অবাক হইয়া ভাবিল এই কয়দিনে কবি ইতালির আভ্যন্তরীণ অবস্থার কী জানিতে পারিয়াছেন—যাহা দ্বারা তাঁহার পক্ষে ইতালির বর্তমান শাসনপ্রণালী ও শাসক সম্বন্ধে এই মত প্রকাশ করা সম্ভব হইল।"...

[রবীন্দ্রজীবনী-তৃতীয় খণ্ড ॥ পৃ ১৮৮]

সরল বিশ্বাসী কবি তখনও পর্যন্ত ইহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। কবির সঙ্গে যাঁহারা ছিলেন, ইতালীয় ভাষায় অজ্ঞতা থাকার জন্য তাঁহারাও

উহার গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারিলেন না।

৭ই জুন কাপিতোল্-এ রোমের শাসনকর্তা ও অভিজাতশ্রেণী কবিকে সম্বর্দ্ধনা জানাইলেন। পরদিন ফ্যাসিস্ট বুদ্ধিজীবীদের আহূত এক সভায় কবি '*Meaning of Art*' সম্পর্কে একটি ভাষণ দেন। ঐদিন প্রাতে শিশুদের একটি বিদ্যায়তনও পরিদর্শন করেন। ১০ই জুন রোমের বিশ্ববিদ্যালয়ে কবিকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা জানান হয়। কবি ইতালির ছাত্রদের উদ্দেশে একটি ভাষণ দেন।

পরদিন ইতালির রাজা ইমানুয়েলের সহিত কবির সাক্ষাৎকার হয়। ১৩ই জুন মুসোলিনীর সহিত কবির সর্বশেষ সাক্ষাৎকার হয়।—দুই দেশের মধ্যে ছাত্রবিনিময়ের কথা উঠে। এই প্রস্তাবে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ কম নহে, কেননা উহাই বিশ্বভারতীর মূল আদর্শ ও লক্ষ্য। কথা প্রসঙ্গে তিনি বিখ্যাত দার্শনিক ক্রোচের সহিত সাক্ষাতের বাসনা ব্যক্ত করেন। স্বভাবতই মুসোলিনীর উহাতে খুশী হইবার কথা নয়, অবশ্য তিনি ক্রোচের সহিত কবির সাক্ষাৎকারের নির্দেশ দেন। ক্রোচে তখন অন্তরীণাবদ্ধ, কেননা তিনি ফ্যাসিজমের বিরোধী ছিলেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সহিত ইতালির আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা লইয়া ক্রোচে আলোচনা করেন নাই—আর তাহার সুযোগ ও অবকাশও ছিল না। কাব্য-সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধেই তাহাদের আলোচনা হয়। ইহার পর রবীন্দ্রনাথ ফ্লোরেন্স, তুরিন প্রভৃতি নগরীতে আরো কয়েকদিন কাটান এবং কয়েকটি ভাষণও দেন। কিন্তু রাজনীতি, বিশ্বসমস্যা ও বিশ্বশান্তি বিষয়ক কোন বক্তৃতা তিনি দিয়াছিলেন বলিয়া এখনও পর্যন্ত তাহার কোন প্রমাণ মেলে না।

রবীন্দ্রনাথ-রোলাঁ সাক্ষাৎকার ঃ
ফ্যাসিজমের প্রতি ধিক্কার

রমাঁ রোলাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ ইতালি হইতে সুইজারল্যাণ্ডের ভিলেন্যুভের পথে যাত্রা করেন (২২ শে জুন)। রোলাঁ তখন ভিলেন্যুভে আসিয়া বাস করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথ এখানে প্রায় একপক্ষ কাল কাটান। রোলাঁ G. Duhamal, J. G. Frazer, Prof. Bovet ও বৈজ্ঞানিক Forel-এর সহিত কবির পরিচয় করাইয়া দেন।

রোলাঁর সহিত রবীন্দ্রনাথের পাশ্চাত্য সঙ্গীত ও শিল্প সাহিত্য লইয়া দীর্ঘ আলোচনা হয়। প্রসঙ্গত অসহযোগ আন্দোলন ও গান্ধীজীর সম্পর্কেও তাঁহাদের আলোচনা হয়। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়, ইতালিতে কবির বিবৃতি ও মন্তব্যগুলি এবং ইতালির ফ্যাসিজম্ লইয়া। রোলাঁ ফ্যাসিস্টদের কুকীর্তিগুলি দেখাইয়া ফ্যাসিজম্ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথকে সতর্ক ও সচেতন করিবার চেষ্টা করেন। ২৫শে জুন ফ্যাসিজম্ ও মুসোলিনী সম্পর্কে তাঁহাদের মধ্যে এক দীর্ঘ আলোচনা হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার একটি 'নোট' পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ কী ভাবে ইতালিতে আসেন এবং ইতালির বর্তমান অবস্থা ও মুসোলিনীর কার্যকলাপকে তিনি কোন্ দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিয়াছিলেন তাহারই বিস্তারিত বিবরণ দিয়া এক জায়গায় বলেন,

...Owing to the great war the social and administrative body in Europe broke down and there was great misery; the people who suffered cried for help and found that they could not get any help from machines but had to depend on individuals. If at this stage somebody comes forward with a forceful personality and announces that he has saved them, then the people naturally accept him as their saviour; specially when they saw that Mussolini succeeded in clearing away the wreckage of the parliamentary machine and substituted his word as law. The common people, in spite of all their weakness, are human beings. The personality of Mussolini could not but have a great effect on them, specially at a time when they had lost faith in their old mechanical contrivances.

..."I was told that Italy had become a land of lunatics. It was the best that could happen for the people themselves to put the whole country under the control of a masterful

personality who alone could bring back order. Once this was achieved, they could hope for higher things to come back in time. I have been told that this is what actually happened. Mussolini has succeeded in bringing back law and order to the people. Now they are prosperous and happy, in fact far better than they were just after the war."......

[*Rolland and Tagore*-pp. 90-91.]

সরল বিশ্বাসী কবি, মুক্তকণ্ঠে ইতালি ভ্রমণ-সংক্রান্ত আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা ও তাঁহার ধারণার কথা রোলাঁর নিকট ব্যক্ত করেন। কবির 'ব্যক্তিত্ববাদ' শেষ-পর্যন্ত যে 'ব্যক্তিপূজা বাদ' ও ফ্যাসিজমে পরিণতি লাভ করিতে পারে, এ'কথা খুব পরিষ্কার বুঝিয়া উঠা তখনও তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। এইটুকু বুঝা যায় যে, ফ্যাসিজম সম্পর্কে এবং ইতালির আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁহাকে প্রায় কিছুই জানিতে দেওয়া হয় নাই। আর তাছাড়া ইউরোপের তৎকালীন রাজনীতি ও ঘটনাবলীর প্রকৃত তাৎপর্য তাঁহার নিকট খুব পরিষ্কার ছিল না। মোট কথা ফ্যাসিস্টদের খপ্পরে পড়িয়া তিনি আসল খবর প্রায় কিছুই জানিত পারেন নাই। অবশ্য তিনি এ কথাও স্বীকার করেন, Duke Scotti'র মত লোকও তাঁহার সহিত প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিতে পারেন নাই; সর্বদাই ফর্মি'কি ও ফ্যাসিস্ট অনুচরেরা কবিকে ঘিরিয়া ছিল। রোলাঁ ব্যাপারটি পরিষ্কার বুঝিতে পারেন। তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সহিত ইতালির আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও ফ্যাসিজমের আসল স্বরূপটি উদ্ঘাটন করিয়া কবির সামনে তুলিয়া ধরিলেন। রোলাঁ সেদিন তাঁহার দীর্ঘ আলোচনার উপসংহারে বলিলেন,

"I realise fully how the present dominance of the Fascist has come about. The political crisis after the war was aggravated by the failure of the socialists who proved doubly unfit for governing the country. I recognise that the seizure of power by Mussolini was inevitable. It was a logical necessity. Conditions in Italy at the time were somewhat similar to those in France at that end of the 18th century when Bonaparte came to prominance...I believe Italy is in a much worse condition, because Mussolini has not got the personality of Napoleon. The people of Italy are more impulsive and Mussolini is playing with fire. He is constantly speaking against foreign governments and is insisting on the patriotic ambition of his countrymen. When he speaks to big gatherings and asks, 'To whom does Nice belong, to whom does Savoy belong ? they all shout together, 'To us'. He is

rousing them and he is appealing to their hatred of other nations. I have no doubt that he is the greatest menace to the whole of Europe." [*Ibid*-pp. 94-95.]

রোলাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রায় অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়। মহাযুদ্ধের সময়ই ইতালির যুদ্ধবাজ 'ফ্যুচারিস্ট' দলটির সহিত মুসোলিনীর ও ফ্যাসিস্টদের গভীর আঁতাত হয়। ১৯১১-১২ সালে ইতালির সাম্রাজ্যবাদীগোষ্ঠী ত্রিপলি আক্রমণ করিয়া তুরস্কের নিকট হইতে উহা ছিনাইয়া লয়। মহাযুদ্ধের শেষ-ভাগে মিত্রপক্ষে যোগ দিয়া ইতালি এক গোপন-চুক্তিতে স্মিরণা ও এশিয়া-মাইনরের কিছুটা জায়গা লাভ করে, অবশ্য সোভিয়েট বিপ্লবের সাফল্যে উহা শেষ পর্যন্ত হজম করা তাহাদের পক্ষে শক্ত হয়। ক্ষমতা-দখলের অনতিকাল পরই মুসোলিনী ইতালির চারিপাশের দেশগুলির দিকে লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে থাকে। মুসোলিনী ও ফ্যুচারিস্টরা 'পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের' পুনরুদ্ধারের সংকল্প ঘোষণা করিয়া ইতালির যুবক ও তরুণদের যুদ্ধোন্মাদনা এবং জাতীয় উন্মাদনা তীব্রতর করিতে প্রয়াস পায়। রোলাঁ গভীর উদ্বেগে ও আতঙ্কে উহার পরিণতির কথা চিন্তা করিয়াই কবিকে সতর্ক করিয়া দিতে চাহিলেন, "I have no doubt that he is the greatest menace to the whole of Europe."

বস্তুত রোলাঁর সময়োচিত সতর্কবাণী রবীন্দ্রনাথকে ফ্যাসিজম্ সম্পর্কে সচেতন করিতে সাহায্য করে। রোলাঁ তাহার *'I will not rest'* পুস্তিকায় লিখিতেছেন,

"আমি রবীন্দ্রনাথের চোখ খুলিবার চেষ্টা করলাম। এ চেষ্টা আমার পক্ষে খুব সহজ হয় নাই। ফ্যাসিজমের আসল রূপ আমি তাহার নিকট খুলিয়া ধরিলাম। ইহার হিংস্রনীতির কবলে যাহারা পড়িয়াছে তাহাদের সহিত তাহার সংযোগ সাধন ঘটাইলাম। রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে বিচলিত হইলেন।

"যে ফ্যাসিজম্ তখন তাহার নাম ভাঙ্গাইতেছিল তাহার সহিত তিনি খোলাখুলিভাবে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন। ইতালীয় বন্ধুগণের এবং সি, এফ, এণ্ড্রুজের নিকট লিখিত চিঠিতে তিনি তাঁহার মত পরিবর্তনের কথা ব্যক্ত করিলেন।"...

[শিল্পীর নবজন্ম ॥ পৃঃ ৬৩ ৬৪]

যাহাই হউক, ইহার কয়েকদিন পরেই কবি জুরিখে গমন করেন। এই-খানেই ইতালির নির্বাসিত অধ্যাপক সালভেদোরির স্ত্রীর (Signora Salvadori) সহিত কবির পরিচয় হয়। উঁহারা স্বদেশ হইতে অকথ্য লাঞ্ছনার পর নির্বাসিত হইয়া এখানে আসিয়া বসবাস করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত কবির ইতালির ফ্যাসিজম্ সম্পর্কে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হয়। এই আলোচনার একটি 'নোট্' পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ইতালি ভ্রমণের সমস্ত ইতিবৃত্তান্ত তাঁহাকে খুলিয়া বলেন। শ্রীমতী সালভেদোরি খুবই বিমর্ষ হইয়া ব্যাপারটি অনুধাবন করিয়া বলিলেন,

…"But what makes us unhappy is that you have unintentionally helped to support Fascism. We know it is unintentional, for you are too good to do so."

জবাবে কবি বলিলেন,

"I did not support Fascism, though I did express my admiration for Mussolini as possessing the personality which alone can effect the miracles of creation in human history. I was careful to make this distinction. About Fascism the only thing of which I was assured by almost everyone I met was that it had saved Italy from economic ruin."

শ্রীমতী সালভেদোরি বললেন যে, উহা আদৌ সত্য নহে। কবি তাহার জবাবে বলিলেন যে, তাহা যদি নাও হয়, তাহাতেও কিছু যায়-আসে না। তিনি বলিলেন,

…"If, on the contrary, Italy, in the pursuit of her political power and material gain, has sacrificed some ideal of humanity she deserves condemnation, not only for her own sake but for the sake of us all. In this she becomes a universal menace, imperilling the foundation of human relationship."…

[*V. B. Q.*-Octo. 1926-PP. 301-02.]

তখন শ্রীমতী সালভেদোরি একে একে ফ্যাসিস্টদের নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের কাহিনী খুলিয়া বলিলেন।—কী ভাবে এক রাত্রেই ফ্লোরেন্সে ১৮ জন ফ্যাসিবিরোধীদের হত্যা করা হয়,—কী ভাবে রাত্রির অন্ধকারে সন্তানদের সম্মুখেই পিতাকে শয্যা হইতে টানিয়া নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়, তিনি তাহারই লোমহর্ষক বিবরণ দেন। শুনিয়া কবি গভীর দুঃখে বিচলিত ও অনুতপ্ত হইয়া বলিলেন,

"I wish I had known for certain the dark deeds that were being done in Italy, then I would not have come to that country—I certainly would not. I had not met any of the people who suffered. But now that I have seen you I realise my own responsibility."

[*Visva-Bharati Quarterly*-October 1926-p. 303.]

কিন্তু পরিশেষে কবি শ্রীমতী সালভেদোরিকে ইহাও পরিষ্কার বলেন যে, ইতালির জনসাধারণের সহিত তাঁহার কোন বিরোধ নাই। তিনি সত্যই তাঁহাদের আন্তরিক ভালোবাসেন এবং ইতালির মহান সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন।

১০ই জুলাই রবীন্দ্রনাথ ভিয়েনায় আসিলেন। এখানেও বহু অত্যাচারিত ও বিতাড়িত ইতালীয়ানদের সহিত কবির সাক্ষাৎ হয়। বিখ্যাত সোস্যালিস্ট

নেত্রী ডাঃ এ্যাঞ্জেলিকা বালবানোফ্‌ ও সিনিয়র মডিগলি এনি কবির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মুসোলিনী ও ফ্যাসিস্টদের অত্যাচার-নিপীড়নের বিবরণ দেন। এই সব সংবাদে কবির মানসিক যাতনা তীব্র হইয়া উঠিল। এমনিতেই অসুস্থ হইয়া পড়ায় তাঁহাকে ভিয়েনায় চিকিৎসাধীন হইয়া পড়িয়া থাকিতে হয়। কয়েকদিন পর তিনি এণ্ড্রুজকে এক পত্রে ফ্যাসিজ্‌মকে তীব্র ভাষায় নিন্দা ও ধিক্কার দিয়া লিখিয়া তাঁহার মানসিক যন্ত্রণার ভার কিছুটা লাঘব করিতে চেষ্টা করেন। পত্রটি লিখিত হয় ২০ শে জুলাই; কিছুদিন পর উহা বিলাতের *Manchester Guardian* প্রকাশিত হয় (৫ই আগস্ট-১৯২৬)। ঐপত্রের একজায়গায় কবি লিখিতেছেন,

"My interviews, as published in Italy, were the products of three personalities,—that of the reporter, the interpreter and mine. Over and above that, there evidently was a hum in the atmosphere of another insistent and universal whispher which without our knowing it mingled in all our talks. Being ignorant of Italian I had no means of checking the result of this concoction. The only precaution which I could take was to repeat emphatically to all my listeners that I had no opportunity to study the history and character of Fascism.

"But since then I have had the chance of knowing the contents of some of these interviews from the newspaper cuttings that my friends have gathered and translated for me. And I was not surprised to find in them what was inevitable."…

ইতালি ভ্রমণ কালে তিনি সেখানে সর্বত্র একটি মাত্র কথাই বার বার শুনিলেন যে, মুসোলিনী আসন্ন বিপর্যয় ও ধ্বংসের মুখ হইতে ইতালিকে উদ্ধার করিয়াছেন। কবি সেই সম্পর্কে বলিলেন,

"True, these are facts that immediatedy and exclusively concern Italy herself; moreover, even their validity has sometimes been challanged by European critics. But however that may be, the methods and the principle of this Fascism concern all humanity, and it is absurd to imagine that I could ever support a movement which ruthlessly suppresses freedom of expression, enforces observances that are against individual conscience, and walks through a blood-stained path of violence. I have said it over and again that the aggrassive spirit of Nationalism and Imperialism, religiously cultivated by most of the nations of the West, is a menace to the whole world.

The demoralisation which it produces in European politics is sure to have disastrous effects, especially upon the peoples of the East, who are helpless to resist the Western methods of exploitation.

"It would be most foolish, if not almost criminal, for me to express my admiration for a political ideal which openly declares its loyalty to brute force as the motive power of civilisation. That barbarism is not altogether incomptible with meterial prosperity may be taken for granted, but the cost is terribly great—it is fatal. This worship of uncrupulous force as the vehicle of nationalism keeps ignited the fire of international jealousy which is for univsesal incendiarism in a fearful orgy of devastation. The michief of infection by this moral aberration is grert because to-day the human races have come close together, and any process of destruction set going does it work in an enormously wholesale manner. Knowing all this, could I be credited with having played my fiddle while an unholy fire was being fed with human sacrifice ?"

[*Visva-Bharati Quarterly*-Octo. 1926-pp. 274-76]

ফ্যাসিস্টদের আদর্শে যে নূতন কথা কিছু নাই,—আমেরিকা ও ইউরোপের পুঁজিবাদী সভ্যতা-সংস্কৃতিকেই তাহারা অনুকরণ করিতেছে, কবি উহা আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিতেছেন।

"I was greatly amused by finding the writer in a Fascist organ vehemently decrying the pantheistic philosophy of the passive and meditative East, while comparing with it the vigorous self-assertion and fury of efficiency which he acknowledges to have been borrowed by his people from their modern schoolmasters in America...

...Hs evidently does not realise that if Christ were born again in this world he would have forcibly been truned back from Now York had he come there from outside, if for nothing else., at least for the want of the necessary number of dollars to be shown to the gatekeeper. Or, if he had been born in that land, Ku Klux Klan would have lynched him , for did he not give utterance to the political blasphemy that blessed are the meek, thus insulting the Nordic right

to rule the world ?—and the economic heresy that blessed are the poor ? Would he not have been put into prison for life for saying that it was as easy for the prosperous to reach the Kingdom of Heaven as for the camel to pass through the eye of a needle.

কবি তাই ফ্যাসিজম্ সম্পর্কে এণ্ড্রুজকে সতর্ক করিয়া দিয়া ঐ পত্রের উপসংহারে বলিলেন,

…"To be tortured by tyranny may be tolerable but to be deluded into the worship of a falsified ideal is humiliating for the whole age which by chance is submitted to it. If Italy has made even a temporary gain through a ruthless politics she may be excused for such an obsession—but for us outsiders, who believe in idealism, there can be no such excuse."

[*Visva-Bharati* Quarterly-October 1926-pp. 276-79]

জুলাইয়ের শেষভাগে রবীন্দ্রনাথ ভিয়েনা হইতে প্যারিসে আসেন। লেভিদম্পতী, অধ্যাপক জুল্ ব্লক (Jules Block) ও আরো অনেক সুধী ব্যক্তি কবির সহিত দেখা করেন। কবির একান্ত অনুরোধে প্যারিসে এই সময় তাঁহার বন্ধুরা কোন বক্তৃতা বা ভাষণের ব্যবস্থা করিলেন না। কবি ইংলণ্ড যাইবার জন্য ব্যগ্র ; সেখানে সাংবাদিক সম্মেলনে ইতালি ভ্রমণ ও ফ্যাসিজম্-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে তাঁহার বক্তব্য খুলিয়া ধরিবেন।

আগস্টের প্রথম ভাগে রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে আসিলেন (৪ঠা আগস্ট ?) সাংবাদিকরা কবিকে ছাঁকিয়া ধরিলেন। সম্ভবত পৌঁছিয়াই এণ্ড্রুজের নিকট লেখা খোলা চিঠিটি 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান'-এ প্রকাশ করিবার জন্য দেন। সাংবাদিকদের সম্মুখে কবি তাঁহার ইতালি ভ্রমণ-সংক্রান্ত ব্যাপারে বিবৃতি দেন (৫ই আগস্ট)। এক জায়গায় কবি বলিলেন,

…"While I wanted to remain neutral I could see that it was difficult. Freedom of expression is repressed in Italy, I never met a single individual in Italy who dared to speak a word against Fascism. My tour was officially arranged, and I was only taken to places where it was thought it would be safe. Even if I had freedom I do not think I would have met many individuals who would have been courageous enough to speak against Fascism.…

পরিশেষে তিনি বলিলেন,

"I realised then that it is not enough that Italy should be prosperous. *You can make a country prosperous, but if your methods are wrong that is the concern of humanity, and they must*

be judged according to the ethical standard.

"I wish that I could have remaind neutral with regard to Italian politics, and if I had not been misrepresented in the papers I should have been able to do so."……

[*Manchester Guardian*-6th August, 1926]

লণ্ডনে রোদেনস্টাইন-দম্পতি 'মাঞ্চেস্টার-গার্ডিয়ানে'র সম্পাদক সি. পি. স্কট, আর্নেস্ট রীস্, রাজকবি ব্রিজেস—প্রমুখ পুরাতন বন্ধুরা কবির সহিত দেখা করেন। এলমহার্স্ট দম্পতির অতিথিরূপে কবি ডিভনশায়ারে ডার্টিংটন-হলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিয়া আসেন। 'কারবিস্-বে'তে তাঁহারা কয়েকদিন কাটান। এখানে বার্ট্রাণ্ড রাসেল দম্পতির সহিত কবির সাক্ষাৎ আলাপ-আলোচনা হয়। বিখ্যাত শিল্পী এপ্‌স্টাইনের সঙ্গে এই সময় কবির পরিচয় হয়। এপ্‌স্টাইন এই সময়ই কবির বিখ্যাত প্রতিকৃতিটি তৈয়ারী করেন। শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশ এবারের কবির ইউরোপ ভ্রমণের বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন তাঁহার 'কবির সঙ্গে য়ুরোপে' গ্রন্থে। ফর্মিকি এবং মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ত অনুচরদের হাতে কবি এবং রথীন্দ্রনাথ, প্রশান্ত মহলানবিশ প্রমুখেরা কী ভাবে প্রতারিত হইয়াছিলেন, নির্মলকুমারী তাঁহার এই গ্রন্থে বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। শ্রীমতী সালভেদরী, শ্রীমতী য়্যাঞ্জেলিকা ব্যালবানভ-এর মুখে মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ট বাহিনীর অত্যাচারের বিবরণ এবং কী ভাবে দার্শনিক ক্রোচের সঙ্গে কবির সাক্ষাৎকার ও আলোচনা হয়, শ্রীমতী মহলানবিশ তাঁহার এই গ্রন্থে তাহারও বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন।

২১শে আগস্ট লণ্ডন হইতে কবি নরওয়ের পথে যাত্রা করেন, সঙ্গে ছিলেন মহলানবিশ দম্পতি ও লর্ড এস পি সিংহ। ২৩শে আগষ্ট তাঁহারা নরওয়ের রাজধানী অস্‌লোতে আসিয়া পেঁছাইলেন। অধ্যাপক স্টেন কোনো (Sten Konow) সস্ত্রীক এবং নরওয়ের বহু সুধীজন কবিকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন। পরদিন নরওয়ের রাজার সহিত কবির সাক্ষাৎকার হয়। নরওয়ের চারিদিক হইতে সভা-সমিতি ও ভোজসভায় কবির অমন্ত্রণ আসিতে থাকে। অধ্যাপক কোনোর গৃহে নরওয়ের শ্রেষ্ঠ গুণীজন ও শিল্পরসিকদের সহিত কবির পরিচয় হয়। অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বিশিষ্ট সম্মানিত অতিথিরূপে কবি আমন্ত্রিত হইয়া একটি ভাষণ দেন। বিদায়ের পূর্বে, তিনি বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক যোহান বয়ারের (Johann Bojer) সহিত একদিন আলাপ-আলোচনা করেন।

নরওয়ে হহতে তাঁহারা সুইডেনে আসেন। বিখ্যাত ভূ-পর্যটক সেভেন হেডেন (Seven Hedin) এক ভোজসভায় কবিকে আপ্যায়িত করেন। সেভেন হেডেনের রচনা এক সময় কবিকে খুব বিচলিত করে,—ব্রিটিশের তিব্বত আক্রমণের তীব্র নিন্দা করিয়া তিনি তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিয়াছিলেন। কবি 'দেশের কথা' (বঙ্গদর্শন—১৩১১ শ্রাবণ) নামক প্রবন্ধে উহার দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেন। এই সময় কবির ইতালি ভ্রমণ-সংক্রান্ত গোলমালের বিবরণ ও ব্যাখ্যা দিয়া অধ্যাপক ফর্মিকি একটি বিবৃতি দেন। উহা ২৫শে আগস্ট ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ফর্মিকি এই দীর্ঘ বিবৃতিতে আত্মদোষ ক্ষালনের চেষ্টা করেন, ইহাতে কবি খুবই ব্যথিত হন।

৬ই সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ ডেন্‌মার্কের রাজধানী কোপেন্‌হেগেনে আসিলেন। এখানে 'রয়েল-নটিকেল ক্লাবে' কবিকে এক ভোজসভায় আপ্যায়িত করা হয়। ঐ ভোজসভায় অধ্যাপক হ্যারল্ড হেফ্‌ডিং ও টুক্‌সেন উপস্থিত ছিলেন।

৯ই সেপ্টেম্বর তাঁহারা জার্মানীর হামবুর্গে আসিলেন। এ যাত্রায় কবি প্রায় একমাসকাল জার্মানীতে কাটান। জার্মানীর বিভিন্ন শহরে ও নগরে বহু সমিতিতে ও ভোজসভায় কবিকে সম্মানিত করা হয়। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বার্লিনে আসিয়া কবির সহিত মিলিত হন। জার্মানীতে কবির বিপুল সম্বর্ধনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়া তিনি '*Modern Review*' ও 'প্রবাসী' পত্রিকায় লিখিলেন। সম্ভবত এই সময়ই কবি অধ্যাপক ফর্মিকির ঐ বিবৃতির জবাবে একটি বিবৃতি *Manchester Guardian*-এর সম্পাদককে প্রকাশের জন্য পাঠাইয়া দেন। উহা ২০ সেপ্টেম্বর ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। শুরুতেই কবি অত্যন্ত বিনয়ের সহিত লিখিলেন,

"Prof Formichi is one of my best friends in Europe, and I do not wish to enter into a controversy with him about a

subject that has been a misunderstanding for which I myself must acknowledge my own share of the blame."

কিন্তু ফ্যাসিজম্ সম্পর্কে কবি তাঁহার সিদ্ধান্তে অটল থাকিয়া উহার জবাবে লিখিলেন,

"But this does not at all mean that I had any sympathy for the methods of Fascism, the nature of which I gradually came to learn at a later date. Even during my stay in Italy I was shocked and surprised when an Englishman in Rome, in his talk to me, tried to defend the Italian Government for forcing the teaching of Roman Catholicism through its educational institutions, saying that the state as an organism has the natural right, for the sake of its welfare, to choose its own particular religion and never to allow individuals to exercise their own choice.…It struck me all the more strongly because I knew that there was a time when Mussolini had openly expressed his hatred of all religions in an extravgant language of abhorrence. For the first time it made me suspect that possibly there was something unnatural in the high-pitched protestation of happiness by the people whom I met, that it rang loudly upon the dread bush of a universal fear.

পরিশেষে তিনি লিখিলেন,

"I need not go into detail about the communications that were poured upon me by the victims of Fascism when I came out of Italy. I felt bound to assure my friends that the rumour which spread the impression that I supproted Fascism as an ideal was unjust to me, that I still decried the despotic intimidation of spirit that humiliates the inner man in order to decorate him with a costly semblance of an outer glory."

ইতালির জনসাধারণ ইহার বিশেষ কিছুই জানিতে পারিল না। পরন্তু ইতালির ফ্যাসিস্ট মুখপত্রগুলি একযোগে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে কুৎসা প্রচার করিতে থাকে। ইতালির '*Popola d' Italia*,' (মুসোলিনীর ভ্রাতা ইহার সম্পাদক ছিলেন) পত্রিকায় অত্যন্ত জঘন্য ভাষায় রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করিয়া একটি প্রবন্ধ বাহির হয়,—*Manchester Guardian* পত্রিকায় প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হয় (১৫ই সেপ্টেম্বর)। তবে '*Dr. Tagore on Fascism*' এই শিরোনামায় ঐ পত্রিকায় কবির ইতালি ভ্রমণ ও ফ্যাসিজম সম্পর্কে কবির বক্তব্যের উপর একটি সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই সব ব্যাপারে কবির মন অত্যন্ত

ভারাক্রান্ত ;—তিনি এই ব্যাপার লইয়া আর কোন বিতর্ক বা বাদানুবাদে প্রবেশ করিতে চাহিলেন না। কবির দুঃখ ও ক্ষোভের আরো কারণ এই, মুসোলিনী ও ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে কবির বিবৃতি ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রবাসী ও *Modern Review* তেও অত্যন্ত বিরূপ সমালোচনা ও মন্তব্য প্রকাশিত হয়। কবি তাঁহার ক্ষোভের কথা রামানন্দবাবুকে পত্রে জানাইয়াছিলেন। শ্রীমতী মহলানবিশ তাহার গ্রন্থে এর বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। বার্লিন হইতে তাঁহারা চেকো-স্লোভাকিয়ার পথে যাত্রা করেন।

৯ই অক্টোবর তাঁহারা প্র্যাগে আসিয়া পৌঁছাইলেন। স্টেশনে অধ্যাপক উইন্টারনীজ্ ও অধ্যাপক লেস্নি, কবিকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত ছিলেন। স্মরণ থাকিতে পারে ইঁহারা উভয়েই কিছুকালের জন্য বিশ্বভারতীতে 'ভিজিটিং-প্রফেসর' রূপে অধ্যাপনা করিয়া আসিয়াছেন। পরদিন সন্ধ্যায় তাঁহারা ওখানকার P.*E*.*N*. ক্লাবের এক ভোজসভায় কবিকে বিরাট সম্বর্দ্ধনা জানান। তাছাড়া অধ্যাপক উইন্টারনীজ্ ও অধ্যাপক লেস্নি উভয়েই কবিকে তাঁহাদের বাটিতে চা-এর মজলিসে নিমন্ত্রণ করেন। এই সব মজলিসে চেকোস্লোভাকিয়ার শ্রেষ্ঠ গুণীজন ও সুধীব্যক্তিদের সহিত কবির আলাপ-পরিচয় হয়।

১৬ই অক্টোবর তাঁহারা ভিয়েনায় আসিলেন। এখানে আসিয়া কবি অসুস্থ হইয়া পড়েন। এই সময় একবার তিনি রাশিয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন ; কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য সে-সংকল্প স্থগিত রাখিতে হয়। ভিয়েনায় বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ ডঃ সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের সহিত তাঁহার আলাপ-আলোচনা হয়। শ্রীমতী মহলানবিশ 'কবির সঙ্গে য়ুরোপ' গ্রন্থে এই সব মনীষীদের সঙ্গে কবির সাক্ষাৎকারের সরস বিবরণ দিয়াছেন।

২৬শে অক্টোবর, তাঁহারা হাঙ্গেরীর রাজধানী বুডাপেস্টে আসিলেন। হাঙ্গেরীতে আসিয়াই কবি পুনরায় অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। চিকিৎসকগণ পূর্ণ বিশ্রামের নির্দেশ দেন। 'বালাতন হ্রদে'র তীরে একটি স্বাস্থ্যনিবাসে কবি কিছুদিন বিশ্রাম গ্রহণ করেন। পত্রিকায় কবির অসুস্থতার সংবাদে উদ্বেগ প্রকাশ ও আরোগ্যকামনা করিয়া রোলাঁ কবিকে এক পত্র লেখেন (১১ই নভেম্বর)। ঐ পত্রের শেষে '*Confidential note*' দিয়া মুসোলিনী ও ফ্যাসিস্টদের সাম্প্রতিক নির্যাতনের খবর দিয়া রোলাঁ আরো লিখেন,

"I know not whether you have read in the papers of the terrible scenes which happened in Italy during the last fifteen days, since the outrage and bestial massacre of this 15-year old child at Bologna. Almost throughout the whole of Italy-frightful scenes of violence, robberies and destruction ; more than five to six thousand innocent people wounded. I learn this morning that at Naples the house of Benedetto Croce had been invaded, as well as the house of the well-known drama-

tist Roberto Bracco. A gifted draughtsman whom I knew, Scalarini, is dying.

"The affair of Colonel Ricciotti Garibaldi, arrested in France as an *agent-provocateur* of Fascism for fomenting false plots against Mussolini and receiving money from Mussolini's chiefs of police, in order to hand over the anti-fascist refugees in France and to compromise her hospitality in the eyes of the world, throws a sinister light upon this political system of crime and hypocrisy.

উপসংহারে রোলাঁ লিখিলেন,

"Often I have accused myself for having disturbed your rest when I took away from you the confidence you had in your Italian hosts. However, I had no other interest in my mind but your glory, which I value more than your rest. I did not want devils misusing your sacred name in the annals of history. Forgive me if my intervention has caused you some restless hours. The future (the present already) will show you that I have acted as your faithful and vigilant guide." [*Rolland and Tagore*-pp. 66-67]

এই সব সংবাদে রবীন্দ্রনাথ যে কী পরিমাণ মর্মাহত হইলেন তাহা অনুমান করা শক্ত নহে। ফ্যাসিজমের নৃশংস দানবীয় রূপ কবির চোখের সম্মুখে পরিষ্কার ফুটিয়া উঠিল। রোলাঁর মত রবীন্দ্রনাথের এত বড়ো সুহৃদ ইউরোপে আর কেহ বোধ হয় ছিল না,—অন্তত রোলাঁ তাই মনে করিতেন। সেই জন্যই বড়ো গলায় তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন, *'I did not want devils misusing your sacred name in the annals of history.'*······

যাহা হউক, অল্প কিছুদিন পর কবি একটু সুস্থ হইয়া উঠিলে, তাঁহারা যুগোশ্লাভিয়া যাত্রা করেন। ১৫ই নভেম্বর তাঁহারা রাজধানী বেলগ্রেডে পেঁছাইলেন। বেলগ্রেড ইউনিভার্সিটিতে কবি পর পর দুইদিন বক্তৃতা করেন।

১৭ই নভেম্বর তাঁহারা বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়ায় আসিলেন। বুলগেরিয়ার সীমান্ত হইতে একদল শিল্পী ও সাহিত্যিক কবিকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন। এখানকার শিল্পী ও মনীষীদের সম্মানিত অতিথিরূপে তাঁহারা দুইদিন অবস্থান করেন। তাঁহাদের উদ্যোগে এক বিরাট জনসভায়ও কবিকে বক্তৃতা করিতে হয়।

১৯শে নভেম্বর তাঁহারা রুমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্টে আসিলেন। ২১শে নভেম্বর সেখানকার 'ন্যাশনাল-থিয়েটার হলে' এক বিরাট জনসভায় কবিকে বক্তৃতা করিতে হয়। রুমানিয়ার রাজা ফার্ডিনেণ্ড, অসুস্থ অবস্থায় প্রাসাদে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে কবিকে আহ্বান করিয়া সাদর সম্ভাষণ ও আলাপ-আলোচনা করেন।

সেখান হইতে কবি তুরস্কের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল নগরীতে আসিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠান হইতে আমন্ত্রণ আসে। কিন্তু শরীর অসুস্থ থাকায় কবি তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই।

উহার পর তাঁহারা গ্রীসে আসিলেন (২৫শে নভেঃ)। আক্রোপলিস ও এথেন্সের ঐতিহাসিক দর্শনীয় বস্তুগুলি তাঁহারা পরিদর্শন করেন। গ্রীসের রাজা কবিকে *Commander of the Order of the Redeemer'* উপাধিতে ভূষিত করিলেন।

২৭শে নভেম্বর তাহারা আলেকজেন্দ্রিয়ায় পৌঁছাইলেন। মিশরে পর পর দুই তিনটি জনসভায় তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের সম্মানে মিশরের পার্লামেণ্ট অধিবেশন স্থগিত রাখিয়া তাঁহাকে এক সঙ্গীতানুষ্ঠানে অভ্যর্থনা জানান। এখানকার প্রধানমন্ত্রীর সহিতও কবির আলাপ-আলোচনা হয়। কিন্তু কবির মন তখন দেশে ফেরার জন্য ব্যাকুল।

১৯শে ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছাইলেন। স্টেশনে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও কলিকাতার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি কবিকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের এইবারের ইউরোপ ভ্রমণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ইউরোপের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রশ্নে যেসব যুগান্তকারী পরিবর্তন ও রূপান্তর চলিতেছিল, তাহাতে রবীন্দ্রনাথের মানসিক কি প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল, ইউরোপের দেশে দেশে আইনস্টাইন, ফ্রয়েড প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত মনীষী ও সুধীজনের সহিত কী কী বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হইয়াছিল, এবং কবি বিভিন্ন স্থানে যে-সব বক্তৃতা বা ভাষণ দিয়াছিলেন,—তাহার বিস্তারিত কোন বিবরণ ও তথ্যাদি সংগৃহীত হয় নাই। কবির অন্যান্যবারের বিদেশ ভ্রমণের বক্তৃতাগুলি যেমন, '*Nationalism,*' '*Sadhana,*' '*Personality,*' *Creative Unity*' প্রভৃতি গ্রন্থে সংকলিত হয়, তেমন কোন সংকলন-গ্রন্থও প্রকাশিত হয় নাই। কবি এইবারে পত্রচ্ছলে 'পথে ও পথের প্রান্তে' যে ডায়ারি লেখেন তাহাতে কবি স্বয়ং আক্ষেপ করিয়া বলেন, 'কিন্তু য়ুরোপভ্রমণের বৃত্তান্ত 'যা কোথাও প্রকাশ পেল না তার দাম খুব বেশি।' কবির এইবার ইউরোপ ভ্রমণের সব থেকে তাৎপর্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা হইল, ফ্যাসিজম্ ও যুদ্ধ সম্পর্কে আরো বেশী করিয়া সচেতনতা। তবে পূর্বাপর ভ্রমণগুলিতে যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ, বিশ্বসমস্যা, আন্তর্জাতিকতাবাদ ও বিশ্বশান্তি সম্পর্কে কবি যে-সব লিখিত আকারে সুচিন্তিত ভাষণ দেন এবার তেমন কিছু দেন নাই বলিয়াই মনে হয়। কেননা উহা সংগৃহীত না-হইবার তেমন কিছু যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না; প্রশান্তচন্দ্র কবির পাশে পাশে ছিলেন। অবশ্য কবির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি ও ভাষণ *Visva Bharati Quarterly*-তে প্রকাশিত হয়। তাছাড়া ভ্রমণ বৃত্তান্ত ইত্যাদির Newspaper clippings ইত্যাদি সংগৃহীত হইয়াছিল।

কবি যখন ইউরোপে তখন ব্রুসেলসে নির্যাতিত জাতিগুলির এক সম্মেলনের আয়োজন চলিতে থাকে। 'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও স্বাধীনতা অর্জনকামী

লীগ' নামে বিভিন্ন দেশের প্রবাসী বিপ্লবীরা একটি সঙ্ঘ গড়িয়া তুলেন। ভারতের প্রবাসী বিপ্লবী বীরেন চট্টোপাধ্যায় এই সংগঠন ও সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। ভারতবর্ষের পত্র-পত্রিকায় আসন্ন এই সম্মেলনের সংবাদ প্রকাশিত হয় এবং তাঁহারা অনুমান করেন রবীন্দ্রনাথ উহাতে তাঁহার একটি বাণী পাঠাইবেন। ১৪ই অক্টোবর মাদ্রাজের *'The Hindu'* পত্রিকা এই আসন্ন সম্মেলনের সংবাদ দিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ দেয়। তাহাতে লীগের কার্যকলাপ সম্পর্কে বলা হয়,

……"This League was founded in Berlin a few months back with the object of exposing the atrocities of the Powers in their colonies and also to combat the activities of the colonial party in this country which despite everything continues with unabated strength. Prominent intellectuals like Prof Einstein, Earnest Toller, Henri Barbusse, etc. have expressed their full sympathy with the objects of this League. It is satisfactory to note that on the committee of this League there is also the name of one Indian, a name not quite unfamiliar to India and particularly to the British Government, Mr. Virendranath Chattopadhyaya the brother of Sreemati Sarojini Naidu, for year a political exile in Germany is one of the two members representing Asia on this League. The other is a Chinese.

"The League has arranged to hold an international meeting in Brussels during November this year. Most of the countries are sending their own representatives. Among them also two governments, the Canton government and the Mexican government. The poet Rabindranath Tagore is expected to give a message would be read out on the occasion"

[*The Hindu*-14 Oct. 1926.]

যাহা হউক, নভেম্বর মাসে ব্রুসেলসে এই কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হইতে পারে নাই,—পর বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে উহা অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে জওহরলাল নেহরু উহাতে যোগদান করেন। যথাস্থানে উহা বিস্তারিত আলোচিত হইবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এবারে ইউরোপে থাকাকালে বীরেন চট্টোপাধ্যায় এবং এম. এন রয় প্রমুখ ভারতের বিপ্লবী নায়কেরা কয়েকজন—বিশেষ করিয়া বীরেন চট্টোপাধ্যায় কবির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসিয়াছিলেন। বীরেন চট্টো'র ভারতে ফেরার ব্যাপারে কবি লর্ড সিংহের মাধ্যমে বহু চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হন। নির্মলকুমারী তাহার ঐ গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত লিখিয়াছেন।

দেশে প্রত্যাবর্তনের পর রবীন্দ্রনাথ সরাসরি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন। শান্তিনিকেতনে তখন পৌষ-উৎসবের আয়োজন চলিতেছে।

এদিকে সারা দেশে তখন তীব্র সাম্প্রদায়িক বিরোধ-বিদ্বেষের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। নভেম্বর মাসে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের পূর্বেই স্বরাজ্যদলে ভাঙন ধরে। লালা লাজপৎ রায় ও পণ্ডিত মালব্য প্রমুখ হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতারা, ন্যাশনালিস্ট পার্টি নামে স্বতন্ত্র এক পার্টি গঠন করেন। স্বরাজ্যদলের অনেকেই এই দলে যোগদান করেন পক্ষান্তরে অধিকাংশ মুসলমান সদস্য সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলিতে যোগদান করেন। ফলে নির্বাচনে স্বরাজ্যদলের খুবই বিপর্যয় ঘটে। এদিকে নির্বাচনী প্রচারে সাম্প্রদায়িক দলগুলি প্রধানত ধর্ম ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকে প্রবলভাবে প্ররোচিত করিতে প্রয়াস পায়। নির্বাচনের পর কয়েকটি প্রদেশে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে মন্ত্রিত্ব গঠনেরও ধুয়া উঠে। এই প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা ও উত্তেজনার মুখে একদিন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ জনৈক মুসলিম আততায়ী কর্তৃক নিহত হইলেন (২৩ শে ডিসেম্বর, ১৯২৬)।

এই সংবাদে সারা দেশ স্তম্ভিত হইয়া যায়। অসহযোগ-আন্দোলনের সময় যে নির্ভীক স্বদেশপ্রেমিক যোদ্ধা দিল্লীর জুম্মা-মসজিদের উচ্চ-চূড়া হইতে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ডাক দিয়াছিলেন,—সেদিন গুর্খা-সৈন্যের উদ্যত-সঙ্গীনের সম্মুখে যিনি তাঁহার বক্ষ প্রসারিত করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহারই ভাগ্যে এই নিষ্ঠুর ও করুণ পরিণতি দেখিয়া সমস্ত দেশ শিহরিয়া উঠিল।

গান্ধীজী ব্যথিত চিত্তে লিখিলেন,

"Death is at any time blessed, but it is twice blessed for a warrior who dies for his cause, that is, truth…I cannot mourn over this death. He and his are to be envied. For though Shraddhanandji is dead, he is yet living…

"But there is another side to the shield. I regard myself as a friend of the Musalmans. They are my blood brothers. Their wrongs are my wrongs.…This foul deed has been done by one who bears a Musalman name. As a friend of the Musalmans, therefore, I deeply regret the event.…

…"Let us not ascribe the crime of an individual to a whole community. Let us not harbour the spirit of retaliation. Let us not think of the wrong as done by a Musalman against a Hindu, but of an erring brother against a hero."

[*Mahatma*.-*Vol-II*,-P. 237]

পৌষ-উৎসবের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ এই দুঃসংবাদ পান। এই সংবাদে কবি যে কী পরিমাণ মর্মাহত হইলেন, তাহা বলাই বাহুল্যমাত্র। কবি সংবাদপত্রে তাহার গভীর শোক ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া একটি বিবৃতি দেন। এই সময়ই কবি স্বামীজীর স্মৃতির উদ্দেশে 'স্বামী শ্রদ্ধানন্দ' প্রবন্ধটি আশ্রমবাসীদের সমক্ষে পাঠ করেন (১০ই পৌষ)। এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তিনি বলিলেন,

..."এর মধ্যে একটি কথা এই আছে যে, তাঁর মৃত্যু যতই শোচনীয় হোক, সে মৃত্যুতে তাঁর প্রাণ, তাঁর চরিত্র ততই মহীয়ান হয়েছে। বারে বারে ইতিহাসে দেখা যায়, নিজের সমস্ত দিয়ে যাঁরা কল্যাণব্রতকে গ্রহণ করেছেন, অপমান ও অপমৃত্যু তাঁদের ললাটে জয়তিলক এমনি করেই এঁকেছে।"......

এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য বিশেষ সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলি দেশের লোককে খুবই প্ররোচিত করিতে থাকে। কবি প্রথমেই সেই দিকে অঙ্গুলী-সংকেত করিয়া বলিলেন,

...."আজকের দিনে স্বভাবতই ক্রোধের উদয় হয়ে থাকবে, সে কথা স্বীকার করি। মানবধর্ম তো একেবারে ছাড়তে পারি নে। কিন্তু ক্রোধের দ্বারা যদি অভিভূত হই তবে সেও মানবধর্ম নয়।...অপরাধের গোড়ার কথাটা ভাবা চাই। শুনে হয়তো লোকে বলবে, না, এ তো ভালো লাগছে না; একটা প্রলয়-ব্যাপার বাধিয়ে দিতে পারলে সান্ত্বনা পাওয়া যায়।"

তিনি বলিলেন,

"ভারতবর্ষের অধিবাসীদের দুই মোটা ভাগ, হিন্দু ও মুসলমান। যদি ভাবি, মুসলমানদের অস্বীকার করে এক পাশে সরিয়ে দিলেই দেশের সকল মঙ্গলপ্রচেষ্টা সফল হবে, তা হলে বড়োই ভুল করব।...আমাদের সব চেয়ে বড়ো অমঙ্গল, বড়ো দুর্গতি ঘটে, যখন মানুষ মানুষের পাশে রয়েছে অথচ পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ নেই অথবা সে সম্বন্ধ বিকৃত।...এক দেশে পাশাপাশি থাকতে হবে, অথচ পরস্পরের সঙ্গে হৃদ্যতার সম্বন্ধ থাকবে না, হয়তো বা প্রয়োজনের থাকতে পারে—সেইখানেই যে ছিদ্র—ছিদ্র নয়, কলির সিংহদ্বার। দুই প্রতিবেশীর মধ্যে যেখানে এতখানি ব্যবধান সেখানেই আকাশ ভেদ করে ওঠে অমঙ্গলের জয়তোরণ।"......

স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতেই হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্পর্কে কবি ক্রমাগত এই কথাটি বার বার বলিয়া আসিতেছেন।—যে শুধু রাজনৈতিক প্রয়োজনে আঁতাত নয়—সে ঐক্য ও মিলন সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং পরস্পরের মধ্যে সত্যকারের প্রেম ও আত্মিক সম্বন্ধ স্থাপনে।

কিন্তু লোকের প্রশ্ন, আশু কর্তব্য কী,—দাঙ্গার সময় আক্রান্ত হইলে হিন্দুরা কি পড়িয়া পড়িয়া মার খাইবে? কবি তাহার উত্তরে হিন্দুদের দৃঢ় ঐক্যবদ্ধ হইয়া দাঙ্গাকারীদের আক্রমণ প্রতিরোধের আহ্বান জানাইয়া বলিলেন,

..."পাপের প্রধান আশ্রয় দুর্বলের মধ্যে। অতএব যদি মুসলমান মারে আর আমরা পড়ে পড়ে মার খাই, তবে জানব, এ সম্ভব করেছে শুধু আমাদের দুর্বলতা। আপনার জন্যেও, প্রতিবেশীর জন্যেও আমাদের নিজেদের দুর্বলতা

দূর করতে হবে। আমরা প্রতিবেশীদের কাছে আপিল করতে পারি 'তোমরা ক্রূর হোয়ো না, তোমরা ভালো হও, নরহত্যার উপরে কোনো ধর্মের ভিত্তি হতে পারে না'—কিন্তু সে আপিল যে দুর্বলের কান্না। বায়ুমণ্ডলে বাতাস লঘু হয়ে এলে ঝড় যেমন আপনিই আসে, ধর্মের দোহাই দিয়ে কেউ তাকে বাধা দিতে পারে না, তেমনি দুর্বলতা পুষে রেখে দিলে সেখানে অত্যাচার আপনিই আসে —কেউ বাধা দিতে পারে না।"... [কালান্তর ॥ পৃঃ ৩১৯-২৬]

সেই সময় গৌহাটিতে কংগ্রেসের ৪১-তম অধিবেশন শুরু হয়। সভাপতি ছিলেন শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার। তিনি তাঁহার অভিভাষণে প্রধানত সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করিয়া ধর্মনিরপেক্ষ-রাজনীতির একটি সঠিক গণতান্ত্রিক পরিপ্রেক্ষিত রাখিতে গিয়া বলিলেন,

"The intrusion into politics of religion, and very often of dogmatic religion, must be resisted as a primitive or mediaeval idea, born of theocracies, and disastrous alike to religion and to politics. Hinduism and Islam will gain immeasurably in strength and purity if they are not mixed up with secular politics.......

[*Congress Presidential Addresses-Vol. II*. p. 818]

কংগ্রেসের প্রথম যুগ হইতেই মডারেট নেতৃবৃন্দ ঠিক এই দৃষ্টিকোণ হইতে ধর্মকে রাজনীতি হইতে তফাতে রাখিবার আবেদন জানাইয়া আসিতেছিলেন। বলা বাহুল্য মাত্র, খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের সময় হইতেই ভারতের জাতীয় রাজনীতিতে নূতন করিয়া উগ্র ধর্মীয় উন্মাদনা অনুপ্রবেশ লাভ করে। এসব কথা পূর্বেই বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে।

অন্যান্য বারের মত গৌহাটি-কংগ্রেসেও 'পূর্ণ-স্বাধীনতার' প্রস্তাবটি উঠিলে গান্ধীজী পুনরায় উহার বিরোধিতা করিয়া বলিলেন,

"Year after year, a resolution is moved in the Congress to amend the Congress creed so as to define swaraj as complete independence, and year after year, happily, the Congress throws out the resolution by an overwhelming majority. The rejection of the resolution is proof of the sanity of the Congress. The moving of the resolution betrays the impatience—pardonable in the circumstances—of some ardent Congressmen who have lost all faith in the British intentions and who think that the British Government will never render justice to India."... [*Mahatma-Vol.* II.p.239

লক্ষ্য করিবার বিষয়, গান্ধীজী তখনও পর্যন্ত ইংরেজের বিবেকবুদ্ধির উপর সম্পূর্ণভাবে আস্থা হারান নাই।

গৌহাটি-কংগ্রেসে আইনসভার সদস্যদের নির্দেশ দেওয়া হয়, কংগ্রেস কোনো

ক্ষেত্রেই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবে না এবং অন্য কোনো দলও যাহাতে মন্ত্রিত্ব গঠন করিতে না-পারে তাহার চেষ্টা করিবে ; তবে জাতীয় সম্পদ ও অর্থনৈতিক উন্নতিকল্পে যাহাতে আইনানুগ সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাহার জন্য সদস্যরা চেষ্টা করিবে। বিশেষ করিয়া, শ্রমিক ও কৃষকের স্বার্থগুলির দিকে তাহাদের লক্ষ্য রাখিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। তাছাড়া সরকারী দমননীতির প্রতিবাদ করিয়া প্রেস, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দাবিতেও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দক্ষিণ-আফ্রিকা ও অন্যান্য দেশে প্রবাসী ভারতীয়দের মানবিক ও গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিও ঘোষণা করা হয়।

তখনও 'কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলা' ও 'দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার' জের চলিতেছে। কবির ইতালি যাত্রার কয়েকদিন পরই আলিপুর জেলে তদন্তকারী কুখ্যাত পুলিশ অফিসার রায়বাহাদুর ভূপেন্দ্র চ্যাটার্জী দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার আসামীগণ কর্তৃক নিহত হয় (২৮শে মে, ১৯২৬)। স্পেশাল ট্রাইবুনালের রায়ে অনন্তহরি মিত্র, বীরেন্দ্রকুমার ব্যানার্জী ও প্রমোদরঞ্জন চৌধুরীর প্রাণদণ্ড ও বাকী সকলের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডাদেশ হয়। গবর্ণমেণ্ট দেশের সন্ত্রাসবাদী ও বিপ্লবী আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবার জন্য অর্ডিনেন্সের সাহায্যে তখনও যুবক কর্মীদের গ্রেপ্তার করিতেছে। এই সময় বার্মার মান্দালয় জেলে সুভাষচন্দ্র প্রমুখ বিপ্লবী নেতাদের দেশে ফিরাইয়া আনা ও মুক্তির জন্য এবং সমস্ত বিনাবিচারে আটক রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য কলকাতায় প্রবল বিক্ষোভ আন্দোলন চলে। এই পরিস্থিতিতে কবির পক্ষে আর চুপ করিয়া থাকা সম্ভবপর হইল না। তিনি কলিকাতায় আসিয়াই ইংরেজ সরকারের এই বর্বর দমন-নীতির তীব্র প্রতিবাদ করিয়া এক বিবৃতি প্রকাশ করিলেন (৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯২৭)। তিনি লিখিলেন,

"According to the teaching of our modern law-givers we refuse to believe that our countrymen who are being punished without trial are guilty of any crime. Taking shortcuts in law is like setting the whole house on fire in order to roast one's pig,—it is the primitive form of despotism. That we are amazed at such instances happening to us, is the best compliment that can be paid to the British administration in India. For we know that even in the West there are governments which in their attempt to enforce loyalty have no scruple in blindly applying the hasty method of punishment that has no restriction of law. The mind of the rulers whose misfortune is to govern a people that are physically helpless, is daily being sucked into the depths of demoralisation. For want of adequate resistance they are too often tempted to simplify the problem of administration by breaking through the

barriers of their own law, thus not only doing injustice to their subjects, but much more so to themselves. As they have partially paralysed their own courts of justice, which represent their conscience, we have no other recourse but to appeal to the higher nature of the Britiss people, and to remind them that civilisation takes infinite trouble to prove itself, to keep the lamp of its best ideals from being extinguished,—and that is why it is more afraid of the innocent being punished than of the chance of escape of the guilty.

"We cannot claim the sympathy of kinship from our ruling race, while on the other hand, we only make our impotence ludicrous when we insinuate retaliation—our only claim is the claim of humanity which if refused comes secretly to hurt those who ignore it." [*Forward*-Feb 3, 1927]

আদর্শ ও নীতিগত ভাবে রবীন্দ্রনাথ সন্ত্রাসবাদ ও বিপ্লবপন্থী আন্দোলনকে কখনও সমর্থন করেন নাই বটে তবে যখনই সন্ত্রাসবাদীদের উপর নির্যাতনের ঝড় বহিয়া গিয়াছে তখনই তিনি উহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দাবিতে কবি সারা জীবন সংগ্রাম করিয়াছেন।

এই সময় বাংলা সরকার কিছু পত্র-পত্রিকা ও পুস্তিকা রাজদ্রোহমূলক অভিযোগে নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত করিয়া লয়। শরৎচন্দ্রের 'পথের-দাবী' তাহাদের মধ্যে অন্যতম। শরৎচন্দ্র ঐবিষয়ে কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া উহার প্রতিবাদে কিছু লিখিবার জন্য কবিকে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু বার বার শুধু প্রতিবাদ জানাইতে কবির যেন ক্লান্তি ও বীতরাগ জন্মিতে থাকে। শরৎচন্দ্রকে জবাবে যাহা লিখিলেন, তাহা যেন তাঁহার নিজের উপরই মৃদু ভৎর্সনা। তাঁহার বক্তব্য, অত্যাচার ও পীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পরিণামে যে আঘাত ও দুঃখ আছে তাহাকে বীরের মত স্বীকার করিয়া লওয়াই আমাদের কর্তব্য। অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ ও প্রতিবাদ করিব অথচ অত্যাচারীর বিবেক বুদ্ধি ও ন্যায়পরতার দোহাই পাড়িয়া প্রতিকার মাগিব. ইহা তাঁহার কাছে দুর্বলের কান্না বলিয়া বোধ হয়। অত্যাচার ও পীড়ন যত কঠিনই হউক, তাহার জন্য যে কোন দুঃখ ভোগের জন্য প্রস্তুত থাকা দরকার। প্রসঙ্গক্রমে তিনি একথাও লিখিলেন যে, তাঁহার বিদেশভ্রমণের অভিজ্ঞতা হইতে তিনি বলিতে পারেন যে, অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের তুলনায় দমননীতিতে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ অপেক্ষাকৃতভাবে কম নৃশংস। শরৎচন্দ্র কবির বক্তব্যের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারেন নাই এবং তিনি কবির উপর বেশ একটু অভিমানও করেন। আমাদের মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের মনে তখনও মুসোলিনী ও ফ্যাসিস্ট ইতালির নৃশংস-দলননীতির তিব্রটি আলোড়ন সৃষ্টি করিতেছিল। কবি ইংরেজের দমননীতির

বর্বরতাকে কোনদিনই লঘু করিয়া দেখান নাই তবে ফ্যাসিজমের নৃশংসতা ও বর্বরতার যেন কোন পরিমাপ ও তুলনা নাই, একথা তিনি ইউরোপে স্পষ্ট জানিয়া-শুনিয়া আসিয়াছিলেন।

সম্ভবত ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি নাগাদ কবি অ্যাঁরি বারবুসের নিকট হইতে এক পত্র পান। মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ট দলননীতির প্রতিবাদে এই সময় বারবুস ও রোলাঁ প্রমুখ ইউরোপের কিছু বিবেকী বুদ্ধিজীবী একটি প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে প্রয়াস পান। রোলাঁ তাঁহার ডায়ারিতে [শিল্পীর নব-জন্ম-পৃ ৬৫] লিখিতেছেন,

……"১৯২৭ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী প্যারীর সাল-ব্যুলিয়েতে প্রথম বৃহৎ ফাশিজমু-বিরোধী সভার অধিবেশন হয়। এলবার্ট আইনস্টাইন, অ্যাঁরি বারবুস ও রমাঁ রোলাঁ সভাপতিত্ব করেন। *League for the Rights of Man*-এর সহসভাপতি পল লাঁজভ্যাঁ কার্যকরী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।"

বারবুস ঐ-পত্রে কবিকে লিখিলেন,

"Dear and Eminent Colleague,

Allow me to join a personal appeal to the one included herewith and to which I am requesting you to adhere. Your name is one of those which impose themselves in a league of great honest people who would stand up to oppose and fight the invading barbarity of Fascism.

"I have worded this appeal spontaneously, without listening to any suggestion of a political order, or anything like it: I have only followed the feeling of solidarity and the voice of common sense. The evil is not without remedy. Something cane be done, and what can be done before all with regard to the frightful proportions Fascism has teken, is to raise a moral protest, to mobilize the real public consciousness, and to give an explicit voice to the reprobation which is to be heard everywhere.

"I must add that concerning the tenor of this appeal, I have exchanged views with Romain Rolland *who is heartily* with me, and who also thinks that a levy of free spirits, a protest of enlightened and respected persons is the only thing likely, if it is organised and contineuous, to put a stop to an abominable state of things."

পরিশেষে তিনি *Monde* নামক তাঁহাদের একটি আন্তর্জাতিকতাবাদী পত্রিকায় কবিকে মাঝে মাঝে কিছু লিখিবার অনুরোধ জানাইলেন। রবীন্দ্রনাথকে লিখিত ইহাই বারবুসের দ্বিতীয় পত্র। প্রায় ৫ বৎসর পূর্বে,—১৯২২ সালে বারবুস

Clarte পত্রিকায় কবিকে লিখিবার অনুরোধ জানাইয়া প্রথম পত্রটি লেখেন। তাছাড়া ১৯১৯ সালে, *Clarte* এর ঘোষণাপত্রেও রবীন্দ্রনাথ স্বাক্ষরদান করিয়াছিলেন। সেই সময় স্বয়ং বিপিন পাল কবির এই মহান ভূমিকার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন।

যাহাই হউক, বারবুস্ ঐ পত্রের সহিত 'লীগে'র ফতোয়া বা আবেদনপত্রটিও কবিকে পাঠাইয়া দেন। কবি ফ্যাসিজম্ ও অত্যাচার-নিপীড়নের বিরুদ্ধে ইউরোপের বুদ্ধিজীবীদের এই প্রতিরোধ-আন্দোলনের সংহতিতে পূর্ণ সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া বারবুস্‌কে লিখিলেন,

"Dear friend,

'It is needless to say that your appeal has my sympathy, and I feel certain that it represents the voices of numerous others who are dismayed at the sudden outbursts of violence from the depth of civilization.

"It is natural to expect in primitive peoples their faith in ceremonies of power-worship dripping with human blood; their awe-struck veneration for the relentless physical force that, at first, coerces and then fascinates its victims into the adject obedience of a slavery. Such a mental attitude only indicates an immaturity of moral consciousness which, like the thoughtless cruelty of adolescence, can claim a future of growth for its rectification.

"But when a similar phenomenon makes its appearance among cultured peoples it proves the second infancy of senility that has lost its control over animal passions. Its greed is not of impulsive youth, but of a hardened old age efficiently unscrupulous. Its infection is noxious because while it exhales from its core an unwholesome odour of decay and death, its outer skin swells and glows with an exultant flush of rotteness.

"Therefore I rejoice at the fact that there are individuals who still believe in a higher destiny of man, proving in their suffering the deathless life of the human soul ever ready to fight its own aberrations."

[*Visva-Bharati Quarterly* : July, 1927-pp 192-95.]

অপরদিকে, এসিয়ার পূর্বদিগন্তে যুদ্ধ ও সংঘর্ষের কালো মেঘ ঘনীভূত হইয়া উঠিল। ১৯২৬ সালের শেষভাগে জেনারেল চিয়াংকাইশেকের নেতৃত্বে কুওমিংটাঙ বাহিনী সমগ্র উত্তর-চীন অভিযানে দ্রুত অগ্রসর ও সাফল্য লাভ করিতে থাকে। ক্রমে, ১৯২৭ সালের প্রথমভাগেই তাহারা হ্যাংকাও, শাংহাই

প্রভৃতি ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত বন্দরগুলি দখল করিতে অগ্রসর হয়। জানুয়ারীর প্রথম ভাগেই ইংরেজরা পুনরায় ভারতবর্ষ হইতে বিরাট এক সৈন্যবাহিনী এই আক্রমণকে প্রতিহত করিবার জন্য শাংহাইয়ে প্রেরণ করে ; ২২শে মার্চ চীনের ন্যাশনালিস্ট-বাহিনী শাংহাই অংশত দখল করে তাহার দুইদিন পর নানকিংও তাহাদের দখলে আসে, (দ্রঃ *Glimpses of World History*-pp.830-32)।

রবীন্দ্রনাথ গভীর উদ্বেগের ও আশংকার সহিত উহার পরিণতি লক্ষ্য করিতেছিলেন। স্মরণ রাখা দরকার, অল্পকাল পূর্বেই তিনি ভারতীয় পুলিস ও সৈন্যদের ইংরেজ সাম্রাজ্যরক্ষার কাজে সাহায্য করার জন্য তীব্র বিদ্রূপ ও নিন্দা করেন। কিন্তু এই সব ঘটনার পর সরাসরি তিনি চীনের পক্ষ গ্রহণ করিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের তীব্র নিন্দা ও সমালোচনা, করিয়া বিবৃতি দেন। এই সময় 'নটীর পূজা' অভিনয় (২৮-৩০ জানুয়ারী) উপলক্ষে কবি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। ৩০শে জানুয়ারী *Forward* পত্রিকার পক্ষে বিশেষ প্রতিনিধি চপলাকান্ত ভট্টাচার্য মশায় চীনে ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী অভিযান ও ভারতীয় সৈন্য প্রেরণ সম্পর্কে কবির অভিমত জানিতে চাহিলে কবি এক দীর্ঘ বিবৃতি (*Forward*-'Feb 4, 1927) দেন। পরে উহা *Unity* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি লিখিলেন, (*Unity* of Chicago)

"I have always felt very keenly on the subject of China and have never failed to express my condemnation of the policy that is being pursued there. The present expedition of the English against China is a crime against humanity, and to our utter shame India is being used as pawn in the game.

"The perpetrators of this tyranny that is doing havoc in China always keep themselves behind, while the Indians, who are being used as tools in carrying out their nefarious designs, have to come in direct contact with the Chinese people. The result is that all their resentment and hatred are directed against the Indians; so much so that they call us demons. It is not an unfamiliar sight in China to see the Indian policeman pulling chinese by the hair and kicking him down for no apparent resons. What wonder is there that we should be characterized by that title !···

···"*Enslaved as we are to our utter shame, we are being used as instruments for forging fetters for other people. In a crusade against justice, freedom and morality where the English are the aggressors, India is being dragged into the field against her own will*···.

"And what has India to gain by allowing such a huge

waste of money and man-power ? By fighting for a cause which is so disreputable, her sons cannot claim to be recognized as heroes,···That is why India is regarded by other Asiatic Power as *a menace to their freedom*."···

তারপর এই আক্রমণে ইংরেজের মিথ্যা অজুহাতগুলি খণ্ডন করিতে গিয়া কবি আরও লিখিলেন,

"We are being repeatedly reminded by the British statesmen that England is fighting on the defensive in China. But who gave the offencs, may I ask ?···Why was Hong Kong wrested away from the Chinese people by force ?···*It was the English who took up the original offensive*, and they should not now take shelter under the false cry of a defensive campaign. *It is China that is really on the defensive.*

"Let the English indulge in the free exercise of their arbitrary will within India, but let them not compel us to participate in the colosal crime against humanity in China. Let them desist from the unholy exploitation of the helplessness of a people in order to rob other people of their heritage.···

উপসংহারে কবি পুনরায় আসন্ন মহাযুদ্ধের হুঁসিয়ারী দিয়া বলিলেন,

"War clouds hover to-day over the sky of humanity. The cry resounds in the West : and Asia doth prepare weapons in her armouries of which the target is to be the heart of Europe : and nests are being built on the shores of the Pacific for the ravening vulture-ships of England." ······ইত্যাদি

[*Modern Review*-July 1927-pp. 94-95.]

কিন্তু বিস্ময়ের কথা,—ভারতের অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতৃবর্গের মাথায় তখন জাতীয়তাবাদী চিন্তার বাহিরে এই সব আন্তর্জাতিক প্রশ্ন ও সমস্যার বিশেষ কোন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না। যুদ্ধোত্তর ইউরোপের রাজনীতিক এবং সাংস্কৃতিক সমস্যা ও সাধনার কী ভীষণ যুগান্তকারী পরিবর্তন চলিতেছে, তাহার কোনো উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়া বা প্রতিফলন কংগ্রেস নেতৃবর্গের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই কই ? ভারতের সোস্যালিস্ট এবং কমিউনিস্ট পার্টি ও আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট কিছু বুদ্ধিজীবী এবং বিদেশে ভারতের প্রবাসী বিপ্লবীরা (মানবেন্দ্র রায়, বীরেন চট্টোঃ প্রমুখ) আধুনিক রাজনীতিক চিন্তাধারার সহিত তাল মিলাইয়া চলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তবে ভারতের রাজনীতিক শক্তি হিসাবে এইসব দল, গোষ্ঠী ও বুদ্ধিজীবী তখনও তাঁহাদের রাজনীতির পরিষ্কার অবয়ব ও রূপ দিতে পারেন নাই ;

ভারতের জনগণেরও জনমানসের উপর ইঁহাদের প্রভাব খুবই সামান্য বা নগন্য। জাতীয় নেতৃবর্গের একমাত্র ব্যতিক্রম বোধ হয় জওহরলাল। কিন্তু তখন তাঁহারও আন্তর্জাতিকতাবাদ সম্পর্কে কোন স্বচ্ছ ধারণা ছিল না, এ'কথা তিনি তাঁহার আত্মজীবনীতে বিবৃত করিয়াছেন।

জওহরলাল তখন পারিবারিক কারণে ইউরোপে। বার্লিনে থাকিতেই তিনি ব্রুসেলস্‌-এ নির্যাতিত জাতিগুলির সম্মেলনের সংবাদ পান। তিনি এই সম্মেলনে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে নেহরুর বক্তব্যটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি লিখিতেছেন,

"১৯২৬-এর শেষভাগে বার্লিন থাকাকালীন আমি শুনিতে পাইলাম যে, শীঘ্রই ব্রুসেল্‌সে নির্যাতিত জাতিগুলির এক কংগ্রেসের বৈঠক বসিবে।...... ব্রুসেলস্‌ কংগ্রেসে ভারতীয় রাষ্ট্র মহাসভার পক্ষ হইতে সরকারী ভাবে প্রতিনিধি প্রেরণ করা উচিত এই মর্মে আমি ভারতে পত্র লিখিলাম। আমার প্রস্তাব মঞ্জুর হইল এবং আমি ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলাম।

"১৯২৭-এর ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে ব্রুসেলস্‌-এ কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল। ইহার প্রবর্তক কে আমি জানি না। এই কালে সর্বদেশের রাজনৈতিক, নির্বাসিত চরমপন্থীদের আকর্ষণের কেন্দ্র ছিল বার্লিন।... কমিউনিস্টরাও এখানে শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। নির্যাতিত জাতিসমূহ নিজেদের মধ্যে এবং বামপন্থী শ্রমিকদের সহিত মিলিত হইয়া এক সাধারণ উদ্দেশ্যে কার্য করিবার কথা তখন আলোচনা করিতেছিল। স্বাধীনতার সর্ববিধ সংঘর্ষ সাম্রাজ্যবাদরূপী এক সাধারণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। অতএব সকলের মিলিতভাবে কার্যপদ্ধতি স্থির এবং সম্ভব হইলে একত্রে কার্য করাই উচিত, এই শ্রেণীর কথা অনেকেই ভাবিতেছিলেন।...

"যাহা হউক অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংঘের পৃষ্ঠপোষক হইলেন। ইঁহাদের মধ্যে আইনষ্টাইন, মাদাম সান-ইয়াৎ সেন এবং আমার মনে হয় রমাঁ রোলাঁও ছিলেন।

"ব্রুসেলস্‌ কংগ্রেস এবং পর পর বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত সংঘের কমিটির অধিবেশন হইতে আমি পরাধীন দেশ ও উপনিবেশগুলির সমস্যা সম্পর্কে অনেক জ্ঞানসঞ্চয় করিলাম। পাশ্চাত্য শ্রমিকজগতের আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ ও সংঘাত ইহার মধ্য দিয়া আমি অধিকতর স্পষ্টভাবে দেখিতে পারিলাম। ইতিপূর্বেও আমি কিছু কিছু জানিতাম এবং পুঁথি-পুস্তকেও কিছু পাঠ করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার জ্ঞানের পশ্চাতে কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা বা ব্যক্তিগত, যোগাযোগ ছিল না।...শ্রমিকজগতে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক অপেক্ষা তৃতীয় আন্তর্জাতিকের প্রতি আমার সহানুভূতি ছিল।...এই কারণে সদিচ্ছা লইয়া আমি অনিবার্যরূপে কমিউনিজমের দিকে ঝুঁকিলাম। ইহার আর যে দোষই থাক্‌ অন্তত ইহার ভণ্ডামি নাই এবং ইহা সাম্রাজ্যবাদী নহে।...আমি অত্যন্ত সীমাবদ্ধরূপে ইহার মোটামুটি অবয়বের সহিত পরিচিত ছিলাম। ইহা এবং

রাশিয়ার অভূতপূর্ব পরিবর্তনের প্রতি আমি আকৃষ্ট হইলাম।”...

[আত্মচরিত-সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার অনূদিত ॥ পৃ ১৭৪-৭৭]

উল্লেখযোগ্য, ১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে নেহরু-রা (পিতা-পুত্রে) ‘নভেম্বর বিপ্লবের’ দশম-বার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপনের সময়ে মস্কোতে উপস্থিত ছিলেন। সোভিয়েট রাশিয়া পরিদর্শনের পর জওহরলাল অত্যন্ত প্রভাবিত হইয়া প্রত্যাবর্তনের পর সোবিয়েত দেশের প্রশংসা করিয়া একটি পুস্তিকা লেখেন।

প্রসঙ্গক্রমে ইহাও উল্লেখযোগ্য, ১৯২৬ সালের শেষভাগে রবীন্দ্রনাথ যখন ইউরোপ পরিভ্রমণ করিতেছেন তখনও জওহরলাল ইউরোপে ছিলেন। কিন্তু ইউরোপে কোথাও তাঁহাদের সাক্ষাৎকার হয় নাই। নেহরু বার্লিনে ও জেনেভায় কিছুদিন ছিলেন এবং রোলাঁর সহিত সাক্ষাতকারের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইতালির ফ্যাসিজম্ এবং মুসোলিনী-রবীন্দ্রনাথ সংক্রান্ত গোলমালের কথা আত্মজীবনীতে কোথাও উল্লেখ করেন নাই। নিঃসন্দেহে ইউরোপে সেদিনে উহা খুবই চাঞ্চল্যপূর্ণ ঘটনা ছিল। আর একটি কথা, তিনি তাঁহার আত্মজীবনীতে ইতালির ফ্যাসিস্ট নির্যাতন ও প্যারিসে প্রথম ফ্যাসি-বিরোধী সম্মেলনের খবরও উল্লেখ করেন নাই। ফ্যাসিজমের কালো মেঘ ইউরোপের ভাগ্যাকাশে যে মহাবিপদের সূচনা করিয়াছিল, সে সম্পর্কে তিনি যে তখনও পর্যন্ত সচেতন হইতে পারেন নাই, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

কিন্তু তবুও ভারতের পররাষ্ট্রনীতি ও আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারণে ব্রুসেল্‌সে নির্যাতিত জাতিগুলির সম্মেলনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। এই জন্য ঐ-সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলি ও উহার রাজনীতিক মূল চিন্তাটি একটু আলোচনা করা দরকার।

এই সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তাদের মধ্যে বীরেন চট্টোপাধ্যায় ও A. Gibarti প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সম্ভবত বীরেন চট্টোঃ জওহরলালের পরামর্শক্রমে ভারতবর্ষে গান্ধীজীকে এই সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান। গান্ধীজী বিনীতভাবে তাঁহার অক্ষমতার কথা জানাইয়া সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া এক বাণী পাঠান। তিনি লিখেন,

“Dear Friends,

I thank you very cordially for your invitation to the Brussells International Congress against Colonial Oppression and Imperialism. I regret that my work here in India prevents my taking part in the Congress I wish you, however, from the depths of my heart, every success in your deliberations.”

ঐ সম্মেলনে ব্রিটিশ, চীন ও ভারতীয় প্রতিনিধিদের এক যুক্ত বিবৃতিতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি ঘোষণা করা হয় :

“We, the undersigned, British, Indian, and Chinese delegations, consider that the task of all working-class forces

in Imperialist countries is :

"(1) To fight for full emancipation side by side with the national forces in oppressed countries, in order to secure complete independence wherever such national forces so desire.

(2) To oppose all forms of coercion against colonial peoples.

(3) To vote against all credits. naval, military and air, for the maintenance of armed force to be used aginst oppressed nations.

(4) To expose the horrors of Imperialism to the civil and military populations.

(5) To expose imperialistic policy, in the light of the working-class struggle for freedom."

সম্মেলনের আলোচনায় চীনের পরিস্থিতির উপর সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেওয়া হয়, তাছাড়া চীনের জরুরী অবস্থা-সংক্রান্ত বিষয়ে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয়,

"(1) We demand the immediate withdrawal of all armed forces from Chinese territory and waters.

(2) We urge the need of direct action, including strikes and the imposition of the embargo to prevent movements of munitions and troops either to India or China and from India to China.

(3) That estimates relating either to war-like preparations or to war shall be voted against.

(4) That in the event of armed intervention or open war every weapon and effort shall be made within the labour movement to use every weapon possible in the working-class struggle to be used to prevent hostilities.

(5) We demand the unconditional recognition of the Nationalist Government, the abolition of the unequal treaties and of extra-territorial rights and the surrender of foreign concessions.

(6) Finally, in the interests of Trade Union and Labour Movements in Britain, India and China we pledge ourselves to work for their immediate, close and active co-operation."

ইহা ছাড়াও চীন ও ভারতের প্রতিনিধিরা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের এক সম্মিলিত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য যুক্ত-বিবৃতি দেন। উহার উপসংহারে বলা হয়,

"We trust that the leaders of the Indian movement will do all in their power to co-ordinate their struggle with that of the Chinese people so that by simultaneously engaging British Imperialism on two of its most vital fronts, China may receive active support in her present struggle and the final victory of both people may be secured.

[*Modern Review*-May 1927.-pp. 555-66]

জওহরলাল ব্রুসেলস্-কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত সহ দেশে A. I. C. C.-র নিকট একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পাঠান। ১৯২৭ সালে মে-মাসে A. I. C. C.-র এক অধিবেশনে ব্রুসেলস্-কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের ও নেহরুর রিপোর্টের ভিত্তিতে কয়েকটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু ফ্যাসিজমের উদ্ভব ও বিপদ সম্পর্কে তখনও তাঁহারা সচেতন নয় এবং কোন সিদ্ধান্ত বা নীতি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। উল্লেখযোগ্য ব্রুসেলস্-কংগ্রেসের উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন অ্যাঁরি বারবুস্ এবং মুসোলিনী ও তাঁহার অত্যাচারে নির্বাসিত ইতালীয়ান পার্লামেণ্টের সদস্য Prof Guio Miglioni মুসোলিনী ও ইতালির ফ্যাসিস্ট দলননীতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া ঐ-কংগ্রেসে এক দীর্ঘ হৃদয়বিদারক ভাষণ দেন।

আর একটি উল্লেখযোগ্য কথা, ভারতবর্ষের কতিপয় মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর মধ্যে ও জাতীয়তাবাদী পত্র-পত্রিকায় এই সময় ফ্যাসিজমের তৈলাক্ত প্রচারকার্য শুরু হয়। রোলাঁ উহা লক্ষ্য করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের উদ্দেশে এক সতর্কবাণী প্রেরণ করেন। উহা ১৯২৭ সালের ১৫ই জানুয়ারি 'ইণ্ডিয়ান ডেলি মেলে' প্রকাশিত হয়।

এই সময় রবীন্দ্রনাথ ফ্যাসিজম্, সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধের আসন্ন বিপদ সম্পর্কে হুঁসিয়ারী দিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে ইঙ্গ-মার্কিন পুঁজিবাদী সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধেও তিনি সমালোচনা করিতে থাকেন। এই সম্পর্কে *Dublin Evening Herald* (3rd March, 1927) একটি কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ দিয়া লিখিতেছে,

"Rabindranath Tagore, India's poet laureate, has declared that the depiction of night life, domestic relations, crime, and undignified scenes in American films, in Western flims, released throughout Asia and Africa are 'libel on Western civilisation' and that the exaggerated scenes of Asiatic life presented to Western audiences seem to him to be equally bad. That these misrepresentations of Western life lead to a political as well as to a social depreciation of the white man in the eyes of Orientals is the reason for a protest addressed to the American Government against certain examples of American producers."...

আরও উল্লেখযোগ্য, এই সময়ই কবি তাঁহার আমেরিকা ভ্রমণগুলির (১৯১৬ ও ১৯২১ সালের) তিক্ত, অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করিয়া *'The Atlantic Monthly'* পত্রিকায় মার্কিনী সভ্যতার তীব্র সমালোচনা করেন। উহা "বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি" পত্রিকায় (এপ্রিল-১৯২৭) পুনর্মুদ্রিত হয়। পূর্বেই উহার উল্লেখ করা হইয়াছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন রোঁলা-বারবুস প্রমুখ প্রগতিশীল ও কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন বুদ্ধিজীবীদের আন্তর্জাতিক সংস্থার সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেছিলেন অপরদিকে ইংলণ্ড ও আমেরিকার উদার-নীতিক ভাবুক সম্প্রদায়ের কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সহিতও তেমনি তিনি তিনি যুক্ত ছিলেন। এই সম্পর্কে মাদ্রাজের *'The Hindu'* (25th July 1927) পত্রিকা লিখিতেছে,

"*The Union of East and West* was started in London seventeen years ago through the zeal of Mr. K. N. Das Gupta (কেদারনাথ দাশগুপ্ত—লেখক) and at that time it enlisted the support of many well known people including Viscount Bryce, Rabindranath Tagore, Keir Hardie, Sir Oliver Lodge and H. G. Wells. During the last few years the promoters of the organisation have been chiefly active in the United States, wher two important offshoots have been established, knwon as the *Fellowship of Faith* and the *League of Neighbours*."

স্মরণ রাখা দরকার, ১৯২০ সালের অক্টোবরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কেদারনাথ দাশগুপ্ত আমেরিকায় আসেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় আমেরিকায় *'Union of East and West'* সোসাইটি গড়িয়া উঠে। তারপর দীর্ঘকাল তিনি আমেরিকায় কাটান। ১৯২৭ সালের জুলাই মাসে আমেরিকায় *'Fellowship of Faiths'* ও *'League of Neighbours'* নামে যে-দুইটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গড়িয়া উঠে কেদারনাথ তাহার অন্যতম প্রধান-উদ্যোক্তা ছিলেন। কেদারনাথ দাশগুপ্ত রবীন্দ্রনাথের একজন প্রধান ভক্ত ছিলেন এবং আমেরিকায় থাকিতে তিনি কবির সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেছিলেন বলিয়াই অনুমিত হয়। তবে এখনও পর্যন্ত সেই সম্পর্কে তেমন নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি পাওয়া যায় নাই।

ইতিমধ্যে জাভা হইতে রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণ আসে। খুব সম্ভবত ১৯২৭ সালের মে-জুন নাগাদ ইংরেজ-শাসিত মালয় ও ওলন্দাজ-শাসিত জাভা হইতে কবির আমন্ত্রণ আসে। এই ভ্রমণের জন্য যুগল কিশোর বিড়লা দশ সহস্র ও নারায়ণ দাস বাজোরিয়া এক সহস্র টাকা দিয়াছিলেন।

'পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ' (অধুনাকালের ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, মালয়, শ্যামদেশ) ভ্রমণের ইচ্ছা কবির বহুদিনের। ১৯০৩সালেই জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ চীন, জাপান ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রাচীন প্রাচ্য-সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার ও গবেষণা কার্যের জন্য সুযোগ্য ব্যক্তিদের প্রেরণ করিবার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও গৌরবময় পুরাকীর্তিগুলির প্রতি রবীন্দ্রনাথ অন্তরে-অন্তরে গভীর আকর্ষণ অনুভব করিতেন। ১৪ই জ্যৈষ্ঠ (১৩৩৪) কবি রামানন্দবাবুকে এক পত্রে লিখিতেছেন যে, বিড়লাদের নিকট হইতে অর্থ সাহায্য না-আসিলেও অন্যত্র উহা সংগ্রহ করিয়া তিনি পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ভ্রমণে যাইবেন। তিনি লিখিতেছেন,

…"জাভা গভর্মেণ্টের কাছে আমি অর্থসাহায্য প্রার্থনাও করি নি। বিরলা যদি সাহায্য না করেন তবে আমি যেমন ক'রে পারি নিজের ব্যয়েই যাব —সেখান থেকে ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ এবং এ সম্বন্ধে গবেষণার স্থায়ী ব্যবস্থা করা ছাড়া আমার অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। আমি নিজে বোধ করি অতি অল্প দিনই থাকব এবং যদি সাধ্যে কুলোয় তবে কোনো ব্যক্তিকে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের জন্য রেখে দিয়ে আসব। কাজটাকে আমি গুরুতর প্রয়োজনীয় ব'লে মনে করি এবং এও জানি আমার দ্বারা কাজটা সহজসাধ্য হতেও পারে। জাভা গভর্ণমেণ্ট আমাকে নিমন্ত্রণ করেন নি। সেখান থেকে যাঁদের উৎসাহ পেয়েছি তাঁরা পুরাতত্ত্ববিৎ—আমাদের দেশের পণ্ডিতের সহযোগিতা পেলে তাঁদের সন্ধানকার্যের সুবিধা হ'তে পারবে।"

[প্রবাসী-১৩৪৮ আশ্বিন ॥ পৃ ৬৬১]

এই চিঠিতেই কবির এই সফরের উদ্দেশ্যটি পরিষ্কার ব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। জাভার '*Kunst Kring*' 'জাভা ইন্‌স্টিটিউট্' নামে দুইটি ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পরিষদ হইতে কবির নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল।

যাত্রার পূর্বে 'বৃহত্তর-ভারত-পরিষদের,' (*Greater India Society*) পক্ষ হইতে কবির এই সাংস্কৃতিক-অভিযানের সাফল্য ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া ইউনিভার্সিটি-ইনস্টিটিউট হলে বাংলার তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ও সংস্কৃতিবিদগণ কবিকে বিদায়-সম্বর্ধনা জানাইলেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অধ্যাপক যদুনাথ সরকার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ অনেকেই সেই সভায় উপস্থিত

ছিলেন। অল্প কিছুকাল আগে ডাঃ কালিদাস নাগ প্রভৃতি কয়েকজনের উদ্যোগে *'Greater India Society'* স্থাপিত হয় এবং রবীন্দ্রনাথ উঁহার প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন। এই সম্বর্ধনা সভায় কবি 'বৃহত্তর ভারত' নামক লিখিত প্রবন্ধটি পাঠ করেন। তিনি বলিলেন,

…"আজ একটা আকাঙ্ক্ষা আমাদের মধ্যে জেগেছে, যে আকাঙ্ক্ষা ভারতের বাহিরেও ভারতকে বড়ো ক'রে সন্ধান করতে চায়। সেই আকাঙ্ক্ষাই বৃহত্তর ভারতের প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে রূপ গ্রহণ করেছে। সেই আকাঙ্ক্ষাই আপন প্রত্যাশা নিয়ে আমাকে অভিনন্দন করছে। এই প্রত্যাশা আমার চেষ্টাকে সার্থক করুক।"

রবীন্দ্রনাথ বার বার বলিয়া আসিয়াছেন, ভারতীয় সভ্যতার ঐতিহ্য তাহার রাজনৈতিক ও সামরিক ইতিহাসের মধ্যে নাই; ভারতের অধ্যাত্মসাধনায় যে-সুমহান মানবতাবাদ সর্বোচ্চ স্থান পাইয়াছে, সেইখানেই তার মহত্তম পরিচয়। তাই তিনি বলিলেন,

"ভারতবর্ষের যে বাণী আমরা পাই যে বাণী শুধু উপনিষদের শ্লোকের মধ্যে নিবদ্ধ তা নয়। ভারতবর্ষ বিশ্বের নিকট যে মহত্তম বাণী প্রচার করেছে তা ত্যাগের দ্বারা, দুঃখের দ্বারা, মৈত্রীর দ্বারা, আত্মার দ্বারা—সৈন্য দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে, পীড়ন লুণ্ঠন দিয়ে নয়। গৌরবের সঙ্গে দস্যুবৃত্তির কাহিনীকে বড়ো বড়ো অক্ষরে আপন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সে অঙ্কিত করে নি।"

তিনি বলিলেন,

"অহংকেই যে মানুষ পরম ও চরম সত্য বলে জানে সেই বিনাশ পায়। সকল দুঃখ সকল পাপের মূল এই অহমিকায়। বিশ্বের প্রতি মৈত্রী ভাবানাতেই এই অহংভাব লুপ্ত হয়, এই সত্যটি আত্মার আলোক।…এই আলোকের আভাতেই ভারত আপন ভূখণ্ডসীমার বাইরে আপনাকে প্রকাশ করেছিল। সুতরাং এইটিই হচ্ছে ভারতের সত্য পরিচয়।"……

ভারতবর্ষ একদা যে-বৃহত্তর মানবতাবোধ,—যে অহিংসা, প্রেম ও মৈত্রীর উপর ভিত্তি করিয়া প্রতিবেশী দেশের সহিত সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়িয়া তুলিয়াছিল কবি ভাবাবেগে আজ তাহাকেই নূতন যুগ-চেতনার আলোকে আমাদের সাধনার লক্ষ্য ও ভিত্তি করিবার আহ্বান জানাইলেন। তাই তিনি সতর্ক করিয়া দিয়া বলিলেন, ভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃতির কোন আত্ম-গরিমা লইয়া যেন আমরা প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও দেশের মানুষকে না দেখি,—আমরা যেন সেই প্রেম ও মৈত্রীর ভাবটিকে সদাই অন্তরে জাগরূক করিয়া রাখি,

"জাভায় যখন যাব তখন মনকে অহংকারমুক্ত ক'রে সত্যের অমৃতমন্ত্রের ক্রিয়াটি দেখে যেন নম্র হতে পারি। সেই মৈত্রীর মহামন্ত্রটি নিজের মধ্যেই পাওয়া চাই, তা হলেই আমার চিত্তে যেখানে অরণ্য সেখানে মন্দির উঠবে, যেখানে মরুভূমি সেখানে সৌন্দর্যের রসবৃষ্টি হবে, জীবনের তপস্যা জয়যুক্ত হয়ে সার্থক হয়ে উঠবে।"

[কালান্তর ॥ পৃ ৩০৪-১৩]

১২ই জুলাই কবি সদলবলে মাদ্রাজ রওনা হন। ১৪ই জুলাই মাদ্রাজ হইতে ফরাসী জাহাজ 'আঁবোয়াজ'-এ করিয়া তাঁহারা সিঙ্গাপুরের পথে যাত্রা করেন। কবির এই বারের ভ্রমণে সঙ্গে ছিলেন ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, আরিয়াম (আর্যনায়কম্), সুরেন্দ্রনাথ কর, ও ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মণ।

পথিমধ্যে জাহাজে বসিয়া কবি লিখিতেছেন 'জাভাযাত্রী'-র পত্রধারা। বিশ্ব-সমস্যার গুরুতর বিষয়গুলির কথাই তিনি চিন্তা করিতে করিতে শ্রীমতী নির্মল-কুমারী মহলানবিশকে এক পত্রে লিখিতেছেন (১লা শ্রাবণ ১৩৩৪),

"য়ুরোপ সর্বদেশ সর্বকালকে যে স্পর্শ করেছে সে তার কোন্ সত্য দ্বারা। তার বিজ্ঞান সেই সত্য।······

"বিজ্ঞান যে বিশুদ্ধ তপস্যার প্রবর্তন করেছে সে সকল দেশের, সকল কালের, সকল মানুষের—এই জন্যেই মানুষকে তাতে দেবতার শক্তি দিয়েছে, সকলরকম দুঃখ দৈন্য পীড়াকে মানবলোক থেকে দূর করবার জন্যে সে অস্ত্র গড়ছে ; মানুষের অমরাবতী নির্মাণের বিশ্বকর্মা এই বিজ্ঞান।···বর্তমান যুগে মানুষের মধ্যে সেই দেবতার শক্তি দেখা দিয়েছে য়ুরোপে। কিন্তু সেই শক্তি কি মানুষকে মারবার জন্যেই দেখা দিল। গত য়ুরোপের যুদ্ধে এই প্রশ্নটাই ভয়ংকর মূর্তিতে প্রকাশ পেয়েছে। য়ুরোপের বাইরে সর্বত্রই য়ুরোপ বিভীষিকা হয়ে উঠেছে, তার প্রমাণ আজ এসিয়া আফ্রিকা জুড়ে। য়ুরোপ আপন বিজ্ঞান নিয়ে আমাদের মধ্যে আসে নি, এসেছে আপন কামনা নিয়ে। তাই এসিয়ার হৃদয়ের মধ্যে য়ুরোপের প্রকাশ অবরুদ্ধ। বিজ্ঞানের স্পর্ধায়, শক্তির গর্বে, অর্থের লোভে, পৃথিবী জুড়ে মানুষকে লাঞ্ছিত করবার এই-যে চর্চা বহু-কাল থেকে য়ুরোপ করছে, নিজের ঘরের মধ্যে এর ফল যখন ফলল তখন আজ সে উদ্‌বিগ্ন। তৃণে আগুন লাগাচ্ছিল, আজ তার নিজের বনস্পতিতে সেই আগুন লাগল। সে ভাবছে, থামব কোথায়। সে থামা কি যন্ত্রকে থামিয়ে দিয়ে।"···

কবি তাহার উত্তরে বলিলেন,

···"আমি তা বলিনে। থামাতে হবে লোভ। সে কি ধর্ম-উপদেশ দিয়ে হবে। তাও সম্পূর্ণ হবে না। তার সঙ্গে বিজ্ঞানেরও যোগ চাই।··· দুইয়ের সম্মিলনে সাধনা সিদ্ধ হয়, বিজ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে ধর্মবুদ্ধির আজ মিলনের অপেক্ষা আছে।"

জাভা-যাত্রাকালে এই সব তর্ক কেন, তাহার কৈফিয়তে কবি বলিলেন,

···"এর কারণ হচ্ছে এই যে, ভারতবর্ষের বিদ্যা একদিন ভারতবর্ষের বাইরে গিয়েছিল। কিন্তু সেই বাইরের লোক তাকে স্বীকার করেছে। তিব্বত মঙ্গোলিয়া মালয়দ্বীপসকলে ভারতবর্ষ জ্ঞানধর্ম বিস্তার করেছিল, মানুষের সঙ্গে মানুষের আন্তরিক সত্যসম্বন্ধের পথ দিয়ে। ভারতবর্ষের সেই সর্বত্রপ্রবেশের ইতিহাসের চিহ্ন দেখবার জন্যে আজ আমরা তীর্থযাত্রা করেছি। সেই সঙ্গে এই কথাও দেখবার আছে, সেদিনকার ভারতবর্ষের বাণী শুষ্কতা প্রচার করেনি। মানুষের ভিতরকার ঐশ্বর্যকে সকল দিকে উদ্বোধিত করেছিল, স্থাপত্যে

ভাস্কর্যে চিত্রে সংগীতে সাহিত্যে ;"…

[রবীন্দ্ররচনাবলী-১৯শ খণ্ড ।। পৃ ৪৫৪-৫৬]

কবির অনুক্ত বক্তব্য এই, আধুনিক সমস্যা-কণ্টকিত জগতকে ইহা কোন সমাধানের ইঙ্গিত দেয় না কী ?

মানুষের চির-বিদ্রোহী ও সংগ্রামী-সত্তার জয়গান গাহিয়া ইহার দুইদিন পরে এক চিঠিতে তিনি লিখিতেছেন, (৩রা শ্রাবণ),

'তীরে দাঁড়িয়ে মানুষ সামনে দেখল সমুদ্র। এত বড়ো বাধা কল্পনা করাই যায় না।…চিরবিদ্রোহী মানুষ বললে, 'নিষেধ মানব না'। বজ্রগর্জনে জবাব এল, 'না মান তো মরবে।' মানুষ তার এতটুকুমাত্র বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তুলে বললে, 'মরি তো মরবো'! এই হল জাত-বিদ্রোহীদের উপযুক্ত কথা। জাত-বিদ্রোহীরাই চিরদিন জিতে এসেছে। একেবারে গোড়া থেকেই প্রকৃতির শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে মানুষ নানা ভাবেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে দিলে। আজ পর্যন্ত তাই চলছে।…

"সত্তার এই বিদ্রোহমন্ত্রের সাধনায় মানুষ যতদূর এগিয়েছে এমন আর-কোনো জীব না। মানুষের মধ্যে যার বিদ্রোহশক্তি যত প্রবল, যত দুর্দমনীয়, ইতিহাসকে ততই সে যুগ হতে যুগান্তরে অধিকার করছে, শুধু সত্তার ব্যাপ্তি দ্বারা নয়, সত্তার ঐশ্বর্য দ্বারা।

"এই বিদ্রোহের সাধনা দুঃখের সাধনা ; দুঃখই হচ্ছে হাতি, দুঃখই হচ্ছে সমুদ্র। বীর্যের দর্পে এর পিঠে যারা চড়ল তারাই বাঁচল ; ভয়ে অভিভূত হয়ে এর তলায় যারা পড়েছে তারা মরেছে। আর, যারা একে এড়িয়ে সস্তায় ফল লাভ করতে চায় তারা নকল ফলের ছদ্মবেশে ফাঁকির বোঝার ভারে মাথা হেঁট করে বেড়ায়। আমাদের ঘরের কাছে সেই জাতের মানুষ অনেক দেখা যায়। বীরত্বের হাঁকডাক করতে তারা শিখেছে, কিন্তু সেটা যথাসম্ভব নিরাপদে করতে চায়। যখন মার আসে তখন নালিশ করে বলে, বড়ো লাগছে। এরা পৌরুষের পরীক্ষাশালায় বসে বিলিতি বই থেকে তার বুলি চুরি করে, কিন্তু কাগজের পরীক্ষা থেকে যখন হাতের পরীক্ষার সময় আসে তখন প্রতিপক্ষের অনৌদার্য নিয়ে মামলা তুলে বলে, 'ওদের স্বভাব ভালো নয়, ওরা বাধা দেয়।'

[ঐ ।। পৃ ৪৬২-৬৪]

এই কটাক্ষ ও বক্রোক্তি যে দেশের নেতৃবর্গকে লক্ষ্য করিয়া, তাহা বলাই বাহুল্যমাত্র। একটি জিনিস লক্ষ্য করিবার মত, প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আহ্বান জানাইবার প্রশ্নে কবি আশ্চর্য রকমের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার বহু কাব্যে, রূপক-নাট্যে ও রচনায় ভয়াবহ সংগ্রাম ও বিদ্রোহের পরিষ্কার নির্দেশ আছে। তাঁহার এইসব কবিতা ও সঙ্গীত চির-বিদ্রোহী মানুষকে যুগে-যুগে উদ্দীপনা সাহস ও প্রেরণা জোগাইবে।

২০শে জুলাই জাহাজ সিঙ্গাপুরে পৌঁছিল। সিঙ্গাপুরের গভর্ণর স্যর হিউ ক্লীফোর্ড, এবং চীনা ও ভারতীয় নরনারীগণ কবিকে অভ্যর্থনা জানান। পরদিন 'সিঙ্গাপুর গার্ডেন কলারের' পক্ষ হইতে কবিকে বিরাট সম্বর্ধনা জানান হয়। তিনি তাঁহার ভাষণে ভারত-চীন সাংস্কৃতিক সম্পর্ক, বিশ্ব-সমস্যা ও বিশ্বভারতীর

আদর্শ এবং লক্ষ্য সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। সিঙ্গাপুরে তাঁহারা ছয় দিন কাটান। এই কয়দিনে বহু সভাসমিতিতে কবিকে বক্তৃতা করিতে হয়। উহার বিস্তৃত বিবরণ সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'দ্বীপময় ভারত' পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

২৭শে জুলাই তাঁহারা ইংরেজ শাসিত মালাক্কায় পৌঁছাইলেন। এখানকার ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট এবং প্রবাসী বাঙ্গালীদের পক্ষ হইতে শ্রীশচন্দ্র গুহ কবিকে যথোচিত সম্বর্ধনা করিয়া লইয়া গেলেন। এখানে প্রায় তিন দিন তাঁহাদের থাকা হয়।

৩০শে জুলাই তাঁহারা মালাক্কা হইতে কুআলা-লুম্‌পুরের পথে যাত্রা করেন। স্টেশন হইতে কবিকে বিরাট সম্বর্ধনা করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। পরদিন স্থানীয় টাউনহলে কবি-সম্বর্ধনা হয়। সভায় বিরাট জনসমাগম হয়—তাহার মধ্যে বহু ভারতীয় উপস্থিত ছিলেন। ইহার পর তাঁহারা আরো কয়েকদিন মালয় উপদ্বীপের বিভিন্ন শহর ও শিল্পকেন্দ্রে ঘুরিয়া পরিদর্শন করিয়া বেড়াইলেন।

মালয় ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথকে লইয়া একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। মালয়ের ইংরেজ বাগিচাওয়ালারা ভারতীয় কবির এই রাজোচিত সম্বর্ধনাকে সুনজরে দেখিতে পারে নাই। কয়েক মাস পূর্বে চীনের জাতীয়-আন্দোলনকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে ইংরেজরা ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনী প্রেরণ করিলে রবীন্দ্রনাথ উহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া যে-বিবৃতি দেন—উহাকেই উপলক্ষ করিয়া মালয়ের ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের 'মালয়া-ট্রিবিউন' নামে একটি মুখপত্র কবিকে অত্যন্ত জঘন্য ও কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ করিয়া লেখে। এই প্রসঙ্গে শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিতেছেন,

…"এই ইংরেজি প্রবন্ধ (কবির বিবৃতি—লেখক) হইতে 'শাঙহাই টাইমস্‌' ও তার থেকে 'মালায়া ট্রিবিউন' বিকৃত অংশাবিশেষ নিয়া কবির বিরুদ্ধে লিখিতে আরম্ভ করে। ট্রিবিউনের এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধের কথা জানিতে পারিয়া কবি সিঙাপুরের সবচেয়ে প্রতিষ্ঠাপন্ন কাগজে প্রতিবাদ করিয়া এক তার পাঠাইয়া দেন। মডার্ন রিভিউ-এর প্রবন্ধ বিকৃত করিয়া যে ছাপা হইয়াছে, এই তথ্যটি সুনীতিবাবুদের দৃষ্টিগোচর করেন কুআলা-লুম্‌পুরের এক তামিল যুবক। তথাকার ভারতীয়দের সংবাদপত্র 'মালায়ান ডেলি এক্সপ্রেস' (৬ই আগস্ট ১৯২৭) Anti-Tagore bubble pricked—an object lesson in dishonest journalism—mischievous propaganda বলে কড়া মন্তব্য লিখিলেন। কবির লেখায় 'that' এর জায়গায় 'and' ও একটা সেমিকোলন দিয়া অর্থের উলট পালটা করা হইয়াহিল। কুআলা-লুম্‌পুরের ইংরেজদের কাগজ 'মালায়া মেল' আগে থাকিতেই কবির তথা ভারতীয়দের বিরোধী ছিল, এখন 'মালায়া ট্রিবিউন' তার সঙ্গে গলা মেলালে। চীনে ভারতীয় সৈন্য পাঠানোর বিরুদ্ধে কবি যে বিরুদ্ধমত প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন, সে-মত থেকে একটুও সরেন নি।…

[রবীন্দ্রজীবনী-তৃতীয় খণ্ড ॥ পৃ ২১৯]

১৬ই আগস্ট মালয় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা সুমাত্রা যাত্রা করেন। পরদিন বেলাওয়ান বন্দরে তাঁহাদের জাহাজ ভিড়িল। ওলন্দাজ সরকারের মুখপাত্রগণ ও বহু প্রবাসী ভারতীয় কবিকে সম্বর্ধনা জানাইলেন। পরদিন তাঁহারা সিঙ্গাপুরের পথে যাত্রা করেন। সিঙ্গাপুরে দুইদিন থাকার পর তাঁহারা যবদ্বীপের পথে যাত্রা করেন। ২১শে আগস্ট তাঁহারা যবদ্বীপের তানজোং প্রিয়ক্ বন্দরে পেঁছালেন। তারপর প্রায় আরও দুই মাসকাল ধরিয়া তাঁহারা জাভা, বালি ও শ্যাম দেশের বিভিন্ন শহর বন্দর ও ঐতিহাসিক দর্শনীয় বস্তুগুলি ঘুরিয়া পরিদর্শন করিয়া বেড়ান। তাহার বিস্তারিত বিবরণ 'দ্বীপময় ভারত' 'রবীন্দ্রজীবনী' (৩য় খণ্ড), 'বিশ্বভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ' প্রভৃতি পুস্তিকায় বর্ণিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ এই ভ্রমণকালে, শুধু যে এইসব পুরাকীর্তির ধ্বংসাবশেষ হইতে ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ বা অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন, তাহা নহে। এখানকার সাধারণ মানুষের সাংস্কৃতিক জীবন তাঁহাকে খুবই আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করে। এখানকার ধর্ম, রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয়, কারুশিল্প ও লোক-সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকগুলি গভীরভাবে উপলব্ধি ও অনুধাবনের চেষ্টা করেন। তাঁহার 'জাভাযাত্রীর পত্র'-এর পাতায় পাতায় এই উচ্ছ্বসিত উপলব্ধি অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই যাত্রায় নন্দলাল আসেন নাই বলিয়া কবির আক্ষেপের অন্ত ছিল না। পরবর্তী কালে শান্তিদেব ঘোষকে কবি জাভায় প্রেরণ করিয়াছিলেন যাহার ফলে জাভা ও বালি দ্বীপের নৃত্য-অভিনয়ের বহু আঙ্গিক-কলার সুস্পষ্ট প্রভাব পড়ে শান্তিনিকেতনের নৃত্যে বা রবীন্দ্রনৃত্যে। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর সুরেন কর মহাশয় বিশ্বাভারতীর কলাভবনে এখানকার 'বাটিক শিল্পের' প্রবর্তন করেন। রবীন্দ্রজীবনীকার লিখিতেছেন,

…"কবির সঙ্গী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর জাভা পরিভ্রমণ কালে তথাকার বাতিক শিল্প Batike সংক্রান্ত সকলপ্রকার সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়াছিলেন; তাছাড়া কি ভাবে কাপড়ে মোম দিয়া কারুকার্য করিতে হয় তাহা তন্নতন্ন করিয়া পর্যবেক্ষণ করিয়া আসেন। দেশে ফিরিয়া কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ ইহার প্রসারের চেষ্টা করেন; বিশবৎসরের মধ্যে বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীদের মারফত ভারতের নানাস্থানে ইহার প্রচার হইয়াছে। বস্তুতান্ত্রিক বা ব্যবহারিক দিক হইতে কবির দ্বীপাবলী ভ্রমণ সার্থক হইয়াছে।"…

[ঐ-পৃ ২২৬]

এই ভ্রমণকালেই কবি তাঁহার বিখ্যাত 'সাগরিকা' কবিতাটি রচনা করেন (১ অক্টোবর ১৯২৭)। উহার শেষ স্তবকে লিখিলেন,

"মিনতি মম শুন হে সুন্দরী,
আরেক-বার সমুখে এসো প্রদীপখানি ধরি।
এবার মোর মকরচূড় মুকুট নাহি মাথে,
ধনুকে বাণ নাহি আমার হাতে;

এবার আমি আনি নি ডালি দখিনসমীরণে
সাগরকূলে তোমার ফুলবনে।
এনেছি শুধু বীণা,
দেখো তো চেয়ে, আমারে তুমি চিনতে পার কি না।”

ইহাতে ঔপনিবেশিকদের লুব্ধ শ্যেন দৃষ্টি নাই। প্রেমের বীণার মধুর ঝঙ্কারে কবি পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বন্দনা গান গাহিলেন। বেরোবুদুর দর্শনের পরও কবির মনে এই ভাবই জাগিয়াছিল—'বোরোবুদুর' কবিতায় তা' অন্য ভঙ্গিতে প্রকাশ পায়, (২৩শে সেপ্টেম্বর)

“চিত্ত আজ শান্তিহীন লোভের বিকারে,
হৃদয় নীরস অহংকারে।
ক্ষিপ্রগতি বাসনার তাড়নায় তৃপ্তিহীন ত্বরা,
কম্পমান ধরা ;
বেগে শুধু বেড়ে চলে ঊর্ধ্বশ্বাসে মৃগয়া-উদ্দেশে,
লক্ষ্য ছোটে পথে পথে, কোথাও পৌঁছে না পরিশেষে ;
অন্তহারা সঞ্চয়ের আহুতি মাগিয়া
সর্বগ্রাসী ক্ষুধানল উঠেছে জাগিয়া ;
তাই আসিয়াছে দিন
পীড়িত মানুষ মুক্তিহীন,
আবার তাহারে
আসিতে হবে যে তীর্থদ্বারে
শুনিবারে
পাষাণের মৌনতটে যে-বাণী রয়েছে চিরস্থির—
কোলাহল ভেদ করি শত শতাব্দীর
আকাশে উঠিছে অবিরাম
অমেয় প্রেমের মন্ত্র,—'বুদ্ধের শরণ লইলাম'।”

এই ভ্রমণকালে তিনি যে ডাচ্ বা ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদকে একেবারেই দেখিতে পান নাই তাহা নহে। জাভার চিনি শিল্পের (Sugar industry) উন্নত প্রণালী দেখার পর তিনি প্রতিমা দেবীকে এক পত্রে লিখিতেছেন,

...“যারা ওস্তাদ গোয়ালা তারা জানে কিরকম খোরাকি বা প্রজননবিধির দ্বারা গোরুর দুধ বাড়ানো চলে। এই শ্যামল দ্বীপটি ওলন্দাজদের পক্ষে ধরণী-কামধেনুর দুধভরা বাঁটের মতো। তারা জানে, কোন্ প্রণালীতে এই বাঁট কোনোদিন একফোঁটা শুকিয়ে না যায়, নিয়ত দুধে ভরে থাকে ; সম্পূর্ণ দুইয়ে-নেবার কৌশলটাও তাদের আয়ত্ত।”...

[রবীন্দ্ররচনাবলী-১৯'খণ্ড ।। পৃ ৫০২]

বিলিটন দ্বীপপুঞ্জে টিনের খনিশিল্প দেখিয়া কবি মন্তব্য করিতেছেন,

...“এই জায়গাটাতে বিশ্বকর্মার মাটির ব্যাগ ছিঁড়ে অনেকগুলো ছোটো ছোটো দ্বীপ সমুদ্রের মধ্যে ছিটকে পড়েছে। সেগুলো ওলন্দাজদের দখলে।

এখন যে-দ্বীপে জাহাজ নোঙর ফেলেছে তার নাম বিলিটন। মানুষ বেশি নেই ; আছে টিনের খনি, আর আছে সেই সব খনির ম্যানেজার ও মজুর। আশ্চর্য হয়ে বসে বসে ভাবছি, এরা সমস্ত পৃথিবীটাকে কিরকম দোহন করে নিচ্ছে।"··· [ঐ ॥ পৃ: ৫২২]

কিন্তু ওলন্দাজদের সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধি থাকিলেও তাহারা এখানে উন্নত কৃষি-পদ্ধতির প্রবর্তন করিয়াছে এবং এই দৃশ্যে তিনি ভারতবর্ষের ব্রিটিশ শাসনের সহিত ইহার তুলনা না-করিয়া পারিলেন না, তাই প্রতিমা দেবীকে ঐ পত্রেই লিখিলেন,

···"আমাদের কর্তৃপক্ষও তাঁদের গোয়ালবাড়ি ভারতবর্ষে বসিয়েছেন ; চা আর পাট নিয়ে এতকাল তাঁদের হাট গুলজার হল ; কিন্তু, এদিকে আমাদের চায়ের খেত নির্জীব হয়ে এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে জিব বেরিয়ে পড়ল চাষিদের। এতকাল পরে আজ হঠাৎ তাঁদের নজর পড়েছে আমাদের ফসলহীন দুর্ভাগ্যের প্রতি। কমিশন বসেছে, তার রিপোর্টও বেরোবে। দরিদ্রের চাকাভাঙা মনোরথ রিপোর্টের টানে নড়ে উঠবে কিনা জানি নে, কিন্তু রাস্তা বানাবার কাজে যে-সব রাজমজুর লাগবে মজুরি মিলতে তাদের অসুবিধে হবে না। মোট কথা, ওলন্দাজরা এখানে কৃষিক্ষেত্রে খুব ওস্তাদি দেখিয়েছে ; তাতে এখানকার লোকের অন্নের সংস্থান হয়েছে, কর্তৃপক্ষেরও ব্যবসা চলেছে ভালো। এর মধ্যে তত্ত্বটা হচ্ছে এই যে, দেশের প্রতি প্রেম জানাবার জন্যে দেশের জিনিস ব্যবহার করব, এটা ভালো কথা ; কিন্তু দেশের প্রতি প্রেম জানাবার জন্যে দেশের জিনিস-উৎপাদনের শক্তি বাড়াতে হবে, এটা হল পাকা কথা। এইখানে বিদ্যার দরকার ; সেই বিদ্যা বিদেশ থেকে এলেও তাকে গ্রহণ করলে আমাদের জাত যাবে না, পরন্তু জান্ রক্ষা হবে।" [ঐ ॥ পৃ:-৫০২]

বলা বাহুল্যমাত্র, এই শোষোক্ত মন্তব্যটি দেশের খাদি ও চরকা প্রচারকদের উদ্দেশ করিয়াই।

আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, এই ভ্রমণ কালেই বিলাতের *New Statesman* পত্রিকায় মিস্ ক্যাথারিণ মেয়োর কুখ্যাত *'Mother India'* পুস্তকটির একটি সমালোচনা কবির নজরে পড়ে। তাহাড়া ঐ পুস্তিকায় লেখিকা রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত টানিয়া আনিয়া তাঁহার বক্তব্যের বিকৃত উদ্ধৃতি দিয়া কবিকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাতে কবি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বিলাতের 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকায় ঐ সমালোচনার এক তীব্র প্রতিবাদ পত্র পাঠাইলেন। কবি লিখিলেন,

"While travelling in this land of Bali, I have juat chanced upon a copy of the New Statesman of the 16th of July, containing the review of a book on India written by a tourist from America. The reviewer, while supporting with an unctuous virulence all the calumnies heaped upon our people by the authoress, and while calling repeated attention to the alleged

common Hindu vice of untruthfulness even amongst the greatest of us, has made public a *malicious piece of fabrication* not as one of the specimens picked up from a show-case of wholesale abuse displayed in this or some other book, but as a gratuitous information about the truth of which the writer tacitly insinuates his own personal testimony. It runs thus: 'The poet Sir Rabindranath Tagore expresses in print his conviction that marriage should be consummated before puberty in order to avert the vagaries of female sexual desire.'...

"We have become painfully familiar with deliberate circulation of hideous lies in the West against enemy countries, but a similar propaganda against individuals, whose country-men have obviously offended the writer by their political aspiration, has come to me as a surprise."...

[*Modern Review*-October 1957-P. 486]

২৭শে অক্টোবর কবি কলিকাতায় পৌঁছিলেন। ইহার অল্পকাল পরেই মিস্ মেয়োর 'মাদার ইণ্ডিয়া' বইখানার প্রতিবাদে কবি তীব্র এক সমালোচনা লেখেন (*Modern Review*-December 1927)। তাছাড়া ঐ পত্রিকায় গান্ধীজী (অক্টোবর সংখ্যায়) রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, আগনেস্ স্মেড্লি, প্রমুখ অনেকেই উহার প্রতিবাদে সমালোচনা করেন।

জাভা যাত্রার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা ও বিতর্ক উত্থাপনের উদ্দেশ্যে 'সাহিত্যধর্ম' (বিচিত্রা-শ্রাবণ ১৩৩৪) নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া যান। অনতিকালের মধ্যে উহার ফল ফলিল। 'কল্লোল-গোষ্ঠী' ও নবীন সাহিত্যিকদের পক্ষে অস্ত্রধারণ করিলেন শরৎচন্দ্র ও নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখ সাহিত্যিকেরা। নরেশচন্দ্র লিখিলেন, 'সাহিত্যধর্মের সীমানা' (বিচিত্রা-১৩৩৪ ভাদ্র) ও 'কৈফিয়ৎ' (বিচিত্রা-১৩৩৪ অগ্রহায়ণ); শরৎচন্দ্র লিখিলেন, 'সাহিত্যের রীতিনীতি' (বঙ্গবাণী-১৩৩৪ আশ্বিন); এবং দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ লিখিলেন 'সাহিত্যধর্মের সীমানা-বিচার' (বিচিত্রা—১৩৩৪ আশ্বিন)। মোট কথা বাংলাদেশের সাহিত্যিক মহলের মধ্যে কবির ঐ প্রবন্ধটি খুবই বিতর্ক ও আলোড়ন সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথ তখন জাভা-বালিদ্বীপ ভ্রমণে রত। এই ভ্রমণ কালেই বালিদ্বীপের পথে কবি লেখেন 'সাহিত্যের নবত্ব' নামে অপর একটি প্রবন্ধ। কবির দেশে প্রত্যাবর্তনের পর উহা 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত (১৩৩৪ অগ্রহায়ণ) হইলে বিতর্ক আরও তীব্র আকার ধারণ করে।

স্মরণ রাখা দরকার, প্রায় ১৩ বৎসর পূর্বে রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে-বাস্তবতা লইয়া একচোট বিতর্ক হয় (১৩২১) সালে)। তারপর ১৯২০ সালের পর, 'নবযুগ', 'মোসলেম ভারত', 'লাঙ্গল', 'গণবাণী', 'সংহতি', 'শনিবারের চিঠি', 'কল্লোল', 'বিচিত্রা', 'কালিকলম' ও 'গণবাণী' ছিল প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক প্রচারমূলক সাহিত্যপত্র—মার্কসীয় দৃষ্টি-ভঙ্গিতে যাহারা জনচেতনাকে জাগ্রত ও উদ্বুদ্ধ করিতে বদ্ধপরিকর হয়। তবে নব্যপন্থীদের মধ্যে এইকালে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য হইল, 'কল্লোল' ও 'কালিকলম'-গোষ্ঠীর সাহিত্যিকেরা। নুট হামসুন, যোহান বয়ার প্রমুখ নরওয়েজিয়ান এবং এমিল জোলা ও মোঁপাসা প্রমুখ ফরাসী ন্যাচারিলিস্ট সাহিত্যিকদের প্রভাব খুব বেশী রকমের পড়ে ইঁহাদের উপর। স্পর্ধাভরে ইঁহারা রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিসিজমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। দারিদ্র্য, যৌনজটিলতা, বেকার সমস্যা, বস্তি, বারবনিতা ও মধ্যবিত্ত সমাজের বিড়ম্বিত অবক্ষয়ী জীবনের চিত্র-চিত্রণের দিকেই তাঁহাদের ঝোঁক ছিল বেশী। আর বাস্তবতার নামে ইঁহারা ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ হইতে যৌন-জটিলতার নগ্ন চিত্রাংকনে মন দেন। সজনীকান্তের নেতৃত্বে 'শনিবারের চিঠি' ইঁহাদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শুরু করে এবং সাহিত্যে অশ্লীলতা দূরীকরণের নামে ইঁহারা 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা হইতে অশ্লীল বর্ণনার অংশ-বিশেষ চয়ন করিয়া 'মণি-মুক্তা' নাম দিয়া প্রকাশ করিতে থাকেন। সজনীকান্ত এক দীর্ঘ চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে ইঁহাদের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণের

অনুরোধ জানান। বলাবাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ এই সব গোষ্ঠীর কোনটিতেই অন্তর্ভুক্ত হন নাই। সুসাহিত্যের আদর্শ ও লক্ষ্যের প্রশ্নে তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তর্ক ও আলোচনা তুলিবার উদ্দেশ্যেই 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধটি রচনা করিয়া যান।

বলা বাহুল্য, কবি ঐ প্রবন্ধে অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ বিকৃত সাহিত্যের তীব্র সমালোচনা করিয়া লেখেন,

…"আজকালকার য়ুরোপীয় সাহিত্যে যৌনমিলনের দৈহিকতা নিয়ে খুব যে একটা উপদ্রব চলছে সেটার প্রধান প্রেরণা বৈজ্ঞানিক কৌতূহল, রেস্‌টোরেশন-যুগে সেটা ছিল লালসা। কিন্তু, সে যুগের লালসার উত্তেজনাও যেমন সাহিত্যের রাজটিকা চিরদিনের মতো পায় নি, আজকালকার দিনের বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের উৎসুক্যও সাহিত্যে চিরকাল টিঁকতে পারে না।

"সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আমদানি যে-একটা বে আব্রুতা এসেছে সেটাকেও এখানকার কেউ কেউ মনে করছেন নিত্যপদার্থ; ভুলে যান. যা নিত্য তা অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না। মানুষের রসবোধে যে-আব্রু আছে সেইটেই নিত্য; যে-আভিজাত্য আছে রসের ক্ষেত্রে সেইটেই নিত্য। এখনকার বিজ্ঞানমদমত্ত ডিমোক্রাসি তাল ঠুকে বলছে, ঐ আব্রুটাই দৌর্বল্য, নির্বিচার অলজ্জতাই আর্টের পৌরুষ।"

[রবীন্দ্ররচনাবলী-২৩'শ খণ্ড ॥ পৃ ৪০৬-০৭]

কবির এই প্রবন্ধ রচনার পর বাংলা দেশে যে কী প্রবল তর্কাতর্কি শুরু হয়, পূর্বেই তাহা উল্লেখ করিয়াছি। অবশ্য কবি তখনও জাভা-বালিদ্বীপে। ঐ সময়ই তিনি তাঁহার বক্তব্য বিষয়কে আরও পরিষ্কার ব্যাখ্যা করিয়া 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধটি রচনা করেন। তিনি বলিলেন,

"বড়ো সাহিত্যের একটা গুণ হচ্ছে অপূর্বতা, ওরিজিন্যালিটি। সাহিত্য যখন অক্লান্ত শক্তিমান থাকে তখন সে চিরন্তনকেই নূতন ক'রে প্রকাশ করতে পারে। এই তার কাজ। এ'কেই বলে ওরিজিন্যালিটি। যখনি সে আজগবিকে নিয়ে গলা ভেঙে, মুখ লাল ক'রে, কপালের শিরগুলোকে ফুলিয়ে তুলে, ওরিজিন্যাল হতে চেষ্টা করে, তখনি বোঝা যায় শেষ দশায় এসেছে। জল যদের ফুরিয়েছে তাদের পক্ষে আছে পাঁক। তারা বলে সাহিত্যধারায় নৌকো-চলাচলটা অত্যন্ত সেকেলে; আধুনিক উদ্ভাবনা হচ্ছে পাঁকের মাতুনি —এতে মাঝিগিরির দরকার নেই—এটা তলিয়ে-যাওয়া রিয়ালিটি। ভাষাটাকে বেঁকিয়ে-চুরিয়ে, অর্থের বিপর্যয় ঘটিয়ে, ভাবগুলোকে স্থানে অস্থানে ডিগবাজি খেলিয়ে, পাঠকের মনকে পদে পদে ঠেলা মেরে, চমক লাগিয়ে দেওয়াই সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ। চরম সন্দেহ নাই। সেই চরমের নমুনা য়ুরোপীয় সাহিত্যের ডাডায়িজ্‌ম্‌।"…

কবি অত্যন্ত বিনয়ের সহিত স্বীকার করিলেন যে, দেশের হাল-আমলের লেখকদের লেখা খুব একটা পাড়বার সময় তিনি পান না; তবুও তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের প্রতিভার স্বাক্ষর দেখিতে পাইয়াছেন। তিনি তাহাদের সতর্ক

করিয়া দিয়াও অভিনন্দন জানাইলেন,

…"যথার্থ যে বীর সে সার্কাসের খেলোয়াড় হতে লজ্জা বোধ করে। পৌরুষের মধ্যে শক্তির আড়ম্বর নেই, শক্তির মর্যাদা আছে; সাহস আছে, বাহাদুরি নেই। অনেক নবীন কবির লেখায় এই সবলতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে; বোঝা যায় যে, বঙ্গসাহিত্যে একটি সাহসিক সৃষ্টি-উৎসাহের যুগ এসেছে। এই নব অভ্যুদয়ের অভিনন্দন করতে আমি কুণ্ঠিত হই নে।

"কিন্তু, শক্তির একটা নূতন স্ফূর্তির দিনেই শক্তিহীনের কৃত্রিমতা সাহিত্যকে আবিল ক'রে তোলে।…বাঁধিগতের সাহায্যে ছাড়া তার চলবার শক্তি নেই ব'লেই সে হাল-আমলের নূতনত্বেরও কতকগুলি বাঁধি বুলি সংগ্রহ ক'রে রাখে। বিলিতি পাকশালায় ভারতীয় কারির যখন নকল করে, শিশিতে কারি-পাউডর বাঁধা নিয়মে তৈরি ক'রে রাখে; যাতে-তাতে মিশিয়ে দিলেই পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কারি হয়ে ওঠে; লংকার গুঁড়ো বেশি থাকাতে তার দৈন্য বোঝা শক্ত হয়। আধুনিক সাহিত্যে সেইরকম শিশিতে-সাজানো বাঁধি-বুলি আছে—অপটু লেখকদের পাকশালায় সেইগুলো হচ্ছে 'রিয়ালিটির কারি-পাউডার'। ওর মধ্যে একটা হচ্ছে দারিদ্র্যের আস্ফালন, আর-একটা লালসার অসংযম।" [রবীন্দ্র রচনাবলী-২৩শ খণ্ড ॥ পৃ ৪১০-১১]

স্পষ্টই বুঝা যায়, আধুনিক শিল্প-সাহিত্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিরুদ্ধে কবির অভিযোগ নয়,—অভিযোগ ইউরোপের শিল্প সাহিত্যের ভাবাদর্শগুলির ও আঙ্গিক কলা-কৌশলের যান্ত্রিক নকল-নবীশীয়ানার বিরুদ্ধে। আর একটি লক্ষণীয় কথা, মানুষের জীবনে দারিদ্র্য ও যৌন সমস্যার প্রশ্নটিকেও কবি লঘু করিয়া দেখিতে বলেন নাই,

"অন্যান্য সকল বেদনার মতোই সাহিত্যে দারিদ্র্যবেদনারও যথেষ্ট স্থান আছে। কিন্তু, ওটার ব্যবহার একটা ভঙ্গিমার অঙ্গ হয়ে উঠেছে; যখন-তখন সেই প্রয়াসের মধ্যে লেখকেরই শক্তির দারিদ্র্য প্রকাশ পায়।…দেশের দারিদ্র্যকে এঁরা কেবল নব্যসাহিত্যের নূতনত্বের ঝাঁজ বাড়াবার জন্যে সর্বদাই ঝাল-মসলার মতো ব্যবহার করেন। এই ভাবুকতার কারি-পাউডারের যোগে একটা কৃত্রিম সস্তা সাহিত্যের সৃষ্টি হয়ে উঠছে। এই উপায়ে বিনা প্রতিভায় এবং অল্প শক্তিতেই বাহবা পাওয়া যায়··এবং অবিচারক পাঠকের পক্ষে একটা সাহিত্যিক অপথ্য।"

সাহিত্যে যৌন-লালসার স্থান সম্পর্কে বলিলেন,

"সাহিত্যে লালসা ইতিপূর্বে স্থান পায় নি বা এর পরে স্থান পাবে না, এমন কথা সত্যের খাতিরে বলতে পারি নে। কিন্তু, ও জিনসটা সাহিত্যের পক্ষে বিপদ্জনক। বলা বাহুল্য, সামাজিক বিপদের কথাটা আমি তুলছি নে। বিপদের কারণটা হচ্ছে, ওটা অত্যন্ত সস্তা, ধুলোর উপরে শুয়ে পড়ার মতোই সহজসাধ্য।…পাঠকের মনে এই আদিম প্রবৃত্তির উত্তেজনা সঞ্চার করা অতি অল্পেই হয়। এইজন্যেই, পাঠকসমাজে এমন একটা কথা যদি ওঠে যে, সাহিত্যে লালসাকে একান্ত উন্মথিত করাটাই আধুনিক যুগের একটা মস্ত

ওস্তাদি, তা হলে এজন্যে বিশেষ শক্তিমান লেখকের দরকার হবে না—সাহস দেখিয়ে বাহাদুরি করবার নেশা যাদের লাগবে তারা এতে অতি সহজেই মেতে উঠতে পারবে।”…

তাছাড়া কবি কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন সাহিত্যিক গোষ্ঠীদের “…তাদের উপরওয়ালা রাশিয়ান হেড্‌মাস্টারদের কড়া বিধান জারি করে পদোন্নতির গৌরব কামনা করেন” বলেও কটাক্ষপাত করিলেন! কিন্তু এত তীব্র সমালোচনার পরও কবির আন্তরিক আশীর্বাদ বর্ষিত হইল বিদ্রোহী নবীন ও তরুণ সাহিত্যিকগোষ্ঠীর প্রতি। উপসংহারে তাই তিনি বলিলেন,

“আমি দেখেছি কেউ কেউ বলছেন, এই সব তরুণ লেখকের মধ্যে নৈতিক চিত্তবিকার ঘটেছে ব'লেই এইরকম সাহিত্যের সৃষ্টি হঠাৎ এমন দ্রুতবেগে প্রবল হয়ে উঠেছে। আমি নিজে তা বিশ্বাস করি না। এঁরা অনেকেই সাহিত্যে সহজিয়া সাধন গ্রহণ করেছেন তার প্রধান কারণ, এটাই সহজ। অথচ দুঃসাহসিক ব'লে এতে বাহবাও পাওয়া যায়, তরুণের পক্ষে সেটা কম প্রলোভনের কথা নয়। তারা বলতে চায় 'আমরা কিছু মানি নে' —এটা তরুণের ধর্ম।…এই অহংকারের আবেগে তারা ভুল করেও থাকে; সেই ভুলের বিপদ সত্ত্বেও তরুণের এই স্পর্ধাকে আমি শ্রদ্ধাই করি।”…

[রবীন্দ্র রচনাবলী-২৩'শ খণ্ড ॥ পৃঃ ৪১১-১৩]

দেশে প্রত্যাবর্তনের পর রবীন্দ্রনাথকে এই বিতর্ক যুদ্ধে আরও জড়াইয়া পড়িতে হয়। কবি বস্তুত 'কল্লোল-কালি-কলম-গোষ্ঠী' ও 'শনিবারের চিঠি' —এই দুইয়ের কোনটিরই পক্ষ অবলম্বন করেন নাই বটে, কিন্তু এই আলোচনা ও বিতর্ক সৃষ্টি হওয়ার জন্য তিনি দুঃখিত হন নাই। বরঞ্চ ইহাই তিনি চাহিয়াছিলেন। তাই প্রত্যাবর্তনের পর দিলীপকুমার রায়কে এক পত্রে লিখিলেন, (১০ই অগ্রহায়ণ-১৩৩৪),

…“এতে ক'রে যে একটা আলোড়ন জাগিয়েছে তাতে ক্ষতি নেই। কেননা, পূর্বেই বলেছি, সাহিত্যলোকে চাঞ্চল্যটার খুব প্রয়োজন আছে। সিদ্ধান্তে পৌঁছনোটা খুব বেশি দরকারি নয়—দেখতেই পাচ্ছি, এক যুগের সিদ্ধান্ত আর এক যুগে উলট-পালট হয়ে যায়, কেবল মনের মধ্যে নিয়তচিন্তার চাঞ্চল্যটাই থাকে।…আমরা সত্যকে পেতে চাই শুধু কেবল পাওয়ার জন্যে নয়, চাওয়ার জন্যেও। এই কারণে আমাদের ভালোবাসার মধ্যে ঝগড়ার স্থানটা খুব বড়ো; হারানোটা পাওয়ার প্রধান বন্ধু—কেননা, ফিরে ফিরে না পেতে থাকলে সম্পূর্ণ পাওয়া হয় না”…

[রবীন্দ্র রচনাবলী-২৩'শ খণ্ড ॥ পৃঃ ৫৫৩]

ইহার পরও বেশ কিছুকাল এই বিতর্ক চলিতে থাকে। চৈত্রের প্রথম ভাগে কবির সভাপতিত্বে জোড়াসাঁকোর বিচিত্রাভবনে নবীন ও প্রবীণ সাহিত্যিকদের এই প্রশ্নের ফয়সলা করার জন্য একটি আলোচনা সভা হয় (৪ঠা ও ৭ই চৈত্র)। যথাস্থানে আমরা এই আলোচনায় আসিব।

মাদ্রাজ কংগ্রেস ও নূতনের সূচনা

রবীন্দ্রনাথ যখন জাভা ও বালিদ্বীপে ভ্রমণে রত, ভারতবর্ষে তখন তীব্র সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ চলিতেছে। উত্তরপ্রদেশ, বোম্বাই, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, বাংলা, বিহারে প্রায় ২৫টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়। গান্ধীজী চরকা, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের আবেদন লইয়া সারা ভারতবর্ষে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন।

নভেম্বরের প্রথমে 'সাইমন কমিশন'-এর কথা ঘোষিত হয় (৮ই নভেম্বর—১৯২৭)। এই কমিশনে একজনও ভারতীয় ছিলেন না,—সকলেই ছিলেন শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের। মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার আইন-প্রণয়নের দশ বৎসর পর ভবিষ্যৎ সংস্কার কল্পে ভারতের অবস্থা তদন্তের জন্য একটি রয়েল কমিশন বসিবে, এইরূপ একটি প্রতিশ্রুতি ছিল। সুতরাং দশ বৎসর অতিবাহিত হইবার পূর্বেই স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে ঐ কমিশন ভারতের শাসনব্যবস্থার তদন্ত করিবার জন্য নিযুক্ত হয়। বলা বাহুল্য, উহার পশ্চাতে পার্লামেণ্টের বিশেষ একটি কু-অভিসন্ধি ছিল; তাছাড়া নিকটেই নির্বাচনে বিপর্যয়ের আশংকা করিয়া বিলাতের রক্ষণশীল দল উহা ত্বরান্বিত করে।

স্বভাবতই, এই ঘোষণার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠান উহার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা ও অসন্তোষ প্রকাশ করিতে থাকেন। অবশ্য গান্ধীজী তখনই ঐ-সম্পর্কে কোন মন্তব্য করিলেন না। ঐ সময় তিনি মিস মেয়োর '*Mother India*' পুস্তকখানিকে "*Drain Inspector's Report*" নামে অভিহিত করিয়া '*Young India*' পত্রিকায় তীব্র সমালোচনা লিখিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে। কখনও বা কলিকাতায় সাহিত্য-বিতর্কে কিংবা সঙ্গীত ও নৃত্যনাট্য অভিনয়ের ব্যবস্থা করিতেছেন। দেশের রাজনৈতিক উত্তেজনায় তিনি নিজেকে জড়িত করিতে চাহিতেছেন না। কিন্তু লোকে ছাড়ে না। এই সময় বাংলা দেশের স্বরাজ্যদলের একটি পত্রিকার পক্ষ হইতে দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে কবির মতামত ব্যক্ত করিবার জন্য অনুরোধ আসে। রবীন্দ্রনাথ উহার জবাবে সংক্ষেপেই তাঁহার মতামতের কথা জানাইলেন। কিন্তু উক্ত পত্রিকায় ('বাংলার কথা'?) কবির রচনাটি প্রকাশিত হয় নাই—সম্ভবত উহা সম্পাদক মহাশয়ের মনঃপূত হয় নাই। পরে উহা প্রবাসী প্রত্রিকায় (১৩৩৪ মাঘ সংখ্যায়) 'বিবিধ প্রসঙ্গে' প্রকাশিত হয়। প্রবাসীর সম্পাদকীয় টীকায় ঐ পত্রিকাটির স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া বলা হইয়াছে, "বঙ্গের স্বরাজদলের যে পত্রিকা-সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে লেখা চাহিয়া লইয়া তাহার পর তাহা ছাপেন নাই, তিনি তৎপূর্বে সাতিশয় আগ্রহ সহকারে মালয় উপদ্বীপের ইংরেজদের কাগজ হইতে রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ নিন্দা উদ্ধৃত করিয়াছিলেন।"…

যাহাই হউক রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, (৩রা পৌষ-১৩৩৪)

"আপনাদের পত্রিকার জন্য আমার কাছ হইতে কিছু লেখা চাহিয়াছেন।

আমার সময় অত্যন্ত অল্প, আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব।

"শাসনকর্তাদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধের মধ্যে যে কিছু বিকৃতি স্বদেশকে উপলব্ধি করিবার পক্ষে বাধা, তাহাই দূর করিবার চেষ্টা বর্তমান ভারতবর্ষের পলিটিক্স্। এই উপলক্ষ্যে আমাদের শিক্ষিতমণ্ডলী কখনো বা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগসাধন কখনো বা বিচ্ছেদ ঘোষণার ব্যাপারে নিরতিশয় প্রবৃত্ত। এই চেষ্টার প্রয়োজন যতই থাক্ ইহারই উত্তেজনা একান্ত হইয়া গুরুতর প্রয়োজন হইতে আমাদের কর্মোদ্যমকে দীর্ঘকাল বিক্ষিপ্ত করিয়াছে।

"আমাদের নিজেদের পরস্পর সম্বন্ধের মধ্যে যে সকল গভীর বাধা বর্তমান; তাহার জটিল মূল আমাদের সমাজে, আমাদের সংস্কারে, আমাদের বুদ্ধির বিকারে, শক্তির জড়তায় চিত্তের ঔদাসীন্যে, পরনির্ভরশীল মনোবৃত্তিতে, বিচারহীন গতানুগতিকায় দীর্ঘকালীন অভ্যাসে, তাহাই স্বদেশকে অন্তরে বাহিরে সত্যভাবে লাভ করিবার সর্বাপেক্ষা প্রবল অন্তরায়। নিজেদের অন্তর্নিহিত এই অপূর্ণতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হই বলিয়াই চোরাবালিতে পলিটিক্সের ভিত্তিস্থাপন চেষ্টায় আমাদিগকে নানাপ্রকার অত্যুক্তি ও আত্মবঞ্চনায় প্রবৃত্ত করিয়াছে। মেকি টাকায় বিধাতার সঙ্গে কারবার চলে না; সিদ্ধির পথকে অবাস্তবের সাহায্যে সহজ ও সংক্ষিপ্ত করিবার কৌশল অবলম্বন করিলে নিজেকেই ফাঁকি দেওয়া হয়। দেশের প্রজাসাধারণ দেশকে আপন করিবে এই ইচ্ছাটি সাধারণের মধ্যে যখন সত্য হইবে, গভীর হইবে, ব্যাপক হইবে, এই ইচ্ছার বিচিত্র দুঃখসাধ্য ত্যাগপরায়ণ দায়িত্ববোধ যখন অগভীর আবেগস্রোতে আন্দোলনের বিষয় না হইয়া সুসংযত বিচারবুদ্ধি ও সুশিক্ষিত সাধনার উপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন বাহিরের প্রতিকূলতা আমরা উপেক্ষা করিতে পারিব। স্বদেশ সম্বন্ধে কল্যাণফল লাভের কথা যখন ওঠে তখন সাধনক্ষেত্রের মাটিতে নামিয়া ঢেলা-ভাঙার কথাই ভাবি, এ কথা মনেও করি না, মুখে বলিতে লজ্জা হয় যে, ফসল ফলিয়াই আছে, কেবল তাহা গোলাজাত করিবার বাহ্য বাধা সরিয়া গেলেই সদ্যই আমাদের পোলিটিক্যাল ভোজের আয়োজন পূরা হইবে।"

[প্রবাসী-মাঘ-১৩৩৪ ।। পৃ ৫৭৬-৭৭]

তৎকালীন কংগ্রেসী-রাজনীতির এই ত্রুটি-বিচ্যুতির স্বরূপটি কবি বারে বারে উদ্ঘাটিত করিয়া অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের পোলিটিকেল-অ্যাজিটেশনের মোদ্দা কথাটা যে ক্ষমতালাভ মাত্র, (to capture state-power) জনসাধারণের শিক্ষা, জ্ঞান, স্বাস্থ্য, আর্থনীতিক পুনর্গঠন ও গ্রামোন্নয়ন প্রভৃতি যে তাঁহাদের কাছে গৌণ কথা, স্বদেশী-আন্দোলনের সময় হইতেই কবি উহা ক্রমাগত নির্দেশ করিয়া আসিতেছিলেন। তবে একথাও খুবই সত্য, পোলিটিকেল অ্যাজিটেশন ও আন্দোলনগুলির ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকাটিও কবি সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগ্রামগুলিতে জনতার স্বাধীনতা-স্পৃহা ও রাজনৈতিক চেতনা যে লাফে-লাফে অগ্রসর হয়, কবি তাহা ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। কবি চিরদিনই রাজ-

নীতিক উত্তেজনা ও আন্দোলন অপেক্ষা গঠনমূলক কার্যপদ্ধতির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন।

অবশ্য তাহার অর্থ এই নয়, কবি দেশের স্বাধীনতা বা স্বরাজের দাবীকে এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের ভূমিকাকে উপেক্ষা করিতেছিলেন। ইতিপূর্বে দেশের স্বরাজ ও জাতীয় আত্ম স্বাতন্ত্র্যের দাবী তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইংরেজের দমননীতি এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনেও তিনি অনেক সময় সকলের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন কিন্তু তথাকথিত স্বরাজ বা রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেন না। দেশের বৃহত্তর জনগণের প্রকৃত শিক্ষা ও চেতনার মান যতদিন পর্যন্ত যথোপযুক্ত পরিমাণে উন্নত না করা যায় ততদিন স্বরাজ পাওয়া বা না-পাওয়া এক কথা। কয়েকমাস পূর্বে বিখ্যাত ভারত-প্রেমিক J. T. Sunderland ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে তাঁহার '*India's Case for freedom and Self-Rule*' পুস্তকটি রচনার সমাপ্তির মুখে কবিকে এক পত্র লেখেন (১১ই এপ্রিল ১৯২৭)। রবীন্দ্রনাথ উহার জবাবে স্বরাজ সম্পর্কে তাঁহার ধারণার কথা ব্যাখ্যা করিয়া যে পত্র লেখেন (২রা মে ? ১৯২৭) এই প্রসঙ্গে তাহা উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখিয়াছিলেন,

"Perhaps you are aware that I have not taken any active part in the political movement lately started in India with the object of gaining Swaraj. It is needless to say that I also dream of freedom for my motherland, but I know that neither the path towards it nor its instrument and expression can be copied from the history of other nations. *So long as the bulk of our people remains steeped in ignorance, unable to know its own mind, it can never attain emancipation for the purpose of its self-revealment in politics* according to its own temperament and need.

"I have been in the West and one thing that has strongly impressed my mind is the fact that there ard nations who are *technically free*, and yet, like a bird that has hurt its wings, have not gained true freedom, remaining incapable of buliding up and using a perfect medium of political self-expression. *There is every sign of their lapsing into slavery, voluntarily surrendering their freedom of self-government into the hands of the few who have the power to subjugate their minds into a dumb and blind obedience.*

বলা বাহুল্য, কবি এখানে ইউরোপের ফ্যাসিস্ট ও স্বৈরতন্ত্রী রাষ্ট্র ও দেশগুলির কথাই বুঝাইতে চাহিলেন। তিনি পরিষ্কার লিখিলেন,

"Freedom, like all other best things in life, cannot be given from outside, but has to be won through the awakened personoality of people truly claiming it with intelligence, feeling and active will.'···

তাই তিনি বলিলেন, "It is a truism to say that freedom cannot be built upon a foundation of unreality. Our want of ordinary human interest not only in our neighbouring provinces, but in communities not our own, is darkly dense among us; the communication of mutual sympathy and understanding between ourselves is barred at *every step by caste and communal obstructions and religious fanaticism.* The unreasoning acceptance of practices and prohibitions in minute deatails of life, the complete sacrifice of individual initiative forced upon our unthinking millions by a system of social tyranny more perfectly organised than in any other country of the world, the terribly efficient machinery for a wholesale manufacture of crowds and slaves constantly working in our domestic surroundings, these are the powerful enemies that are in alliance with the evil star of our political misfortune. Our immediate duty is to fight them, to conquer our country from the age-long domination of an intellectual and moral inertia, from the crude materialism ruling in the guise of piety causing immense *dissipation of energy and unmeaning suffering and degradation.

কিন্তু তাহা হইলে এই সমস্যার সমাধান কোথায়? কবি তাহার জবাবে লিখিলেন,

···"*That means widespread education*···Only when they are conscious of the real meaning of self-rule within themselves, can they successfully strive to establish it over their outer circumastances."

*[*Visva-Bharati Quarterly*—*July*-1927-pp. 190-92.]

ডিসেম্বরের শেষভাগে মাদ্রাজে কংগ্রেসের ৪২-তম বাৎসরিক অধিবেশন। সভাপতি নির্বাচিত হন, ডাঃ এম. এ. অনাসারী।

মাদ্রাজ কংগ্রেস, কংগ্রেসের রাজনীতিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ও রূপান্তরের সূচনা করে। জওহরলাল নেহরু ইউরোপ ও সোভিয়েট রাশিয়া পরিদর্শনের পর মাদ্রাজ কংগ্রেসে যোগদান করিবার উদ্দেশ্যে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। উল্লেখযোগ্য, ব্রুসেলস কংগ্রেসে যোগদানের পর নেহরু

উহার রিপোর্ট সহ ইউরোপের ঘটনাবলীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিয়া দেশে কংগ্রেসের নিকট ঐ বিবরণ দাখিল করেন। ঐ রিপোর্ট বা বিবরণী কংগ্রেস নেতৃত্বকে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে চিন্তা করিবার প্রেরণা দেয়। মে মাসের মধ্যভাগে (১৫ই ও ১৬ মে) A. I. C. C-র এক অধিবেশনে জওহরলাল নেহরুর ঐ বিবরণ অনুমোদন করা হয় এবং তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যের প্রশংসা করিয়া 'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সঙ্ঘে' (*League Against Imperialism*) জাতীয় কংগ্রেসকে সদস্যভুক্ত করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাঁহাকে নির্দেশ দেওয়া হয়। তাছাড়া ব্রুসেলস্ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে চীনে একটি 'মেডিকেল মিশন' প্রেরণ করিবার প্রস্তাবও গৃহীত হয়। অবশ্য ব্রিটিশ সরকার সে-প্রস্তাব অনুমোদন করে নাই।

মাদ্রাজ কংগ্রেসে জওহরলাল নেহরু পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব আনিলেন। অপরদিকে যুদ্ধের আশঙ্কা, 'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সঙ্ঘে'র সহিত যোগাযোগ স্থাপন, চীনের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতীয় সৈন্য নিয়োগের তীব্র প্রতিবাদ—প্রভৃতি প্রস্তাবগুলিও তিনি আনয়ন করিলেন এবং শেষ পর্যন্ত উহা গৃহীতও হয়। পূর্ণ স্বাধীনতা এবং যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে কংগ্রেসের এই সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গি আনয়ন করিবার কৃতিত্ব বহুলাংশে জহরলালের প্রাপ্য। বলা বাহুল্য, শুধু লিখিত সিদ্ধান্ত আকারে রহিয়া গেল।—এই সব প্রস্তাব ও দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যগুলি সাধারণ সদস্যরা তো দূরের কথা এমনকি কংগ্রেসের নেতারাও সকলে উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। এই প্রসঙ্গে জওহরলালের নিজস্ব উক্তিটি অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখিতেছেন,

"মানসিক ও শারীরিক পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য লইয়া আমি ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসিলাম।…

"জগতের এই সকল ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত সম্পর্কে আমাদের স্বদেশবাসীকে সুশিক্ষিত করিয়া ভবিষ্যতের সম্ভাবনার জন্য প্রস্তুত রাখাই আমাদের আশু কর্তব্য বলিয়া মনে হইল। এই প্রস্তুত করা বহুলাংশে সুস্পষ্ট মতবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আদর্শ প্রচারের উপর নির্ভর করে। রাজনৈতিক স্বাধীনতাই প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত ইহা নিঃসন্দেহ। অস্পষ্ট ও জটিল ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক আমাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য স্পষ্ট করিয়া বুঝা উচিত। তাহার পর সামাজিক লক্ষ্যও নির্দিষ্ট করিতে হইবে।…কংগ্রেসী রাজনীতি জাতীয়তাবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং ইহা অন্যভাবে চিন্তা করিতে অনভ্যস্ত, তথাপি নূতন সূচনা করিতে হইবে।…

"মাদ্রাজে উপস্থিত হইয়াই আমি এক ঘূর্ণিপাকের মধ্যে পড়িয়া গেলাম। পূর্ণস্বাধীনতার প্রস্তাব সহ এক গোছা প্রস্তাব আমি ওয়ার্কিং কমিটির দরবারে পেশ করিলাম। যুদ্ধের আশঙ্কা, সাম্রাজ্য-বিরোধী সঙ্ঘের সহিত যোগ স্থাপন প্রভৃতি সমস্ত প্রস্তাবই কার্যকরী সমিতির সরকারী প্রস্তাবরূপে গৃহীত হইল। আমাকেই ঐগুলি কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে উপস্থিত করিতে হইল। ঐগুলি বিনা প্রতিবাদে গৃহীত হইল দেখিয়া আমি আশ্চর্য হইলাম।…কিন্তু

আমি অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতে লাগিলাম। মনে হইল, হয় প্রস্তাবগুলিকে বুঝিতে কেহ চেষ্টা করিলেন না, না হয় ভুল বুঝিলেন। কংগ্রেসের পর যখন স্বাধীনতা প্রস্তাব লইয়া বাদানুবাদ উপস্থিত হইল, তখনই ইহা বুঝিলাম।

"সাধারণত কংগ্রেসে যে শ্রেণীর প্রস্তাব উপস্থাপিত হয় আমার প্রস্তাবগুলি অনেকাংশে তাহা হইতে পৃথক ছিল। এগুলির দৃষ্টিভঙ্গী ছিল নূতন। অনেক কংগ্রেসপন্থীই এগুলি পছন্দ করিলেন, অনেকের নিকট ইহা ভাল লাগিল না। কিন্তু কেহই বিশেষ প্রতিবাদ করিলেন না। সম্ভবতঃ তাঁহারা মনে করিলেন, এই প্রস্তাবগুলি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণামাত্র এবং ইহাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না। অতএব ঐগুলি তাড়াতাড়ি পাশ করিয়া দিয়া অন্য গুরুতর বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়াই ঐগুলি এড়ানর প্রকৃষ্ট পন্থা।...

"গান্ধীজী মাদ্রাজ কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তিনি কোন আলোচনায় যোগ দেন নাই।...আমি যে সকল প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলাম, সেগুলি তিনি অনুমোদন করিলেন কি না বুঝিতে পারিলাম না। আমার মনে হইল, প্রস্তাবগুলির মতামত না হউক, বলিবার ভঙ্গী তাঁহার ভাল লাগে নাই।......

[আত্মচরিত-পৃ :৮০-৮২]

গান্ধীজী কংগ্রেসের এই নতুন রাজনীতি নির্ধারণে (সাব্‌জেক্টস্‌ কমিটির আলোচনায়) কোন ভূমিকা গ্রহণ করিতে চাহিলেন না বটে, কিন্তু অন্যান্যবারের মত এবারও তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবের সমালোচনা করিয়া বলিলেন,

"The Congress stultifies itself by repeating year after year resolutions of this character when it knows that it is not capable of carrying them into effect. By passing such resolutions, we make an exibition of our impotence, become the laughing-stock of critics and involve the contempt of our adversary. The Congress cannot become the irresistible force it was and is intended to be, if its resolutions are ill-conceived and are to remain merely paper resolutions. We have almost sunk to the schoolboys' depating society".

[*Mahatma-Vol. II*-p. 304]

সভাপতি, ডাঃ আনসারী পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব সম্পর্কে তখনই কোন মন্তব্য করিলেন না কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে কংগ্রেসের ভূমিকা গ্রহণের তাৎপর্যটির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলিলেন,

..."The only hope of success in our efforts to check the forces of European Imperialism and Capitalism lies in Eastern nations coming closer and taking a more intimate interest in the problems facing them....

"A happy beginning was made by the Congress in this direction by participating officially in the 'Congress against Imperialism' held at Brussles, and by becoming associated with the '*League against Imperialism.*' A more important and practical step taken by the Congress was the *proposal of sending a mission to give medical relief and assistance to the people of China* in their present struggle. The mission could not go as the Government of India refused to grant passports."...

[*Congress Presidential Addresses-Vol. II*-p. 846]

কিন্তু স্বাধীনতা প্রস্তাব মাদ্রাজ কংগ্রেসে গৃহীত হইয়াও কার্যত গৃহীত হইল না। নেতারা প্রায় সকলেই সাইমন কমিশন সম্পর্কে চিন্তা করিতে ব্যস্ত। অবশেষে কংগ্রেসে সাইমন কমিশন বর্জন ও ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য এক সর্বদলীয় সম্মেলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রসঙ্গে জওহরলাল আরও লিখিতেছেন,

"সাইমন কমিশনের নিন্দা ও উহা বর্জন করিবার একটি প্রস্তাব কংগ্রেসের এই অধিবেশনেই উপস্থিত হইল এবং উহা আলোচনা প্রসঙ্গে স্বাধীনতা প্রস্তাবটি যে কেহই বিশেষ গুরুত্ব দেন নাই, তাহা বুঝা গেল। এই প্রস্তাবের পরিশিষ্ট হিসাবে ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য এক সর্বদল সম্মিলনীর প্রস্তাব হইল। এই প্রস্তাবে স্বাধীনতা যাঁহাদের ধারণার মধ্যে নাই, সেই মডারেটদের সহযোগিতা কামনা করা হইল। অথচ তাঁহারা বড়জোর একপ্রকার স্বায়ত্তশাসন পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারেন।" [আত্মচরিত ।। পৃ-১৮২]

স্বাধীনতা প্রস্তাব ও সর্বদলীয় সম্মেলনে ভারতের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সিদ্ধান্ত যে পরস্পর-বিরোধী চিন্তা, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। তাছাড়া সম্মেলনে রাজবন্দীদের মুক্তি এবং দক্ষিণ ও পূর্ব-আফ্রিকায় ভারতীয়দের মানবিক অধিকারের দাবিতেও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ব্রিটিশ পণ্য বয়কটের জন্য নূতন পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

কংগ্রেসের আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারণ করিয়া জওহরলাল নেহরু মাদ্রাজ-কংগ্রেসে যে কয়টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আনেন সংক্ষেপে তাহা এইরূপ :

(৩) "সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করিবার নিমিত্ত যে সংঘ গঠিত হইয়াছে, এবং গত ১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ব্রুসেলস নগরে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যে কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল, উক্ত কংগ্রেস ও সার্বজনীন সংঘকে এই সভা সম্বর্ধন করিতেছে এবং সাম্রাজ্যবাদ-ধ্বংসের যুদ্ধে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগ-স্থাপনের সে সিদ্ধান্ত নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি গ্রহণ করিয়াছে, এই সভা তাহা অনুমোদন করিয়া লইতেছে।

(৪) "চীনের অধিবাসিবৃন্দকে এই সভা আন্তরিক সম্বর্ধনা জানাইতেছে। চীনাবাসীদের স্বাধীনতা যুদ্ধে এই সভা সহযোগিতার ভাব জ্ঞাপন করিতেছে

এবং বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতবাসীকে যে চিকিৎসা-বাহিনী প্রেরণ করিতে অনুমতি প্রদান করে নাই, তজ্জন্য নিন্দা প্রকাশ করিতেছে। ভারতীয় সৈন্য-গণকে যে পুনরায় সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য চীনাবাসীর বিরুদ্ধে নিয়োগ করা হইতেছে, এই সভা তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে, এবং অচিরে চীন এবং তৎসহ মেসোপোটোমিয়া, পারস্য এবং বৃটিশ উপনিবেশ-সমূহ হইতে সমস্ত ভারতীয় সৈন্য ও পুলিশ ফিরাইয়া আনিতে নির্দেশ করিতেছে।

(৬) "বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বর্তমান সময়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে এবং প্রাচ্য সমুদ্রে যে সমরায়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সভা তাহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ জ্ঞাপন করিতেছে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ভারতের স্বাধীনতা নিষ্পেষণ করিবার এই সম্ভাবিত চেষ্টার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে। যদি বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কোন প্রকার যুদ্ধ আরম্ভ করে, তাহা হইলে প্রত্যেক ভারতবাসীর উহা হইতে বিযুক্ত থাকা কর্ত্তব্য।" [প্রবাসী-মাঘ ১৩৩৪ ॥ পৃ ৫৪৬-৪৭]

পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবে ৯নং সিদ্ধান্তে বলা হয়,

"এই সভা ঘোষণা করিতেছে যে, সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভই ভারত-বাসীদের অভীষ্ট লক্ষ্য।"

লক্ষ্য করিবার বিষয়, মাদ্রাজ-কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে ফ্যাসিজমের বিপদ সম্পর্কে একটি কথাও বলা হয় নাই। কিন্তু ইহার বেশ কিছুকাল পূর্ব হইতেই রবীন্দ্রনাথ যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিজমের বিপদ সম্পর্কে হুঁসিয়ারী দিয়া আসিতেছিলেন।

প্রসঙ্গত, ঐতিহাসিক তথ্যের দিক হ'তে এখানে একটা কথা পরিষ্কার উল্লেখ করা দরকার যে, ব্রুসেলসে 'সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংঘ'এর আন্তর্জাতিক সম্মেলনের পর জওহরলালই ভারতবর্ষের রাজনীতিতে চীনের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের সমর্থন এবং ভারত-চীন মৈত্রীর সূচনা করেন, এ ধারণা সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক এবং ভ্রান্ত। ১৯২৭ সালের জানুয়ারী ও ফ্রেব্রুয়ারীতে চীনের বুকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের নতুন করিয়া হামলা এবং চীনে ভারতীয় সৈন্য প্রেরণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আন্দোলন সারা দেশে—বিশেষত কলিকাতায়, প্রবল হইয়াছিল। সভা সমিতিতে চীনের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনে নৈতিক সমর্থন জ্ঞাপন এবং সেই সঙ্গে একটি মেডিকেল মিশন প্রেরণেরও সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী উভয়েই ইংরেজের এই সাম্রাজ্যবাদী অভিযানের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ এবং সেই সঙ্গে চীনের প্রতি নৈতিক সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া বিবৃতি ও বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন। যথাস্থানে এই সব আলোচিত হইয়াছে।

সাহিত্য বিচার-সভায় এবং
বর্ণ-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে—

মাদ্রাজ কংগ্রেসে দেশের রাজনীতির যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা হয়, সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথকে প্রত্যক্ষভাবে কোন কথা বা মন্তব্য করিতে দেখা যায় না। অন্তত এখনও পর্যন্ত সেরকম কোন তথ্যাদি পাওয়া যায় নাই।

জানুয়ারীর প্রথমভাগে কবি কলিকাতায় আসিলেন। কলিকাতায় 'সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি'র বার্ষিক উৎসবে তাঁহাকে সভাপতিত্ব করিতে হয় (৫ই জানুয়ারী, ১৯২৮)। এই সময় প্রেসিডেন্সি কলেজের 'রবীন্দ্রপরিষদের' উদ্যোগে তাঁহাকে বিরাট সম্বর্ধনা জানান হয়। কবি তাঁহার ভাষণে, অত্যন্ত বিনয়ের সহিত তাঁহার সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করিয়া নবযুগের কবি-শিল্পীদের স্বাগত জানাইয়া বলিলেন,

"ভাবীকালকে অত্যন্ত বেশি করে জুড়ে বসে থাকব, এমন আশাও নেই, আকাঙ্ক্ষাও নেই। ভবিষ্যতের কবি ভবিষ্যতের আসন সগৌরবে গ্রহণ করবে। আমাদের কাজ তাদেরই স্থান প্রশস্ত করে দেওয়া। মেয়াদ ফুরোলে যে-গাছ মরে যায় অনেক দিন থেকে ঝরা পাতায় সে মাটি তৈরি করে; সেই মাটিতে খাদ্য জমে থাকে পরবর্তী গাছের জন্যে। ভবিষ্যতের সাহিত্যে আমার জন্যে যদি জায়গার টানাটানিও হয় তবু এ কথা সবাইকে মানতে হবে যে, সাহিত্যের মাটির মধ্যে গোচরে অগোচরে প্রাণের বস্তু কিছু রেখে গেছি। নতুন প্রাণ নতুন রূপ সৃষ্টি করে, কিন্তু পুরাতনের জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হলে সে প্রাণশক্তি পায় না; আমাদের বাণী সপ্তকে প্রতিষ্ঠা লাভ করে তবেই ভবিষ্যতের বাণী উপরের সপ্তকে চড়তে পারে।"…

উপসংহারে কবি বলিলেন,

"কিন্তু, আমি তরুণ বলব তাঁদেরই যাঁদের কল্পনার আকাশ চিরপুরাতন রক্তরাগে অরুণবর্ণে সহজে নবীন, চরণ রাঙাবার জন্যে যাদের ঊষাকে নিয়ুমার্কেটে 'খুন' ফরমাশ করতে হয় না। আমি সেই তরুণদের বন্ধু, তাঁদের বয়স যতই প্রাচীন হোক। আর যে বৃদ্ধদের মরচে-ধরা চিত্তবীণায় পুরাতনের স্পর্শে নবীন রাগিণী বেজে ওঠে না তাঁদের সঙ্গে আমার মিল হবে না, তাঁদের বয়স নিতান্ত কাচা হলেও।

"এই পরিষদ সকল বয়সের সেই তরুণদের পরিষদ হোক। পুরাতনের নবীনতা বুঝতে তাঁদের যেন কোনো বাধা না থাকে।"

[রবীন্দ্ররচনাবলী-২৩শ খণ্ড ॥ পৃ: ৪৯১-৯২]

পরদিনই কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন (৬ই জানুয়ারী)। ঐদিন নিখিল ভারত বিজ্ঞান কংগ্রেসের সদস্যগণ শান্তিনিকেতন দেখিতে আসেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত অধ্যাপক লেসনী এই সময় কয়েক মাসের জন্য ভিজিটিং প্রফেসর রূপে বিশ্বভারতীতে যোগদান করেন।

বিখ্যাত গায়িকা ক্লারা বাট্ এই সময় একদিন শান্তিনিকেতনে কবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। পাশ্চাত্য সংগীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ও আকর্ষণ চিরদিন খুবই প্রবল ছিল। কবির মনোরঞ্জনের জন্য শ্রীমতী বাট্ তাঁহাকে গান গাহিয়া শুনান।

এই সময় কলিকাতায় একটি অত্যন্ত অপ্রীতিকর ঘটনায় কবিকে জড়াইয়া পড়িতে হয়। কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত সিটি কলেজের 'রামমোহন রায় হোস্টেলে' সরস্বতী পূজা উপলক্ষে কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রদের মধ্যে এক বিরোধ সৃষ্টি হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের ধর্মাদর্শের ভিত্তিতে কলেজে কিংবা হোস্টেলে পৌত্তলিক পূজা অনুষ্ঠান অনুমোদন করিতেন না। কিন্তু রামমোহন হোস্টেলের ছাত্ররা এই বৎসর হোস্টেলে সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠানের জন্য জেদ্ করিতে থাকে। এই লইয়া কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রদের মধ্যে বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করিল। ইতিমধ্যে ছাত্র ও যুবচিত্ত জয়ের অভিলাষে কলিকাতার কয়েকজন বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা ছাত্রদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহাদের দাবি মানিয়া লইবার জন্য অগ্রণী হইয়া আসিলেন। ফলে অবস্থা ক্রমেই গুরুতর আকার ধারণ করিতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই এই ধরণের সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মোন্মাদনাকে সমর্থন করিতেন না। তিনি উহার তীব্র সমালোচনা করিয়া মডার্ণ রিভ্যু পত্রিকায় একটি বিবৃতি দেন (*Modern Review*—May 1928)। তিনি উহাতে পরিষ্কার ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন ধর্মানুষ্ঠানের অনুমতি দেওয়া সঙ্গত নহে। কেননা হিন্দুদের কোন ধর্মানুষ্ঠানের অনুমতি দিলে মুসলমান বা অন্য সম্প্রদায়ের ছাত্ররা নিজ নিজ ধর্মানুষ্ঠানের জন্য জেদ্ করিবে;—যাহা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয় অন্তত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে।

কিন্তু কবির দুঃখ ও আক্ষেপ, এই ধরণের সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মোন্মাদনার সমর্থনের বিখ্যাত দেশনেতারা অগ্রণী হইয়াছেন বলিয়া;—বিশেষ করিয়া যখন জাতীয় ও রাজনৈতিক ঐক্যের সংহতি রক্ষার জন্য নেতারা সকলেই গগনবিদারী বক্তৃতা ও আবেদন করিয়া বেড়াইতেছেন। তাই ঘটনাটি উপলক্ষ করিয়া কিছুদিন পর কবি গভীর দুঃখে ও আক্ষেপে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন (২৩শে বৈশাখ-১৩৩৫),

··"যারা ভারতে রাষ্ট্রিক ঐক্য ও মুক্তিসাধনাকে তাঁদের সমস্ত চেষ্টার একমাত্র লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করেছেন, তাঁরাও যখন প্রকাশ্যে এই ধর্মবিরোধকে পক্ষপাত দ্বারা উৎসাহই দিচ্ছেন, তাঁরাও যখন ছাত্রদের এই স্বরাজনীতিগর্হিত আচরণে লেশমাত্র আপত্তি প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত তখন স্পষ্টই দেখচি, আমাদের দেশের পলিটিক্‌স্ সাধনার পদ্ধতি নিজের ভীরুতায়, দুর্বলতায় নিজেকে ব্যর্থ কর্‌বার পথেই দাঁড়িয়েছে।"···

[প্রবাসী-জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫ ॥ পৃ ৩০০]

আমাদের জাতীয়তাবাদী নেতাদের অধিকাংশই কীরূপ হিন্দু-ঘেঁষা ছিলেন, এই সব ঘটনা হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কলিকাতায় তখন 'কল্লোল-কালিকলম' গোষ্ঠী ও 'শনিবারের চিঠি'র বিরোধ চরম আকার ধারণ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে এই ক্ষুদ্র গোষ্ঠীগত সংকীর্ণতার তীব্র বিরোধী ছিলেন। তাছাড়া বাংলা সাহিত্যে অশ্লীলতা দমনের অজুহাতে শনিবারের চিঠি 'মণিমুক্তা' নামে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা হইতে অশ্লীল রচনার অংশবিশেষের সংকলন করিয়া প্রকাশ করিতে থাকে। কবি উহার নিন্দা করিয়া অধ্যাপক সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে এক পত্রে লিখিলেন, [শনিবারের চিঠি-মাঘ ১৩৩৪] :

"সাহিত্যের দোহাই ছেড়ে দিয়ে সমাজহিতের দোহাই দিতে পারো। আমার নিজের বিশ্বাস শনিবারের চিঠির শাসনের দ্বারাই অপরপক্ষে সাহিত্যের বিকৃতি উত্তেজনা পাচ্ছে। যে সব লেখা উৎকট ভঙ্গির দ্বারা নিজের সৃষ্টি ছাড়া বিশেষত্বে ধাক্কা মেরে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সমালোচনার খোঁচা তাদের সেই ধাক্কা মারাকেই সাহায্য করে। সম্ভবত ক্ষণজীবীর আয়ু এ-তে বেড়েই যায়। তাই যদি না হয়, তবু সম্ভবত এতে বিশেষ কিছু ফল হয় না। আইনে প্রাণদণ্ড বিধান আছে, প্রাণহত্যাও থামচে না।

পরিশেষে তিনি গোষ্ঠীগত সংকীর্ণতা ত্যাগ করিয়া প্রকৃত গুণীর সমাদর করিবার আহ্বান জানাইয়া লিখিলেন,

"ব্যঙ্গরসকে চিরসাহিত্যের কোঠায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আর্টের দাবি আছে। শনিবারের চিঠির অনেক লেখকের কলম সাহিত্যের কলম, অসাধারণ তীক্ষ্ণ, সাহিত্যের অস্ত্রশালায় তার স্থান—নব নব হাস্যরূপের সৃষ্টিতে তার নৈপুণ্য প্রকাশ পাবে, ব্যক্তিবিশেষের মুখ বন্ধ করা তার কাজ নয়। সে কাজ করবারও লোক আছে, তাদের কাগজী লেখক বলা যেতে পারে, তারা প্যারাগ্রাফ বিহারী।

"আর একটা কথা যোগ ক'রে দিই। যে সব লেখক বে-আব্রু লেখা লিখেচে তাদের কারো কারো রচনাশক্তি আছে। যেখানে তাদের গুণের পরিচয় পাওয়া যায়, সেখানে সেটা স্বীকার করা ভালো। যেটা প্রশংসার যোগ্য তাকে প্রশংসা করলে তাতে নিন্দা করবার অনিন্দনীয় অধিকার পাওয়া যায়।"

[কল্লোল যুগ ।। পৃ ২৫৮-৫৯]

রবীন্দ্রনাথ যে কোন পক্ষেই নেই, ইহাতে অনেকটা স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

উল্লেখযোগ্য, এই সময় কবি 'মহুয়া' ও 'বনবাণীর' অধিকাংশ কবিতাগুলি রচনা করেন। শান্তিনিকেতনে বসন্তোৎসবের পর কবি কলিকাতায় আসেন। সাহিত্য বিচারে এতদিন ধরিয়া যে বিতর্ক চলিয়া আসিতেছিল তাহারই একটা মধ্যস্থতা করিবার উদ্দেশ্যে জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা' ভবনে পর পর দুইদিন সাহিত্যসভা হয় (৪ঠা ও ৭ই চৈত্র—১৩৩৪)। রবীন্দ্রনাথ উহার সভাপতি। তা'ছাড়া প্রমথ চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, প্রশান্ত মহলানবিশ, অপূর্ব কুমার চন্দ, নরেন্দ্র দেব, মোহিতলাল, অশোক চট্টোপাধ্যায়, রবীন মৈত্র, গোপাল হালদার, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত প্রমুখ প্রবীণ ও নবীনদের আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন। এই আলোচনাসভায় কবি 'সাহিত্যরূপ' ও 'সাহিত্য সমালোচনা'

প্রবন্ধ দুইটি যথাক্রমে পাঠ করেন। 'সাহিত্যরূপ' প্রবন্ধের এক জায়গায় কবি বলিলেন,

"সাহিত্যের যুগ বলতে কী বোঝায় সেটা বোঝাপড়া করবার সময় হয়েছে। কয়লার খনিক বা পানওয়ালীদের কথা অনেকে মিলে লিখলেই কি নবযুগ আসে। এই রকমের কোনো একটা ভঙ্গিমার দ্বারা যুগান্তরকে সৃষ্টি করা যায়, এ কথা মানতে পারব না।···কোনো-একটা চাপরাশের জোরে যে-সাহিত্য আপন বিশিষ্টতার গৌরব খুব চড়া গলায় প্রমাণ করতে দাঁড়ায়, জানব, তার গোড়ায় একটা দুর্বলতা আছে।···য়ুরোপের কোনো কোনো লেখক শ্রমজীবীদের দুঃখের কথা লিখেছে, কিন্তু সেটা যে-ব্যক্তি লিখেছে সেই লিখেছে।···খাঁটি সাহিত্যিক যখন একটা সাহিত্য রচনা করতে বসেন তখন তাঁর নিজের মধ্যে একটা একান্ত তাগিদ আছে বলেই করেন; সেটা সৃষ্টি করবার তাগিদ, সেটা ভিন্ন লোকের ভিন্নরকম। তার মধ্যে পানওয়ালী বা খনিক আপনিই এসে পড়ল তো ভালোই। কিন্তু, সেই এসে পড়াটা যেন যুগধর্মের একটা কায়দার অন্তর্গত না হয়।"···

[রবীন্দ্র রচনাবলী-২৩'শ খণ্ড ।। পৃ: ৪৯৭]

পরদিনের আলোচনায় কবি এই কথাই অন্যভাবে বলিলেন। তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সহিত বলিলেন,

···"আমি কখনও মনে করি নি, আমার পক্ষের কথা বলে সকলের কথাকে চাপা দেব। আমার নিবেদন এই যে, আপনারা আমার উপর রাগ না করে আপনাদের মত সভায় ব্যক্ত করুন। আমার যেটা মত সেটা আমারই মত। ···আমরা এতদিন যা ভেবে এসেছি সেটা চিরকালের সাহিত্যে স্থান না পাবার যোগ্য হতেও পারে।" ··

আলোচনা সভায় সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস প্রমুখ অনেকেই বিভিন্ন দিক হইতে প্রশ্ন করিলে কবি লিখিত আকারে উহার জবাব দেন। এক প্রশ্নের জবাবে, 'শনিবারের চিঠি' সম্পর্কে বলিলেন,

···"যে-সমালোচনার মধ্যে শান্তি নাই, যা কেলমাত্র আঘাত দেয়, কেবলমাত্র অপরাধটুকুর প্রতি সমস্ত চিত্ত নিবিষ্ট করে, আমি তাকে ঠিক মনে করি নে।··· সাহিত্যিক অপরাধের বিচার সাহিত্যিক ভাবেই হওয়া উচিত অর্থাৎ, রচনাকে তার সমগ্রতার দিক থেকে দেখতে হবে।"··· [ঐ-।। পৃ: ৫০৭-০৯]

আলোচনাসভায় উপসংহারে কবি যাহা বলিলেন তাহা অত্যন্ত প্রণিধান-যোগ্য।

···"তোমরা কথায় কথায় আধুনিক মাসিকপত্রে বল, আমরা আধুনিক কালের লোক, অতএব গরিবের জন্য কাঁদব। এরকম ভঙ্গিমাবিস্তারের প্রশ্রয় সাহিত্যে অপকার করে। আমরা অর্থশাস্ত্র শেখবার জন্য গল্প পড়ি না। গল্পের জন্য গল্প পড়ি। 'গরিবিয়ানা' 'দরিদ্রিয়ানা'কে সাহিত্যের অলংকার করে তুলো না।···যখন তোমাদের লেখা পড়ব তখন এই বলে পড়ব না যে, এইবার গরিবের কথা পড়া যাক। গোড়ার থেকে ছাপ মেরে চিহ্নিত করে তোমরা

নিজেদের দাম কমিয়ে দাও। দল বেঁধে সাহিত্য হয় না।...প্রত্যেকের নিজের ভিতর অভিমান থাকা উচিত যে, আমি যা লিখছি 'গরিবিয়ানা' বা 'যুগ' প্রচার করবার জন্য নয়, একমাত্র আমি যেটা বলতে পারি সেটাই আমি লিখছি। এ কথা বললেই লেখক যথার্থ সাহিত্যিকের আসন পায়। উপসংহারে এ কথাও আমি বলে রাখতে চাই, তোমাদের অনেক লেখকের মধ্যে আমি প্রতিভার লক্ষণ দেখেছি। আমি কামনা করি, তাঁরা যুগ-প্রবর্তনের লোভে পড়ে তাঁদের লেখার সর্বাঙ্গে কোনো দলের ছাপের উল্‌কি পরিয়ে তাকে সজ্জিত করা হল বলে না মনে করেন। তাঁদের শক্তির বিশুদ্ধ স্বকীয় রূপটি জগতে জয়ী হোক।"

[ঐ।। পৃ-৫১২]

এবার শ্রীনিকেতনের অষ্টম সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে কবি পল্লীসমস্যা সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া 'পল্লী প্রকৃতি' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন (২৩শে মাঘ-১৩৩৪)। পল্লীসমস্যার বিভিন্ন দিকগুলি আলোচনা করিবার পর কবি বলিলেন,

"এখনকার কালের সাধনা, লোকালয়কে আবার সমগ্র ক'রে তোলা। বিশিষ্টে সাধারণে, শক্তিতে সৌহার্দ্যে, শহরে গ্রামে মিলিয়ে সম্পূর্ণ করা। বিপ্লবের দ্বারা এই পূর্ণতা ঘটবে না। বিপ্লবকে যারা বাহন করে তারা এক অসামঞ্জস্য থেকে আর-এক অসামঞ্জস্যে লাফ দিয়ে চলে, তারা সত্যকে ছেঁটে ফেলে সহজ করতে চায়।...আমরা এই কথা বলি যে, সত্যকে সমগ্রভাবে না নিতে পারলে মানবস্বভাবকে বঞ্চিত করা হয়—বঞ্চিত করলেই তার থেকে রোগ, তার থেকে অশান্তি। এমন-কি, ঐ যে কলের কথা বলছিলুম—তাকে দিয়ে আমরা বিস্তর অকার্য করেছি ব'লেই যে তাকে বাদ দেওয়া চলে এ কথা বলা যায় না। এই যন্ত্রও আমাদের প্রাণশক্তির অঙ্গ। এ একেবারেই মানুষের জিনিস। হাতকে দিয়ে ডাকাতি করেছি বলে যে তাকে কেটে ফেললে মঙ্গল হয় তা নয়, সেই হাতকে দিয়েই প্রায়শ্চিত্ত করাতে হবে।...

[পল্লীপ্রকৃতি। পৃ ৫১]

তিনি আরো বলিলেন,

"মানুষ যেমন একদিন হাল লাঙলকে, চরকা তাঁতকে, তীর ধনুককে, চক্রবান যানবাহনকে গ্রহণ ক'রে তাকে নিজের জীবনযাত্রার অনুগত করেছিল, আধুনিক যন্ত্রকেও আমাদের সেই রকম করতে হবে। যন্ত্রে যারা পিছিয়ে আছে যন্ত্রে অগ্রবর্তীদের সঙ্গে তারা কোনোমতেই পেরে উঠবে না। যে কারণে চার-পা-ওয়ালা জীব দুই-পা-ওয়ালা জীবের সঙ্গে পেরে ওঠেনি, এও সেই একই কারণ।

"বিজ্ঞান মানুষকে মহাশক্তি দিয়েছে। সেই শক্তি যখন সমস্ত সমাজের হয়ে কাজ করবে তখনই সত্যযুগ আসবে। আজ সেই পরম যুগের আহ্বান এসেছে। আজ মানুষকে বলতে হবে, 'তোমার এ শক্তি অক্ষয় হোক ; কর্মের ক্ষেত্রে, ধর্মের ক্ষেত্রে জয়ী হোক'।...

লক্ষ্য করিবার বিষয়, এই ভাষণে কবি যত স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায়

আধুনিক বিজ্ঞান, কারিগরী ও যন্ত্রশিল্পকে গ্রহণ করিবার জন্য জোর দিলেন ইতিপূর্বে তাহা তেমনটি করেন নাই। শুধু তাহাই নহে, এই বিজ্ঞান ও যন্ত্রশক্তিকে তিনি পল্লীপুনর্গঠনে পূর্ণভাবে কাজে লাগাইবার জন্য বলিলেন।

তাই তিনি বলিলেন,

"মানুষের শক্তির এই নূন্যতম বিকাশকে গ্রামে গ্রামে আনা চাই। এই শক্তিকে যে আবাহন ক'রে আনতে পারে নি ব'লেই গ্রামে জলাশয়ে আজ জল নেই, ম্যালেরিয়ার প্রকোপে দুঃখশোক পাপতাপ বিনাশমূর্তি ধরেছে, কাপুরুষতা পুঞ্জীভূত। চার দিকে যা দেখছি এ তো পরাভবেরই দৃশ্য।...এ যুগের শক্তিকে যদি গ্রহণ করতে পারি তা হলেই জিতব, তা হলেই বাঁচব।

"এইটেই আমাদের শ্রীনিকেতনের বাণী।"...

তিনি বলিলেন, একদিন দেবতারা যেমন দৈত্যগুরুর নিকট হইতে—যাহাতে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়—সেই অমরত্বের বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া আসিয়াছিল, তেমনিভাবে পশ্চিমের নিকট হইতে জ্ঞান-বিজ্ঞান আমাদের অনুশীলন ও আয়ত্ত করিয়া লইতে হইবে। তাই তিনি বলিলেন,

..."দানবের ব্যবহার স্বর্গের ব্যবহার না হতে পারে, কিন্তু যে বিদ্যা দানবকে শক্তি দিয়েছে সেই বিদ্যাই দেবতাকেও শক্তি দেয়—বিদ্যার মধ্যে জাতিভেদ নেই।

"আজকের দিনে আমাদের দেশে সর্বদাই শুনতে পাই, য়ুরোপের বিদ্যা আমরা চাই নে, এ বিদ্যায় সয়তানি আছে। এমন কথা আমরা বলব না। বলব না, শক্তি আমাদের মারছে, অতএব অশক্তিই আমাদের শ্রেয়। শক্তির মার নিবারণ করতে গেলে শক্তিকে গ্রহণ করতে হয়, তাকে ত্যাগ করলে মার বাড়ে বই কমে না।...

..."বিজ্ঞানের সত্য যে পণ্ডিত যখনই আবিষ্কার করুন, জাতিনির্বিশেষে তা এক। অতএব এই শক্তি-আবিষ্কার আমাদেব সকলকে এক করবার সহায়তা করে যেন। বিজ্ঞান যেখানে সত্য সেখানে বস্তুতই সে সকল জাতির মানুষকে ঐক্য দান করেছে। কিন্তু তার শক্তির ভাগাভাগি নিয়ে মানুষ হানাহানি ক'রে থাকে; সেই বিরোধ সত্যের বা শক্তির মধ্যে নয়, আমাদের চরিত্রে যে অসত্য যে অশক্তি, তারই মধ্যে।" ..

[পল্লীপ্রকৃতি ॥ পৃ ৫৩-৫৬]

এই সময় দক্ষিণ-আফ্রিকার, হবিব মোতান নামক জনৈক ভারতীয়ের বর্ণবিদ্বেষমূলক একটি পত্রের দিকে কবির দৃষ্টি পড়ে। দক্ষিণ-আফ্রিকার অধিবাসীদের সহিত ভারতীয়দেরও একসাথে একটি বিদ্যায়তনে পাঠ করিবার জন্য ভারতের এজেন্ট জেনারেলের নির্দেশ আসে; উহাই উক্ত ভদ্রলোকের ক্ষোভ প্রকাশের ও উষ্মার কারণ। রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয়দের মধ্যে এই ধরণের জাত্যভিমানিতা ও বর্ণবিদ্বেষের পরিচয় পাইয়া, ঐ পত্রের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া এক বিবৃতি দেন। তিনি লিখিলেন,

"I have read the letter of Mr. Habid Motan dated

November 19, 1927, addressed to the Agent-General, protesting against any Indian being invited to attend Fort Hare Native College, for University Education. In this published letter, he states, that 'it is humiliating to the Indian sentiment, and to the Indian National Honour and Civilisation, to think that our Agent-General is trying to bring us down to such a low level.' Such colour prejudice, from an Indian, who has himself suffered from the racial prejudice of the European, is to me revolting in the extreme. It is neither in accord with Indian sentiment, or with Indian National Honour and Civilisation. Our only right to be in South-Africa at all is that the native Africans, to whom the soil belongs, wish us to be there. To insult them publicly as Mr. Habib Motan has done, in this open letter,—both by the words I have quoted, and by others are equally contemptuous,—is an act which needs immediate repudiation from all rightmined men."

[*Modern Review*-April, 1928. p. 491.]

বেনারসীদাস চতুর্বেদী কবির এই পত্রের টীকায় লিখিতেছেন,

"...The Poet has given a timely warning to our *Chhota* Imperialists, who consider themselves superior to the Natives and think it below their dignity to associate with them."

দক্ষিণ-আফ্রিকা যে দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসীদের, ভারতীয়রাও এক হিসাবে সেখানে ঔপনিবেশিকমাত্র এবং—"*Our only right to be in South-Africa at all is that the native Africans, to whom the soil belongs wish us to be there.*"—এ'কথা কংগ্রেস-সভামঞ্চ হইতে তখনও পর্যন্ত কোন নেতাকেই উচ্চারণ করিতে দেখা যায় না, এমনকি স্বয়ং গান্ধীজীকেও নয়। স্মরণ রাখা দরকার, দক্ষিণ-আফ্রিকায় অবস্থানকালে গান্ধীজী সেখানে মূলত ভারতীয় ও এশিয়াবাসীদের মানবিক অধিকারের দাবিতেই সংগ্রাম করিয়াছিলেন এমনকি 'বুয়র যুদ্ধ' ও 'জুলু-বিদ্রোহের' সময় তিনি সেখানকার 'নেটিভদের' বিরুদ্ধে ব্রিটিশ এম্পায়ারের স্বার্থে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। এ সব কথা পূর্বখণ্ডেই বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে।

উল্লেখযোগ্য, কিছুকাল পূর্বে দক্ষিণ-আফ্রিকায় প্রধানমন্ত্রী General Hertzog 'গান্ধী-স্মাটস্ চুক্তি' ভঙ্গ করিয়া ভারতীয়দের পূর্ব অর্জিত অধিকার হরণ করিবার উদ্দেশ্যে '*Class Areas Bill*' নামে একটি আইন প্রণয়ন করিবার উদ্যোগ করেন (১৯২৫)। গান্ধীজী ও কংগ্রেসের অনুরোধে এণ্ড্রুজ উহার প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে দক্ষিণ-আফ্রিকায় জেনারেল Hertzog-এর

সহিত আলোচনা করিয়া উহা স্থগিত রাখেন। কিছুকাল পর কেপটাউনে এক সম্মেলনে (First Cape Town Round Table Conference) সাময়িক-ভাবে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার ও ভারতীয়দের মধ্যে এক আপোষ-চুক্তি হয়। এবারও এণ্ড্রুজ জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করেন। ঐ সম্মেলনের ফলে দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়দের স্বার্থরক্ষা ও তত্ত্বাবধানের জন্য একজন 'এজেণ্ট-জেনারেল' নিযুক্ত হয়। Hon. V. S. S. Sastri প্রথম এজেণ্ট-জেনারেল নিযুক্ত হন।

শুধু দক্ষিণ-আফ্রিকায়ই নহে—আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ভারতীয়দের মানবিক অধিকার অর্জনের জন্য এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সব উপনিবেশে শুধু ভারতীয় 'কুলি' ও মজুর সম্প্রদায়ের লোকেরাই ছিল না—ব্যবসায়ী ও সরকারী চাকুরিজীবী বহু ভারতীয়ও ছিল। এই সব শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির অনুগ্রহ লাভ করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের আজ্ঞাভাজন সেবক ও অনুচরের কাজ করিত। তাছাড়া ঐ সব দেশের অধিবাসীদের তাহারা ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখিত। এণ্ড্রুজ বার বার এইদিকে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদের চোখ খুলিবার চেষ্টা করেন ; রবীন্দ্রনাথের ঐ প্রতিবাদপত্র প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিন পর বেনারসীদাস চতুর্বেদী কেনিয়ায় এবং অন্যত্র ভারতীয়দের ঔপনিবেশিক মনোবৃত্তির তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ করিয়া এক বিবৃতি দেন এবং এণ্ড্রুজ ও গান্ধীজীর নিকট এই বিষয়ে তাঁহাদের অভিমত ব্যক্ত করিবার অনুরোধ জানান। এণ্ড্রুজ উহার জবাবে 'Fiji for the Fijians' নামক একটি প্রবন্ধে (*Young India*) লিখিলেন,

'One of the most serious dangers in the way of attainment of Swaraj in India in the fullest sense of the term—moral and spiritual, as well as political and geographical,—may be this. We are likely to be tempted to 'assist' the white rulers in their 'trusteeship' over the 'natives', whether African, Fijian or Malay. The most dangerous clause, of that kind,…which states that the trusteeship over the natives in Kenya may be shared by the emmigrant communities,…it is an assurance that Indian equality with the white emmigrants was not to be threatened. But there are different kinds of equality ; and we who are fighting against imperialism do not wish for a moment to be equal partners in imperialism over the native Africans ; for that, in plain language, is what the hypocritical word 'trusteeship' really means.…

"Once I gave a somewhat sinister name to this 'joint-imperialism.' I called it the 'jackal policy.' The great British lion would allow India to follow it on its march of finding

its prey, and would allow India to pick the bones after the lion's feast was over. I said that nothing in the world must let us ever 'play jackal' to the British lion over the native races."

সাম্রাজ্যবাদের জঘন্য কূটনীতিটির সম্পর্কে পুনরায় সতর্ক করিয়া দিয়া ঐ প্রবন্ধে এণ্ড্রুজ আরও বলিলেন,

"There is no more dangerous offer ever made than the old Roman imperialist offer,—*Divide et Impera* 'Divide and Rule.' Everywhere imperialism feeds upon this policy ; everywhere it is sure to be tried."...

[*Modern Review*-May, 1928-p. 619]

তিনি সতর্ক করিয়া দিয়া আরও বলিলেন, সাম্রাজ্যবাদীরা দক্ষিণ-আফ্রিকা, কেনিয়া ও সর্বত্রই ঐ নীতি অবলম্বন করিয়া ভারতীয়দের ঐ ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। ইতালির ফ্যাসিজম ও মুসোলিনীর সাম্রাজ্য-লালসা সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়া এণ্ড্রুজ আরো লিখিলেন,

"Just as a straw will show what way the wind blows, so these things are indications of a great struggle that lies ahead. *Italy today is furiously imperialist under Mussolini, although not long ago Italy was crying out loudly against Austrian imperialism.*"......

গান্ধীজী এণ্ড্রুজের এই প্রবন্ধের মন্তব্যে লিখিলেন,

"Though what Dinabandhu says is the truth and nothing but the truth, I fear that if the British imperialist rulers offer the Indian emmigrants in any part of the world, sufficient inducement, they will succumb, and imagine that they are 'equal partners' not knowing that they are but 'jackals'. But the hope lies in Imperialists never offering enough inducement and the native wit of the Indian emmigrants seeing through the thin veil of Imperial *maya*." [*Ibid*-P.619.]

বলা বাহুল্য, সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ সম্পর্কে দীর্ঘদিন হইতে রবীন্দ্রনাথ ও এণ্ড্রুজ গান্ধীজীকে সতর্ক ও সচেতন করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার তখনও পর্যন্ত গান্ধীজী সাম্রাজ্যবাদের চরিত্ররূপ পরিষ্কার বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই এবং এই সম্পর্কে তাঁহাকে পরিষ্কার বিচার-বিশ্লেষণ কিংবা মন্তব্য করিতেও দেখা যায় না।

কলিকাতার উত্তেজনা ও কোলাহল হইতে মুক্তি পাইবার জন্য চৈত্রের শেষ-ভাগে কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন।

ইহার কিছুকাল আগেই কবি 'খরবায়ু বয় বেগে' গানটি রচনা করেন। গানটির প্রথম পঙ্‌ক্তি,

"খরবায়ু বয় বেগে চারি দিক ছায় মেঘে,
ওগো নেয়ে, নাওখানি বাইয়ো।
তুমি কষে ধরো হাল, আমি তুলে বাঁধি পাল—
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো॥"

[মানসী ও মর্মবাণী-ফাল্গুন-১৩৩৪]

পরে গানটি 'তাসের দেশ' গীতিনাট্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সাইমন কমিশন বর্জন বিক্ষোভ-আন্দোলনের পটভূমিতেই কবি গানটি রচনা করিয়াছিলেন।

সমবায়, বৃক্ষরোপণ ও হলকর্ষণ-উৎসব

১৯২৮ সালের শুরুতেই সারা দেশে তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনা ও উদ্দীপনা দেখা দিল।

'সাইমন-কমিশন' বর্জন উপলক্ষে এই উত্তেজনা তীব্র ও চরম আকার ধারণ করিল। ৩রা ফেব্রুয়ারী কমিশন বোম্বাইয়ে পদার্পণ করে। কংগ্রেস ও অন্যান্য প্রায় সমস্ত দল ও প্রতিষ্ঠানের নির্দেশে সারা দেশে ঐদিন ঐ কমিশন বয়কট করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিবাদসভা ও হরতাল পালন করা হয়। পরদিন কমিশন দিল্লী পৌঁছাইলে এক বিরাট শোভাযাত্রা উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ক্রমে মাদ্রাজ, পাটনা, কলিকাতা, লাহোর—দেশের সর্বত্রই অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। সর্বত্রই জনতা কমিশনের বিরুদ্ধে কৃষ্ণ পতাকা প্রদর্শন ও 'গো ব্যাক সাইমন কমিশন' ধ্বনি সহকারে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে থাকে। মাদ্রাজ, লক্ষ্ণৌ ও লাহোরে বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী জনতার উপর পুলিশ লাঠি ও গুলিবর্ষণ করে। লাহোরে এই পুলিশী-হামলা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। বিক্ষোভকারীদের সহিত লালা লাজপৎ রায় নিদারুণভাবে প্রহৃত হন। ঐ আঘাতের চোটেই, উহার কয়েকমাস পরে লালাজীর মৃত্যু হয় (১৭ই নভেম্বর ১৯২৮)।

অপরদিকে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গঠনতন্ত্র রচনার জন্য ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে দিল্লীতে পর পর দুইটি সর্বদলীয় সম্মেলন হয়। ডাঃ আনসারীর সভাপতিত্বে ১৯শে মে তৃতীয় সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে, শাসনতন্ত্রের খসড়া রচনা ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের জন্য পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। স্থির হয়, পরবর্তী সম্মেলনে কমিটি উহার একটি খসড়া দাখিল করিবেন (১লা জুলাই)।

কিন্তু দেশের যুবশক্তি প্রাচীনপন্থী ও প্রবীণদের এই রাজনীতিকে কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারিতেছিল না। এই জাতীয় আন্দোলনে যুবশক্তির নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসু।

১৯২৭ সালের শেষভাগ হইতে সারা দেশে যুব-আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলন ক্রমশ ব্যাপক ও প্রবল আকার ধারণ করিতে থাকে। যুক্তপ্রদেশ ও গুজরাটে কৃষক আন্দোলনও শক্তিশালী হইতে থাকে। মে মাসে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে বরদৌলিতে ভূমিকর বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিরাট কৃষক আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু ট্রেড-ইউনিয়ন ও শ্রমিক আন্দোলনই এই সময় সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ও তীব্র আকার ধারণ করে। কিন্তু তৃতীয় শক্তি হিসাবে এই সময় কমিউনিস্ট পার্টি ও 'ওয়ার্কার্স এ্যাণ্ড পেজাণ্টস্ পার্টি' বেশ কিছুটা সংগঠিত আকারে প্রসারলাভ করে এবং শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনে তাহারা সর্বাপেক্ষা

উৎসাহ-উদ্দীপনা লইয়া অংশ গ্রহণ করে। বস্ত্রশিল্প, রেলওয়ে, পাটকল ইত্যাদি কয়েকটি শিল্পে শ্রমিক আন্দোলন অধিকতর সংগঠিত ও সঙ্ঘবদ্ধ হয়। এইসব শিল্পে একটানা ধর্মঘট লাগিয়াই ছিল; শ্রমিক আন্দোলন প্রসারলাভ করার ফলে উহার আদর্শ ও নীতিগত বিরোধও প্রকট হইয়া উঠিল। এই প্রসঙ্গে জওহরলাল নেহরু লিখিতেছেন,

…"শ্রমিক সঙ্ঘের পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে অপরিহার্যরূপে তাহার মধ্যে পাশ্চাত্য হইতে আভ্যন্তরীণ কলহ ও ধ্বংসের বীজও আসিল। ভারতে ট্রেড্ ইউনিয়ন আন্দোলন প্রতিষ্ঠালাভ না করিতে করিতেই ইহার মধ্যে দল ভাঙ্গাভাঙ্গি বিচ্ছেদ প্রতিযোগিতা এবং শত্রুতার আশঙ্কা উপস্থিত হইল। ইহাদের মধ্যে একদল ছিল দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ভক্ত, একদল তৃতীয় আন্তর্জাতিকের অনুরাগী, একদল সংস্কারমূলক নরমপন্থী অপরদল খোলাখুলি বৈপ্লবিক ও আমূলপরিবর্তনকামী। এই দুই দলের মাঝামাঝি অনেক রকম মতের লোক এবং সুবিধাবাদীরাও ছিল।"…

[আত্মজীবনী ।। পৃঃ ১৮৫]

উল্লেখযোগ্য, এই সময় ভারতে কমিউনিস্ট্ আন্দোলনকে সংগঠিত করিবার উদ্দেশ্যে বেন্ ব্রাড্‌লে ও ফিলিপ স্প্রাট্‌কে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টি ভারতে প্রেরণ করে। মোট কথা কমিউনিস্ট ভাবাদর্শ দেশের প্রগতিশীল যুব সম্প্রদায়কে ক্রমশই আকৃষ্ট করিতে থাকে। এই প্রসঙ্গে নেহরু আরও লিখিতেছেন,

"ভারতে সমাজতন্ত্রবাদের প্রথম প্রচারক আমি নহি, বস্তুতঃ আমি অনেকের পশ্চাতে ছিলাম এবং অতিকষ্টে এক এক পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতেছিলাম। তখন অন্যান্য সকলে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের ন্যায় দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতে ছিলেন। শ্রমিকদের ট্রেড্ ইউনিয়ন আন্দোলন এবং যুবক সমিতিগুলির অধিকাংশই মতবাদের দিক দিয়া নিশ্চিতই সমাজতান্ত্রিক। আমি যখন ১৯২৭-এর ডিসেম্বরে ভারতে প্রত্যাবর্তন করি তখন চারিদিকে এক প্রকার অস্পষ্ট সমাজতন্ত্রবাদের কথা হাওয়ায় ভাসিতেছে, এবং তাহার পূর্বে অনেকে ব্যক্তিগত-ভাবে সমাজতান্ত্রিক ছিলেন। অধিকাংশ যদিও কল্পনারাজ্যে বিহার করিতেন তথাপি তাঁহারা ক্রমশঃ মার্কস্ মতবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতেছিলেন। মুষ্টিমেয় ব্যক্তি নিজেদের পুরোপুরি মার্কস্-পন্থী মনে করিতেন। সোভিয়েট ইউনিয়নের উন্নতি এবং বিশেষভাবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলে ইউরোপ আমেরিকার মতই ভারতেও এই ভাব শিকড় গাড়িতেছিল।"

[আত্ম-জীবনী ।। পৃ ১৯৭-৯৮]

তাছাড়া সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনও উগ্রপন্থী যুবকদের মধ্যে পুনরায় প্রবলভাবে প্রসারলাভ করিতে থাকে।

এই সময় ইংলণ্ডে হিবার্ট ট্রাস্টিদের নিমন্ত্রণে বক্তৃতা করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ বিলাতের পথে রওনা হন (১২ই মে ১৯২৮)। কিন্তু পথিমধ্যে মাদ্রাজে অসুস্থ হইয়া পড়ায় তিনি বিলাতযাত্রা স্থগিত রাখেন। মাদ্রাজে অসুস্থ

হইয়া পড়ায় তিনি বিলাতযাত্রা স্থগিত রাখেন। মাদ্রাজে আদেয়র-এ অ্যানি বেসান্তের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে প্রায় সপ্তাহ কাল কাটাইতে হয়। এই-খানেই 'সংস্কার' নামে ছোট গল্পটি তিনি রচনা করেন এবং সম্ভবত 'শেষের কবিতা'র খসড়া 'মিতা' নামক উপন্যাসটির রচনাও এই সময় শুরু করেন। কিন্তু সাংবাদিকরা ছাড়ে না—'দেশের বর্তমান রাজনীতিক সমস্যা সম্পর্কে কবির কি অভিমত ? উহার সমাধান কোথায় ?' রবীন্দ্রনাথ দেশের রাজনীতির বিস্তারিত খুঁটিনাটি প্রশ্ন ও বিষয়গুলির উপর খুব গুরুত্ব দেন নাই। কেননা ঐ রাজ-নীতির মূল সুরটিকেই তিনি মানিয়া লইতে পারেন নাই। অল্প কিছুকাল পূর্বে তিনি স্বরাজ্যদলের পত্রিকা-সম্পাদকের নিকট লিখিত পত্রে তাঁহার অভি-মতের কথা পরিষ্কার ব্যক্ত করেন; পূর্বেই তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। কবি সমবায় আন্দোলন ও পল্লী উন্নয়নমূলক কাজের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিতেছিলেন। প্রায় এক বৎসর পূর্বে কলিকাতায় 'বঙ্গীয় সমবায়-সংগঠন-সমিতি'র এক সভায় যে বক্তৃতাটি পাঠ করিয়াছিলেন খুব সম্ভবত এই সময় উহারই সারকথাটি ইংরেজীতে সাংবাদিকদের দেন (দ্র.-'ভারতবর্ষে সমবায়ের বিশিষ্টতা'-সমবায়নীতি ॥ পৃ ২০-৩০)। উহা '*Indian National Herald*' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (২৭মে-১৯২৮)।

তিনি বলিলেন,—মানুষের সত্তাগত সত্যের মর্মকথাটি হইতেছে, তাহার ঐক্য ও মিলনমূলক এবং সমষ্টিগত সহযোগিতা ও সমবায়গত জীবনযাত্রা প্রণালী। জীবনের এই মূল ধর্ম ও সত্যটি অবজ্ঞা ও লঙ্ঘন করার জন্যই মানুষের আজ এত দুঃখ ও দুর্দশা। তিনি তাই বলিলেন,

"Man has not yet accepted the *truth of co-operation either economically or politically*. The production of wealth, with its distribution and enjoyment, has been regarded as a private and unwilling to curb his greed and self-indulgence. His sense of moral responsibility has become weak……"

"Only recently mankind has discovered the utility of this truth in the domain of economics. It is known as the produ-ction of wealth by co-operation. This shows that the time is not distant, when mammoth capital will cease to exist. *Man will be free from the tyranny of economic inequality, not by wading through blood, but establishing harmony between the various units of power*. The principles of humanism, whose absence caused such disorder in economics, are going to be recognized at last. Just as formerly, the weak social animal conquered the isolated monster, even so to-day, victory will come to the economically weak, not by exterminating the powerful, but by realising its own strength united strength."

স্পষ্টতই, ইহা কবির পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানার বিরুদ্ধে আক্রমণ। সমষ্টিগত ও সমবায়গত উৎপাদন এবং সাম্রাজ্যবাদী মালিকানায় যে আজিকার সমস্যা-সংকটের আসল সমাধান, ইহাই কবির মূল বক্তব্য বিষয়। আর আর্থনীতিক পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এই সমবায় নীতিকে প্রয়োগ এবং মূলভিত্তি করিলে শান্তিপূর্ণ উপায়েই আর্থিক বৈষম্য ও অসাম্য আপনিই দূর হইবে,—বিদ্রোহ বিপ্লব বা রক্তপাতের প্রয়োজন হইবে না। বলা বাহুল্য, 'ইউটোপিয়ান' সমাজতন্ত্রবাদী বা বহু পূর্বেই এই তত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন।

একমাত্র সমবায় নীতিকে গ্রহণ করিয়াই ভারতের ধ্বংসোন্মুখ গ্রামীণ জীবন রক্ষা পাইতে পারে, এই কথাই জোর দিয়া কবি উপসংহারে বলিলেন,

"We are now slowly learning in India and elsewhere that the cne way forward is along the path of *mutual co-operation*. Only along this path can the inner life of our Indian villages be preserved."

কিন্তু শুধু কথায় বা উপদেশ দিয়া নয়;—গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনায় মিত-শ্রমিক যন্ত্র ব্যবহার করিয়া সমবায় নীতির বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দীর্ঘকাল ধরিয়া কবি সাধনায় রত। পূর্বেই তাহা আলোচনা করিয়াছি।

গান্ধীজীর আর্থনীতিক চিন্তায় গ্রামের মানুষের দুঃখ-কষ্টের কথাই প্রধান-ভাবে বিবেচিত হইয়াছে। গান্ধীজী, চরকা ও খদ্দরের মাধ্যমেই সকল সমস্যার সমাধান হইবে বলিয়া বার বার গুরুত্ব আরোপ করিতেছিলেন। কয়েকমাস পূর্বে বিলাতের কমিউনিস্ট এম. পি সাপুরজী সাকলাতওয়ালার এক পত্রের জবাবে তিনি তাঁহার আর্থনীতিক-চিন্তায় চরকার তাৎপর্য নির্দেশ ও ব্যাখ্যা করিয়া 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় লিখিলেন,

"But the whole of the impatient communist's letter concentrates itself upon the cities and thus ignores India and Indian conditions which are to be found only in her 700,000 villages. The half a dozen modern cities are an excrescence and serve at the present moment the evil purpose of draining the life-blood of villages. Khaddar is an attempt to revise and reverse the process and establish a better relationship between the cities and the villages. The citses with their insolent torts are a constant menance to the life and liberty of the villagers."

প্রসঙ্গত বলা দরকার, ১৯২৭ সালের প্রথমভাগেই সাকলাতওয়ালা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিয়া দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যা লইয়া আলোচনা করিয়া যান।

সর্বশেষে, পুঁজি ও শ্রম-বিরোধ এবং মুনাফার বণ্টন সম্পর্কে তাঁহার ধারণার

কথা ব্যাখ্যা করিয়া তিনি সাকলাতওয়ালাকে লিখিলেন,

"I am not opposed to organization of labour but, as in everything else, I want its organization along the Indian lines, or if you will, my lines. I am doing it…*I do not regard capital to be the enemy of labour.* I hold their co-ordination to be perfectly possible. The organization of labour that I undertook in South Africa, Champaran or Ahmedabad was in no spirit of hostility to the capitalists. My ideal is equal distribution but, so far as I can see, it is not to be realized. I, therefore, work *for equitable distribution. This I seek to attain through khaddar.* And since its attainment must sterilize the British exploitation at its centre, it is calculated to purify the British connection. Hence in that sense khaddar leads to swaraj."

[*Mahatma-Vol*. II-pp. 256-57]

বলা বাহুল্য, গান্ধীজী চিরদিনই শ্রেণী-সংগ্রাম এবং বিদ্রোহ-বিপ্লবের বিরুদ্ধে। তিনি শ্রেণী সমন্বয়ের ভিত্তিতেই শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনা করিতে চাহিয়াছিলেন। এখন বলিলেন, চরকাই সব সমস্যার সমাধান করিবে।

লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথ যেখানে গ্রামের বহু চাষীর সম্মিলিত বা সমবায়-পদ্ধতিতে চাষবাস ও কুটীর শিল্প পুনর্গঠনের পরিকল্পনা দিলেন, গান্ধীজী সেখানে বিকেন্দ্রীভূত, ব্যক্তি-বা কুটীর-কেন্দ্রিক চরকা-শিল্প গড়িয়া তুলিবার পরিকল্পনা দিলেন। সর্বোপরি, গান্ধীজী তখনও পর্যন্ত ভূমি-সংস্কার ও কৃষি-সমস্যা সম্পর্কে প্রায় কিছুই চিন্তা করিতে পারেন নাই। এসব পূর্বেই বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে।

দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণকালে কবি পণ্ডিচেরি আশ্রমে 'শ্রীঅরবিন্দের' সহিত সাক্ষাৎ করেন (২৯ শে মে)। অরবিন্দের অধ্যাত্ম-সাধনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ খুবই উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। এই সাক্ষাৎকারের পর তিনি যে কী পরিমাণ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা এই সময়কার লেখা একটি পত্রে স্পষ্টই ব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি লিখিতেছেন, (২৯শে মে, ১৯২৮),

"অনেক দিন মনে ছিল অরবিন্দ ঘোষকে দেখ্‌ব। সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হ'লো।…

…"প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝলুম,—ইনি আত্মাকেই সব চেয়ে সত্য ক'রে চেয়েছেন, সত্য ক'রে পেয়েছেন। সেই তাঁর দীর্ঘ তপস্যার চাওয়া ও পাওয়ার দ্বারা তাঁর সত্তা ওতপ্রোত। আমার মন ব'ল্‌লে, ইনি এঁ'র অন্তরের আলো দিয়েই বাহিরে আলো জ্বালবেন। …অতি অল্পক্ষণ ছিলুম। তারি মধ্যে মনে হ'লো, তাঁর মধ্যে সহজ প্রেরণাশক্তি পুঞ্জিত। কোনো খর-দস্তুর মতের উপ-দেবতার নৈবেদ্যরূপে সত্যের উপলব্ধিকে তিনি ক্লিষ্ট ও খর্ব করেন নি।…আমি

তাঁকে ব'লে এলুম—আত্মার বাণী বহন ক'রে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন এই অপেক্ষায় থাকবো। সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজবে, শৃণ্বন্তু বিশ্বে।

..."অরবিন্দকে তাঁর যৌবনের মুখে ক্ষুব্ধ আন্দোলনের মধ্যে যে তপস্যার আসনে দেখেছিলুম সেখানে তাঁকে জানিয়েছি—'অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার'।

"আজ তাঁকে দেখলুম তাঁর দ্বিতীয় তপস্যার আসনে, অপ্রগল্‌ভ স্তব্ধতায়,—আজও তাঁকে মনে মনে ব'লে এলুম,

—অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।"

[প্রবাসী-১৩৩৫ শ্রাবণ ॥ পৃ-৫০৫-৮]

আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি (১৩৩৫) নাগাদ দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণ শেষ করিয়া কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন। উল্লেখযোগ্য, এই দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণকালেই তিনি তাঁহার অবিস্মরণীয় 'শেষের কবিতা' গ্রন্থখানি রচনা সম্পূর্ণ করেন (২৮শে জুন ১৯২৮)। উহার অল্পকাল পূর্বে তিনি 'যোগাযোগ' উপন্যাস-খানি রচনা শেষ করেন।

শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া, অল্পকাল পরেই কবি 'বৃক্ষরোপণ-উৎসব' ও 'হলকর্ষণ-উৎসবের' পরিকল্পনা করেন। আর্থনীতিক ও সমাজ-কল্যাণমূলক পরিকল্পনাগুলিকে কীভাবে মাঙ্গলিক উৎসব-অনুষ্ঠানে মনোরম রূপদান করা যায় তাহাই ছিল কবির চিন্তা ও সাধনা। ১৪ই জুলাই এক মনোরম কাব্যিক পরিবেশে 'বৃক্ষরোপণ-উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন শ্রীনিকেতনে হয়, 'হলকর্ষণ-উৎসব'। অবশ্য, প্রকৃতপক্ষে 'বৃক্ষরোপণ-উৎসব'-এর সূচনা হইয়াছিল কয়েক বৎসর পূর্বে—১৩৩২ সালে ২৫ শে বৈশাখ, কবির পঞ্চষষ্টিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে। সেই সময় পঞ্চবটী রোপণ ও উৎসর্গ হয়। ঐ অনুষ্ঠান উপলক্ষেই কবি বিখ্যাত 'মরু বিজয়ের কেতন উড়াও' গানটি রচনা করেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রজীবনীকার লিখিতেছেন,

"রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল পশ্চিমবঙ্গে বাস করিতেছেন; তিনি জানেন তরু-হীনতার ফলে বারিপাতের অংক হ্রস্বমুখী। এককালে এদেশে নিষ্ঠুরভাবে বনচ্ছেদন চলিয়াছিল, যাহার ফলে শ্যামল ধরণীর রক্তবর্ণ কংকাল আজ উন্মুক্ত। কবির ইচ্ছা এই বৃক্ষরোপণ উৎসবের মধ্য দিয়া গ্রামে গ্রামে বনভূমির পত্তন হয়; afforestation ছাড়া দেশের বারিপাত, কৃষি সংকটাপন্ন হইবে।

"শান্তিনেকেনে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানের পর দিন (১৫ই জুলাই ১৯২৮) শ্রীনিকেতনের হলকর্ষণ-উৎসব। ইহার উদ্দেশ্য গ্রাম ও গ্রামবাসীদের সহিত বিচ্ছিন্ন ভদ্র জনতার সংযোগ স্থাপন। আমাদের আধুনিক জীবনে প্রাচীন ধর্মের আচারনিবদ্ধ অনুষ্ঠানাদির প্রতি আন্তরিক অনুরাগ কালান্তরে ম্লান হইয়া আসিয়াছে। অথচ আচার অনুষ্ঠান উৎসব আমোদ প্রমোদ সমাজ-জীবনে না থাকিলে মানুষ শুষ্ক যন্ত্রে পরিণত হয়। রবীন্দ্রনাথ আনুষ্ঠানিক সংস্কারাবদ্ধ ধর্মকর্মে বিশ্বাসহীন আধুনিক বাঙালীকে নূতন উৎসব অনুষ্ঠানের

মধ্য দিয়া নব আনন্দ রস উপভোগের প্রশস্ত ক্ষেত্র উন্মোচন করিয়াছেন। ঋতুউৎসব, বৃক্ষরোপণ, হলকর্ষণ এই শ্রেণীর সর্বজন-প্রীতিকর উৎসব। হলকর্ষণ এদেশে বহুকাল নিন্দনীয় ছিল—উহা ছিল শূদ্রের কর্ম। কবি সেই অপমান অপনোদনের জন্য সর্বশ্রেণীর লোককে আহ্বান করিয়া হলকর্ষণ উৎসব সম্পন্ন করিলেন।"

[রবীন্দ্রজীবনী, তৃতীয় খণ্ড ॥ পৃ ২৩৭-৩৮]

কিন্তু শুধুই কী 'শূদ্রের অপমান অপনোদনের' জন্যই এই উৎসব? কৃষিই যে ভারতীয় সমাজ এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রাণ বা মূল কথা এবং আজিকার আর্থনীতিক ও রাজনীতিক সংকটেরও অন্যতম প্রাধান কথাই যে কৃষি-সমস্যা, এইকথা দীর্ঘদিন ধরিয়া রবীন্দ্রনাথ জাতীয় নেতৃবৃন্দকে স্মরণ করাইয়া দিয়া আসিতেছিলেন। গান্ধীজীর সহিত 'চরকা' বিতর্কে কবি পুনঃ পুনঃ ঐ কথাই বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কৃষির মুক্তি ও সমৃদ্ধির মধ্যেই যে আমাদের সভ্যতার ও জাতীয় দুর্গতির মুক্তির ইশারা, ইহারই প্রতীক বা Symbol হিসাবে কবি বৃক্ষরোপণ ও হলকর্ষণ উৎসবের প্রবর্তন করেন। উল্লেখযোগ্য, এই উৎসবের মাত্র কয়েকদিন পূর্বে সরসীলাল সরকারের সহিত 'সাইকো-এনালিসিসের' Symbol বা প্রতীক লইয়া কবির দীর্ঘ আলোচনা হয়। উহার বিবরণ ১৩৩৫ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাহার অংশবিশেষ এইরূপ,

"সরসীবাবু ॥ আর একটা জিনিস আছে যাকে symbolism বলে। ...Symbolism অর্থে যেমন মনে করুণ যুদ্ধক্ষেত্রের flag (নিশান)। নিশান একটা কাষ্ঠফলকে জড়ানো বস্ত্রখণ্ড মাত্র। কিন্তু যে সৈনিকেরা যুদ্ধ করে তারা তো একে সে ভাবে নেয় না। তারা মনে করে এটাই তাদের দেশের সম্মান ও স্বাধীনতার প্রতীক। ...মহাত্মা গান্ধীর চরকা সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যেতে পারে। চরকার যে কোনও Economic value নেই একথা আপনি সবুজপত্রে লিখে বুঝিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী দেশের সম্মুখে এই চরকা তাঁর Economic সমস্যা সমাধান হিসাবে উপস্থাপিত করেন নি; বিদেশী বর্জন ক'রে দেশী দ্রব্য ব্যবহার করবো, দেশের দরিদ্র শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি দেখাবো, এই সকলের প্রতীক হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন। তাল, গান ও গতি, যাহা 'মানসী'তে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধের বক্তব্য, সেগুলি কি শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্ মন্ত্রের প্রতীক (Symbol) স্বরূপ আপনার মনের মধ্যে নাই?"

"কবি ॥ তোমার ব্যাখ্যা যে সম্ভব হতে পারে তা আমি অস্বীকার করি না। উপনিষদের এই মন্ত্র আমারও জীবনের মূল মন্ত্র।...Symbols-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের লক্ষ্যকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। প্রত্যেক মানুষই তার জীবনের একটা-কিছু লক্ষ্য অথবা উদ্দেশ্য ঠিক করে রাখে, যাকে সে উপলব্ধি করবে। যাহাতে আমরা এই লক্ষ্য ভুলে না যাই, তাকেই সহজভাবে মনের মধ্যে জাগিয়ে রাখবার চেষ্টা রয়েছে এই Symbol সৃষ্টির মধ্যে।

জাপানে কচি গাছের ডালকে স্বর্গের Symbol স্বরূপ ব্যবহৃত হ'তে দেখেছি।...

[প্রবাসী-আষাঢ়, ১৩৩৫ ॥ পৃ ৩৪২-৪৩]

স্পষ্টই বুঝা যায়, এই আলোচনার পর কবি 'প্রতীক' (বা Symbol) ব্যবহার সম্পর্কে অধিকতর সচেতন হন। ইহার পর একথা বলিলে অন্যায় বলা হইবে না যে, বৃক্ষরোপণ-উৎসব ও হলকর্ষণ-উৎসব পরিকল্পনার পশ্চাতে এই সব আলোচনার প্রতিক্রিয়াও আছে। 'বৃক্ষরোপণ-উৎসব' ও 'হলকর্ষণ উৎসব' যেন কবির গান্ধীজীর 'চরকা'র নীরব জবাব। আর শ্রীনিকেতনের কুটীরশিল্প, সমবায় আন্দোলন ও পল্লী উন্নয়নমূলক কাজে, কবির সেই সাধনক্ষেত্র।

প্রসঙ্গত এখানে আর এক মূল্যবান তথ্যের উল্লেখ করা দরকার। সরসীলাল সরকারের সহিত রবীন্দ্রনাথের চরকা লইয়া কয়েকমাস পূর্বে আলোচনা হয় এবং পরে চিঠিপত্রেও এই আলোচনা চলিতে থাকে। এইবার বিলাত যাত্রার কথা যখন হয় তখন শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী মহাশয় সরসীবাবুর এক পত্রের জবাবে চরকা সম্পর্কে কবির অভিমত জ্ঞাপন করেন। ঐ পত্রের সংযোজনে কবি স্বয়ং আরও কিছু কথা লিখিয়াছিলেন। পত্রটি জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ১৩৩৫ 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়।

শান্তিনিকেন হইতে শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী মহাশয় ঐপত্রে লিখিয়াছিলেন (৯ই এপ্রিল ১৯২৮)

"অসুস্থতাবশত আপনার পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই।...

"আপনার দ্বিতীয় পত্র কবিকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলাম, তিনি নিজেই একটি উত্তর লিখিয়া দিবেন আশা দিয়াছিলেন কিন্তু সহসা তাঁহার ইউরোপযাত্রার দিনস্থির হওয়ায় তাঁহার বলিবার কথা আমাকে সংক্ষেপে বলিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য এই যে, মানবমনের সমগ্রতা এবং বিচিত্র সম্ভবপরতাকে উপেক্ষা করিয়া তাহার নিকট কেবলমাত্র চরকা-চালনার দাবী করিলে তাহার শক্তিকে মূলে আঘাত করা হয়, এবং জনমনের ভিতরে এইরূপ inferiority complex এর সৃষ্টি করিলে তাহা অপেক্ষা জাতির দুর্গতি আর কী হইতে পারে। বুদ্ধ কিম্বা খৃষ্ট, সর্বদেশের সকল মহাপুরুষই মানুষের কাছে শ্রেষ্ঠ, দুরূহতম পূর্ণতার আদর্শের দাবী জানাইয়া তাহাদের টানিয়া তুলিয়াছেন, তাহাদের চেতনার ক্ষেত্রকে সুবিস্তৃত করিয়াই, তাহাদের সম্মুখ পথে পরিণতির পর্যায়ে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। ছোটো ছেলের নিকট বেশীর দাবী করিয়াই, তাহার বিচিত্র শক্তির উপর দাবী জানাইয়াই আমরা তাহার শিক্ষাকে সফল করিয়া তুলি, সে মানুষ হইয়া উঠে, দাবীকে খাটো করিয়া, সহজ করিয়া, মনুষ্যত্বের আদর্শকে খর্ব পঙ্গু করিয়া কাহারো কখনো মঙ্গল হয় না।

"এই কথাই কবি আপনাকে জানাইতে বলিলেন। এই কটি কথার ইঙ্গিত হইতেই আপনি তাঁহার বক্তব্য স্পষ্ট বুঝিয়া লইতে পারিবেন।"

কবি স্বয়ং এই পত্রের শেষে সংযোজনে আরও লিখিতেছেন,

"সরসীবাবুকে অমিয় যে চিঠি লিখেছেন সেটি দেখলুম। সেই প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি কথা বলেচি সেগুলিকে বাদ দিলে চলবে না।

"চরকাকাটা একটা বাহ্যক্রিয়া—এটাকে একটা লৌকিক আচার ক'রে তোলা যেতে পারে। কিন্তু আচার প্রায়ই প্রবল হ'য়ে বিচারকে উপেক্ষা করে। কোনো একটা অভ্যস্ত দৈহিক কর্মকে যখনি উচ্চ সাধনার মূল্য দেওয়া হয় তখনি সে আন্তর সত্যের চেয়ে বাহ্য আচারকে বড়ো জায়গা দেয় আমাদের সমাজে তার অনেক প্রমাণ আছে। আরো একটা নতুন আচার যোগ ক'রে আমাদের মনোবৃত্তির জড়তা তাতে বাড়ানো হ'বে বলে আশংকা করি।

"একা একা ব'সে যাঁরা চরকা কাটেন তাঁরা মনে মনে ভাবতে পারেন যে চরকা কেটে সুতো উৎপাদন ক'রে তাঁরা দেশের ধন বৃদ্ধি করচেন। কিন্তু একথা মনে রাখতে বেশি লোক বেশি দিন পারবে না—ক্রমেই এটা যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পরিণত হ'য়ে বুদ্ধিকে ম্লান ক'রেই দেবে।

"বস্তুত চরকা কাটো একথার মধ্যে কোনো মহৎ অনুশাসন নেই এই জন্যে একথায় পূর্ণভাবে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন ঘটায় না। আধুনিক কালে ভারতবর্ষে বিবেকানন্দই মহৎ বাণী প্রচার করেছিলেন, সেটি কোনো আচারগত নয়। তিনি দেশের সকলকে ডেকে বলেছিলেন তোমাদের সকলেরই মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি, দরিদ্রের মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা চান। এই কথাটি যুবকদের চিত্তকে সমগ্রভাবে জাগিয়েচে। তাই এই বাণীর ফল দেশের সেবায় আজ বিচিত্র ভাবে বিচিত্র ত্যাগে ফলেচে। তাঁর বাণী মানুষকে যখনি সম্মান দিয়েচে তখনি শক্তি দিয়েচে। সেই শক্তির পথে কেবল এক-ঝোঁকা নয়, তা কোনো দৈহিক প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তির মধ্যে পর্য্যবসিত নয়, তা মানুষের প্রাণ মনকে বিচিত্র ভাবে প্রাণবান করেচে। বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে যে সব দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই তার মূলে আছে বিবেকানন্দের সেই বাণী যা মানুষের আত্মাকে ডেকেছে আঙ্গুলকে নয়। ভয় হয় পাছে আচারের সংকীর্ণ অনুশাসন সেই নবোদ্বোধিত তেজকে চাপা দিয়ে ম্লান ক'রে দেয়, কঠিন তপস্যার পথ থেকে যান্ত্রিক আচারের পথে দেশের মনকে ভ্রষ্ট করে।"

[প্রবাসী-জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫ ॥ পৃ ২৮৫-৮৬]

পরিশেষে, 'বৃক্ষরোপণ' ও 'হলকর্ষণ-উৎসব'-এর তাৎপর্য সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলার থাকিয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের মত বিরাট প্রতিভাশালী কবি ও মনীষী স্বয়ং হল-চালনা ও বৃক্ষরোপণ করিলেন,—ভারতবর্ষ তো দূরের কথা, সারা পৃথিবীর কবি, শিল্পী ও সাহিত্যিক-সমাজে এমন নজির খুবই বিরল। শিল্পাচার্য নন্দলাল শ্রীনিকেতনের ভিত্তিচিত্রে কবিকর্তৃক হলচালনা বা হলকর্ষণ উৎসবকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। নন্দলাল বৃক্ষরোপণ উৎসবেরও চিত্র আঁকিয়াছেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় গান্ধীজী কবিকে চরকা কাটিতে বলিয়াছিলেন। কবি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং শ্রীনিকেতনের গ্রামীণ আর্থনীতিক পুনর্গঠনের সামগ্রিক পরি-

কল্পনাকে বাস্তবায়িত করার সাধনায় তাহার নীরব জবাব দিতে চাহিলেন। 'বৃক্ষরোপণ' ও 'হলকর্ষণ উৎসব' সেই সামগ্রিক পরিকল্পনার একটি অংশ মাত্র।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই চরকা কাটিলেন না, পক্ষান্তরে গান্ধীজীও কোনোদিন স্বয়ং হল-চালনা করিলেন না। 'হলকর্ষণ' ও 'বৃক্ষরোপণ উৎসব'-এর বৈজ্ঞানিক ও আর্থনীতিক তাৎপর্য গান্ধীজী কোনোদিনই ঠিক উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। অবশ্য শেষজীবনে ১৩৫০-এর মন্বন্তরের পর তিনি 'অধিক খাদ্য ফলাও' আন্দোলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

কলিকাতা কংগ্রেস (১৯২৮)

আগাস্ট মাসের (১৯২৮) প্রথম ভাগেই, নেহরু-কমিটি'র রিপোর্ট ও খসড়া শাসনতন্ত্র প্রকাশিত হয়। ঐ খসড়া আলোচনার জন্য আগস্টের শেষভাগে লক্ষ্ণৌতে (২৮-৩০শে আগস্ট) সর্বদলীয় সম্মেলন হয়। বলা বাহুল্য, মতিলাল নেহরুর খসড়ায় মডারেট ও প্রতিক্রিয়াশীলদের রাজনীতিক-লক্ষ্যই বজায় রহিল অর্থাৎ স্বায়ত্তশাসন বা ডোমিনিয়ন স্টেটাসের ভিত্তিতেই ঐ খসড়া-শাসনতন্ত্র রচিত হয়; তাছাড়া জমিদার ও তালুকদারদের স্বার্থ রক্ষার আশ্বাসও উহাতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়। জওহরলাল নেহরু প্রমুখ কংগ্রেসের প্রগতিশীল গোষ্ঠী উহা মানিয়া লইতে পারেন নাই। তাঁহারা স্বতন্ত্রভাবে পূর্ণ-স্বাধীনতার আদর্শ ও লক্ষ্যের কথা ঘোষণা করিয়া বিবৃতি দেন। এই সময়ই জওহরলালের নেতৃত্বে উত্তরপ্রদেশে *'Independence League of India'* নামে একটি স্বতন্ত্র নূতন দল গঠিত হয়। ইহার মাধ্যমে তাঁহারা পূর্ণ স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক অধিকার, জমিদারী প্রথার অবসান প্রভৃতি প্রগতিশীল দাবীর কর্মসূচী গ্রহণ করেন। উভয়পক্ষই আসন্ন কলিকাতা কংগ্রেসে চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। গান্ধীজী মতিলাল 'নেহরু-কমিটি'র সিদ্ধান্তের সহিত সম্পূর্ণভাবে একমত এবং উহার সমর্থনে এক বিবৃতি দেন।

বর্ষামঙ্গল ও হলকর্ষণ উৎসবের পর রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনেই আছেন। ক্ষমতা দখল ও রাজশক্তির ভাগাভাগির জন্য যে-রাজনীতির এত বিতর্ক ও লড়াই,—উহাতে রবীন্দ্রনাথের কোন আগ্রহ ও আকর্ষণ নাই। এইজন্যই 'স্বাধীনতা-প্রস্তাব' ও নেহরু-কমিটির খসড়া-গঠনতন্ত্র সম্পর্কে তাঁহাকে কোন মন্তব্য করিতে দেখা যায় না। তাছাড়া সর্বোপরি তিনি কবি। কবির মনে তখন গান ও কাব্যের ধারা নামিয়াছে। 'মহুয়া'র অধিকাংশ কবিতাগুলি তিনি এই সময় রচনা করেন। তাহারই মাঝে বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতনের সাংগঠনিক বহু কাজ ও বিভিন্ন সমস্যা লইয়াও তাঁহাকে চিন্তা করিতে হয়। শ্রীনিকেতন একদিন পরিণত রূপে তাহার বক্তব্য লইয়া দেশের সম্মুখে উপস্থিত হইবে, ইহাই কবির বিশ্বাস ও ধারণা।

কিন্তু যুদ্ধ-বিরোধী ও বিশ্ব-শান্তির আন্দোলনে কবির আগ্রহ ও উৎকণ্ঠার অন্ত নাই। বিশ্বশান্তির লক্ষ্যে, এই সময় ইউরোপে রমাঁ রোলাঁ প্রমুখ শিল্পীদের উদ্যোগে *'World League for Peace'* নামে একটি প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর মনীষী ও শিল্পীদের একটি আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে প্রয়াস পান। ঐ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বিশ্বশান্তির সপক্ষে একটি *'Golden Book of Peace'* প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। উহাতে কবির স্বাক্ষরযুক্ত একটি বাণী প্রেরণের অনুরোধ আসে। ঐ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে Georges Dejean নামক জনৈক শিল্পী রোলাঁর মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথকে নিম্নলিখিত একটি আবেদন পত্রে লেখেন, ১৩ই জুন-১৯২৮,

"Be pleased to permit us to approach you through the esteemed personality of Monsieur Romain Rolland, to pray that you be gracious enough to grant us an autograph for the *'Golden Book of Peace.'*

"The work will consist of reproductions of the thoughts on peace from the most illustrious personages and the most eminent writers of each country We have received, up to this day, for this book, over 270 documents, among which are the autographs of Messrs. Heriot, Briand, Paul-Boncour, Poincare, Brieux, Marcel Prevost, Chamberlain, Stresemann, Ador, Henri Barbusse, Maurice Donnay, Vandervelde, Charles Richet, Quidde and others…

"We feel sure that you will undoubtedly approve of our effort and that you will contribute to its moral success by letting us have a few lines that we solicit from your generosity.

"Be kind enough, honoured Monsieur, to accept the expression of our great admiration and the assurance of our porfound gratitude.

রবীন্দ্রনাথ, সঙ্ঘের প্রেরিত vellum-এ তাঁহার স্বাক্ষরযুক্ত নিম্নলিখিত বাণীটি লিখিয়া পাঠান, (৩০ শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৮)

"In our political ritualism, we still worship the tribal god of our own make and try to appease it with human blood. This fetishism is blindly primitive and angers truth that leads to death-dealing conflicts. To many of us it seems that this blood-stained idolatory is a permanent part of human nature. But we know in our past history, there have been things born of dark unreason producing phantoms of fear in our mind and ferocity of suspicion. Within the boundaries of night they also had loomed large and appeared as everlasting. But a great many of them have already vanished, making the social life of a fruitful peace possible in civilised communities.

"Let us, today, by the strenght of our own faith prove that the homicidal orgies of a cannibalistic politics are doomed, in spite of contradictions that seen overwhelmingly formidable.

[*Modern Review*-October 1928, p. 373]

এই সময় রবীন্দ্র-প্রতিভার আর এক বিস্ময়কর দিকের সূচনা হয়।—কবি ছবি আঁকায় মন দিলেন। সেপ্টেম্বর মাস হইতে কবি বিশ্বভারতীর কার্যভার স্বয়ং নিজহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাছাড়া 'মহুয়া'র কাব্য রচনাতেও ছেদ পড়ে। ছবি আঁকায় অনুশীলন ও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এখন তাঁহার দিন কাটে। কোন একটি বিশেষ দিকে বা বিষয়ে, কবি কোনদিনই দীর্ঘকাল আপনাকে নিয়োজিত রাখিতে পারেন নাই। চিত্তের ও প্রতিভার এই বহুমুখী বিকাশ কোন একটি বিশেষ বিষয়ে একনিষ্ঠ এবং সুসম্বন্ধ ও প্রণালীবদ্ধ চিন্তা করিবার পথে বাধা হইয়া দাঁড়ায়,—বিশেষ করিয়া সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে। এই কারণেই ঐসব বিষয়সংক্রান্ত প্রশ্নে কবির চিন্তা সুসম্বন্ধ ও প্রণালীবদ্ধ (consistent and methodical) হইতে পারে নাই। আমাদের সব সময়ই স্মরণ রাখা দরকার, রবীন্দ্রনাথ প্রধানত এবং মূলত কবি ও শিল্পী। নিয়তই তাহা বিচিত্র ও বিভিন্ন মুখে ধাবিত হইয়াছে। কিন্তু স্বদেশ ও বিশ্ব, সর্বোপরি মানুষের দুঃখ কষ্ট ও সমস্যাকে তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন নাই।

অক্টোবরের শেষভাগে ডাঃ সু-সি-মো ইউরোপ হইতে দেশে প্রত্যাবর্তনের পথে শান্তিনিকেতনে কবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। চীনের জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের নিন্দা করিয়া কবি যে প্রতিবাদ করেন উহা পত্রপত্রিকা ও রেডিয়োর সাহায্যে পুনঃ পুনঃ চীন সরকার প্রচার করেন। চীনের জনগণ গভীর কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাম স্মরণ করিতে থাকেন। ডাঃ সু-সি-মো, (শু-চু মো) চীনবাসীদেরপক্ষ হইতে কবিকে তাঁহার গভীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলেন। তাছাড়া ভারত-চীন সাংস্কৃতিক সম্পর্ক যাহাতে দৃঢ় হয়, তাহার উপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। শান্তিনিকেতনে এক মনোরম সম্বর্ধনা সভায় তাঁহাকে আপ্যায়িত করা হয়।

কিছুকাল পরে বোম্বাইয়ের বিখ্যাত *'Times of India'* ও *'Illustrated Weekly'* পত্রিকার প্রতিনিধি কবির সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং বিশ্বসমস্যা সম্পর্কে তাঁহার অভিমত জানিতে চাহেন। ঐ প্রতিনিধি আরও জানিতে চাহেন, ব্রিটিশ ও মার্কিন সভ্যতার মধ্যে অপেক্ষাকৃতভাবে কোনটি ভালো এবং আমাদের পক্ষে তাহা গ্রহণযোগ্য কিনা। কবি উহার জবাবে এক দীর্ঘ বিবৃতিতে বলেন,

"You ask me whether I prefer European to American civilisation. Well, there is not much to choose between the two. European and American civilisations were built upon the same foundation, and only the rhythm of life is different on the two continents. But this difference is not so wide as to prevent me from finding a common denominator for both the Americanised European and the Europeanised American civilisation. This common denominator is the Machine, the fantastical idol which to-day the Westerners worship. I

deplore this *glorification of the Machine*, because I consider it the greatest enemy of humanity. The machine devours everything, and make it impossible that the nobler forces and finer values that lie dormant in the human soul should ever be awakened. *Yet I donot despair of the future of humanity.* However blind and foolish man may be, sooner or latter he will realise that the tyranny of the Machine cramps his individuality, and compels him to lead a stunted existence, and he *will overthrow its tyrannical rule.* Then the epoch of industrialism will be ended and man will be more like the devine ideal. Although the spiritual regeneration is drawing ever nearer, a long period of time must elapse before it will reach its climax. Light will come from the East, and will save the dying West. In its unceasing search for efficiency the West spent its vital energies, whereas the Oriental possesses an inexhaustible reserve of regenerative powers."

[*Times of India : Ills. Weekly*:-25th Nov. 1928.]

উল্লেখযোগ্য, যুদ্ধোত্তরকালে ভারতবর্ষে এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর মধ্যে মার্কিনী-সভ্যতার সম্পর্কে মোহ জন্মিতে থাকে। তাঁহারা মার্কিনী-সভ্যতার আদর্শ অনুকরণের জন্য প্রচার চালাইতে থাকেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রথম থেকেই এ সম্পর্কে কোন মোহ ছিল না। ১৯১৬ সালে মার্কিন দেশ পরিভ্রমণকালে কবি মার্কিনী-সভ্যতার আসল রূপটি স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেন। তারপর ১৯২১ সালের ভ্রমণে ঐ দেশ সম্পর্কে তাঁহার যে ভয়ংকর তিক্ত অভিজ্ঞতা জন্মে, তাহার কথা পূর্বেই বিস্তারিত উল্লিখিত হইয়াছে। ইউরোপীয় এবং মার্কিনী-সভ্যতার মূল ভিত্তি যে, পুঁজিবাদ এবং উহার বাহ্যপ্রকারভেদ থাকিলেও মূলত উহারা যে একই বস্তু, এ'কথা কবি স্পষ্টই উপলব্ধি করিতে পারেন। কবির 'রক্তকরবী'র যক্ষপুরী যে মার্কিনী-সভ্যতার প্রতীক, একথাও খুবই স্পষ্ট বুঝা যায়। কিন্তু এই বিবৃতিতে কবি 'যন্ত্র'কে (Machine) সব কিছু অনিষ্টের মূল বলিয়া অভিহিত করিলেও তিনি ঠিক 'যন্ত্র-বিজ্ঞান' বা 'কারিগরী-বিজ্ঞান'কে আক্রমণ করিতে চাহেন নাই। কেননা ইতিপূর্বে অজস্রবার কবি ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যন্ত্রশক্তির জয়গান করিয়াছেন এবং শুধু তাহাই নহে ভারতের জাতীয় ও স্বাদেশিক সাধনায় উহাকে যথাযথভাবে গ্রহণ করিবার জন্য তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করিয়া আসিতেছিলেন। এ'সব কথা পূর্বেই বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে। যন্ত্র ও বিজ্ঞানকে গ্রহণ করিবার প্রশ্নে কবির কোন সন্দেহ ছিল না, কিন্তু কোন্ সমাজ-আর্থনীতিক ব্যবস্থায় যন্ত্র ও বিজ্ঞানকে যথার্থ মানবকল্যাণকর রূপে ব্যবহার করা যায়, এ' সম্পর্কে তখনও পর্যন্ত তাঁহার কোন স্বচ্ছ ধারণা ছিল না। তিনি কৃষিতে সমবায়-আর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর অত্যধিক

গুরুত্ব আরোপ করিতেছিলেন। কিন্তু ভারতের মত পশ্চাদপদ দেশে ব্যাপক শিল্পায়নের (Industrialisation) আবশ্যকতার গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যটি তিনি উপলব্ধি করিলেও পরিষ্কার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উহার জন্য নির্দেশ দিতে পারিলেন না। তবে তাঁহার সব কিছু চিন্তার মধ্যে একটি কথা খুবই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, আজীবন তিনি ছিলেন পুঁজিবাদী-শোষণব্যবস্থার ঘোরতর বিরোধী ও শত্রু। তিনি যখন 'Machine' কে আক্রমণ করিয়াছেন তখন আসলে তিনি পুঁজিবাদী শোষণব্যবস্থাকেই আক্রমণ করিতে চাহিয়াছেন। আসলে আধুনিক রাজনীতি-অর্থনীতিশাস্ত্রে তাঁহার যথাযথ পাঠ ও অনুশীলন না-থাকার জন্য ঐ-সব বিষয়ে সংজ্ঞা ও পারিভাষিক শব্দ নির্ণয়ে (terminology) তাঁহার গোলমাল হইয়াছে।

এদিকে দেশে রাজনীতিক উত্তেজনা চরম আকার ধারণ করিতে থাকে। লালা লাজপৎ রায়ের মৃত্যুর (১৭ই নভেম্বর) পর সাইমন-কমিশন যেখানেই যাইতে লাগিলেন সেইখানেই তাঁহাদের প্রবল প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের সম্মুখীন হইতে হয়। এই প্রতিবাদ আন্দোলনকে দমন করিবার জন্য পুলিশী অত্যাচার চরমে উঠে। এই লাঞ্ছনা, অপমান ও অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা এক শ্রেণীর যুবকদের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠে এবং উহারই প্রতিক্রিয়ায় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন পুনরায় সারা ভারতে দ্রুত প্রসারলাভ করিতে থাকে। লালাজীর লাঞ্ছনা ও মৃত্যুর জবাবে লাহোরের সহকারী পুলিশ-সুপার মিঃ সাণ্ডার্স (Mr. Sandars) সন্ত্রাসবাদীগণ কর্তৃক নিহত হইলেন (ডিসেম্বর)। এই সম্পর্কে ভগৎ সিং প্রমুখ কয়েকজনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইল।

ডিসেম্বরের শেষভাগে কলিকাতায় কংগ্রেসের ৪৩-তম অধিবেশন। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু সভাপতি। শুরুতেই সর্বদলীয় কমিটির খসড়া সিদ্ধান্ত পাস করিয়া লওয়ার ব্যাপারে কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙ্গনের আশঙ্কা দেখা দিল। জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র প্রমুখ কংগ্রেসের নবীনপন্থীরা মাদ্রাজের স্বাধীনতা প্রস্তাবের পক্ষে জোর দিবার উপক্রম করিতেই মতিলালজী হুমকি দিলেন যে, সর্বদলীয় কমিটির প্রস্তাব গৃহীত না-হইলে তিনি সভাপতিত্ব করিবেন না। অবশ্য নবীনপন্থীরা এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। গান্ধীজী এই ভাঙ্গনের মুখে খুবই সুকৌশলে একটি মধ্যপন্থা বা আপোষ রফার প্রস্তাব দিলেন যে,—আগামী দুই বৎসরের মধ্যে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট যদি এই সর্বদলীয় কমিটির খসড়া-শাসনতন্ত্র মানিয়া না লয় তাহা হইলে কংগ্রেস স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করিতে বাধ্য হইবে। ইহাতেও নবীনপন্থীরা সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীর দুই বৎসরের পরিবর্তে এক বৎসরের চরম পত্র বা ultimatum দিবার প্রস্তাব সম্মেলনে গৃহীত হইল। ঐ সিদ্ধান্তের চরমপত্রে বলা হয়,

"Subject to the exigencies of the political situation, this Congress will adopt the Consitution if it is accepted in its

entirety by the British Parliament on or before the 31st December, 1929, but in the event of its non-acceptance by the date or its earlier rejection, the Congress will organise a campaign of non-violent Non-co-operation by advising the country to refuse taxation and in such other manner as may be decided upon."

[*The History of the Indian National Congress-Vol*-I p-329.]

উল্লেখযোগ্য, বিষয়-নির্বাচনী কমিটির সভায় (Subjects Committee meeting) জওহরলাল বা সুভাষচন্দ্র কেহই আর স্বাধীনতা প্রস্তাবের জন্য জেদাজেদি করিলেন না। কিন্তু প্রকাশ্য অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর ঐ প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া সংশোধনী প্রস্তাব আনিলেন এবং জওহরলাল উহা সমর্থন করিলেন। বলা বাহুল্য, গান্ধীজীর প্রস্তাবই শেষ পর্যন্ত বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করে। সম্ভবত সুভাষচন্দ্র প্রমুখ বামপন্থী নেতাদের এই-রূপ আচরণে রবীন্দ্রনাথ একটু অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

আর একটি খুবই উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কলিকাতা কংগ্রেসে কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণী একটি সংঘবদ্ধ মিছিল করিয়া স্বাধীনতা প্রস্তাবের পক্ষে কংগ্রেস সভামণ্ডপে প্রবেশ করিয়া তাহাদের বলিষ্ঠ দাবী ঘোষণা করেন। এই প্রসঙ্গে ডাঃ সীতারামীয়া লিখিতেছেন,

"...The Calcutta Session will be remembered for a demonstration in which the labourers numbering over 50,000 men from neighbouring mill areas marched in an orderly fashion and saluted the National Flag hoisted in the Congress grounds occupied the Pandal for nearly two hours, and passed their resolution deciding for Independence for India and then walked out." [*Ibid*-p. 332]

বলা বাহুল্য কমিউনিস্ট পার্টি, সন্ত্রাসবাদীরা ও বিভিন্ন বামপন্থী শক্তিগুলি বার বার কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে ভোট দিয়া আসিতেছিলেন।

কলিকাতা কংগ্রেস অধিবেশনের সাফল্য কামনা করিয়া মাদাম সান ইয়াৎ সেন, রমাঁ রোলাঁ প্রভৃতি অনেকেই বাণী পাঠান। '*League Against Imperialism*'-এর বিশিষ্ট প্রতিনিধি W. J. Johnstone কংগ্রেসে যোগদান করিবার জন্য ভারতে পৌঁছিলে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বিনা বিচারে নির্বাসিত করেন। কলিকাতা কংগ্রেসে উহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান হয়।

পৌষ-উৎসবের পরদিনই রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা আসেন। কংগ্রেস নেতাদের অনেকেই জোড়াসাঁকোর বাসভবনে কবির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অনেক বিষয়ে আলোচনা করেন বলিয়া জানা যায়। কিন্তু কী কী বিষয়ে এই আলাপ-

আলোচনা হয় তাহার বিস্তারিত কোন তথ্যাদি এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই, তবে কলিকাতা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র প্রমুখ বাংলার নেতাদের আচরণ কবির ঠিক মনঃপূত হয় নাই।

কিছুদিন পর মীরা বেন (Mira Behn)-কে এক চিঠিতে কবি তাঁহার মনোভাবের কথা ব্যক্ত করিয়া লিখিলেন, (২০ জানুয়ারী ১৯২৯),

…"The lack of truth among our leaders, at least in Bengal, has been pitifully exhibited by our politicians in the orgies of Megalomania, the undignified display of unreality at the late Congress. It proves the greatness of Mahatmaji's message that has taken form in his asram. Along with it is needed the richness of mind, the illumination of life, the consciousness of the joy of existence and its manifestations in creative efforts which only can save us from the obscurity of insignificance. According to the Upanishad, the reconcilliation of contradiction between *tapasya* and *ananda* is at the root of creation, and Mahatmaji the prophet of *tapasya* and I am the poet of *ananda*."

সম্পূর্ণ চিঠিখানি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে।

উল্লেখযোগ্য কলিকাতায় যুব-কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র বসু তাঁহার ভাষণে বলেন,

"আজ আমি দেশের মধ্যে দুইটা আন্দোলন বা দুইটা দেশের চিন্তাধারার প্রাধান্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি।…আমি যে দুইটি চিন্তাধারার উল্লেখ করিলাম, তাহার একটি সবরমতী ও অপরটি পণ্ডিচেরী হইতে উদ্ভুত।…

"সবরমতী হইতে উদ্ভুত চিন্তাধারার আন্দোলনের বাস্তবিক উদ্দেশ্য দেশের মধ্যে এইরূপ মনোভাব সৃষ্টি করা যে, আধুনিক যাহা কিছু সব মন্দ, অনেক পরিমাণে কিছু উৎপাদন অত্যন্ত অশুভজনক, অভাব ও জীবিকানির্বাহের আদর্শ বাড়ান উচিত নহে, আমাদিগকে আবার গোযানের যুগে ফিরিয়া যাইতে হইবে এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ব্যায়াম চর্চা ও সামরিক-শিক্ষায় অবহেলা প্রদর্শন করিতে হইবে।…

…"গোযানের দিন চলিয়া গিয়াছে এবং তাহার আর ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা নাই। আমি ভারতের অতীতকে মুছিয়া ফেলিবার পক্ষপাতী নহি। ভারতের নিজস্ব বিশিষ্ট পথে তাহাকে তাহার বৈশিষ্ট্য রক্ষা ও তাহার উৎকর্ষ সাধনকরিতে হইবে।…এক কথায় আমাদেরপ্রাচীন আদর্শ ও আধুনিক বিজ্ঞানের বর্তমান ও অতীতের মধ্যে আমাদিগকে একটা সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে।…

[প্রবাসী-মাঘ ১৩৩৫-পৃ: ৫৭৫-৭৬]

কলিকাতা কংগ্রেসের ঘটনা ছাড়াও সম্ভবত কবি চিঠিতে মীরা বেন্‌কে সুভাষচন্দ্রের ঐ মন্তব্য, বিশেষ করিয়া 'সবরমতী' ও 'পণ্ডিচেরীর' অধ্যাত্ম-সাধনা সম্পর্কেও তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করেন। তবে সুভাষচন্দ্রের ভাষণের শেষাংশ অর্থাৎ দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে যেখানে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার ওপর গুরুত্ব দিয়াছিলেন তাহার সহিত কবির চিন্তাভাবনার গভীর মিল ও ঐক্য ছিল। কবি কোনদিনই 'গোযানের যুগে' ফিরিয়া যাইতে বলেন নাই। শিলাইদহ ও পতিসরে কৃষি ব্যাংক স্থাপন এবং পুত্র রথীন্দ্রনাথের সাহায্যে সেখানে ট্রাক্টর ও বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষবাসের চেষ্টার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। পরবর্তীকালে ডঃ মেঘনাদ সাহা ও সুভাষচন্দ্রের উদ্যোগে যখন বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা ও 'জাতীয় পরিকল্পনা' কমিটি হয় গঠিত তখন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম তাহাকে স্বাগত জানাইয়া তাঁহার পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, এসব কথা যথাস্থানেই আলোচিত হইবে।

কলিকাতা-কংগ্রেসের পরেই সারা দেশে রাজনীতিক উত্তেজনা প্রবল ও তীব্র আকার ধারণ করিতে থাকে। আসন্ন সংঘর্ষের আভাস পাইয়া গভর্ণমেণ্ট উহার প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসাবে 'জননিরাপত্তা বিল' (Public Safety Bill) ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত করিলেন। ফলে দেশবাসীর বিক্ষোভ আরো বেশী করিয়া প্ররোচিত হইতে থাকে। গান্ধীজীরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। এই সময় গান্ধীজীর বিলাত যাইবার কথা হয় কিন্তু এই পরিস্থিতিতে তাঁহাকে ঐ পরিকল্পনা স্থগিত রাখিতে হয়। তিনি ঘোষণা করিলেন, (৩১ জানুয়ারী-১৯২৯),

…"Above all, I must prepare myself for the next year's struggle, whatever shape it may take. If Nehru committee's Report is not accepted by or on behalf of the British people before the end of the year, after midnight on December 31 next, it will cease to have any meaning for me, I must declare myself an independence-walla. But if I mean this seriously, I may not leave India for the best part of this year of probation and preparation…I need greater preparation.."…

[*Mahatma-Vol.* II p-337.]

ইহার প্রস্তুতি হিসাবে গান্ধীজী সারা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া চরকা ও খাদির ব্যাপক প্রচার অভিযান শুরু করিলেন। বিদেশী কাপড় বর্জন ও পোড়াইবার নির্দেশও তিনি দিলেন। তাছাড়া কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত ব্যাপক প্রচারকল্পে এবং অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, মাদকদ্রব্য বর্জন প্রভৃতি বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য কতগুলি সাব-কমিটি গঠিত হয়। গান্ধীজী বয়কট-কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হন। ৪ঠা মার্চ গান্ধীজী বর্মা যাইবার পথে কলিকাতায় পার্কের এক জনসভায় স্তূপীকৃত বিদেশী বস্ত্রে অগ্নিসংযোগ করিয়া এক ভাষণ দেন। পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া পরে মুক্তি দেয়। গান্ধীজী ব্রহ্মদেশ হইতে ফিরিবার পর তাঁহার বিচার হইবে, স্থির হয়।

রবীন্দ্রনাথ দেশের এই রাজনীতির পরিস্থিতির উপর খুব বেশী গুরুত্ব দেন নাই, সেকথা পূর্বেই বলিয়াছি। দেশের কাজ বলিতে তিনি যাহা বুঝিতেন তাহা বেশ কিছুকাল হইতে তিনি শ্রীনিকেতনের গঠনমূলক কাজের মাধ্যমে বলিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। এই বৎসর শ্রীনিকেতনের সাম্বৎসরিক উৎসবের সময় সেখানে স্যর ড্যানিয়েল হ্যামিলটনের সভাপতিত্বে বর্ধমান বিভাগীয় সমবায়-সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হয় (২৭ শে মাঘ—৯-১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৯)। এই সম্মেলনের উদ্বোধনে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিখ্যাত

'সমবায়নীতি' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে কবি আধুনিক সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ও আভ্যন্তরীণ বিরোধ-সংঘাতের চিত্রটি সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করিয়া বলিলেন,

"য়ুরোপীয় ভাষায় যাকে সভ্যতা বলে সেই সভ্যতা সাধারণ প্রাণকে শোষণ ক'রে বিশেষ শক্তিকে সংহত ক'রে তোলে ;...

"ইংরেজিতে যাকে বলে এক্‌স্‌প্লইটেশন, অর্থাৎ শোষণনীতি, বর্তমান সভ্যতার নীতিই তাই। ন্যূনাংশিক বৃহদাংশিককে শোষণ করে বড়ো হতে চায় ; তাতে ক্ষুদ্র-বিশিষ্টের স্ফীতি ঘটে, বৃহৎ-সাধারণের পোষণ ঘটে না। এতে করে অসামাজিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বেড়ে উঠতে থাকে।

"এই কারণে ধন বর্তমানকালে সকল প্রভাবের নিদান এবং সকলের চেয়ে সমাদৃত। বস্তুত, আজকালকার দিনের রাষ্ট্রনীতির মূলে রাজপ্রতাপের লোভ নেই, ধর্ম-অর্জনের জন্য বাণিজ্যবিস্তারের লোভ।...এখানকার সমস্ত সভ্যতাই ধনের পরাশিত (parasite)। তাই শুধু ধনের অর্জন নয়, ধনের পূজা প্রবল হয়ে উঠেছে। অপদেবতার পূজায় মানুষের শুভবুদ্ধিকে নষ্ট করে, আজ পৃথিবী জুড়ে তার প্রমাণ দেখা যাচ্ছে। মানুষ মানুষের এত বড়ো প্রবল শত্রু আর কোনো দিন ছিল না, কারণ ধনলোভের মতো এমন নিষ্ঠুর এবং অন্যায়পরায়ণ প্রবৃত্তি আর নেই।...

"পাশ্চাত্য দেশে আজ দেখতে পাচ্ছি, যারা ধন-অর্জন করেছে এবং যারা অর্জনের বাহন তাদের মধ্যে কোনোমতেই বিরোধ মিটছে না। মেটবার উপায়ও নেই।...সভ্যতার সুযোগ যথেষ্টপরিমাণে ভোগ করবার জন্যে প্রচুর ধনের আবশ্যকতা উভয়পক্ষেই। এমন স্থলে পরস্পরের মধ্যে ঠেলাঠেলি কোনো এক-জায়গায় এসে থামবে, এমন আশা করা যায় না।"

তিনি আরও বলিলেন,

..."এই রকম অবস্থাতেই নগরের আধিপত্য হয় অপরিমিত, আর গ্রামগুলি উপেক্ষিত হতে থাকে। তখন যত-কিছু সুবিধা সুযোগ, যত-কিছু ভোগের আয়োজন, সমস্ত নগরেই পুঞ্জিত হয়। গ্রামগুলি দাসের মতো অন্ন জোগায়, এবং তার পরিবর্তে কোনোমতে জীবনধারণ করে মাত্র। তাতে সমাজের মধ্যে এমন-একটা ভাগ হয় যাতে একদিকে পড়ে তীব্র আলো, আর-এক দিকে গভীর অন্ধকার। য়ুরোপের নাগরিক সভ্যতা মানুষের সর্বাঙ্গীণতাকে এই রকমে বিচ্ছিন্ন করে।"...

কিন্তু তবুও পাশ্চাত্য সভ্যতার উন্নতি ও সমৃদ্ধিকে তিনি অস্বীকার করিতেছেন না। পাশ্চাত্য সভ্যতার উন্নতির মূলে আছে তাহার 'সমবায়-মূলক জ্ঞানের সভ্যতা' ইহাই কবির ধারণা।—'এই জ্ঞান-সমবায়ের অভাবে' এশিয়ার বিভিন্ন সভ্যতাগুলি খুব বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার তীব্র অসঙ্গতি ও স্ববিরোধী রূপটি কবি পরিষ্কার দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাই তিনি বলিলেন,

"কিন্তু এই য়ুরোপীয় সভ্যতার মধ্যেই কোন্‌খানে বিনাশের বীজ-রোপণ

চলেছে? যেখানে তার মানবধর্মের বিরুদ্ধতা, অর্থাৎ যেখানে তার সমবায় ঘটতে পারে নি। সে হচ্ছে তার বিষয়ব্যাপারের দিক। এইখানে য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশ স্বতন্ত্র ও পরস্পরবিরুদ্ধ। এই বৈষয়িক বিরুদ্ধতা অস্বাভাবিক পরিমাণে প্রকাণ্ড হয়েছে, তার কারণ বিজ্ঞানের সাহায্যে বিষয়ের আয়োজন ও আয়তন আজ অত্যন্ত বিপুলীকৃত। তার ফলে য়ুরোপীয় সভ্যতায় একটা অদ্ভুত পরস্পরবিরুদ্ধতা জেগেছে। এক দিকে দেখছি মানুষকে বাঁচাবার বিদ্যা যেখানে প্রত্যহ দ্রুতবেগে অগ্রসর—ভূমিতে উর্বরতা, দেহে আরোগ্য, জীবনযাত্রায় জড় বাধার উপর কর্তৃত্ব মানুষ এমন করে আর কোনোদিন লাভ করে নি; এরা যেন দেবলোক থেকে অমৃত আহরণ করতে বসেছে। আবার আর-এক দিক ঠিক এর বিপরীত। মৃত্যুর এমন বিরাট সাধনা এর আগে কোনদিন দেখা যায় নি।...জ্ঞানসমবায়ের ফলে য়ুরোপ যে প্রচণ্ড শক্তিকে হস্তগত করেছে আত্ম-বিনাশের জন্য সেই শক্তিকেই য়ুরোপ ব্যবহার করবার জন্যে উদ্যত।...জ্ঞানের অন্বেষণে বর্তমান যুগে মানুষ বাঁচাবার পথে চলেছে আর বিষয়ের অন্বেষণে মারবার পথে। শেষ পর্যন্ত কার জয় হবে সে কথা বলা শক্ত হয়ে উঠল।"

[সমবায়নীতি ॥ পৃ ৩৩-৩৮]

কিন্তু এই সর্বনাশা মনোবৃত্তির জন্য যন্ত্রই কি দায়ী? কবি তাহার উত্তরে বলিলেন,

"কেউ কেউ বলেন, মানুষের ব্যবহার থেকে যন্ত্রগুলোকে একেবারে নির্বাসিত করলে তবে আপদ মেটে। এ কথা একেবারেই অশ্রদ্ধেয়।...মানুষ ভাগ্যক্রমে পেয়েছে দুটো হাত, কেবলমাত্র কাজ করবার জন্যে। তাতে তার কাজের শক্তি বিস্তর বেড়ে গেছে। সেই সুবিধাটুকু পাওয়াতে জীবজগতে অন্য-সব জন্তুর উপরে সে জয়ী হয়েছে; আজ সমস্ত পৃথিবী তার অধিকারে। তার পর থেকে যখনই কোনো উপায়ে মানুষ যন্ত্রসাহায্যে আপন কর্মশক্তিকে বাড়ায় তখনই জীবনের পথে তার জয়যাত্রা এগিয়ে চলে। এই কর্মশক্তির অভাবের দিকটা পশুদের দিক, এর পূর্ণতাই মানুষের। মানুষের এই শক্তিকে খর্ব করে রাখতে হবে এমন কথা কোনোমতেই বলা চলে না, বললেও মানুষ শুনবে না। মানুষের কর্মশক্তির বাহন যন্ত্রকে যে জাতি আয়ত্ত করতে পারে নি সংসারে তার পরাভব অনিবার্য, যেমন অনিবার্য মানুষের কাছে পশুর পরাভব।"

[ঐ ॥ পৃ ৩৯-৪০]

কিছুদিন পূর্বে '*Times of India*' পত্রে তিনি যে সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিয়াছিলেন তাহাতে কবির বক্তব্য যে যথাযথ প্রকাশ পায় নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। লক্ষ্য করিবার বিষয়, কবি এখানে পরিষ্কার যন্ত্র ও বিজ্ঞানের জয়গান করিতেছেন। শুধু তাহাই নহে আধুনিক উপকরণ সভ্যতাকেই তিনি অভ্যর্থনা জানাইয়া ঐ প্রবন্ধেই বলিতেছেন,

..."অতীত কালের সামান্য সম্বল নিয়ে বর্তমান কালে কোনোমতে বেঁচে থাকা মানুষের নয়। মানুষের প্রয়োজন অনেক, আয়োজন বিস্তর, সে আয়োজন জোগাবার শক্তিও তার বহুধা। বিলাস বলব কাকে? ভেরেণ্ডার তেলের প্রদীপ

ছেড়ে কেরোসিনের লণ্ঠনকে, কেরোসিনের লণ্ঠন ছেড়ে বিজলিবাতি ব্যবহার করাকে বলব বিলাস? কখনোই নয়।…যে মানুষ সেদিন গোরুর গাড়িতে চড়েছিল সে যদি আজ মোটরগাড়িতে না চড়ে তবে তাতে তার দৈন্যই প্রকাশ পায়। যা এক কালের সম্পদ তাই আর-এক কালের দারিদ্র্য। সেই দারিদ্র্যে ফিরে যাওয়ার দ্বারা দারিদ্র্যের নিবৃত্তি শক্তিহীন কাপুরুষের কথা।"

রবীন্দ্রনাথের মন কতখানি প্রগতিশীল ছিল ইহা হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহার সহিত গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারার পার্থক্য কোথায় তাহা পরিষ্কার বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন হয় না।

কিন্তু তাহা হইলে আসল সমস্যার সমাধান কোথায়? কবি তাহার উত্তরে বলিলেন,

…"আজকালকার দিনে অর্থশক্তি বিশেষ ধনীসম্প্রদায়ের মুঠোর মধ্যে আটকা পড়েছে। তাতে অল্প লোকের প্রতাপ ও অনেক লোকের দুঃখ। অথচ বহু লোকের কর্মশক্তিকে নিজের হাতে সংগ্রহ করে নিতে পেরেছে বলেই ধনবানের প্রভাব। তার মূলধনের মানেই হচ্ছে বহু লোকের কর্মশ্রম তার টাকার মধ্যে রূপক মূর্তি নিয়ে আছে। সেই কর্মশ্রমই হচ্ছে সত্যকার মূলধন, এই কর্মশ্রমই প্রত্যক্ষভাবে আছে শ্রমিকদের প্রত্যেকের মধ্যে। তারা যদি ঠিকমতো করে বলতে পারে যে 'আমরা আমাদের ব্যক্তিগত শক্তিকে এক জায়গায় মেলাব' তা হলে সেই হয়ে গেল মূলধন।…

"একেই বলে সমবায়নীতি। এই নীতিতেই মানুষ জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হয়েছে, লোকব্যবহারে এই নীতিকেই মানুষের ধর্মবুদ্ধি প্রচার করছে। এই নীতির অভাবেই রাষ্ট্র ও অর্থের ক্ষেত্রে পৃথিবী জুড়ে মানুষের এত দুঃখ এত ঈর্ষা দ্বেষ মিথ্যাচার নিষ্ঠুরতা, এত অশান্তি।"

লক্ষ্য করিবার বিষয়, রবীন্দ্রনাথের কাছে সমবায়নীতি শুধুমাত্র নিছক একটি আর্থনীতিক পরিকল্পনা নয়। তাঁহার মতে, এই সমবায়-নীতিকে গ্রহণ করিয়াই মানুষ আজ সাম্রাজ্যলোলুপ যুদ্ধোন্মাদ শক্তিগুলির কুটিল ষড়যন্ত্রজাল ব্যর্থ করিয়া দিতে পারে; আর সে দায়িত্ব পড়িয়াছে, আজ সাধারণ মানুষের স্কন্ধে। তাই তিনি বলিলেন,

"পৃথিবী জুড়ে আজ শক্তির সঙ্গে শক্তির সংঘাত অগ্নিকাণ্ড করে বেড়াচ্ছে। ব্যক্তিগত লোভ আজ জগৎব্যাপী বেদীতে নরমেধযজ্ঞে প্রবৃত্ত। একে যদি ঠেকাতে না পারি তবে মানব-ইতিহাসে মহাবিনাশের সৃষ্টি হবেই হবে। শক্তিশালীরা একত্রে মিলে এর প্রতিরোধ কখনোই করতে পারবে না, অশক্তেরা মিললে তবেই এর প্রতিকার হবে।…

"তাই আজকের দিনের সাধনায় ধনীরা প্রধান নয়, নির্ধনেরাই প্রধান। বিরাটকায় ধনের পায়ের চাপ থেকে সমাজকে, মানুষের সুখশান্তিকে বাঁচাবার ভার তাদেরই 'পরে। অর্থোপার্জনের কঠিন-বেড়া-দেওয়া ক্ষেত্রে মনুষ্যত্বের প্রবেশপথ নির্মাণ তাদেরই হাতে। নির্ধনের দুর্বলতা এতদিন মানুষের সভ্যতাকে দুর্বল ও অসম্পূর্ণ করে রেখেছিল, আজ নির্ধনকেই বললাভ ক'রে তার প্রতিকার

করতে হবে।"

'নির্ধনেরা' বলিতে কবি যে সাধারণভাবে সর্বহারা শ্রেণীকেই বুঝাইতেছেন তাহা বলাই বাহুল্য এবং তাহারাই যে একমাত্র আজকের দিনে আশা ও ভরসা, ইহাই কবির বক্তব্য। কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হইয়া কবি জনশক্তির সচেতন ও সক্রিয় ভূমিকার উপর তাঁহার আস্থা প্রকাশ করিলেন। অথচ অল্পকাল পূর্বেই কবিকে আমার 'মহান ব্যক্তিত্বের' (Great Individuals) আবাহন জানাইতে দেখি। কবিমানসের এই স্ববিরোধিতা লক্ষণীয়।

উপসংহারে কবি ভারতের আর্থিক পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এই সমবায়নীতিকে ব্যাপকভাবে সফল করিয়া তুলিবার আহ্বান জানাইয়া বলিলেন,

…"এই পথ অনুসরণ করে আজ ভারতবর্ষে জীবিকা যদি সমবায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তবে ভারতসভ্যতার ধাত্রীভূমি গ্রামগুলি আবার বেঁচে উঠবে ও সমস্ত দেশকে বাঁচাবে। ভারতবর্ষে আজ দারিদ্র্যই বহুবিস্তৃত, পুঞ্জধনের অভ্রভেদী জয়স্তম্ভ আজও দিকে দিকে স্বল্পধনের পথরোধ করে দাঁড়ায় নি। এইজন্যই সমবায়নীতি ছাড়া আমাদের উপায় নেই, আমাদের দেশে তার বাধাও অল্প। তাই একান্তমনে কামনা করি ধনের মুক্তি আমাদের দেশেই সম্পূর্ণ হোক এবং এখানে সর্বজনের চেষ্টার পবিত্র সম্মিলনতীর্থে অন্নপূর্ণার আসন ধ্রুবপ্রতিষ্ঠা লাভ করুক।"

['সমবায়নীতি'-সমবায়নীতি ॥ পৃ ৪১-৪৭]

বাংলাদেশে সমবায়-আন্দোলনের কর্মকর্তারা অনেকেই সরকারী কর্মচারী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গী ও ভাবাদর্শ তাঁহারা কতদূর গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিংবা আদৌ করিয়াছিলেন কিনা তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। উল্লেখযোগ্য, বাংলাদেশে তখনও সমবায়মূলক চাষ আবাদ বা সমবায়-শিল্প তেমন গড়িয়া উঠে নাই। সমবায় সমিতিগুলি তখনও ঋণদান-সমিতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। মূলধন ও চাষ আবাদের খরচের জন্য চাষী যাহাতে সুদখোর মহাজনের কবলে না-পড়ে, মূলত সেই উদ্দেশ্যেই *Co-operative Credit Societies* গুলি গঠিত হইয়াছিল। দিল্লীতে তখন '*Indigenous Banking Enquiry Committee*'র এক অধিবেশন বসিতেছে। ঐ সভায় দেশের সমবায় ব্যাংক ও সমিতিগুলি হইতে যাহাতে যথোপযুক্ত পরিমাণে প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারে তাহারই দাবি জানাইয়া সম্মেলনের শেষের দিন এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটন সভাপতির আসন হইতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তটি উপস্থাপিত করিলেন,

"This conference which is representative of All-Bengal respectfully requests the Government of India to invite to the Banking Enquiry to be held at Delhi on Feb. 16, the co-operative Registrar of every province in India as representing the people's banking system and that on any committee appointed to consider the development of banking the co-operative credit

movement be fully represented.

এই সিদ্ধান্তের নকল ভাইসরয় ও স্যর জর্জ সুস্টারের নিকট পাঠাইবার কথা হয়। স্যার ড্যানিয়েল তাঁহার অভিভাষণের এক জায়গায় বলিলেন,

"Within the Co-operative Bank there is no caste but that of the worker, no creed but that of brotherhood....

"We provide the common platform on which all can unite to lend India a helping hand and the Statutory Commission will blunder badly and act blindly if they fail to see that platform. For, *the co-operative movement is more than mony. It is a new form af social and political structure which is arising in this ancient land.*"

[*Amrita Bazar* *Patrika*-12 Feb. 1929]

লক্ষনীয়,রবীন্দ্রনাথের মত হ্যামিলটন সাহেবও 'কো-অপারেটিভ সোস্যাইটি'কে শুধুমাত্র ঋণদান সোস্যাইটিতে সীমাবদ্ধ রাখতে চাহেন নাই। সমবায় প্রথায় নতুন সমাজ-আর্থনীতিক ব্যবস্থা পুনর্গঠিত করিতে হইবে এই ছিল তাহার মত। কিন্তু পরিহাসের ব্যাপার এই, কৃষিঋণ সমস্যার সমাধানেও উহা এদেশে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়।

প্রসঙ্গত বলা দরকার এই সময়ই *Bengal Banking Enquery Committee* গঠিত হয়। এই কমিটির তদন্তে দেখা যায় যে, ১৯২৯ সালে সমস্ত বাংলা দেশে কৃষিজীবীর ঋণ ছিল ১০০ কোটি টাকা। গড়ে মাথাপিছু সে ঋণ হয় ১৬০। *Co-operative credit societies* কৃষিঋণ সমস্যার বিন্দুমাত্রও সমাধান করিতে পারে নাই পরন্তু আন্তর্জাতিক বাজার মন্দার জন্য চাষীর ঋণের পরিমাণ চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল—জমির হস্তান্তরও সেই সঙ্গে প্রভূত বাড়িয়া যায়।

বলা বাহুল্য, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ, এমনকি স্বয়ং গান্ধীজীকেও সমবায় আন্দোলনের উপর সেদিন বিশেষ কোন গুরুত্ব দিতে দেখা যায় নাই। তাছাড়া কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির উপর রবীন্দ্রনাথই সেদিন বার বার গুরুত্ব আরোপ করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন। কিছুদিন পূর্বে 'প্রবাসী'তে কৃষিবিৎ সন্তোষবিহারী বসু সম্পর্কে কিছু বলিতে গিয়া কবি লিখিয়াছিলেন,

..."কৃষিকার্যে নূতন জ্ঞান ও নূতন চিন্তা প্রয়োগ করিবার দিন আসিয়াছে। যদি জড় প্রথার উপর বরাত দিয়া উদাসীন থাকি তবে আধুনিক কালের দাবী রক্ষা করিতে অক্ষম হইয়া বিশ্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আমাদিগকে পরাস্ত হইতে হইবে। পূর্বকালে আমাদের গ্রামের হাটই ছিল আমাদের ফসলের হাট, আমাদের ফল ফলাইবার চেষ্টা সেই সংকীর্ণ পরিধির উপযুক্ত ছিল। এখন বিশ্বের হাটে আমাদের চাষীদের তলব পড়িয়াছে, জোগান দিতে কুলায় না। বাহিরের কথা ছাড়িয়া দিলেও আগে আমাদের গৃহস্থের প্রয়োজনের পরিমাণ যতটা ছিল এখন তার চেয়ে অনেক বেশি বাড়িয়াছে, অথচ উৎপাদনের উপায়গুলি পূর্ববৎ, এবং উৎপাদনের শক্তিও বাড়ে নাই। কৃষি-প্রধান দেশের

পক্ষে এমন সাংঘাতিক দুর্গতির কারণ আর কিছুই হইতে পারে না। কৃষিজীবী দেশের পক্ষে বিশেষ দরকার উদ্বৃত্তসঞ্চয়। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বাহিরের হাটে মূল্যের পতন, আকস্মিক উৎপাত মাঝে মাঝে অনিবার্য। সে স্থলে পূর্ব-সঞ্চিত সম্বল হাতে না থাকিলে দল বাঁধিয়া নিরুপায়ে মরিতে হয়। সেই দারুণ দৃশ্য প্রায়ই আমাদের চোখে পড়িতেছে। শুধু তাই নয়—আমাদের দেশে চাষীর বিপদ কেবল যে নৈমিত্তিক তাহা বলিতে পারি না, তাহা নিত্য। টানাটানি প্রতিদিনই চলিতেছে। তাই উদ্বৃত্ত দূরে থাক ঋণের দায়ই বাড়িয়া চলিয়াছে, বর্তমানের দায়ে তাহাদের ভবিষ্যৎ পর্যন্ত বাঁধা পড়িল। চাষী ছাড়া আমরা অন্য যাহারা আছি, বাক্য ছাড়া কোন প্রকার উৎপাদনের প্রায় কিছুই করিতেছি না। সুতরাং সমাজের নিম্নস্তরের চাষী যাহা ফলাইতেছে উপরিস্তরের লোক নানা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া তাহাদেরই সেই ফসলের ভাগ লইতেছে, দেশের অল্প ধন নিয়ত গ্রহণ করিতেছে, তাহার পরিবর্তে কোন ধন দেশকে ফিরাইয়া দিতেছে না।

"সেই উপরিতন লোকদের কথা এখন থাক্। চাষীদের হাতে যাহাতে উদ্বৃত্ত সঞ্চয় থাকে—আশু তাহার উপায় করা উচিত—অন্যান্য সকল সমস্যার চেয়ে এটা বড়ো বই ছোটো নয়। এই উদ্বৃত্ত সঞ্চয় হইতেই তাহাদের স্বাস্থ্য, তাহাদের শিক্ষা, তাহাদের ধর্মকর্ম, তাহাদের উৎসব সম্ভবপর। সে সঞ্চয় যদি না থাকে তবে তাহারা মূঢ়তা, অস্বাস্থ্য, অপমান ও নিরানন্দের মধ্যে কেবলই তলাইতে থাকিবে ও তাহার ফলে তাহাদের প্রাণশক্তি ক্ষীণ হইতে ক্ষণীতর হইয়া তাহাদের কর্মকে মূল্যহীন ও স্বল্পফল করিয়া তুলিবে। যত লোক দেশে বাস করিতেছে নানা কারণে তাহাদের শক্তি যদি অল্প হয়—তবে তাহাদের সংখ্যাধিক্যে ব্যয় যত বাড়িবে, আয় তত বাড়িবে না—সুতরাং দারিদ্র্যের দুঃখই কেবল বাড়িয়া চলিবে। এ কথা ভুলিলে বিপদ যে, উদ্বৃত্ত অন্নই আমাদের শক্তির পরিচয় ও শক্তির আশ্রয়, এই শক্তিই সকল সভ্যতার মূল।"

পরিশেষে কবি বলিলেন,

'আজ পৃথিবীতে সর্বত্রই ফসল ফলানোর ব্যাপার কেবল মাত্র চাষীর হাতে নাই। জ্ঞানী বুদ্ধিমান ও উদ্ভাবনপটু যান্ত্রিকদল ইহাতে মন দিয়াছেন। যাহা অন্ধ অভ্যাসের কাজ ছিল তাহাতে চিত্তের দৃষ্টি পড়িবামাত্র আশ্চর্য সফলতা ঘটিয়াছে। তাই আমাদের দেশের কৃষির পশু ও কৃষিফলের সহিত পাশ্চাত্য দেশের তুলনা করিলে আমাদের মাথা হেঁট হইয়া যায়। যে অযোগ্যতার বিধি-নির্দিষ্ট শাস্তি মৃত্যু, সেই শাস্তি স্বীকার করিয়াও দেশের বুদ্ধি এই কাজে একটুও লাগিল না। উপবাসে মরিতে মরিতেও নিরক্ষর চাষীর উপর নির্ভর করিয়া রহিলাম। যাহা যেমন আছে তাহা তেমনিই থাকিবে; স্বচেষ্টায় তাহার উন্নতি করিতে পারি এ শ্রদ্ধা নিজের উপর নাই—তাই জীর্ণ সাবেক কালকে দিয়া বর্তমান কালের বিপুল দায় মিটাইবার তাড়ায় প্রাণ বাহির হইল।"

[প্রবাসী-পৌষ-১৩৩৫।। পৃঃ ৪৩৮-৩৯]

কৃষি সমস্যার বাস্তব খুঁটি-নাটি দিকগুলিকে রবীন্দ্রনাথ যত পরিষ্কার দেখিতে পাইয়াছিলেন কংগ্রেসের প্রবীণ নেতারা কেহই এতখানি দেখিতে পাইয়াছিলেন কিনা তাহাতে সন্দেহের অবকাশ আছে। এমনকি স্বয়ং গান্ধীজীও নহেন। গান্ধীজী জমিদার-তালুকদার জোতদার-মহাজনের শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে তখনও পর্যন্ত প্রায় কিছুই বলেন নাই। তাছাড়া ভারতবর্ষ যে কৃষি-প্রধান দেশ এবং কৃষি সমস্যাই তাহার প্রধানতম সমস্যা, এ' কথা গান্ধীজী কিছুতেই যেন বুঝিতে পারেন নাই। অন্ন সমস্যা ও জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির জন্য চরকাই গান্ধীজীর কাছে সমস্যার একমাত্র সমাধান। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ শুধু অন্ন সমস্যাকেই দেখেন নাই।—অন্নবস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি কলা,—দেশের বিশেষত গ্রামীণ জীবনের এই সামগ্রিক সমস্যাটি তিনি যতখানি সম্পূর্ণভাবে দেখিতে পাইয়াছিলেন এতখানি গান্ধীজী পান নাই। কিন্তু তবুও একথা সত্য—রবীন্দ্রনাথের আর্থনীতিক ও রাজনীতিক চিন্তার মূল কথাই ছিল, কৃষির উৎপাদিকা শক্তির মুক্তি ও বিকাশ। যন্ত্রশিল্প সম্পর্কে কবির নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল সত্য,—কিন্তু কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রশ্নে তিনি বার বার যন্ত্রবিজ্ঞান ও আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া আসিতেছিলেন।

কিন্তু কবির আর্থনীতিক পরিকল্পনা যতই প্রগতিশীল হউক না কেন, একটি কথা তিনি বুঝিতে পারিতেন না যে, যতদিন দেশ ইংরেজের পদানত থাকিবে ততদিন ঐ পরিকল্পনা বাস্তবে কার্যকরী হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা থাকিবে না। দ্বিতীয়ত জমিদার মহাজনের শোষণের, এক কথায় কৃষিতে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের অবসান ঘটাইয়া গণতান্ত্রিক ভূমি-সংস্কার (Democratic land reforms) প্রবর্তনের পরই ঐ ধরণের পরিকল্পনাগুলি গ্রহণ করিবার উপযুক্ত বাস্তব পরিস্থিতির সৃষ্টি করা সম্ভবপর হয়। একমাত্র স্বাধীন দেশের প্রকৃত জনগণের সরকারই ঐ সব ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে। রবীন্দ্রনাথ 'রাষ্ট্রক্ষমতা ও 'রাষ্ট্রের' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

গান্ধীজী তখন আসন্ন সংগ্রামের প্রস্তুতি হিসাবে সারা ভারতে চরকা ও বিদেশী বস্ত্র বয়কটের প্রচার-অভিযানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। চরকার জন্য তহবিল সংগ্রহের আবেদনও তিনি জানাইতেছিলেন। বলা বাহুল্য নেহরু প্রমুখ কংগ্রেসের নবীন ও প্রগতিশীল গোষ্ঠী উহা মোটেই ভালো চোখে দেখিতে পারেন নাই। এই প্রসঙ্গে নেহরু তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিতেছেন,

…"গান্ধীজীর এই শ্রেণীর অ-রাজনৈতিক কাজে লিপ্ত থাকায় মাঝে মাঝে আমার রাগ হইত। তাঁহার মনের মধ্যে কি আছে, আমি কিছুতেই বুঝিতে পারিতাম না। এই সময়ে তিনি খাদির জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেন এবং প্রায়ই বলিতেন যে, "দরিদ্রনারায়ণ" সেবার জন্য অর্থের আবশ্যক। ইহার অর্থ—কুটীরশিল্পের মধ্য দিয়া কর্মসৃষ্টি তাঁহার উদ্দেশ্যে। কিন্তু ঐ শব্দটির মধ্যে দারিদ্র্যকে মহিমান্বিত করিবার একটি ভাব আছে, যেন ঈশ্বর বিশেষভাবে দরিদ্রদের প্রভু এবং দরিদ্ররাই তাঁহার বিশেষ প্রিয়। আমার মনে হয় সর্বত্রই ধর্মভাবের

এই মনোভাব আছে। কিন্তু আমার পক্ষে ইহা অসহ্য। আমার মতে, দারিদ্র্য অত্যন্ত ঘৃণার্হ। উহার সহিত যুদ্ধ করিয়া উহাকে উন্মূলিত করাই কর্তব্য, উহাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে। কেন না, এই মনোভাব হইতে লোকে দারিদ্র্যকে আক্রমণ না করিয়া যে ব্যবস্থা হইতে দারিদ্র্যের উৎপত্তি হয়, লোক তাহা সমর্থন করে এবং যাহারা দারিদ্র্যের প্রতি যুদ্ধবিমুখ, তাহারা দারিদ্র্যের একটা সঙ্গত, শোভন ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করে। তাহারা অভাবপূর্ণ জগৎচিন্তা করিতেই অভ্যস্ত, ইহজগতেই জীবনের সর্বপ্রকার প্রয়োজন প্রচুররূপে পাওয়া যায়, তাহা ধারণা করিতে পারে না, ইহাদের মতে জগতে চিরকাল ধনী এবং দরিদ্র থাকিবে।

"এই বিষয় লইয়া মাঝে মাঝে আমার গান্ধীজীর সহিত আলোচনা হইয়াছে। তিনি জোরের সহিত বলেন যে, ধনীরা তাহাদের ধন দরিদ্রদের পক্ষ হইতে অছি স্বরূপ রক্ষা করিতেছে, ইহাই মনে করিবে। ইহা অতি প্রাচীন মত। ইউরোপীয় মধ্যযুগে এবং ভারতবর্ষে ইহা সচরাচর শোনা যায়। আমি অকপটে স্বীকার করি, আমি ইহা বুঝিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম যে কেমন করিয়া একজন ব্যক্তি ধারণা করিতে পারে, এই উপায়ে সামাজিক সমস্যার সমাধান সম্ভবপর।"

[আত্মচরিত ॥ পৃ ২০৮]

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের ও গান্ধীজীর অর্থনীতিক চিন্তা দেশের প্রগতিশীল যুব সম্প্রদায়কে এতটুকু প্রভাবিত করিতে পারে নাই। তাঁহারা সশস্ত্র সংগ্রাম ও বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতেই (in terms of revolution) চিন্তা ও সাংগঠনিক তৎপরতায় ব্যস্ত ছিলেন।

অপরদিকে, সারা দেশে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য ও জাগরণ দেখা দিয়াছে। ১৯২৮ সাল হইতে ভারতের প্রধান প্রধান শিল্পকেন্দ্রগুলিতে এক-নাগারে ধর্মঘট চলিয়া আসিতেছিল; ১৯২৯ সালের প্রথমার্ধে এই ধর্মঘটের প্রবাহ আরো গভীর ও ব্যাপক আকার ধারণ করে। তন্মধ্যে বোম্বাইয়ে সূতাকলে ও কলিকাতায় পাটকলগুলিতে ধর্মঘট খুবই ব্যাপকতর হয়। জামসেদপুরে 'টিন প্লেটে'র শ্রমিকেরাও ধর্মঘট শুরু করে। তাছাড়া 'ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে' ও কলিকাতায় 'মেথর' বা ঝাড়ুদার ধর্মঘটও খুবই উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বলা বাহুল্য, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তাহাদের সকল উদ্যম ও শক্তিতে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিকোণ হইতে এইসব শ্রমিক আন্দোলনকে ভবিষ্যৎ সংঘর্ষের দিকে সংগঠিত ও প্রসারিত করিতে প্রয়াস পান। ইংরেজ সরকার অত্যন্ত উদ্বেগের সহিত ইহা লক্ষ্য করিতেছিল। অনতিকালের মধ্যেই শুরু হয় তাহার আক্রমণ। ১৯২৯ সালের ২০ শে মার্চ, সারা দেশে খানা-তল্লাসী করিয়া প্রায় ৩০ জন কমিউনিস্ট ও বামপন্থী শ্রমিক নেতাকে গ্রেপ্তার করিয়া মীরাটে আনা হইল। তারপর শুরু হইল সেই কুখ্যাত অথবা বিখ্যাত 'মীরাট-ষড়যন্ত্র মামলা'। দীর্ঘ চারি বৎসর ধরিয়া এই মামল চলে;

গান্ধীজী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ চিত্তে ঘোষণা করিলেন,

"The arrests of labour leaders or so-called communists show

that the Government is in a panicky state and is betraying the symptoms to which we have been used and which presage a period of terrorism. Evidently it believes in a periodical exibition of its capacity to supersede all law and to discover to a trembling India the red claws which usually remain under cover. Of course, the farce of a trial will be enacted··· [*Mahatma-Vol.* II-P 356]

২রা এপ্রিল কেন্দ্রীয় আইন সভায় 'জননিরাপত্তা বিল'টির (*Public Safety Bill*) আলোচনা শুরু হয়। সভাপতি ভি. জে. প্যাটেল ঐ বিলের তীব্র সমালোচনা করিয়া বলেন যে, যতদিন না মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার রায় বাহির হয়, ততদিন এই বিল লইয়া আলোচনার কোন ন্যায়সঙ্গত অধিকার আমাদের নাই। আইনসভাগুলির এই নীরস একঘেয়ে আলোচনায় লোকের বিরক্তি ও ঘৃণা জন্মাইয়া গিয়াছিল। বিশেষত দেশের যুবশক্তি ইহার ফলে খুবই অধীর ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিল। ৮ই এপ্রিল, দিল্লীর আইনসভাকক্ষে দর্শকের গ্যালারী হইতে পর পর দুইটি বোমা পড়ে। এই সূত্রে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত গ্রেপ্তার হইলেন। উল্লেখযোগ্য ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ, যোগেশ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজনের নেতৃত্বে এই সময় উত্তর-ভারতেও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন দ্রুত প্রসারলাভ করিতে থাকে।

১২ই জুন, সেই কুখ্যাত মামলার রায় বাহির হয়। বিচারে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। বিচারকক্ষে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত তাঁহাদের ঐতিহাসিক বিবৃতিতে ঘোষণা করিলেন,

"We have been ruminating upon this as also upon the wholesale arrests of leaders of the labour movement. When the introduction of the *Trades Disputes Bill* brought us into the Assembly to watch its progress and the course of the debate. it only served to confirm our conviction that the labouring millions of India had nothing to expect from the institution that stood as a menacing monument to the strangling power of the exploiters and the serfdom of the helpless labourers.

"We dropped the bombs on the floor of the Assembly to register our protest on behalf of those who had no other means left to give expression to their heart rending agony. Our sole purpose was to make the deaf hear and to give the headless a timely warning.

···"We have only marked *the end of the era of the utopian*

non-violence of whose futility the rising generation has been convinced beyond a shadow of doubt.

"Revolution is the inalienable right of mankind. Freedom is the imprescriptible birthright of all. The labourer is the real sustainer of society. The sovereignty of the people is the ultimate destiny of workers. For these ideals and for this faith we shall welcome any suffering to which we may be condemend. To the alter of revolution we have brought our youth as incense, for no sacrifice is too great for so magnificent a cause. We are content. *We await the advent of revolution, Long live revolution.* [*Ibid*-P. 358]

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা ও ভগৎ সিং-এর বোমা কি কালান্তরের পটপরিবর্তনের ঘণ্টাধ্বনি !

কানাডায় ও জাপানে

১৯২৯ সালের প্রথম ভাগেই কানাডা হইতে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা দিবার নিমন্ত্রণ আসে। কানাডার '*National Council of Education*' পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিক্ষাশাস্ত্রীদের লইয়া এক সম্মেলনের আয়োজন করেন। এই সম্মেলনের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল, শিক্ষা ও অবসর (*Education and leisure*)।

স্মরণ রাখা দরকার, প্রায় ১৩ বৎসর পূর্বে কবির আমেরিকা পরিভ্রমণকালে কানাডা হইতে তাঁহার প্রথম নিমন্ত্রণ আসে। ভারতীয়দের প্রতি দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে তিনি সেদিন কানাডা-সরকারের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। পূর্বখণ্ডেই তাহা বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে।

যাহাই হউক, কবি এবার কানাডার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। এবার কবির সঙ্গে চলিলেন, অধ্যাপক B. G Tucker, অপূর্বকুমার চন্দ এবং কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। ২৬শে ফেব্রুয়ারী (১৪ই ফাল্গুন-১৩৩৫) তাঁহারা কলিকাতা হইতে বোম্বাই অভিমুখে রওনা হইলেন।—কলম্বো হইতে জাহাজ ধরিবার কথা।

কলম্বো হইতে পেনাঙ, সিঙ্গাপুর, শাংহাই, টোকিয়ো হইয়া অবশেষে ৬ই এপ্রিল তাঁহারা কানাডার ভিক্‌টোরিয়া বন্দরে পেঁীছিলেন। এণ্ড্রুজ এইখানে তাহাদের সহিত মিলিত হন। ভিক্‌টোরিয়ার ভারতীয় শিখ সম্প্রদায়ের লোকেরা এখানকার গুরুদ্বারে রবীন্দ্রনাথ ও এণ্ড্রুজকে সম্বর্ধনা জানান। কবি তাঁহার ভাষণে এখানকার সমস্ত ভারতীয়দের মনেপ্রাণে কানাডার সৎ নাগরিক হইবার আহ্বান জানান। তিনি কানাডায় তাঁহাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার লইয়া আসিবারও পরামর্শ দেন,—বিশেষ করিয়া ঐ সম্পর্কে আইনগত বিধি-নিষেধের বাধা অপসারিত হওয়ার পর, স্ত্রী-পুত্রদের এখানে লইয়া আসিতে তাঁহাদের আশংকা করার কোন কারণ থাকে না এই কথাই কবি বুঝাইয়া বলিলেন।

৮ই এপ্রিল রাত্রি বেলায় ভিক্‌টোরিয়ায় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের সম্মিলনে কবি ভাষণ দিলেন। কবির বক্তৃতার বিষয় ছিল,—'অবসর তত্ত্ব' বা '*Philosophy of Leisure*'। কবির বক্তব্য বিষয় শুধু উহার মধ্যেই সীমিত ছিল না,—জীবনের বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় দিকগুলির এক সামগ্রিক চিত্র তিনি উপস্থাপিত করিলেন। বর্তমান পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী সভ্যতার লক্ষ্য ও গতি যে-পথে চলিয়াছে তাহাতে তাহাদের চিন্তা মনীষা ও আধ্যাত্মিক শক্তির ধ্বংস অনিবার্য ;—কবি তাঁহার ভাষণে এই সতর্কবাণী করিয়াও পাশ্চাত্যকে খুবই সহানুভূতি ও সহৃদয়তার সহিত বুঝিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিলেন,

"It is evident that the modern age is riding on a tornado of rapidity, jealously competing with its own past every moment in speed and production.

"We cannot stop its course, and should not, even if we could. Our only anxiety with regard to it is that we may forget that slow and mature productions of leisure are of immense value to man, for these only can give balance to bloated atmosphere of infinity in a width of leisure across which some invisible messengers of life and light, bring in their silent voices of creation."

আধুনিক সভ্যতার কর্মব্যস্ততাময়-জীবনে অবসরের প্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য উল্লেখ করিতে গিয়া তিনি আরও বলিলেন,

"Compressed and crowded time has its use when dealing with material things but living truths must have for their significanee a full accommodation of leisure. The cramped time produces deformities and degeneracy, as the mind constantly pursued by a frenzied haste develops a chronic dyspepsia. It is ungenerous in its reception of the world ; it is frustrated with existence. It easily comes to believe that reality is truly representd by nightmares, that only the lowest is reliable in its explanation of the highest in a language crudely obscure.

[*Times of India* : Bomby. 15 June, 1929]

এই বক্তৃতার পর কানাডা ও আমেরিকায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় পক্ষে ও বিপক্ষে নানা সমালোচনা হয়। নোবেল বেকার (Nobel Baker) নামক জনৈক সাংবাদিক এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কে কবির ধারণার সমর্থনে কিছু বলিতে থাকিলে কবি তৎক্ষণাৎ তাঁহার বক্তব্য বিষয় আরো পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন,

"Very many people seem to think that I am always talking about the materialism of the West and setting it against the spiritual qualities of my own people. I do not do this, and my own people know it. I have known the West and have found there a deep substratum of spiritual thought in your civilization. There are many men in the West with highest ideals and I have known many of them. My idea is that there is, as it were, a great planet dragging at the minds of the present age, a huge planet with its gravitation distracting our thoughts and endeavours towards a path which is not the normal path of mankind.

পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী সভ্যতার 'বস্তুতান্ত্রিকতা' বলিতে তিনি তাহাদের

উন্মত্ত অর্থগৃধ্নুতা বা মুনাফা-লালসার কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। মুনাফা—আরোও বেশি মুনাফা। পাশ্চাত্য দেশগুলির এই অত্যুগ্র মুনাফা-লালসার নিন্দা করিয়া কবি বলিলেন :

Everywhere an enormous profit is demanded, and that was never so in former days. In every department of life men are struggling to make big profits···Intellectual life has been invaded by this desire for riches···The shadow of profit-making is over the mind of humanity not only in the older and newer Western nations, but it has invaded Eastern cotinents."

ইহার ফলে তাহাদের বিশ্রামহীন কর্মব্যস্তজীবনের ঘূর্ণাবর্ত।

বিজ্ঞান সম্পর্কে তিনি বলিলেন,

"I do hope that science itself will bring about the remedy for what science has unwittingly brought about. It was not the function of science to spread materialism, for truth is never materialistic.···

"There will be a reconciliation of industrialism with the spirit of creation. *I hope to see established a harmony between creative man and inventive man.* This is the problem. You have siad for long 'We must conquer the air' and you have done it. In the same way you must *conquer the moral problems.*

'লীগ-অব নেশনস্' সম্পর্কে ও বিশ্বসমস্যা সমাধানে উহার ভূমিকা কী হওয়া উচিত, এই প্রশ্নের জবাবে কবি বলিলেন,

"Directly you build up a machinery for accomplishing anything, the ambitious people, who are very clever, try to capture the machinery for their own selfish interests, and if this *League of nations* ever obtains some real power like the monarchs of the Old World once possessed, then the courtiers will surround it and try and use it for their own selfish ends, as even now *some of the great powers are trying to thwart it.*

তিনি বলিলেন,

"Our great effort must be to organize such a body of public opinion among all nations along the right lines that it will be overwhelming in its strength. Then nothing can withstand it. I have faith in the reality of ideals and when they spread and the number of individuals who come under their influence in sufficient, then spontaneously there will be a great change and the world will wonder how it came about. But you have

to go to the root. That is the mission of all idealists. They appeal to the humanity of man, not by making outward adjustments but by overcoming inner obstacles."...

[*The Vancouver Star* : April 12, 1929.]

ভিক্‌টোরিয়ায় বক্তৃতার পরদিনই রবীন্দ্রনাথ ভাংকুভার নগরীতে চলিয়া আসেন। ৮ই এপ্রিল ভাংকুভারে কবির বক্তৃতার আয়োজন হয়। ঐদিন তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল,—সাহিত্যের ধর্ম (*The Principle of Literature*)। সভায় তিল ধারণের জায়গা ছিল না, সহস্র সহস্র লোক সভাকক্ষের বাহিরে সারিবন্ধভাবে দাঁড়াইয়া কবিকে দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

কানাডায় তাঁহারা প্রায় দশদিন অবস্থান করেন। কানাডার গভর্ণরের সহিত কবির সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হয়। বিদায়ের প্রাক্‌কালে নবীন-কানাডার জয়কামনা করিয়া কবি তাঁহার এক বাণীতে তাঁহাদের বর্ণ সমস্যার সমাধান করিবার আহ্বান জানাইলেন,

"Canada will have to solve, for the salvation of man, the most difficult of all problems, *the race problem*, which has become insistent with the close contact of communities that had their isolation for centuries in their geographical and cultural exclusiveness. She will have to reconcile the efficiency of the machine with the creative genius of man, which must build its paradise of self-expession; reconcile science with religion; individual right with the social obligation that it must acknowledge.

"She must dream of the introduction of honesty, even in politics, with the self-interest of the nation, knowing that such interest can *only have its sure foundation in truth, justice and sympathy in international relationships.* She must ever hope to be able to win the heart of the world by offering the best that she produces."

উপসংহারে তিনি তাঁহার শুভেচ্ছা বাণীতে বলিলেন,

"However, I may indulge in generality and say with conviction that Canada, being a young country is full of possibilities that are incalculable......Her creative youth is still before her, and the faith needed for her building up a new world is still fresh and strong."

[*The Gazette Montreal* : April 15, 1929.]

১৮ই এপ্রিল, তাঁহারা লস্‌-এনজেলস্‌-এ পৌঁছান। কানাডা ভ্রমণকালে আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠান হইতে বক্তৃতা করিবার জন্য

কবির নিমন্ত্রণ আসে। কিন্তু লস্-এনজেলস্-এ আসিবার পূর্বে ভাংকুভারে কবিকে এক হীন ও জঘন্য পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হয়। কবির পাসপোর্ট খুঁজিয়া না পাওয়ার জন্য নূতন পাসপোর্টের জন্য ভাংকুভারে মার্কিন পাসপোর্ট অফিসে তাঁহাকে ধর্ণা দিতে হয়। এখানকার আমেরিকান এমিগ্রেসন্ অফিসার অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় সাধারণ কুলিমজুরের মত কবিকে তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয়, আর্থিক সামর্থ ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে থাকে। এই জঘন্য আচরণের ফলে কবির মার্কিন দেশ ভ্রমণের ইচ্ছা নিমেষে অন্তর্হিত হইল।—আমেরিকায় সমস্ত এশিয়াবাসীদের ভাগ্যে অহরহ এই লাঞ্ছনা ও অপমান জুটিতেছে, এই কথা বুঝিতে পারিয়া কবির অন্তর ক্ষোভ, দুঃখ ও ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তিনি আমেরিকা ভ্রমণের সমস্ত প্রোগ্রাম বাতিল করিয়া দিয়া দেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করিলেন। ভাংকুভারে অধ্যাপক অপূর্বকুমার চন্দকেও অনুরূপ ব্যবহার করা হয়। কানাডা, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশের সাংবাদিকরা সর্বদাই কবির সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছিলেন। ঐ-ঘটনার পর ঐ সমস্ত দেশের পত্র-পত্রিকায় উহার তীব্র নিন্দাবাদ করিয়া বড়ো বড়ো শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়।

১০ই মে রবীন্দ্রনাথ জাপানের য়োকোহামা বন্দরে পেঁাছাইলেন। কবি জাপানে পেঁাছিবার পর তাঁহার আমেরিকা ভ্রমণের কর্মসূচী বাতিল করিয়া দিবার আসল কারণটি ব্যাখ্যা করিয়া এক দীর্ঘ বিবৃতি দেন, (১১ই মে-১৯২৯)

"I was asked by the U. S. Immigration Authorities at Vancouver to go to their office in person with my papers. My secretary had asked the Immigration Officer to fix an hour for the examination and at the appointed hour, I went to the office. After I had waited for about half-an-hour, the officer came to the door, saw me and without taking any notice of me, went on talking to some one who had then come. After finishing that, he silently beckoned to me to come into the room and then curtly pointed to a chair with a nod of his head. I was then asked the usual questions about my ability to pay my passage, whether I had independent means of livelihood as long as I remained in the States, and I was warned of the penalty that I shall incur if I overstayed in the States the period of time allowed to me by the officer.

"I had visited the States before but I never had such experience. I thought of cancelling my proposed visit to the States; but I had already reserved my accommodation in the train and said good-bye to my friends. I arrived at Los Angeles and I felt something in the air—a cultivated air of

suspicion and general incivility towards Asiatics. I was assured that the Immigration Regulations were made in the application particularly humiliating to all Asiatics. I felt that I should not stay in a country on sufference. *It was not a question of personal grievance or of ill-treatment from some particular officer. I felt the insult was directed towards all Asiatics, and I made up made up my mind to leave a country where there was no welcome for ourselves.*

..."I have great regard for your people. But I have also my responsibility towards those whom you classify as coloured people of whom I am one. *I am a representative of Asiatic peoples and I could not remain in a country where Asiaticis were not wanted.*"

তিনি আরও বলিলেন,

..."I am very glad that the other did not treat me differently because I might have some reputation but treated me as an Oreintal and as a coloured man. The ordinary civility between gentleman and gentleman was lacking in his treatment, but this was entirely due to the fact that he had been dealing with Asiatics and the Immigration Regulations had given his attitude of mind."

[*The Japan Adviser* : Tokio,-11 May, 1929.
দ্র· *Visave Bharati Bulletin*-No. 14-Nov. 1929-pp. 40-42.]

ইহা হইতেই বুঝা যায়, মার্কিন দেশে এসিয়াবাসীদের লাঞ্ছনা-নিগ্রহের জ্বালা কী তীব্রভাবে কবি মর্মে মর্মে অনুভব করিতেন। মার্কিন দেশে ভ্রমণের কর্মসূচী বাতিল করিয়া দিয়া কবি সমগ্র এসিয়াবাসীর পক্ষ হইতে আমেরিকানদের বর্ণবিদ্বেষের তীব্র প্রতিবাদ জানাইলেন। এমনিভাবে কবি বারে বারে মার্কিন শাসকগোষ্ঠীর হাতে লাঞ্ছিত হইতে লাগিলেন। স্মরণ রাখা দরকার, প্রায় দুই বৎসর পূর্বে কবি তাঁহার পূর্বাপর মার্কিনদেশ ভ্রমণের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করিয়া *'The Atlantic Monthly'* পত্রিকায় দীর্ঘ এক বিবৃতি দেন।

[দ্র· *Visva Bharati Quarterly* : April-1927. pp. 85-92]

আমেরিকা হইতে একদল মার্কিন-সাংবাদিক কবির সহিত জাপান পর্যন্ত অনুগমন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের রাজনীতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কবির অভিমত জিজ্ঞাসা করিলে কবি তাঁহাদের সমক্ষে এক দীর্ঘ বিবৃতি দেন। ঐ সাংবাদিকদের মধ্যে *New York Times*-এর বিখ্যাত সাংবাদিক H. L. Mathewsও ছিলেন। তিনি উহা ঐ পত্রিকায় প্রকাশ করেন (*New York Times*-June 2, 1929.)।

ঐ বিবৃতিতে অবশ্য কবি কংগ্রেসের স্বাধীনতা প্রস্তাবের উপর খুব বেশী গুরুত্ব দেন নাই। তিনি বলিলেন,—স্বাধীনতা অবশ্যই আমরা চাই কিন্তু তাহা কংগ্রেসের ভোটের জোরে আসিবে না। আসল সমস্যা, জনগণের সহিত কংগ্রেসের এই রাজনীতিক চিন্তার কোন যোগ নাই। ভারতের বিরাট গ্রামবাসী জনতাই আসল সমস্যা। দারিদ্র্য, অভাব-অনটন, দুর্ভিক্ষ, রোগমহামারী, অশিক্ষা ও কুসংস্কার ইত্যাদির মধ্যে অবর্ণনীয় অবস্থায় তাহারা বাস করিতেছে। এই বিশাল জনতা 'যে তিমিরে—সেই তিমিরেই' আছে। খুবই অল্প সংখ্যক লোক আজ শিক্ষার সুযোগ পাইয়াছে।

"The fundamental cause of India's poverty is the dislocation of ancient resources, which were contained in the villages. The people have lost their centre of balance. There is unbelievable misery in the villages ......

"*The British had done practically nothing for the education of the masses.*" Dr. Tagore said. He ascribed this largely to the fact that the enormous financial burden of keeping up the administration left a 'pitifully small' sum for such things as education, sanitation and medical relief. Protests on the injustice of such a state of affairs, according to Dr. Tagore have been useless."

গান্ধীজী প্রবর্তিত আন্দোলন জনসাধারণের মধ্যে প্রসারলাভ করিতেছে কিনা এই প্রশ্নের জবাবে কবি বলিলেন,

......"the people as a whole are most indifferent....The appeal which Gandhi's movement has for the masses is not cultural in character. It is more personal. Their trust in him is creating mental attitude not based upon reason. His movement is *directed more toward the educated classes,* intensifying their patriotic fervour."

অবশ্য গান্ধীজীর আদর্শ ও ব্যক্তিত্ব এবং তাঁহার নিষ্ঠা সততা সম্পর্কে কবিও গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন। খুব সম্ভবত মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা প্রসঙ্গে সংবাদিকরা কবিকে প্রশ্ন করেন, ভারতবর্ষে রাশিয়ার বলশেভিকরা কোন ষড়যন্ত্র করিতেছে কিনা। জবাবে কবি বলিলেন, বলশেভিকরা হয়ত ভারতবর্ষের জনসাধারণের মধ্যে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করিতেছে তবে বাংলাদেশে তাহারা অনুরূপ প্রচেষ্টা করিতেছে কিনা তাহা তাঁহার ব্যক্তিগতভাবে জানা নাই। তবে যখনই তাহাদের অপছন্দমত কোনো জিনিস হয়, তখনই তাহাকে 'বলশেভিক-জুজুর' ভয় দেখান বা অপবাদ দেওয়া হয়, যেমন বিগত মহাযুদ্ধের সময় ছিল সব কিছুতেই 'জার্মান-জুজুর' অপবাদ দেওয়া। তিনি বলিলেন,

"I find that in every country now, *whenever you dislike a*

thing, it is the fashion to label it Bolshevism, just as during the war and shortly after it everything that you disliked you called pro-German. *So Bolshevism is the latest cry.*',...

পরিশেষে, যখন মিস মেয়োর '*Mother India*' পুস্তকের প্রসঙ্গ আসিল তখন কবির ক্ষোভ, ঘৃণা ও উষ্মা যেন ফাটিয়া পড়িতে চাহিল। তিনি বলিলেন, লেখিকা এই বই লিখিয়াছেন বলিয়া তিনি বিস্মিত নহেন, কেননা তাঁহার আর্থিক ও ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। কিন্তু—

......"But I am surprised that so many thousands in your country read it. I cannot belive that the multitude of readers were genuinely interested in India. They voraciously swallowed all the statements, believed them, and enjoyed them. I*ndia never occupied your attention even when she fully warranted it, but directly a tale of vice and cruelty and sexual perversion was dished up before you, you lapped it up with tremendous gusto.* I am sorry for your readers, for the author has catered to something which is wrong in their psychological make-up.

"The book is a conglomeration of detached and fragmentary facts, sprinkled with innumerable mis-statements which were never corrected in later editions. Do you think that I could not collect enough facts as damaging or even more so, about America ? Do not yourself, realize that the raking of the gutters, of your country would supply ample data for such a book ? But I could not generalize from these facts, even though they would de documentary. Miss Mayo did.

"You Americans seem blind to the fact, for instance, that you have *your own caste system, quite as rigorous as ours, in your treatment of the negro*, but you ignore that and point the finger of shame at us without understanding the profound ethnological and historic reasons which have brought about the caste system in India."

উপসংহারে কবি বলিলেন,

"Let me say in conclusion, that I am deeply conscious of some positive element in the mind of the Indian people which has survived the repeated shocks of centuries of vicissitudes and niggardliness of fortune, and I am sure that our people will yet triumph, ultimately bringing some gift to the world

which will justify its existence."

H. L. Mathews, (Special correspondent.)

[*New York Times* : 2 June, 1929]

এইবার জাপানে কবি প্রায় এক মাস কাটান। বেশীর ভাগ সময় তাঁহার টোকিয়োতে কাটে। এখানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভ্যর্থনা ও নিমন্ত্রণ জানান হয়। টোকিওতে আসিবার পরদিনই এক সভায় '*Philosophy of Leisure*' বক্তৃতাটি পাঠ করেন। এই সময় চীন সরকার কবিকে এক আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু কবির শারীরিক অসুস্থতার দরুণ এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কয়েকদিন পর টোকিওর *Indo-Japanese Society*-র উদ্যোগে এক জনসভায় কবি '*On oriental culture and Japanese mission*' সম্পর্কে এক বক্তৃতা পাঠ করেন। তাঁহার বহু আশা ছিল, জাপান এশিয়ার সভ্যতা-সংস্কৃতির সত্যকারের প্রতিনিধিত্ব করিবে। কিন্তু চীন, কোরিয়া প্রভৃতি প্রতিবেশী দেশগুলির সহিত জাপানের সাম্রাজ্যবাদীসুলভ মনোভাব ও আচরণে তিনি গভীরভাবে দুঃখিত ;—তাহাই কবির ভাষণে ব্যক্ত হইয়া উঠে।

ইহার পর কবি আরও কয়েকটি সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করেন ; তন্মধ্যে শিক্ষা সম্পর্কীয় একটি ভাষণ খুবই উল্লেখযোগ্য। ৩রা জুন জাপানের শিক্ষা-বিদ্‌দের এক সম্মেলনে কবি 'শিক্ষার আদর্শ' (*Ideals of Education*) নামক একটি বক্তৃতা পাঠ করেন। জাতীয়তাবাদের ভূত কিভাবে বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ, বিদ্বেষ ও ঈর্ষার ভাব জাগাইয়া তুলিতেছে, কবি তাহার ভয়াবহ চিত্রটি তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন,

"Nations are kept apart not merely by international jealousy but also by their own past, handicapped by the burden of the dead and decaying, the breeding ground of diseases that attack the spiritual man. I could not believe that generations of peoples, century after century, must have their birth chamber in a moral and intellectual coffin which has its restricted space-regulation for a body that has lost its movements......

"The reign of the ghost has strewn the path of our history lessons with mischief, with prejudices that ever obstruct the mutual understanding of nations, that helps in the cultivation of the thorny crop of national vanity and unscrupulousness in international relationship. From our young days our minds are *deliberately trained with the aid of untrue words and unholy symbolism in the name of patriotism* to a collective moral attitude, which we condemn in individuals."

কিন্তু এই সমস্যার সমাধান কোথায় ? সমাজতন্ত্রবাদী ও মার্কসবাদীরা যেখানে সমাজতন্ত্রবাদ ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতির মধ্যে ইহার সমাধান নির্দেশ করিয়াছে কবি তেমন কিছু রাজনীতিক ব্যবস্থার বা তত্ত্বাদর্শের নির্দেশ দিতে পারিলেন না। কবির সমাধানের পথ বা মাধ্যম রাজনীতিতে নয়। তিনি মানুষের নৈতিক আদর্শের পুনরভ্যুত্থানেরই স্বপ্ন দেখিতেছিলেন আর অবাধ সুশিক্ষাই হইবে তাহার প্রধান বাহন। তিনি তাই বলিলেন,

…"I refuse to believe that human society has reached its limit of moral possibility. And we must work all our strength for the seemingly impossible, and must believe that there is a constant urging in the depth of human soul for the attainment of the perfect, the urging which secretly helps us in all our endeavour for the good. This faith has been my only asset in the eductional mission which I have made my life's work, and almost unaided and alone, I struggle along my path. I try to assert in my words and works that education has its only meaning and object in freedom—freedom from ignorance about the laws of universe, and freedom from passion and prejudice in our communication with the human world."……

উপসংহারে কবি বিদ্যাসমবায় ও শিক্ষা-সহযোগিতার আদর্শের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলিলেন,

…"Education in all its different forms and channels has its ultimate purpose in the evolving of a luminous sphere of human mind from the nebula that has been rushing round ages to find in itself an eternal centre of unity…And for this cause I ask your co-operation, not merely because co-operation gives us strength in our work but because co-operation itself is the best aspect of the truth we represent, it is an end and not merely the means."

[*Visva-Bharati Bulletin* : Nov. 1929. pp. 69-72]

১৪ই মে, চীনের জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ হইতে টোকিওর চীনা ডেলিগেশনের এক প্রতিনিধিদল কবির সহিত ইম্পীরিয়াল হোটেলে সাক্ষাৎ করেন। ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেনের মৃতদেহ নানকিং-এ স্থানান্তর উপলক্ষে যে উৎসবের আয়োজন হয় তাহাতে রবীন্দ্রনাথকে যোগদানের অনুরোধ লইয়া এই প্রতিনিধি দল সাক্ষাৎ করেন। প্রায় দুইঘণ্টাকাল তাঁহাদের মধ্যে চীন ও ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ সমস্যা লইয়া আলোচনা চলে। *'Ideals of Education'* বক্তৃতায় তিনি যেমন শিক্ষা-প্রসারের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন, চীনা ডেলিগে-

শেনের সহিত আলোচনায় তেমনি তিনি গ্রামবাসী জনতার সমস্যার আলোচনা করিয়া গ্রাম-উন্নয়নের কর্মসূচী গ্রহণের উপর গুরুত্ব দেন। আর এই গ্রাম-উন্নয়নের অন্যতম প্রধান কথাই ছিল গ্রামবাসী জনতার মধ্যে শিক্ষার বিস্তার। আর যতক্ষণ পর্যন্ত না ইহাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হয় ততদিন স্বাধীনতা বা স্বরাজ্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যই বহুদূরে থাকিবে, সেদিনের আলোচনায় ইহাই ছিল কবির মূল বক্তব্য।

'বর্তমান পরিস্থিতিতে চীনের কর্তব্য কী', চীনা প্রতিনিধি দল কবির নিকট এই মর্মে উপদেশ চাহিলে, তিনি বলিলেন,

"You in China have certain advantages which we in India lack. You are not under foreign subjection.···But you are suffering from a conflict of ambitions harassing the whole country, and it seems to be following an interminably vicious circle. With all their strength of determination and power of self-sacrifice, let your people effectively decide to have a long period of settled government even if it not the best government possible. Let it only give you sufficient time completely to irrigate the mind of your people, to develop its potential wealth and thus enable your nation to realize the majesty of its humanity." [*Ibid*. P. 50]

৭ই জুন রবীন্দ্রনাথ জাপান পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশ অভিমুখে রওনা হন। পথিমধ্যে ইন্দোচীনের সাইগনে নামিয়া দুই তিনদিন কাটান। ২৪শে জুন পুনরায় যাত্রা শুরু হয়। ৩রা জুলাই তাঁহারা মাদ্রাজে পৌঁছিলেন। সেখান হইতে ট্রেনে কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইলেন। ৫ই জুলাই কবি কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছাইলেন।

কানাডা ও জাপান হইতে প্রত্যাবর্তনের পর রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে চলিয়া আসিলেন।

দেশে তখন দারুণ রাজনৈতিক উত্তেজনা। বাংলা, উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে সন্ত্রাসবাদীদের ক্রিয়াকলাপে গবর্ণমেণ্ট সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। ফলে সরকারী দমন-নীতি প্রবল আকার ধারণ করে। আইনসভায় বোমা নিক্ষেপের পর স্যাণ্ডার্স-হত্যা উপলক্ষে পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশে বহু যুবককে গ্রেপ্তার করিয়া গবর্ণমেণ্ট 'লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা' দায়ের করে। অপরদিকে বাংলার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে দমন করিবার জন্য 'বেঙ্গল অর্ডিনেন্স' জারি করিয়া পুলিস বাংলার বহু যুবককে বিনা বিচারে আটক করিয়া রাখে। এই সময় সুভাষচন্দ্রও কলিকাতায় গ্রেপ্তার হইলেন। কবির সুহৃদ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও J. T. Sunderland-এর '*India in Bondage*' নামক পুস্তক প্রকাশের জন্য গ্রেপ্তার হন। কয়েদীদের প্রতি অমানুষিক দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে দেশের বিভিন্ন জেলখানায় রাজনৈতিক বন্দীরা অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত ও যতীন দাস প্রমুখ বিপ্লবপন্থীরা আমরণ অনশন শুরু করিলেন। গান্ধীজী তখন আসন্ন সংগ্রামের প্রস্তুতিতে অন্ধ্র এলাকায় চরকা ও অস্পৃশ্যতা বর্জনের প্রচারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতনের সাংগঠনিক কাজেই ব্যস্ত। তাছাড়া এই সময় 'রাজা ও রাণী' নাটিকাটি ভাঙিয়া অভিনয়োপযোগী করিয়া 'তপতী' নামে উহা পুনর্লিখনে ব্যস্ত ছিলেন। দেশের এই রাজনৈতিক উত্তেজনার সুরে তাঁহার মন সায় দেয় না। কেন সে কথা পূর্বেই বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু তবুও লোকে ছাড়ে না। দেশের এই পরিস্থিতিতে কবি কি বলেন,—কী তাঁহার অভিমত, ইহাই লোকের প্রশ্ন। তাছাড়া সাংবাদিকরাও ভীড় করেন। এইসব প্রশ্নের ও জিজ্ঞাসার শেষ নাই, ইহা ভাবিয়া কবি লিখিত আকারে *Ceylon Observer*-এর বিশেষ প্রতিনিধির নিকট একটি বিবৃতি দেন। উহা ১১ই আগষ্ট ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য এই বিবৃতিতে কবি নূতন কোন কথা বলেন নাই। প্রায় একমাস পূর্বে জাপানে মার্কিন সাংবাদিকদের সম্মুখে তিনি যে বিবৃতি দেন উহাই পুনর্লিখিত আকারে *Ceylon Observer*-এর প্রতিনিধিকে প্রকাশের জন্য দিলেন।

ঐ-বিবৃতিতে কবি ভারতের গ্রামদেশের বিশাল জনসাধারণের দুঃখ-কষ্ট ও অজ্ঞানতা দূর করিবার উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন, এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার মতে এই সমস্যাগুলিকে উপেক্ষা বা চাপা দিয়া রাখিয়া স্বাধীনতা বা স্বরাজের জন্য চীৎকার করাটা প্রাজ্ঞতার পরিচায়ক নহে। অবশ্য তাই বলিয়া তিনি দেশের স্বাধীনতার দাবিকে উপেক্ষা করিলেন না। তিনি বলিলেন,

"*It is a truism to say that we want independence. We should all want it.* But the real problem is how to have it. I do not quite understand what the Indian National Congress meant by the resolution it passed this year demanding independence within the year. *Unfortunately independence cannot be had by a unanimous vote of the Congress.*

'I sometimes think that when they were about it they were too modest. They might have demanded the subjection of England. You cannot have independence immediately unless things change."

অর্থাৎ তিনি শিক্ষা-বিস্তার ও গ্রাম পুনর্গঠনের কর্মসূচীর উপরই অধিক গুরুত্ব দিলেন।

শ্রীনিকেতনে তখন 'বৃক্ষরোপণ' ও 'হলকর্ষণ উৎসব' অনুষ্ঠিত হইতেছে (২৫ ও ২৬ শ্রাবণ-১৩৩৬)। এবারও হলকর্ষণ-উৎসবের দিন কবি স্বয়ং হল চালনা করেন। ঐ-দিনই কবি শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে এক পত্রে এই উৎসবের তাৎপর্য সম্পর্কে লিখিতেছেন, (২৫শে শ্রাবণ ১৩৩৬ ১০ই আগষ্ট ১৯২৯).

"আজ সুরুলে হলচালন উৎসব হবে। লাঙ্গল ধরতে হবে আমাকে। বৈদিক মন্ত্র-যোগে কাজটা করতে হবে ব'লে এর অসম্মানের অনেকটা হ্রাস হবে। বহু হাজার বৎসর পূর্বে এমন একদিন ছিল যখন হাল-লাঙল কাঁধে করে মানুষ মাটিকে জয় করতে বেরিয়েছিল, তখন হলধরকে দেবতা বলে দেখেছে, তার নাম দিয়েছে বলরাম। এর থেকে বুঝবে নিজের যন্ত্রধারী স্বরূপকে মানুষ কতখানি সম্মান করেছে। বিষ্ণুকে বলেছে চক্রধারী, কেননা এই চক্র হচ্ছে বস্তুজগতে মানুষের বিজয়রথের বাহন। মাটি থেকে মানুষ ফসল আদায় করেছে এটা তার বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা হচ্ছে হাললাঙলের উদ্ভাবন।··· মানুষের গৌরব হচ্ছে সে আপন দেহের উপর চূড়ান্ত নির্ভর করে না, তার নির্ভর যন্ত্র-উদ্ভাবনী বুদ্ধির উপর। ···আজ আমরা একটা মিথ্যা কথা বলে থাকি—dignity of labour, অর্থাৎ শারীর শ্রমের সম্মান। অন্তরে অন্তরে মানুষ এটাকে আত্মাবমাননা বলেই জানে।"

কবি ঐ-পত্রে আরও ব্যাখ্যা করিয়া লিখিলেন,

···"আজ আমাদের উৎসবে আমরা হাল-লাঙলের অভিবাদন যদি করে থাকি তবে সেটা আপন উদ্ভাবন-কৌশলের আদিম প্রকাশ ব'লে। সেইখানে খতম করতে বলা মনুষ্যত্বকে অপমানিত করা। চরকাকে যদি চরম আশ্রয় বলি তা হলে চরকাই তার প্রতিবাদ করবে—আপন দেহশক্তির সহজ সীমাকে মানুষ মানে না এই কথাটা নিয়ে চরকা পৃথিবীতে এসেছে—সেই চরকার দোহাই দিয়েই কি মানুষের বুদ্ধিকে বেড়ার মধ্যে আটকাতে হবে। আজ দেখলুম একটা বাংলা কাগজ এই বলে আক্ষেপ করেছে যে, বেহারের ইংরেজ মহাজন কলের

লাঙলের সাহায্যে চাষ শুরু করেছে, তাতে করে আমাদের চাষীদের সর্বনাশ হবে। লেখকের মত এই যে, আমাদের চাষীদের আধপেটা খাওয়াবার জন্যে মানুষের বুদ্ধিশক্তিকে অনন্তকাল নিষ্ক্রিয় করে দিতে হবে। লেখক এ কথা ভুলে গেছেন যে, চাষীরা বস্তুত মরছে নিজের জড়বুদ্ধি ও নিরুদ্যমের আক্রমণে। শান্তিনিকেতনে শিক্ষাব্যাপারে আমি আর-আর অনেক প্রকারের আয়োজন করেছি—কিন্তু যে শিক্ষার সাহায্যে মানুষ একান্ত দৈহিক শ্রমপরতার অসম্মান থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে তার আয়োজন করতে পারলুম না এই দুঃখ অনেক দিন থেকে আমাকে বাজছে। দেহের সীমা থেকে যে বিজ্ঞান আমাদের মুক্তি দিচ্ছে আজ য়ুরোপীয় সভ্যতা তাকে বহন করে এনেছে—একে নাম দেওয়া যাক বলরামদেবের সভ্যতা।"...

[পল্লীপ্রকৃতি ॥ পৃ ২৭৮-৭৯]

স্পষ্টতই, কবি এখানে ইউরোপের যন্ত্রবিজ্ঞানকে দেশের কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার কথাই বলিলেন। একান্তভাবে দৈহিক শ্রমপরতাকে তিনি মানুষের অসম্মান ও দাসত্বপনা বলিয়া অভিহিত করিলেন। এই জন্য লাঙলকে তিনি নিছক লাঙল হিসাবেই গ্রহণ করেন নাই,—আধুনাকালের ট্রাক্টর ও 'Harvester's Combine' এর আদিম অগ্রদূত হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর লাঙলেই তিনি থামিতে চাহেন নাই.—উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে তিনি পাশ্চাত্যের যন্ত্র-শক্তিকেই অন্তত শ্রীনিকেতনের ক্ষেত্রে প্রয়োগের চেষ্টা করিবেন, তাহারই আভাস দিলেন। স্মরণ রাখা দরকার প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্বে কবির নির্দেশে রথীন্দ্রনাথ পতিসরে ট্রাক্টর লইয়া চাষ করিবার পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করেন। অবশ্য 'হলকর্ষণে'র প্রধানতম উদ্দেশ্যই ছিল উপেক্ষিত ও অবহেলিত কৃষি-সমস্যার প্রতি দেশের লোকের দৃষ্টি ফিরাইয়া আনা।—বৈদিক মন্ত্রপাঠ এবং অন্যান্য আনুষ্ঠানিক দিকগুলি গৌণ ব্যাপার। বস্তুত, বৈদিক মন্ত্রপাঠ, শাস্ত্রীয় অনুশাসন ও স্বস্তিবচন পাঠ এবং এ সবের সঙ্গে সঙ্গীত নৃত্য ও নাট্যাভিনয় ইত্যাদির সাহায্যে কবি 'হলকর্ষণ' ও 'বৃক্ষরোপণ উৎসব' প্রভৃতি জন ও সমাজকল্যাণমূলক কার্যগুলিকে তিনি মনোরম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রূপদানের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

'হলকর্ষণ-উৎসবের' পর কবি কলিকাতায় আসিলেন। এই সময় প্রেসিডেন্সি কলেজের 'রবীন্দ্র-পরিচয়-সভা'র উদ্যোগে একটি সাহিত্য-সভা হয়। এই সভায় তিনি 'সাহিত্যের-স্বরূপ' ও 'সাহিত্য-বিচার' নামে দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

কলিকাতায় 'তপতী' নাটকটি অভিনয়ের ব্যবস্থার জন্য তিনি তাড়াতাড়ি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন। শান্তিনিকেতনে কবি যখন 'তপতী'র অভিনয়ের মহড়া লইয়া খুবই ব্যস্ত তখন, অকস্মাৎ একদিন খবর আসিল, লাহোর জেলে দীর্ঘ ৬৪-দিন অনশনরত অবস্থায় যতীন দাসের মৃত্যু হইয়াছে (১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৯)। এই সংবাদে কবি কি পরিমাণ বিচলিত হইলেন তাহা অনুমান করা শক্ত নহে। অভিনয়ের মহড়া বন্ধ করিয়া কবি উঠিয়া গেলেন। ঐ দিনই 'সর্ব খর্বতারে দহে' গানটি তিনি রচনা করেন।

"সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ—
হে ভৈরব, শক্তি দাও, ভক্তপানে চাহো ॥
দূর করো মহারুদ্র যাহা মুগ্ধ, যাহা ক্ষুব্ধ
মৃত্যুরে করিবে তুচ্ছ প্রাণের উৎসাহ ॥
দুঃখের মন্থনবেগে উঠিবে অমৃত
শঙ্কা হতে রক্ষা পাবে যারা মৃত্যুভীত ।
তব দীপ্ত রৌদ্র তেজে নির্ঝরিয়া গলিবে যে
প্রস্তর শৃঙ্খলোন্মুক্ত ত্যাগের প্রবাহ ॥"

এ গানে যতীন দাসের মত দেশের মৃত্যুঞ্জয়ী বীর সন্তানদের উদ্দেশেই কবি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও আশীর্বাদ জানাইয়াছেন ।

যতীন দাসের মৃত্যুর সংবাদে সারা দেশ ভয়ংকর বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। কলিকাতায় ঐদিন পাঁচ লক্ষাধিক জনতার মিছিল বিক্ষোভ প্রকাশ করে। চতুর্দিকে আসন্ন সংঘর্ষ ও সংগ্রামের প্রস্তুতি। এই পরিস্থিতিতে অধিকাংশ কংগ্রেস কর্মী গান্ধীজীকেই নেতৃত্বের-হাল ধরিবার অনুরোধ জানাইলেন। গান্ধীজী দৃঢ়তার সহিত উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। তিনি জওহরলালকেই সভাপতিত্ব বরণ করিয়া লইবার আহ্বান জানাইলেন। সেপ্টেম্বর মাসে ঐ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য A. I. C. C'র এক অধিবেশন হয়। কিন্তু গান্ধীজী রাজী হইলেন না এবং শেষ পর্যন্ত জওহরলালকেই লাহোর কংগ্রেসের জন্য সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। কিন্তু তবুও গান্ধীজী আসলে তখনও কংগ্রেসের অবিসংবাদিত নেতা। অনেকে অধীর হইয়া গান্ধীজীর সমালোচনা করিয়া বলিলেন, 'সংগ্রাম ও সংঘর্ষ আসন্ন জানিয়াও আপনি কেন এখনও 'খাদি খাদি খাদি' করিয়া চিৎকার করিতেছেন। জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র নবীন নেতৃবর্গকে কেন আপনি এক লক্ষ যুবকের এক ভলেণ্টিয়ার বাহিনী গড়িয়া তুলিবার নির্দেশ দিতেছেন না, যাহারা দেশের জন্য প্রাণ দিবে।' গান্ধীজী তাহার জবাবে বলিলেন,

"That even if khadi gets on one's nerves, I have no other remedy to suggest in its place. I cannot conceive of swaraj without khadi.

'Nor is it true to say that the country is utterly fed up with khadi and that khadi has begun to get on the people's nerves It may be so in the case of handful of town dwellers of India, but they do not constitute India. The foundation of India's nationality is to be laid not in her towns, but in her villages, and the only movement that is at present actively going on among India's villages is that of khadi And it is daily expanding.······"

তিনি বলিলেন, "It is a gratuitous insult to Jawaharlal

Nehru or Subhas Bose to say that they are awaiting my permission or mandate to organize the youth of the country and are being kept back for want of it. They are already doing the work of organization to the best of their power and ability.…

[*Mahatma-Vol.* II P. 374]

কলিকাতায় 'তপতী'র অভিনয়ের পর কবি পুনরায় শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন। অল্পকাল পরেই পূজাবকাশের জন্য শান্তিনিকেতনের প্রায় সকলেই চলিয়া গেলেন। কবি শান্তিনিকেতনেই রহিয়া গেলেন। কবির মনে নানা চিন্তা-সমস্যার মাঝে দেশের সমস্যাও বড়ো স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। কোজাগরী পূর্ণিমার দিন এক পত্রে শ্রীমতী মহলানবিশকে কবি লিখিতেছেন (২রা কার্তিক-১৩৩৬ ॥ ১৯শে অক্টোবর-১৯২৯) :

…"শীতের দেশে মানুষের উদ্যমের সচ্ছলতা প্রচুর—সেখানে তারা চারি দিকের প্রকৃতির সঙ্গে কেবলই লড়াই করে চলেছে। প্রকৃতির ভাণ্ডারে যা-কিছু সম্পদ লুকোনো তা তাদের করে নিতে তারা অহোরাত্র প্রবৃত্ত। নিজের দেশকে সমাজকে তারা কিরকম ঐশ্বর্যবান করে তুলেছে সে তোমরা চোখে দেখে এসেছ—এখনও জলে স্থলে আকাশে অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলবার চেষ্টায় তাদের বিরাম নেই।…

তিনি লিখিলেন,

…"আজ আমরা দেশ উদ্ধার-কল্পে যখন কাজের কথাও ভাবি তখনও চরখার ঊর্ধ্বে মনের সাহস পৌঁছয় না। চারখায় কিছু ভাববার দরকার হয় না, বহুকাল আগে যা উদ্ভাবিত হয়ে গেছে তাকে বিচারহীন অধ্যবসায়হীন মন নিয়ে নিরন্তর চালিয়ে গেলেই হল। কোনো নিরলস বীর্যবান্ দেশে এমন প্রস্তাব উত্থাপন করাই অসম্ভব হ'ত—কিন্তু এ দেশে এর চেয়ে কঠিন প্রস্তাব উত্থাপন করলেই সেটা একেবারেই বর্জিত হ'ত। মনে করো মহাত্মা যদি বলতেন প্রত্যেক চাষীকেই এক বিঘা জমিতে অন্তত দুই সের ফসল বেশি ফলাতে হবে এই তার সাধনা হওয়া চাই, এই তার পুণ্যকর্ম—যে পরিমাণে এটা সফল হবে সেই পরিমাণেই স্বদেশেরই যথার্থ পরিত্রাণ—তা হলেই তর্ক উঠত এতে যে বুদ্ধি চাই, জ্ঞান চাই, উদ্যম চাই, প্রকৃষ্ট পন্থার প্রতি শ্রদ্ধা চাই। হাঁ, তা চাই, তা চাই ব'লেই তার দ্বারাই দেশে মুক্তি সম্ভবপর হতে পারে, মূঢ়চিত্তের ক্ষীণ উদ্যমের দ্বারা দেশ জাগতেই পারে না। দেশের বারো আনা লোক চাষী, তারা আরও ভালো করে চাষ করবে এ কথা না বলে তারা জড়যন্ত্রের মতো চরখা চালাবে এ উপদেশ মানুষের অবমাননা। অবশ্য, এই চাষের উন্নতির কথা বলার মানেই এই উদ্দেশে দেশব্যাপী ব্যবস্থা করা। চরখার জন্যে খদ্দরের জন্যে যে ব্যবস্থার চেষ্টা চলেছে এ তার চেয়ে বড়ো জাতের চেষ্টা। এর জন্যে চাষীদের মধ্যে ফসল-উৎপাদনের সমবায়প্রণালী প্রবর্তন করতে হবে, প্রদেশে প্রদেশে উৎকৃষ্ট বীজের ভাণ্ডার স্থাপন করতে হবে, জমির

প্রকৃতি-পরীক্ষার ও উপযুক্ত সার জোগাবার প্রতিষ্ঠান গড়তে হবে। দেশে একদিন চরখা গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে চলত (বিদেশেও চলত), স্বাভাবিক কারণেই তা বন্ধ হয়ে গেছে—আজ বাহ্য উত্তেজনা-দ্বারা সেই চরখা কিছু পরিমাণে চলতেও পারে, কিন্তু আবার তা বন্ধ হয়ে যাবে। তার কারণ, এ জিনিসটা এখনকার কালের সঙ্গে একেবারেই সংগত নয়। অথচ সমবায়প্রণালীতে কৃষির উন্নতি-চেষ্টা যদি সমস্ত ভারতবর্ষে প্রবর্তিত করা হয় তবে যতটুকু পরিমাণেই সেই চেষ্টা সফল হবে ততটুকু পরিমাণেই সেই সফলতা স্থায়ী হবে এবং ক্রমশই ব্যাপ্ত হতে থাকবে, কেননা এইটেই বর্তমান কালের সঙ্গে সংগত। খদ্দরের প্রচার দেশ-উদ্ধারের মুখ্যতম উপায় এই উপদেশবাক্য যে এতটা ব্যাপ্ত হতে পেরেছে তার প্রধান কারণ—ল্যাংকাশায়ারের উপর চাপ দিয়ে বণিক্‌জাতিকে দুরস্ত করে আনবার ইচ্ছেটাই মনের মধ্যে প্রবল আছে। অর্থাৎ দেশ-উদ্ধারের পথ এখনও আমরা বাইরের দিকেই খুঁজছি। এটা অন্তর্গূঢ় পরমুখাপেক্ষিতারই লক্ষণ। স্বদেশীর দিনে যখন বয়কট-ব্যাপারে দেশ মেতে উঠেছিল তখনও লক্ষ্যটা ছিল সেই বাইরের দিকে। অসহযোগিতার প্ল্যান যখন করি তখন জবরদস্তির পন্থায় সহযোগিতা লাভ করবার আশাতেই তা করি। সে চেষ্টাও বহির্মুখী।"

[দেশ-বৈশাখ, ১৩৬৮ ॥ পল্লীপ্রকৃতি-পৃ ১৭৯ ৮১]

পরাধীন ভারতবর্ষে কবির ঐ-সব পরিকল্পনা ব্যাপকভাবে বাস্তবায়িত হওয়ার কোনই সুযোগ ও অবকাশ ছিল না এ কথা বার বার উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যদি নিছক পরিকল্পনাগত দিক হইতেও কবির ঐ সব পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টাগুলির বিচার করা যায়, হইলে উহার গভীর তাৎপর্য আজ আমাদের বুঝিতে এতটুকুও কষ্ট হয় না। স্মরণ রাখা দরকার, দেশগঠনের জন্য কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করিবার কথা তখনও পর্যন্ত কংগ্রেস নেতাদের চিন্তায় আসে নাই। ১৯৩৮ সালের শেষভাগে কংগ্রেসের নির্দেশক্রমে একটি জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি গঠিত হয়। অধুনাকালে ভারত সরকারের 'পরিকল্পনা-কমিশন' রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত ও প্রচেষ্টিত প্রায় সমস্ত গ্রামীণ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন এবং শুধু গ্রহণই করেন নাই, ঐগুলির উপর তাঁহারা আজ অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন। অবশ্য 'জাতির জনক' বা *Father of the Nation* বলিয়া রবীন্দ্রনাথকে কোনদিনই অভিহিত করা হয় নাই।

কিন্তু চরকা বা খাদি সম্পর্কে গান্ধীজীর নিজস্ব আর্থনীতিক তত্ত্ব ও চিন্তা যাহাই হউক না কেন, দেশের অধিকাংশ সাধারণ মানুষ ইহাকে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অমোঘ অস্ত্র-জ্ঞানে বরণ করিয়া লইয়াছে। বস্তুত পক্ষে গান্ধীজী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আসন্ন সংঘর্ষের প্রস্তুতি হিসাবে চরকাকেই একমাত্র অস্ত্র বা হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করিবার জন্য বার বার আকুল আবেদন জানাইতেছিলেন। গান্ধীজীর চরকা সংগ্রামেরই প্রতীক এবং অস্ত্র, আর সেই সংগ্রাম হইতেছে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় মুক্তির ও স্বাধীনতার সংগ্রাম। এইখানেই গান্ধীজীর চরকার অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক ভূমিকা। গান্ধীজী সংগ্রামকে এবং

গণসংগ্রামকেই বরণ করিয়া লইলেন, পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথ সংগ্রামকে এড়াইয়া শিক্ষা ও গঠনমূলক পরিকল্পনায় আত্মনিয়োগ করিলেন।—এ সব আত্মপ্রস্তুতির কাজ ফেলিয়া রাখিয়া সংগ্রামে সাফল্য বা জয়লাভ করা যায় না, এই ছিল কবির অভিমত।

আসন্ন-সংগ্রামের সাংগঠনিক প্রস্তুতির জন্য গান্ধীজী তখন ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। আগ্রার এক জনসভায় তিনি এই সাংগঠনিক কর্মসূচীর উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলিলেন, (১১ই সেপ্টেম্বর ১৯২৯)

"I am here to re-declare my faith in the potency of non-co-operation. You have all got to prepare for January 1930 from now. The A. I. C. C. has already laid down certain conditions by fulfilling which alone, in its opinion, swaraj by non-violent means can be attained. It is the triple constructive programme—the boycott of foreign cloth through khadi, the suppression of the drink and drug evil and the elimination of untouchability by the Hindus. And since all this work can be effectively done through a proper Congress organization, the reorganization of the Congress by the enrolment of Congress members is a necessity. Let me warn you solemnly that if we do nothing, swaraj or independence is not going to drop down from heaven by a more declaration by the Congress in December. I will go further and say, that unless in the meantime we shall have forged an effective sanction to back our declaration which we want to make, if the Government should refuse to accept by the midnight of December 31, 1929 the national demand, our declaration will remain a dead letter and we shall be unable to do anything effective during 1930." [*Mahatma.-Vol.* II-pp. 375-76]

লক্ষ্য করিবার বিষয়, চরকা, অস্পৃশ্যতা ও মাদকদ্রব্য-বর্জন,—গান্ধীজীর সাংগঠনিক এই মূল তিন-নীতি,দেশর স্বাধীনতা-সংগ্রামের শর্তে ও পরিপ্রেক্ষিতেই রচিত। অর্থাৎ স্বাধীনতা-সংগ্রামকে বাদ দিয়া নিছক নির্বিরোধ ও শান্তিপূর্ণ কোন গঠনমূলক পরিকল্পনার কথা তিনি চিন্তা করেন নাই। অবশ্য স্বরাজ বা স্বাধীনতা সম্পর্কে তখনও তিনি কোন বিস্তারিত ও স্পষ্ট রূপ চিন্তা করিতে না-চাহিলেও বস্তুত কলিকাতা ও লাহোর কংগ্রেসের পূর্ণ-স্বাধীনতার লক্ষ্য গ্রহণ করিয়া ল'ন। আর এই স্বাধীনতা যে দেশের জনগণের সংগঠিত ও অহিংস সংগ্রাম ব্যতিরেকে আসিতে পারে না, তাহাই তিনি বার বার দেশের মানুষকে বুঝাইতে চাহিলেন। শুধু তাহাই নহে, গান্ধীজী তখন হইতেই গণআইন-অমান্য

আন্দোলনের কথা চিন্তা করিতে শুরু করেন।

সারা দেশের আকাশে-বাতাসে তখন পূর্ণ-স্বাধীনতা ও আসন্ন সংঘর্ষের উত্তেজনাপূর্ণ কথা ধ্বনিত হইয়া ফিরিতেছে। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ দেশের স্বাধীনতার দাবী অন্তরে-অন্তরে সমর্থন করিলেও কংগ্রেসের ঐ রাজনীতিক-স্বাধীনতার আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পর্কে আন্তরিক আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। গান্ধীজী জওহরলাল সুভাষচন্দ্র প্রমুখ জাতীয় নেতৃবৃন্দের 'পরে কবির গভীর শ্রদ্ধা ছিল। এবং তাঁহাদের নেতৃত্বে সংগ্রামের ফলে 'স্বরাজ' বা 'স্বাধীনতা' আসিলেও শেষ পর্যন্ত তাহা দেশের ক্ষমতালোভী মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর করায়ত্ত হইবে—উহাতে ভারতের গ্রামবাসী বিশাল জনতার বিশেষ কিছু সুখ-সুবিধার সম্ভাবনা নাই বলিয়া তিনি মনে করিতেন। কয়েকমাস পূর্বে টোকিওতে কবির সহিত চৈনিক ডেলিগেশনের এই বিষয়ে যে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হয়, এই প্রসঙ্গে তাহা স্মরণীয়। কবি সেদিন বলিয়াছিলেন,

..."I work for my own people but if this work has any truth, it is working for the world. There is the same great problem in India as in China. It concerns not the upper classes, *not the ambitious people seeking power, but it is about the real people, the people living in the villages; the problem is to make them strong, self-reliant.* The village is the cradle of the nation, but the villages are being drained of their life-sap by the extortionate towns which are eating up the resources of the land. It is the great multitude, the common people, who bear the burden of civilization....

..."We are the parasites whom they maintain with their own blood. *The country can only be truly free when the real people become conscious of their own selves. Until then they will always be exploited, and their lives overladen with misery and ignorance will drag the whole country down with themselves.* It has become my life's work to try to restore the fullness of life to those of my race who have been deprived of their own proper share of physical and intellectual opportunities and to open the inner path of communication with other nations for the purpose of establishing perfect human relationship which is the real goal of civilization."......

এই প্রসঙ্গে তিনি কয়েক বৎসর পূর্বে শান্সির গভর্ণরের সহিত দুই দেশের জনগণের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার যে-সব আলোচনা করেন, তাহারই পুনরুল্লেখ করিলেন। তিনি বলিলেন,

..."The multitude of peolpe in China and India are sunk

in ignorance and superstition. We must educate them, go to the very root and make them conscious of their manhood; they must be taught to know their mind and exercise their will. To-day the difference between them and the upper classes is not merely that of degree but of kind. We belong to two different times and two different worlds. In fact, in our countries the educated minority lives in a solitude of illimitable inertia. It is a region which is hardly populated. *And therefore, when we talk of freedom, we mean real freedom for an insignificant few.* And yet the life-force, the strength of will needed for the attainment of freedom lies hidden in the unfathomed soul of these very people who today are as good as non-existent. In a land where the greater part of human resources lies buried and unused, you can never hope to realize the great human wealth which is freedom."

ভারতবর্ষের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এই স্বাধীনতা সম্পর্কে কী ভাবিতেছেন, এই প্রশ্নের জবাবে কবি বলিলেন,

"Whatever the educated young people may think, they cannot think for the whole populace, for the people's mind is not entire, it is divided by a great gulf. The unlighted part of the community is all the more vague because of the partitioned light of a limited section. This is the reason why the educated few forget that freedom depends upon certain essential conditions, the most important of which is that there should not be an overwhelming disproportion between those who have an intelligent notion of their national function and those who have not. Even in those parts of the West, where the masses are comparatively unenlightened, a desirable amount of self-government has not been achieved. For self-rule has its basis upon the intelligent will and disciplined mind of the people. Where they are steeped in the helplessness bred of ignorance and superstition, the clever, the ambitious will ever fight for power and use them for their own self-interest. This is what is going on to-day in China and the only restraining power that could effectively have checked the contending parties lies hopelessly dormant in the people who are not conscious of their own strength. Japan has taken

the true path by giving education to the people at large.··· Where this knowledge and this dignity are lacking, there to dream of freedom is something that the whole history of mankind contradicts"

[*Visva Bharati Bulletin.-No-14*-Nov. 1929. pp. 48-50]

বক্তব্য এতই সুস্পষ্ট যে ইহার কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না।

লক্ষ্য করিবার বিষয়, রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেসের স্বাধীনতার লক্ষ্য ও দাবির ঠিক বিরোধিতাও করিতেছেন না। তাঁহার বক্তব্য, এই স্বাধীনতা আসিলেও তাহা প্রকৃত স্বাধীনতা হইবে না। এই স্বাধীনতা যদি আসেও তবে তাহা বুদ্ধিজীবী ও ক্ষমতালোভী শ্রেণীর কুক্ষিগত হইবে এবং জনগণ যেমন চিরদিন শোষিত হইয়া আসিয়াছে তেমন শোষিত হইবে। একদিকে দেশের বুদ্ধিজীবী ও কায়েমী স্বার্থভোগীরা অপরদিকে দেশের কোটি কোটি অশিক্ষিত জনসাধারণ,—এই দুই শ্রেণীর মধ্যে তিনি নিয়তই স্বার্থের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সম্পর্ক লক্ষ্য করিতেছেন। তাঁহার মূল বক্তব্য, ভারতের গ্রাম দেশের এই অশিক্ষিত বিশাল জনতার মধ্যে যখন প্রকৃত জ্ঞান ও শিক্ষার বিস্তার হইবে, তখনই দেশে প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা আসিবে।—তখনই জনগণ অতন্দ্র প্রহরীরূপে সদা-সতর্ক দৃষ্টিতে সেই স্বাধীনতা রক্ষা করিবে। আর ইহাকেও তিনি স্বরাজ বা স্বাধীনতালাভের পূর্বশর্তরূপে গণ্য করিবার আহ্বান জানাইলেন। অর্থাৎ আশু রাজনীতিক স্বাধীনতার লক্ষ্য ও সংগ্রাম অপেক্ষাও তিনি জনগণের শিক্ষা এবং সমবায় ও পল্লী উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে চাহিলেন। কবির এইসব কথাকে নিছক 'সংস্কারপন্থা' বলিয়া অবজ্ঞা করা উচিত নয়। জনশিক্ষা, জনচেতনাবৃদ্ধি এবং ঐসব গঠনমূলক কার্যসূচী গ্রহণ করিলে স্বাধীনতা সংগ্রামও অনেক বেশী শক্তিশালী হইত। কংগ্রেস ও রাজনৈতিক দলগুলির ব্যাপক জনসংযোগ ঘটিত এবং জনগণের হৃদয়ের গভীরে তাহারা অনুপ্রবেশ লাভ করিতে পারিতেন। কংগ্রেস কোনদিনই প্রকৃত জনগণের কংগ্রেস দলে পরিণত হইতে পারে নাই।

কবির এই স্বরাজ-চিন্তার সব থেকে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, তিনি বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসনের নাগপাশমুক্ত জাতীয় স্বাধীনতা এবং স্বাধীন-রাষ্ট্রের আশু প্রয়োজনীয়তার গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যটি তখনও পর্যন্ত সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। কবির আশঙ্কা যদি অমূলক নাও হয়, অর্থাৎ এই স্বাধীনতায় যদি রাষ্ট্রযন্ত্রটি দেশের ক্ষমতালোভী বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর কুক্ষিগত হয়ও, তবুও ইহা অন্তত বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী সরকার অপেক্ষা অধিক কাম্য এবং দেশের তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা অতীব আশু প্রয়োজনীয় বিষয় ছিল। এইখানেই গান্ধীজী, জওহরলাল প্রমুখ দেশের নেতৃবৃন্দের সহিত কবির চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রধান পার্থক্য। গান্ধীজীও তাঁহার স্বরাজ-চিন্তায় বেশীদূর অগ্রসর হইয়া চিন্তা করিতে চাহিতেন না; এবং উহা কিছুটা অস্পষ্ট রাখিয়া সর্বদাই আশু প্রয়োজনীয় লক্ষ্যগুলির জন্য সংগ্রাম করিতেন। পূর্ণ স্বাধীনতাই

হউক বা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনই হউক অথবা 'রামরাজ্যই' হউক,—অর্থাৎ স্বাধীনতা যে রূপেই এবং যত সীমাবদ্ধ আকারেই আসুক না কেন, গান্ধীজী ইংরেজ শাসনের হাত হইতে আশু রাজনীতিক স্বাধীনতার জন্যই দাবী জানাইলেন এবং ইহারই জন্য সারা দেশব্যাপী এক গণসংগ্রামের সাংগঠনিক প্রস্তুতিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। কলিকাতা-কংগ্রেসের (১৯২৮) অনতিকাল পরেই গান্ধীজী তাঁহার স্বরাজ-চিন্তার মূল কথাটি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিলেন,

"...That fact is, that we do not know our distant goal. It will be determined not by our definitions but by our acts, voluntary and involuntary. If we are wise, we will take care of the present and the future will take care of itself....

"I submit that swaraj is an all-satisfying goal for all the time...

..."Personally I crave not for 'independence,' which I do not understand, *but I long for freedom from the English yoke. I would pay any price for it. I would accept chaos in exchange for it* For the English peace is the peace of the grave. Anything would be better than this living death of a whole people. This satanic rule has wellnigh ruined this fair land materially, morally and spiritually....

তিনি বলিলেন,

..."My ambition is much higher than independence Through the deliverance of India, I seek to deliver the so-called weaker races of the earth from the crushing heels of western exploitation in which England is the greatast partner. ...I want India to come to her own and that state cannot be better defined by any single word than swaraj. Its content will vary with the action that the nation is able to put forth at a given moment. India's coming to her own will mean every nation doing likewise." [*Mahatma-Vol.* II-pp. 326-27.]

'ইংরেজ-রাজত্বের পরিবর্তে দেশে যদি অরাজকতাও আসে—তবুও অবিলম্বে ইংরেজ-শাসনের অবসান চাই!'—গান্ধীজীর মত রবীন্দ্রনাথ জোর গলায় সেদিন এই কথা ঘোষণা করিতে পারিলেন না।

এসব সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক সতর্কবাণীর একটা মস্ত তাৎপর্য-পূর্ণ দিক আছে। বার বার বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা, বিশেষত ফ্যাসিজমের অভ্যুত্থানের পর হইতে তিনি তথাকথিত রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রকৃত তাৎপর্যটি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অদূর ভবিষ্যতে ভারত স্বাধীনতালাভ করিলে তাহার পরিণাম যে কী হইবে তা তিনি যেন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এজন্যই তিনি জনশিক্ষা জনচেতনাবৃদ্ধি এবং আর্থনীতিক পুনর্গঠনের কাজে দেশনেতাদের অগ্রণী হইবার অনুরোধ জানাইতেছিলেন।

'পূর্ণ স্বাধীনতা' প্রস্তাব—রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী ও জওহরলাল

এদিকে লাহোর কংগ্রেসের দিন ক্রমশই নিকটবর্তী হইতে লাগিল। দেশের রাজনৈতিক উত্তেজনা চরম আকার ধারণ করিতেছে।

বড়লাট লর্ড আরউইন বিলাত হইতে প্রত্যাবর্তনের পর এক গোলটেবিল বৈঠকের কথা ঘোষণা করিলেন (৩১ অক্টোবর, ১৯২৯)। এই ঘোষণাপত্র বা বিবৃতিটি অত্যন্ত দ্ব্যর্থবোধক ও চাতুরীপূর্ণ ভাষায় রচিত ছিল। ইহাতে এক অস্পষ্ট ভাষায় ও অনির্দিষ্ট কালের মধ্যে ভারতকে 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস' দিবার আশ্বাসবাণী ছিল মাত্র। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজী, মতিলাল নেহরু, সপ্রু, মালব্যজী ও মিসেস্ বেশান্ত প্রমুখেরা এক বৈঠকে মিলিত হইয়া ঐ প্রস্তাবের আলোচনা করেন। শেষ পর্যন্ত তাঁহারা বড়লাটের ঐ ঘোষণাপত্র কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে গ্রহণ করিয়া এক যুক্ত ইস্তাহার প্রকাশ করেন। উহার প্রধান শর্তগুলি ছিল—(১) পূর্ণ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে প্রস্তাবিত বৈঠকের আলোচনা হইবে ; (২) বৈঠকে কংগ্রেসের প্রতিনিধি সংখ্যাই অধিক সংখ্যক থাকিবে ; (৩) সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দিতে হইবে ; (৪) এখন হইতেই বর্তমান অবস্থার সহিত যথাসম্ভব সঙ্গতি রক্ষা করিয়া ভারত গভর্ণমেণ্ট ঔপনিবেশিক গবর্ণমেণ্টের ধারায় কার্যপ্রণালী পরিচালনা করিতে থাকিবেন।

বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষের জন্য এইটুকু মাত্রও বিলাতের শাসকগোষ্ঠী অনুমোদন করিতে পারিল না। ইতিমধ্যেই পার্লামেণ্টে বড়লাটের ঘোষণাপত্রের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল দল তীব্র ভাষায় আক্রমণ চালাইতে থাকে। কংগ্রেস নেতারা বুঝিলেন, আপোষের কোনো আশা নাই।

শেষ মুহূর্তে,—লাহোর কংগ্রেসের মাত্র কয়েক দিন আগে—আর একবার আপোষ-আলোচনার কথা হয় (২৩শে ডিসেম্বর)। কিন্তু উহাও ব্যর্থ হয়। ঐদিন সকালে দিল্লী প্রত্যাবর্তনের কালে বড়লাটের ট্রেনের নীচে বোমা বিস্ফোরিত হয়। অল্পের জন্য বড়লাট বাঁচিয়া যান।

অবশেষে আসিল, সেই অবিস্মরণীয় লাহোর কংগ্রেস। জওহরলাল নেহরু সভাপতি। জওহরলাল কংগ্রেস রাজনীতিকে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে—এক নূতন পরিপ্রেক্ষিতে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি তাঁহার ঐতিহাসিক ভাষণে, দেশের রাজনীতির এক নূতন পরিপ্রেক্ষিত মেলিয়া ধরিলেন,

"*India to-day is a part of a world movement.* Not only China, Turkey, Presia, and Egypt but also Russia and the countries of the West are taking part in this movement, and *India cannot isolate herself from it.* We have our own problems —difficult and intricate—and we cannot run away from them

and take shelter in the wider problems that affect the world. But if we ignore the world, we do so at our peril…"

…"*Independence for us means complete freedom from British domination and British imperialism.* Having attained our freedom, I have no doubt that India will welcome all attemps at world-co-operation and fedaration, and will even agree to give up part of her own independence to a larger group of which she is an equal member.'

[*Congress Presidential Addresses-Vol. II.* pp. 886-92.]

ব্রিটিশ কমনওয়েলথ সম্পর্কে বলিলেন,

…"It cannot be a true commonwealth so long as imperialism is its basis and the exploitation of other races its chief means of sustenance. The British Empire to-day is indeed gradually undergoing a process of political dissolution."…

জগতে যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে বলিলেন,

…"So long as there is domination of one country by another, or the exploitation of one class by another, there will always be attempts to subvert the existing order and no stable equilibrium can endure. *Out of imperialism and capitalism peace can never come*…

তিনি বলিলেন, ক্ষমতা দখল করাটাই আজিকার দিনে আসল প্রশ্ন ও সমস্যা,

"We have had much controversy about Independence and Dominion Status and we have quarrelled about words. But the real thing is the conquest of power by whatever name it may be called. I do not think that any form of Dominion Status applicable to India will give us real powers. A test of this power would be the entire withdrawal of the alien army of occupation and economic control. Let us, therefore, concentrate on these and the rest will follow easily.

We stand therefore to day *for the fullest freedom of India.*" [*Ibid*-pp. 892-93.]

শুধু তাহাই নহে, কংগ্রেসের সভামঞ্চ হইতে নেহরুই সর্বপ্রথম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ও বলিষ্ঠকণ্ঠে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ও লক্ষ্যের কথা ঘোষণা করিলেন,

'I must frankly confess that I am a socialist and a republican and am no believer in kings and princes, or in the order which produces the modern kings of industry,…I recognise, however, that it may not be possible for a body constituted

as is this National Congress and in the present circumstances of the country to adopt the full socialistic programme. But we just realise that the philosophy of socialism has gradually permeated the entire structure of society the world over and almost the only point in dispute is the pace and methods of advance to its full realisation. India will have to go that way too if she seeks to end her poverty and inequality, though she may evolve her own methods and may adapt the ideal to the genius of her race."

[*Ibid*-pp. 894-65.]

কংগ্রেস রাজনীতিতে এই চিন্তা—এই সুর সম্পূর্ণ অভিনব ও অশ্রুতপূর্ব।

সভাপতি-অভিভাষণের মূল ধারায় লাহোর কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলি রচিত ও গৃহীত হইয়াছিল। পূর্ণ-স্বাধীনতার সিদ্ধান্তটির এক জায়গায় বলা হয়,

"This Congress, therefore, in pursuance of the resolution passed at its session at Calcutta last year, declares that the word '*Swaraj*' *in Art. I of the Congress Constitution shall mean Complete Independence*, and further declares the entire scheme of the Nehru Committee's Report to have lapsed, and hopes that all Congressmen will henceforth devote their exclusive attention to the attainment of Complete Independence for India. As a preliminary step towards organising a campaign for Independence, and in order to make the Congress policy as consistent as possible with the change of Creed, this Congress calls upon Congressmen and others taking part in the national movement to abstain from participating directly or indirectly in future elections, and directs the present Congress members of the Legislatures and Committees to resign their seats. This Congress appeals to the Nation zealously to prosecute the constructive programme of the Congress, and authorises the All-India Congress committee, whenever it deems fit, to launch upon a programme of Civil Disobedience including non-payment of taxes, whether in selected areas or otherwise, and under such safegurads as it may consider necessary.

[*The History of the Congress-Vol.* I. p-357.]

এই প্রসঙ্গে নেহরু তাঁহার আত্মজীবনী-তে লিখিতেছেন,

"পূর্ণ স্বাধীনতার মূল প্রস্তাব এবং স্বাধীনতা সংঘর্ষের কার্যপ্রণালী প্রায়

সর্বাদীসম্মতরূপে গৃহীত হইল, কয়েক সহস্রের মধ্যে একশতেরও কম ব্যক্তি বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন।···পরিশেষে ৩১শে ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে পুরাতন বর্ষ শেষে, নব বর্ষারম্ভের মুহূর্তে, মূল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইল। ইহা যেন কাকতালীয়বৎ; কেন না কলিকাতা কংগ্রেস-নির্দিষ্ট এক বৎসর সময় ঠিক সেই মুহূর্তেই শেষ হইল এবং নূতন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া সংঘর্ষের আয়োজন আরম্ভ হইল। কর্মচক্র ঘুরিতে লাগিল; কিন্তু কখন, কি ভাবে, কোথায় আরম্ভ, তাহা আমরা অন্ধকারে তখন বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। সংঘর্ষের কার্যক্রম নির্দেশ করিবার ভার নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির উপর অর্পিত হইল কিন্তু আমরা সকলেই বুঝিলাম, গান্ধীজীর উপরই সমস্ত নির্ভর করিতেছে।···

"ভবিষ্যৎ তখনও অনিশ্চিত। কংগ্রেসে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সত্ত্বেও, দেশ কি ভাবে সাড়া দিবে সে সম্বন্ধে কাহারও কোন ধারণা ছিল না।···সংগ্রামের সূচনার জন্য এবং দেশবাসীর মনোভাব বুঝিবার জন্য ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস নির্দিষ্ট হইল। স্থির হইল, ঐ দিবস দেশের সর্বত্র পূর্ণ স্বরাজ্য সংকল্প গৃহীত হইবে।" [আত্মচরিত ॥ পৃ-২১৭-১৮]

দেশের এই রাজনৈতিক উত্তেজনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথকে প্রত্যক্ষভাবে আমরা কোন মন্তব্য করিতে দেখি না। উহাতে যে তাঁহার প্রাণ মন ঠিক সায় দেয় নাই, তাহা বলাই বাহুল্য।

এই সময় ডঃ শচীন সেন রবীন্দ্রনাথের রাজনীতিক চিন্তা সম্পর্কে, '*Political Philosophy of Rabindranath*' (সেপ্টেম্বর ১৯২৯) নামে একটি পুস্তক রচনা করেন। লেখক এই পুস্তক সম্পর্কে কবির অভিমত দাবি করেন।

রবীন্দ্রনাথ ডঃ শচীন সেনের ঐ পুস্তিকার সমালোচনা উপলক্ষে তাঁহার রাজনীতিক চিন্তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিয়া দীর্ঘ এক প্রবন্ধ রচনা করেন (প্রবাসী-অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬)। কবি যে তাঁহার রাজনীতিক রচনা ও চিন্তাধারাকে ঐতিহাসিকভাবে বিচার ও গ্রহণ করিবার কথা বলেন, তাহা আমরা পূর্ব খণ্ডেই বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। যাহা হউক, তিনি তাঁহার রাজনীতিক আদর্শ ও চিন্তার বৈশিষ্ট্যটি সংক্ষেপে আলোচনা করিতে গিয়া বলিলেন,

···"আমার লেখায় আমি বিশেষ করে এবং বার বার করে বলেছি যে, ভারতবাসী যদি ভারতবর্ষের সকল প্রকার হিতকর দান কোনো-একটি প্রবল শক্তিশালী যন্ত্রের হাত দিয়েই চিরদিন গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হয়, তা হলে তার সুবিধা সুযোগ যতই থাক্, তার চেয়ে দুর্গতি আমাদের আর হতেই পারে না। সরকারবাহাদুর-নামক একটা অমানবিক প্রভাব ছাড়া আমাদের অভাবনিবারণের আর কোনো উপায় আমাদের হাতে নাই, এই রকম ধারণা মনে বদ্ধমূল হতে দেওয়াতেই আমরা নিজের দেশকে নিজে যথার্থভাবে হারাই। আমাদের নিজের দেশ যে আমাদের নিজের হয় নি তার প্রধান

কারণ এ নয় যে, এ দেশ বিদেশীর শাসনাধীনে। আসল কথাটা এই যে, যে দেশে দৈবক্রমে জন্মেছি মাত্র সেই দেশকে সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, জানার দ্বারা, বোঝার দ্বারা সম্পূর্ণ আত্মীয় করে তুলি নি; একে অধিকার করতে পারিনি।···কেউ কেউ বলেন, আমাদের দেশ পরাধীন ব'লেই তার সেবা সম্বন্ধে দেশের লোক উদাসীন। এমন কোথা শোনবার যোগ্য নয়। সত্যকার প্রেম অনুকূল প্রতিকূল সকল অবস্থাতেই সেবার ভিতর দিয়েই স্বতই আত্মত্যাগ করতে উদ্যত হয়। বাধা পেলে তার উদ্যম বাড়ে বই কমে না। আমরা কন্‌গ্রেস করেছি, তীব্র ভাষায় হৃদয়াবেগ প্রকাশ করেছি; কিন্তু যে-সব অভাবের তাড়নায় আমাদের দেহ রোগে জীর্ণ, উপবাসে শীর্ণ, কর্মে অপটু, আমাদের চিত্ত অন্ধসংস্কারে ভারাক্রান্ত, আমাদের সমাজ শত খণ্ডে খণ্ডিত, তাকে নিজের বুদ্ধির দ্বারা, বিদ্যার দ্বারা, সংঘবদ্ধ চেষ্টার দ্বারা দূর করবার কোনো উদ্‌যোগ করি নি। কেবলই নিজেকে এবং অন্যকে এই ব'লেই ভোলাই যে, যেদিন স্বরাজ হাতে আসবে তার পরদিন থেকেই সমস্ত আপনিই ঠিক হয়ে যাবে। এমনি করে কর্তব্যকে সুদূরে ঠেকিয়ে রাখা, অকর্মণ্যতার শূন্যগর্ভ কৈফিয়ত রচনা করা, নিরুৎসুক নিরুদ্যম দুর্বল চিত্তেরই পক্ষে সম্ভব।"

তিনি আরও বলিলেন,

"আমাদের দেশকে সম্পূর্ণভাবে কেউই কেড়ে নিতে পারে না, এবং সেই দেশকে বাইরে থেকে দয়া করে কেউ আমাদের হাতে তুলে দেবে এমন শক্তি কারও নেই। দেশের 'পরে নিজের স্বাভাবিক অধিকারকে যে পরিমাণে আমরা ত্যাগ করেছি সেই পরিমাণেই অন্যে তাকে অধিকার করেছে। এই চিন্তা করেই এক দিন আমি 'স্বদেশী সমাজ' নাম দিয়ে একটি বক্তৃতা করেছিলুম।···"

স্বদেশী-আন্দোলনের সময় হইতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ভারতবর্ষের সমাজ আর্থনীতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটি তত্ত্ব প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহা হইতেছে এই যে,

"চিরদিন ভারতবর্ষে এবং চীনদেশে সমাজতন্ত্রই প্রবল, রাষ্ট্রতন্ত্র তার নীচে। দেশ যথার্থভাবে আত্মরক্ষা করে এসেছে সমাজের সম্মিলিত শক্তিতে। সমাজই বিদ্যার ব্যবস্থা করেছে, তৃষিতকে জল দিয়েছে, ক্ষুধিতকে অন্ন, পূজার্থীকে মন্দির, অপরাধীকে দণ্ড, শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা; গ্রামে গ্রামে দেশের চরিত্রকে রক্ষিত এবং তার শ্রীকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। দেশের উপর দিয়ে রাজ্য-সাম্রাজ্যের পরিবর্তন হয়ে গেল, স্বদেশী রাজায় রাজায় নিয়তই রাজত্ব নিয়ে হাত-ফেরাফেরি চলল, বিদেশী রাজারা এসে সিংহাসন-কাড়াকাড়ি করতে লাগল, লুটপাট অত্যাচারও কম হল না, কিন্তু তবু দেশের আত্মরক্ষা হয়েছে, যেহেতু সে আপন কাজ আপনি করেছে, তার অন্নবস্ত্র ধর্মকর্ম সমস্তই তার আপনারই হাতে। এমনি করে দেশ ছিল দেশের লোকের; রাজা ছিল তার এক অংশে মাত্র, মাথার উপর যেমন মুকুট থাকে তেমনি। রাষ্ট্রপ্রধান দেশে রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যেই বিশেষভাবে বদ্ধ থাকে দেশের মর্মস্থান; সমাজপ্রধান দেশে দেশের প্রাণ সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে থাকে।"

[কালান্তর ॥ পৃ ৩৪৭-৭৯]

কবি স্বীকার করেন, ইংরেজ-শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকেই ভারতবর্ষ তাহার এই সামাজিক ও রাজনৈতিক মূল বনিয়াদের বৈশিষ্ট্যটি হারায়। যখন থেকে বিদেশী রাজার রাষ্ট্রযন্ত্রটির অনুগ্রহ ও আনুকূল্যলাভের উপর দেশের লোক নির্ভর করিতে শুরু করে তখন থেকেই আমাদের গ্রামীণ ও বৃহত্তর সমাজ-জীবনে এই দুর্গতি ও বিপর্যয় শুরু হয়। 'স্বদেশী-সমাজে' তাই তিনি বিদেশী শাসকের রাষ্ট্রযন্ত্রটির মুখাপেক্ষী না-হইয়া সামাজিক ও আর্থিক পুনর্গঠনের যাবতীয় কর্মসূচী নিজেদেরকেই অগ্রণী হইয়া তাহা বাস্তবায়িত করিবার আহ্বান জানাইয়াছিলেন। সেই কথাটিই পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিয়া কবি বলিলেন,

…"স্বদেশী-সমাজে তাই আমি বলেছিলুম ইংরেজ আমাদের রাজা কিম্বা আর-কেউ আমাদের রাজা এই কথাটি নিয়ে বকাবকি ক'রে সময় নষ্ট না ক'রে সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা নিজের দেশকে নিজে সত্যভাবে অধিকার করবার চেষ্টা সর্বাগ্রে করতে হবে। দেশের সমস্ত বুদ্ধিশক্তি ও কর্মশক্তিকে সংঘবদ্ধ আকারে কেমন করে দেশে বিস্তীর্ণ করা যেতে পারে, স্বদেশী-সমাজে আমি তারই আদর্শ ব্যাখ্যা করেছিলুম—।"…

কিন্তু 'স্বদেশী-সমাজ' রচনার পর দীর্ঘ প্রায় দুই যুগ অতিক্রান্ত হইয়াছে। সেই সময় দেশের দাবী ছিল খুবই স্বল্প ও সীমাবদ্ধ আকারে। তারপর দেশের অবস্থা ও রাজনীতিক চিন্তা-চেতনার বহু পরিবর্তন হইয়াছে। এখন দেশের আকাশে-বাতাসে পূর্ণ-স্বাধীনতার দাবিতে সংগ্রামের কথা ধ্বনিত হইতেছে। কবিরও চিন্তা-চেতনার বহু পরিবর্তন ও বিকাশ হইয়াছে; তিনি ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান, যন্ত্রশক্তি, সমবায়তত্ত্ব এবং আধুনিক রাজনীতি ও সমাজনীতি হইতেও কিছু কিছু শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি দেশের রাজনীতিক-স্বাধীনতার দাবীও অস্বীকার করিতেছেন না। কিন্তু সেই স্বাধীনতার যোগ্যতা অর্জন বা পূর্বপ্রস্তুতির জন্য তিনি দেশে ব্যাপক জনশিক্ষা, সমবায় ও পল্লী-উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করিবার আহ্বান জানাইতেছিলেন, পূর্বেই তাহা আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। তাই দেশের স্বরাজ সাধনায় গান্ধীজীর চরকাতত্ত্বকে মুক্তির একমাত্র রাস্তা বলিয়া তিনি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এই প্রবন্ধে তিনি উহার পুনরুল্লেখ করিয়া বলিলেন,

"আজ আমাদের দেশে চরকালাঞ্ছন পতাকা উড়িয়েছি। এ যে সংকীর্ণ জড়-শক্তির পতাকা, অপরিণত যন্ত্রশক্তির পতাকা, স্বল্পবল পণ্যশক্তির পতাকা—এতে চিত্তশক্তির কোনো আহ্বান নেই। সমস্ত জাতিকে মুক্তির পথে যে আমন্ত্রণ সে তো কোনো বাহ্য প্রক্রিয়ার অন্ধ পুনরাবৃত্তির আমন্ত্রণ হতে পারে না। তার জন্যে আবশ্যক পূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্‌বোধন; সে কি এই চরকা-চালনায়? চিন্তাবিহীন মূঢ় বাহ্য অনুষ্ঠানকেই ঐহিক পারত্রিক সিদ্ধিলাভের উপায় গণ্য করেই কি এত কাল জড়ত্বের বেষ্টনে আমরা মনকে কর্মকে আড়ষ্ট করে রাখি নি? আমাদের দেশের সব চেয়ে বড়ো দুর্গতির কারণ কি তাই নয়? আজ কি আকাশে পতাকা উড়িয়ে বলতে হবে, বুদ্ধি চাই নে, বিদ্যা চাই নে, প্রীতি চাই নে, পৌরুষ চাই নে, অন্তর-প্রকৃতির মুক্তি চাই নে, সকলের চেয়ে বড়ো ক'রে

একমাত্র ক'রে চাই, চোখ বুজে, মনকে বুজিয়ে দিয়ে হাত চালানো, বহু সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন চালানো হয়েছিল তারই অনুবর্তন ক'রে ? স্বরাজ-সাধন-যাত্রায় এই হল রাজপথ ? এমন কথা ব'লে মানুষকে কি অপমান করা হয় না ?

"বস্তুত যখন সমগ্রভাবে দেশের বুদ্ধিশক্তি কর্মশক্তি উদ্যত থাকে তখন অন্য দেশ থেকে কাপড় কিনে পরলেও স্বরাজের মূলে আঘাত লাগে না। গাছের গোড়ায় বিদেশী সার দিলেই গাছ বিদেশী হয় না, যে মাটি তার স্বদেশী তার মূলগত প্রাধান্য থাকলে ভাবনা নেই। পৃথিবীতে স্বরাজী এমন কোনো দেশই নেই যেখানে অন্য দেশের আমদানি জিনিস বহুল পরিমাণে ব্যবহার না করে। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গেই তারা নানা চেষ্টায় আপন শক্তিকেও সার্থক করেছে—কেবল এক দিকে নয়, কেবল বণিকের মতো পণ্য-উৎপাদনে নয়, বিদ্যা-অর্জনে, বুদ্ধির আলোচনায়, লোকহিতে, শিল্পসাহিত্য-সৃষ্টিতে, মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশে। সে দিকে যদি আমাদের দেশে অভাব থাকে তবে নিজের হাত দুটোকে মনোবিহীন কল-আকারে পরিণত করে আমরা যতই সুতো কাটি আর কাপড় বুনি আমাদের লজ্জা যাবে না। আমরা স্বরাজ পাব না।"

উপসংহারে কবি দেশবাসীদের গঠনমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করিবার আহ্বান জানাইয়া বলিলেন,

"আমি প্রথম থেকেই রাষ্ট্রীয় প্রসঙ্গে এই কথাই বারম্বার বলেছি, যে কাজ নিজে করতে পারি সে কাজ সমস্তই বাকি ফেলে, অন্যের উপরে অভিযোগ নিয়েই অহরহ কর্মহীন উত্তেজনার মাত্রা চড়িয়ে দিন কাটানোকে আমি রাষ্ট্রীয় কর্তব্য বলে মনে করি নে।···স্বরাজ হাতে পেলে আমরা স্বরাজের কাজ নির্বাহ করতে পারব, তার পরিচয় স্বরাজ পাবার আগেই দেওয়া চাই। সে পরিচয়ের ক্ষেত্র প্রশস্ত।···আজ যদি দেখি সেই প্রকাশ অলস উদাসীন, তবে, বাহিরের অনুগ্রহে বাহ্য স্বরাজ পেলেই অন্তরের সেই জড়তা দূর হবে, এ কথা আমি বিশ্বাস করি নে। আগে আমাদের বাহিরের বাধা দূর হবে, তার পরে আমাদের দেশপ্রীতি অন্তরের বাধা ভেদ করে পরিপূর্ণ শক্তিতে দেশের সেবায় নিযুক্ত হবে, এমন আত্মবিড়ম্বনার কথা আমরা যেন না বলি। যে মানুষ বলে, 'আগে ফাউণ্টেন-পেন পাব তার পরে মহাকাব্য লিখব', বুঝতে হবে তার লোভ ফাউণ্টেন-পেনের প্রতিই, মহাকাব্যের প্রতি নয়। যে দেশাত্মবোধী বলে 'আগে স্বরাজ পেলে তার পরে স্বদেশের কাজ করব,' তার লোভ পতাকা-ওড়ানো উর্দি-পরা স্বরাজের রঙকরা কাঠামোটার' পরেই।"···

[কালান্তর ॥ পৃ ৩৪৯-৫২]

বক্তব্য খুবই সুস্পষ্ট।

তাছাড়া রাজনৈতিক শক্তি বা ক্ষমতা লাভ করিলেই সমস্যার সমাধান হইবে না, একথাও তিনি বার বার স্মরণ করাইয়া দিতেছিলেন। এই সব প্রশ্ন সম্পর্কে, কানাডা ভ্রমণকালে জনৈক কোরীয় সাম্যবাদী যুবকের সহিত তাঁহার যে-সব আলোচনা হয় তাহারই ভিত্তিতে এই সময় তিনি একটি প্রবন্ধ রচনা করেন

('কোরীয় যুবকের রাষ্ট্রিক মত'-প্রবাসী ॥ পৌষ, ১৩৩৬)।

জাপ সাম্রাজ্যবাদের হাত হইতে কোরিয়ার রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার পক্ষে ঐ যুবকটি নানা যুক্তি দিতে থাকিলে কবি তাঁহাকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। তিনি প্রশ্ন করেন, রাষ্ট্রিক বা রাজনীতিক স্বাধীনতা রক্ষা করিবার মত সত্যকারের যোগ্যতা কোরীয় জনগণ অর্জন করিয়াছে কিনা ?—কোরীয় জনগণের শিক্ষা ও রাষ্ট্রচেতনা উপযুক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে কিনা ? প্রসঙ্গত তিনি 'স্বাধীন' চীনাদেশের দৃষ্টান্ত দিয়া বলিলেন,

"চেয়ে দেখো সামনে ঐ চীনদেশ। সেখানে স্বজাতীয় আত্মসম্মানবোধ শিক্ষার অভাবে দেশের জনসাধাণের মধ্যে অপ্রবুদ্ধ। তাই দেখি, ব্যক্তিগত ক্ষমতাপ্রাপ্তির দুরাশায় সেখানে কয়েকজন লুব্ধ লোকের হানাহানি-কাটা-কাটির ঘূর্ণিপাক। এই নিয়ে লুটপাট অত্যাচারে ডাকাতের হাতে, সৈনিকের হাতে, হতভাগ্য দেশ ক্ষতবিক্ষত, রক্তে প্লাবিত, অসহায়ভাবে দিনরাত সন্ত্রস্ত। শিক্ষার জোরে যেখানে সাধারণ লোকের মধ্যে স্বাধিকারবোধ স্পষ্ট না হয়েছে সেখানে স্বদেশী বা বিদেশী দুরাকাঙ্ক্ষীদের হাতে তাদের নির্যাতন ঠেকাবে কিসে ? সে অবস্থায় তারা ক্ষমতালোলুপের স্বার্থসাধনের উপকরণমাত্র হয়ে থাকে।"…

তাই তিনি কোরীয় যুবককে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিলেন,

…"বিচারের বিষয় এই যে, তোমার দেশে শিক্ষাবিস্তারের এতটা হয়েছে কি না যাতে দেশের অধিকাংশ লোক স্বাধিকার উপলব্ধি এবং সেটা যথার্থভাবে দাবি করতে পারে। যদি তা না হয়ে থাকে তবে সেখানে বিদেশী নিরস্ত হলেও সর্বসাধারণের যোগে আত্মশাসন ঘটবে না, ঘটবে কয়েক জনের দৌরাত্ম্যে আত্মবিপ্লব। এই স্বল্প লোকের ব্যক্তিগত স্বার্থবোধকে সংযত করবার একমাত্র উপায় বহু লোকের সমষ্টিগত স্বার্থবোধের উদ্‌বোধন।"

তিনি বলিলেন,

"তোমরা শিক্ষিত লোকেরা দেশের সেই শিক্ষার অভাব যদি অনুভব কর তবে এই শিক্ষাবিস্তারের সাধনাকেই সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কর্তব্যরূপে নিজেরাই গ্রহণ করবে না কেন ? দেশকে বাঁচাতে গেলে কেবল তো ভাবুকতা নয়, জ্ঞানের প্রয়োজন করে।"…

তাছাড়া কবির আরও প্রশ্ন যে, 'আজিকার দিনে যুদ্ধবিগ্রহ যখন বৈজ্ঞানিক সাধনা সাধ্য ও প্রভুত ব্যায় সাধ্য' তখন রাশিয়া জাপানের মত প্রবল পরাক্রমশালী শক্তিবর্গের হাত হইতে কোরিয়ার মত দুর্বল দেশগুলির আত্মরক্ষার উপায় কিসে ও কী ভাবে ? কোরীয় যুবকটি কিন্তু এমন বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডভাবে জাতীয় স্বাধীনতার কথা চিন্তা করেন নাই। মনে হয়, তিনি কমিউনিস্টদের শ্রেণী-সংগ্রাম ও বিশ্ববিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিত হইতে সমস্যাটির সমাধান দেখিতে-ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,

…"এমন একটা সময় আসবে যখন পৃথিবীতে জাপানী চীনীয় রুশীয় কোরীয় প্রভৃতি নানা জাতির মধ্যে আর্থিক স্বার্থগত রাষ্ট্রীয় প্রতিযোগিতাই সব চেয়ে প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনা রূপে থাকবে না। কেন থাকবে না বলি। যে

দেশের মানুষকে চলতি ভাষায় স্বাধীন বলে থাকে তাদেরও ঐশ্বর্যের এবং প্রতাপের ক্ষেত্রে দুই ভাগ। এক ভাগের অল্প লোকে ঐশ্বর্যের ভোগ করে, আর-এক ভাগের অসংখ্য দুর্ভাগা সেই ঐশ্বর্যের ভার বয়; এক ভাগের দু-চারজন লোক প্রতাপযজ্ঞশিখা নিজের ইচ্ছায় উদ্দীপিত করে, আর-এক ভাগের বিস্তর লোক ইচ্ছা না থাকলেও নিজের অস্থিমাংস দিয়ে সেই প্রতাপের ইন্ধন জোগায়। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যুগে যুগে মানুষের মধ্যে এই মূলগত বিভাগ, এই দুই স্তর। এত দিন নিম্নস্তরের মানুষ নিজের নিম্নতা নতশিরেই মেনে নিয়েছে, ভাবতেই পারে নি যে এটা অবশ্যস্বীকার্য নয়।

…"আজ পৃথিবীতে যে যুগান্তকারী দ্বন্দ্বের সূচনা হয়েছে সে ভিন্ন ভিন্ন মহাজাতির মধ্যে নয়, মানুষের এই দুই বিভাগের মধ্যে—শাসয়িতা এবং শাসিত, শোষয়িতা এবং শুষ্ক। এখানে কোরীয় এবং জাপানী, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য এক পঙ্‌ক্তিতেই মেলে। আমাদের দুঃখই, আমাদের দৈন্যই আমাদের মহাশক্তি। সেইটেতেই জগৎ জুড়ে আমাদের সম্মিলন এবং সেইটেতেই ভবিষ্যৎকে আমরা অধিকার করব। অথচ যারা ধনিক তারা কিছুতেই একত্র মিলতে পারে না, স্বার্থের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরে তারা বিচ্ছিন্ন।…আজ দুঃখদৈন্যেই আমরা মিলিত হব, আর ধনের দ্বারাই ধনী হবে বিচ্ছিন্ন।"…

অত্যাচারী ও অত্যাচারিত, শোষক ও শোষিত—এই দুই শ্রেণীর অস্তিত্ব ও তাহাদের নিয়তই স্বার্থ-সংঘাতের কথাও রবীন্দ্রনাথ বহুবার স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু কমিউনিস্টদের সর্বহারা একাধিনায়কত্ব ও বলপ্রয়োগের দ্বারা সাম্যনীতিকে তিনি মানিয়া লইতে পারেন নাই। তাই তিনি ঐ প্রবন্ধের উপসংহারে তাঁহার সংশয়ের কথা ব্যাখ্যা করিয়া লিখিলেন,

…"আমি মনে মনে ভাবলুম, অসংযত শক্তিলুব্ধতা নিজের মধ্যে বিষ উৎপাদন করেই নিজেকে মারে এ কথা সত্য, কিন্তু শক্ত ও অশক্তের ভেদ আজ যে-একটা বিশেষ আকার ধরে প্রকাশ পাচ্ছে সেইটেকে রক্তপাত করে বিনাশ করলেই কি মানবপ্রকৃতি থেকে ভেদের মূল একেবারে চলে যায়? পৃথিবীর সমস্ত উচ্চভূমি ঝড়বৃষ্টির ঝাঁটার তাড়নায় ক্ষয় পেয়ে পেয়ে একদিন সমুদ্রের গর্ভে তলিয়ে যাবে এমন কথা শোনা যায়, কিন্তু সেই দিনেই কি পৃথিবীর মরবার সময় আসবে না? সমত্ব এবং পঞ্চত্ব কি একই কথা নয়? ভেদ নষ্ট ক'রে মানবসমাজের সত্য নষ্ট করা হয়। ভেদের মধ্যে কল্যাণসম্বন্ধ-স্থাপনই তার নিত্য সাধনা, আর ভেদের মধ্যকার অন্যায়ের সঙ্গেই তার নিত্য সংগ্রাম। এই সাধনায়, এই সংগ্রামেই মানুষ বড়ো হয়ে ওঠে। য়ুরোপ আজ সাধনাকে বাদ দিয়ে সংগ্রামকেই যখন একান্ত করতে চায় তখন তার চেষ্টা হয়, শক্তকে বিনাশ করে অশক্তকে সাম্য দেওয়া। যদি অভিলাষ সফল হয় তবে যে হিংসার সাহায্যে সফল হবে সেই রক্তবীজকেই জয়ডঙ্কা বাজিয়ে সেই সফলতার কাঁধের উপর চড়িয়ে দেবে। কেবলই চলতে থাকবে রক্তপাতের চক্রাবর্তন। শান্তির দোহাই পেড়ে এরা লড়াই করে এবং সেই লড়াইয়ের ধাক্কাতেই সেই শান্তিকেই মারে; আজকের

দিনের শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কালকের দিনের যে শক্তিকে জাগিয়ে তোলে আবার তারই বিরুদ্ধে পরদিন থেকে যুদ্ধের আয়োজন করতে থাকে। অবশেষে চরম শান্তি কি বিশ্বব্যাপী শ্মশানক্ষেত্রে ?"

[রাশিয়ার চিঠি ॥ পৃ ১৪৫-৪৯]

অবশ্য ইহার কয়েকমাস পরেই সোভিয়েত রাশিয়া পরিদর্শনের পর রবীন্দ্রনাথের এই সংশয়-দ্বিধা বেশ কিছুটা দূরহয়।—সোভিয়েতরাশিয়া তাঁহার চিন্তা-চেতনায় এক নতুন দিগন্ত—এক উজ্জ্বল মহাভবিষ্যতের চিত্র উদ্ঘাটিত করে। যথাস্থানে আমরা সে আলোচনায় আসিব।

পরাধীন দেশ ও জাতিগুলির স্বাধীনতা আন্দোলনের সমস্যা এবং বিশ্বসমস্যা সম্পর্কে গান্ধীজী তখনও পর্যন্ত বিশেষ মনোযোগ দিতে পারেন নাই, সত্য। স্বাধীন ভারতের রাজনীতিক ও আর্থনীতিক কাঠামো সম্পর্কেও তখনও পর্যন্ত তিনি খুব গভীরভাবে কিছু চিন্তা করিতে পারেন নাই, এ কথাও সত্য। তবে তাঁহার স্বরাজ-চিন্তায় গ্রামীণ জনসাধারণই মুখ্য স্থান অধিকার করে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ যে-অর্থে ব্যাপক জনশিক্ষা ও জনচেতনার উপর গুরুত্ব দিতেছিলেন, তিনি তাহা দেন নাই। কবির সমবায়, কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনাও তিনি সঠিক অর্থে গ্রহণ করেন নাই, এ সব কথাও আমরা পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

গান্ধীজীর চরকা ও গঠনমূলক পরিকল্পনা সেদিন প্রধানত রাজনীতিক স্বাধীনতার লক্ষ্যেই রচিত ও পরিচালিত হইতেছে। তিনি লাহোর কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিলেন এবং উহাকেই কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ মূল নিয়ামক নীতি বলিয়া মন্তব্য করিলেন। টেণ্ডুলকরের ভাষায় বলা যায়, '*Gandhi characterized this resolution as the root of the future Congress work.*'

বলা বাহুল্য, স্বরাজ চিন্তায় গান্ধীজীর আদর্শের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল রাম-রাজত্ব। এই 'রাম-রাজত্বের' বিস্তারিত কোন রাষ্ট্রিক গঠনতন্ত্রের রূপ তিনি তখনও চিন্তা করিতে পারেন নাই, অথবা চাহেন নাই। কেননা উহা দূর ভবিষ্যতেরও লক্ষ্য বলিয়া তিনি উহা করিতে চাহেন নাই। সেপ্টেম্বরে (১৯২৯) ভোপালে মুসলিমদের এক বিরাট জনসভায় গান্ধীজী তাঁহার 'রাম-রাজত্বে'র আদর্শ ও লক্ষ্যের বর্ণনা করিতে গিয়া বলিলেন,

"I warn my Muslim friends against misunderstanding me in my use of the word *Ram Raj*. By *Ram Raj*, I do not mean Hindu Raj. I mean by Ram Raj, Divine Raj, the Kingdom of God. For me, Rama and Rahim are one and the same deity. I acknowledge no other God but the one God of truth and righteousness. Whether Rama of my imagination ever lived or not on this earth, the ancient ideal of RamRaj is undoubte-

dly one of true democracy, in which the meanest citizen could be sure of swift justice without an elaborate and costly procedure. Eeven the dog is described by the poet to have received justice under Ram Raj."

[*Mahatma.-Vol.* II P.-375.]

অবশ্য শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, সহরবাসী ও গ্রামবাসী, ধনী ও গরীব, জমিদার ও রায়ত,—এক কথায় শোষক ও শোষিতদের মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রামের অস্তিত্বও গান্ধীজী লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত তিনিও কমিউনিস্টদের সর্বহারা একনায়কত্ব ও বলপ্রয়োগের দ্বারা সাম্যবাদ প্রবর্তনের নীতিকে অনুমোদন বা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তিনি রাজা, জমিদার ও কলমালিকদের দেশের গরীব মানুষের ন্যাসী (trustee) হইবার কথা বলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন,ঐ সব ধনিক শ্রেণীর আত্মিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটান সম্ভবপর। লাহোর কংগ্রেসের কয়েকদিন পূর্বে আদর্শ জমিদার-তালুকদারের কর্তব্য সম্পর্কে তিনি '*Young India*' পত্রিকায় লিখিলেন (5th Dec. 1929),

"The fact is that whatever may be done is no more than a belated return to the ryots of their due. The hideous caricature of Varnashram if responsible for the air of superiority that the so-called Kshatriya assumes and the status of inherited inferiority the poor ryot submissively recognizes as his deserved lot in life. If Indian society is to make real progress along peaceful lines, there must be a definite recognition on the part of the moneyed class that the ryot possesses the same soul that they do and that their wealth gives them no superiority over the poor. They must regard themselves, even as the Japanese nobles did, as trustees holding their wealth for the good of their wards, the ryots. Then, they would take no more than a reasonable amount as commission for their labours.

"At present there is no proportion between the wholly unnecessary pomp and extravagance of the moneyed class and the squalid surroundings and the grinding pauperism of the ryots in whose midst the former are living. A model zaminder would, therefore, at once reduce much of the burden the ryot is now bearing, he would come in intimate touch with the ryots and know their wants and inject hope into them, in the place of despair, which is killing the very life out of them..."

তিনি আরও বলিলেন,

—"স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম সম্পর্কে রায়তগণের অজ্ঞানতা দেখিয়া তিনি কখনো সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি রায়তগণ যাহাতে সংগ্রহ করিতে পারে সেজন্য তিনি নিজে দারিদ্র্যকে বরণ করিবেন। তিনি তাঁহার রক্ষণাধীন রায়তগণের আর্থিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিবেন এবং বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে রায়তগণের সন্তান ও নিজের সন্তানগণকে একই সঙ্গে শিক্ষাদান করিবেন। তিনি গ্রামের কূপ ও পুষ্করিণীর সংস্কার করিবেন; রায়তগণকে নিজের নিজের রাস্তাঘাট ও মলমূত্রাগারগুলি পরিষ্কার করিতে শিক্ষা দিবার জন্য তিনি এই প্রয়োজনীয় কার্যে নিজে অংশ গ্রহণ করিবেন। তিনি তাঁহার বাগানগুলি রায়তগণকে স্বাধীনভাবে ব্যবহার করিতে দিবেন। আমোদ-প্রমোদের জন্য যে সব অপ্রয়োজনীয় অট্টালিকা তাঁহার রহিয়াছে, সেগুলি তিনি হাসপাতাল স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানরূপে ব্যবহার করিবেন। কালের ইঙ্গিত অনুধাবন করিয়া ধনিকগণ যদি তাহাদের এই ধারণার পরিবর্তন করে যে নিজ নিজ সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত সমস্ত কিছুরই উপরই তাহাদের যে অধিকার তাহা ঈশ্বরপ্রদত্ত, তাহা হইলেই যে সাতলক্ষ আবর্জনার স্তূপকে আজ তাচ্ছিল্যের সহিত গ্রাম বলিয়া চালানো হইতেছে, সেগুলিকে অবিশ্বাস্য রকম অল্প সময়ের মধ্যে সুখ, শান্তি ও স্বাস্থ্যের বাসভূমিতে রূপান্তরিত করা যাইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ধনিকগণ যদি জাপানী সামুরাই-এর (Samurai) দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে, তাহা হইলে তাহারা বিন্দুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না, বরং সবদিক দিয়াই লাভবান হইবে। সম্মুখে দুইটি পথই মাত্র উন্মুক্ত রহিয়াছে: একদিকে, অতিরিক্ত অর্থের উপর ধনিকগণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে অধিকার ত্যাগ এবং তাহার ফলে প্রত্যেকের জন্য প্রকৃত সুখ ও শান্তির বিধান; এবং অপরদিকে, ভাবী বিপর্যয়—ধনিকগণের যদি যথাকালে জ্ঞানোদয় না হয় তাহা হইলে লক্ষ লক্ষ জাগ্রত অথচ অজ্ঞান ও বুভুক্ষু জনগণ সমগ্র দেশকে বিপর্যয়ের মধ্যে তলাইয়া দিবে, এবং, এমন কি একটি শক্তিশালী সরকারও তাহার সাধ্যমতো সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করিয়া তাহা রোধ করিতে পারিবে না।"

[*Mahatma-Vol. II* pp. 379-80]

[দ্র. গান্ধীজীর ন্যাসবাদ (নির্মল বসু অনূদিত) পৃ: ১৯-২০]

এই পটভূমিকায় জওহরলাল নেহরু কংগ্রেস সভামঞ্চ হইতেই সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ও লক্ষ্যের কথা ঘোষণা করিলেন। বলা বাহুল্য, নেহরু বহুলাংশে মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ হইতেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির বিচার-বিশ্লেষণ করিতেছিলেন। এই কারণেই গান্ধীজীর 'ন্যাসবাদ' (*Theory of Trusteeship*) তিনি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। লাহোর কংগ্রেসে তিনি পরিষ্কার ঘোষণা করিলেন,

..."The Congress, it is said, must hold the balance fairly between capital and labour and, zamindar and tenant.

"But the balance has been and is terribly weighted on one side and to maintain the *status quo* is to maintain injustice and exploitaion. The only way to right it is to do away with the domination of one class over another. The All India Congress Committee accepted this idea of social and economic change in a resolution it passed some months ago in Bombay. I hope the Congress will also set its seal on it and will further draw up a programme of such changes as can be immediately put in operation.

"In this programme perhaps the Congress as a whole cannot go very far to-day. But it must keep the ultimate ideal in view and work for it. The question is not one merely of wages and charity doled out by an employer or landlord. Paternalism in industry or in the land is but a form of charity with all its sting and its utter incapacity to root out the evil. The new theory of trusteeship, which some advocate, is equally barren. For trusteeship means that the power for good or evil remains with the self-appointed trustee and he may exercise it as he will. The sole trusteeship can be fair is the trusteeship of the nation and not of one individual or a group. Many Englishmen honestly consider themselves the trustees for India and yet to what a condition they have reduced our country."

[*Congress Presidential Addresses-Vol.*-II pp. 895-96]

ইহার অর্থ দেশের যাবতীয় উৎপাদনের উপায় ও সম্পদের দেশবাসীর ও জাতীয় স্বার্থে নিয়োগ বা 'রাষ্ট্রীয়-করণ', যাহা ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক সমাজের ক্ষেত্রভূমি সৃষ্টি করিবে। কিন্তু নেহরুর মতে এ সবই দূরের লক্ষ্য, এসব সদিচ্ছা ও বড়ো বড়ো আশার বাণী শুনানোর কোনো অর্থই হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমতা আমাদের হাতে না-আসে। তাই তিনি বলিলেন,

"All these are pious hopes till we gain power, and *the real problem therefore before us is the conquest of power.*"...

উপসংহারে তিনি সমগ্র দেশ ও জাতিকে আসন্ন সংগ্রামের প্রস্তুতির আহ্বান জানাইলেন। তিনি বলিলেন, গুপ্ত ষড়যন্ত্রের যুগ শেষ হইয়াছে, আজ 'প্রকাশ্য ষড়যন্ত্রে' সমগ্র জাতিকে বিদেশী শত্রুর শক্তির সহিত মোকাবিলা করিতে হইবে,

"But the time has gone for secret conspiracy. We have now an open conspiracy to free this country from foreign rule, and you comrades, and all our countrymen and countrywomen are invited to join it."…

[*Ibid*-pp. 902]

ঝড়ের পূর্বাভাস।—সারা দেশে একটা 'গুমোট্ থম্‌থমে' ভাব। সেই চরম মুহূর্ত,—সেই চরম নির্দেশের অপেক্ষায় সমগ্র জাতি এক অধীর আগ্রহে উৎকর্ণ।

সংযোজন

অমৃতসর কংগ্রেসে কবির প্রার্থনাসংগীত প্রেরণ

* পৃ: ৪৮ :

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, অমৃতসর কংগ্রেসেও রবীন্দ্রনাথ ইংরেজীতে তিনটি প্রার্থনা সংগীত পাঠাইয়াছিলেন। কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে তাহা পাঠ করা হয়। সমসাময়িক '*Bengalee, Amrita Bazar*, (*Dec 30 1919*) প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় তাহা প্রকাশিত হয়। তাহার প্রথম চরণটি ছিল এই :

"Light thy signal Father for us who have strayed far from thee. Our heart is bent under the load of despair and we insult Thee. when we grovel to dust at every favour or threat that mocks our manhood.

বলাবাহুল্য, কবির এই ক্ষোভ সংগ্রাম-বিমুখ ও আপসকামী 'মডারেট' নেতৃত্বের বিরুদ্ধেই। উপসংহারে, কবি তাঁহার 'জীবন-দেবতা' ও 'দেশমাতৃকা'র উদ্দেশে মৃত্যুঞ্জয়ী সংগ্রামে প্রাণ উৎসর্গ করিবার শক্তিভিক্ষা করিয়া বলিলেন :

"If it is Thy will let us push into the thick of conflicts and hurts.

Only give us thy own weapon, Mother, Thy power to suffer and to trust.

Honour us with difficult duties and pain that is hard to bear.

* * * *

At the end of our task let us proudly bring before Thee our scars and lay at Thy feet the soul, that is ever free and life that is deathless."

অমৃতসর কংগ্রেসের পূর্ব মুহূর্তে কবির মনের বীণায় তার কী সুরে বাঁধা ছিল, এই প্রার্থনা-সংগীতেই তাহার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।

কয়েকদিন পর ২৪ শে ডিসেম্বর, (১৯১৯) প্রার্থনা সংগীতগুলি *Modern Review*-তে প্রকাশের জন্য পাঠাইয়া দিয়া কবি রামানন্দবাবুকে এক পত্রে লিখিতেছেন :

"এবার কনগ্রেসে যে প্রার্থনা মন্ত্র তিনটি পাঠাইয়াছি মডারন রিভিয়ুর জন্য পাঠাইলাম। এবার ছাপিবার সময় ও স্থান আছে কিনা জানি না।"

কিন্তু 'অমৃতসর কংগ্রেসে'র আলোচনার ধারার মূল সুরটি কবির ঠিক মনঃপূত হয় নাই,—বিশেষত, পাঞ্জাবের অত্যাচার এবং 'হান্টার কমিশন'

সম্পর্কে নেতাদের গগন-বিদারী বক্তৃতা বাগাড়ম্বর ইত্যাদি সম্পর্কে। কিছুদিন পর ১৩ই জানুয়ারী (১৯২০) কবি একপত্রে রামানন্দবাবুকে তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিয়া লিখিলেন :

"এন্ড্রুজের পত্রটি আপনাকে দেখতে পাঠাচ্চি। এর কোন্ অংশ আপনার কাগজে বাহির করা যায় সে আপনি বিচার করে গ্রহণ করতে পারবেন। পত্রখানিতে অনেক কথা ভাববার আছে কিন্তু এতে ভারতবাসীকে যে আহ্বান আছে সেটা প্রকাশ হলে হয়ত কর্তৃপক্ষকে অনর্থক সতর্ক করা হবে এবং ভারতবাসীর পক্ষে সেটা বাধার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

"এবারকার কন্‌গ্রেসে আমাদের খুব একটা বড়ো সুর দেবার অবকাশ ছিল। গান্ধী এবং শ্রদ্ধানন্দ সেই সুর লাগিয়েছিলেন। কিন্তু মোটের উপর আমার মনে হয় dignity এবং সংযমের অভাব ঘটেচে। পঞ্জাবের উৎপাত সম্বন্ধে আমাদের এত বেশি বাচালতা করা অনাবশ্যক ছিল—উচিত ছিল এ সম্বন্ধে আমাদের অতিমাত্র-উত্তেজনার দ্বারা কমিশনের বিচারকে বিচলিত না করা। আমাদের কথা পৃথিবীর কাছে যাবে না। আজ পঞ্জাবের অত্যাচার সম্বন্ধে পৃথিবীর কাছেই বিচার চলচে। আমরা যা পেয়েচি সে ত সয়েচি—তাতে আমাদের উপকারও হয়েচে—কিন্তু দোষীর দণ্ডের ভার সমস্ত জগতের উপর। যদি কমিশন দুর্বলভাবে সত্য গোপন করতে চায়, তখনই আমাদের যা কর্তব্য তা করা উচিত হবে। ঝগড়াটে সুর কিংবা জিতের বড়াই ছেলেমানুষি—এত বড় উপলক্ষের অনুপযুক্ত। লাট সাহেবকে তাড়িয়ে দেওয়া প্রভৃতি নিয়ে আমরা যে সব আবদার করেছি সে যেন আদুরে ছেলের বাপের কাছে আবদার করার মত—আমাদের কি সেই সম্বন্ধ? সত্য প্রকাশ হোক্ সেইটেই সবচেয়ে বড় দণ্ড, moral দণ্ড, তার চেয়ে ছোট দণ্ড আমরা মাপ করতে পারি—সত্যই নিজের দণ্ড নিজে গ্রহণ করুন—আমরা চঞ্চলতা করে এই বিচার প্রণালীর গাম্ভীর্য নষ্ট করলে দুঃখের কথা।"

বলা বাহুল্য, কবির এ-ধরণের চিন্তা ও ভাবাবেগও খুবই সাময়িক। ইংরেজের চেয়ে ভারতের অনেক উচ্চ ও মহত্তর নৈতিক সংগ্রামের দৃষ্টান্তস্থাপনের উদ্দেশ্যেই কবি এ-সব কথা বলিয়াছিলেন। কয়েক মাস পরে, বিলেতে গিয়া পার্লমেণ্টে পাঞ্জাবের ঘটনার আলোচনাকালে কবি স্বয়ং ইংরেজের আসুরিক বর্বরতার স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্য কী চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাও আমাদের প্রায় সকলেরই জানা আছে। পার্লামেণ্টের এই আলোচনা শোনার পর কবি ব্রিটিশ জাতি সম্পর্কে তাঁহার তীব্র ক্ষোভ ও মনোবেদনা ব্যক্ত করিয়া দেশে তাঁহার এক গুণমুগ্ধ বন্ধুকে যে পত্র লেখেন, এই প্রসঙ্গে তাহা স্মরণযোগ্য। সমসাময়িক 'প্রবাসী' পত্রিকায় উহা প্রকাশিতও হয়। এই পত্রের একজায়গায় কবি লিখিয়াছিলেন (প্রবাসী-ভাদ্র ১৩২৭):

..."পাঞ্জাবে এরা যে বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিল, মনে করেছিলুম, সেটা আকস্মিক এবং সাময়িক আতঙ্ক থেকে তার উৎপত্তি। কিন্তু এখানে পার্লামেণ্টে সে সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়েছিল তার থেকে স্পষ্টই দেখতে

পেয়েছি এই প্রচণ্ডতা এদের মজ্জায় নিহিত, তাদের রক্তে বহমান। ডায়ারের কীর্তিকে এরা কেউ কেউ 'splendid brutality' বলে প্রশংসা করেছে। এই উপলক্ষে এদের মেয়েদের মধ্যেও রক্তলোলুপ হিংস্রতার পরিচয় পেয়ে আমি বিস্মিত হয়ে গেছি। আমাদের বোঝবার সময় এসেচে যে, এদের কাছ থেকে আমাদের কিছু আশা করবার নেই—আশা করা আত্মাবমাননা।···আমাদের দেশের 'মডারেট' যাঁরা তাঁরা হাত জোড় করে ভিক্ষা করেন, আর যাঁরা 'এক্সট্রিমিস্ট' তাঁরা চোখ রাঙিয়ে ভিক্ষা করেন, এইমাত্র তফাৎ। একদল মনিবের পাতের সামনে ল্যাজ নাড়েন, আর একদল ঘেউ ঘেউ করেন।—একদল মনে করেন তাঁরা ভারি সেয়ানা, আর এক দল মনে করেন তাঁরা ভারি তেজস্বী কিন্তু মনিবের উচ্ছিষ্ট এবং লাথি দুই দলের পিঠে সমান ভাবেই পড়ে—অথচ সেই উচ্ছিষ্টের ভাগ সম্বন্ধে দুই দলের কলহের আর অন্ত নেই। ওদিকে দেশের কাজ পড়ে আছে, সেদিকে মন দেবার সময় নেই। অতএব উচ্ছিষ্টের চেয়ে এই লাথিই আমাদের পক্ষে যথার্থ সৌভাগ্য।"

* পৃ ৫৬ :

'চিন্তার স্বাধীনতা আন্দোলন'এর সূচনার অল্পকাল পরেই অ্যাঁরি বারবুসের নেতৃত্বে ইউরোপের বুদ্ধিজীবী ও লেখক শিল্পীদের লইয়া আরও একটি শক্তিশালী যুদ্ধ-বিরোধী সংগঠনের ও আন্দোলনের সূচনা হয়। যুদ্ধাবসানের কয়েক মাস পর বারবুস্ কিছুসংখ্যক প্রগতিশীল ফরাসী বুদ্ধিজীবীদের লইয়া 'ক্লার্তে' (*clarte* বারবুসের বিখ্যাত একটি উপন্যাসের নামানুসারেই) লেখক গোষ্ঠীর ও সংস্থার পত্তন করেন। এই সময়ই তাঁহারা 'ক্লার্তে' এর পক্ষ হতে এক যুক্তবিবৃতি ও 'ফতোয়া' প্রকাশ করেন। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাঁহারা সর্বাত্মক প্রতিরোধ ও যুদ্ধ-ঘোষণা করেন।—*war on war*, এইটিই ছিল তাঁহাদের মূল 'রণধ্বনি'।

অল্পকাল পরেই ইংল্যাণ্ড, জার্মানী, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশে 'ক্লার্তে'র শাখা কমিটি গঠিত হয়। বারবুস্, মনাৎ, মার্শেল, মার্তিনে, আনাতোল ফ্রাঁস্, জুল্ রম্যাঁ, পল্ ভেলাণ্ট ক্যুতুরে, রেমণ্ড লেফেভার, জর্জ ব্রুয়ের, আলবের মাতিয়েজ প্রমুখ প্রখ্যাত লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন ফরাসী-শাখার নেতৃস্থানীয় কর্মকর্তা।

'ক্লার্তে'এর ব্রিটিশ শাখার মধ্যেও বহু খ্যাতনামা কবি-সাহিত্যিক ও মনীষী ছিলেন। ডগ্লাস গোল্ডরিং ব্রিটিশ-শাখা কমিটির অনারারী সেক্রেটারী। এ ছাড়া রবার্ট ডেল্, ই ডি মোরেল, বার্ণার্ড শ,' এইচ. জি. ওয়েলস্, অলডুস্ হ্যাকসলি, সিট্ওয়েলস, সিগফ্রিড সেসুন, টমাস হার্ডি প্রমুখ প্রখ্যাত লেখক ও মনীষী এই সঙ্ঘের সদস্য অথবা সমর্থক ছিলেন। এছাড়া আন্তর্জাতিক কমিটিতে ছিলেন আপ্টন্ সিনক্লেয়ার, নর্মান এঞ্জেল, এলেন কে, জর্জ ব্রাণ্ডেস, আঁদ্রিয়াস লাজ্কে, স্টিফান জাইগ, সেল্মা লাগরলফ্। এই সময় 'ক্লার্তে'র পক্ষ হইতে একটি ঘোষণাপত্র বা ইস্তেহার প্রচারিত হয়। এই ঘোষণাপত্রে

উপরোক্ত লেখক শিল্পী ও মনীষীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেরও স্বাক্ষর ছিল। খুব সম্ভবত, ১৯১৯ সালের জুলাইয়ের শেষে কিংবা আগস্টের প্রথম ভাগেই বারবুসের নিকট হইতে উপরোক্ত ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদানের জন্য পত্র পাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ উহাতে স্বাক্ষরদান করেন। 'ক্লার্তে''-এর মূল ইস্তেহার বা ঘোষণাপত্রটি ছিল এই।

'CLART'E'

MANIFESTO

1. Our social system is wrong. It results in privilege, arbitrary oppression, ruin and assasination.

2. The majority of men have so far been reduced to slavery, crushed and slaughtered to satisfy the caprice of a few in obedience to traditional superstition. Ignorance has been more powerful than that which all power is derived. The whole structure of modern society rests on a basis of absurdity.

3. Wrong begets wrong, progress begets progress. What is half wrong will become worse. As long as we do not change everything, we change nothing.

4. The fundamental principles of a righteous social system are simple. All great thinkers, all great moralists, all the founders of religions have always agreed on those principles.

5. Power must belong to all like ideals. Labour alone, manual or mental, is honourable. Labour alone should be rewarded. Speculation is a crime against the majority; inheritance is theft.

6. Equality consists in giving to all men exactly the same social opportunities. The class struggle aims at the elimination of classes.

7. No distinction can be drawn between citizens on account of sex differences.

8. To promote one's country's welfare as a step towards altruistic internationalism is a virtue; to make it an end in itself is a crime.

9. Whoever prepares for war paves the way for all wars. Territorial boundaries and economic boundaries are successive steps in the wrong direction.

10. There are on earth many individual interests but only one general interest. There are no outsiders anywhere,

for logic and ethics are international.

11. The stirring groupings of peoples nowadays are heralding a new era, purer and greater than the Christian era.

12. It is thought that has initiated all progress. It is the duty of thinkers to lend their life to promote the world's advance.

13. Stand-patters are propagandists for things as they are.

14. The political strike is the most efficient form of strike. It constitutes peaceful revolution, midway between evolution and revolution.

15. Governments bring about revolutions. Counter revolutionists make revolutions bloody. It is the oppressor not those who struggle for freedom, who are responsible for war, whatever the war may be.

"An anti-war association of French, German, Austrian, Hungarian and English persons who took part in the war (World War I) has been organised under the leadership of Henri Barbusse, Romain Rolland, Horzog and Nicholai. The association which is known as the International Group Clarite.

The manifesto of the Clarite is in 15 points, and is signed by Anatole France, Henri Barbusse, Norman Angel, Ellen Key, George Brandes, Andreas Lazko, Bernard Shaw, H. G. Wells, Nicholai, Rabindranath Tagore, Selma Lagerlof and others."

এই ঘোষণাপত্রের 'নোট' বা পাদটীকায় বলা হয় :

"An anti-war association has been organised under the leadership of Henri Barbusse and Romain Rolland. The association is known as the International Group Clarite to be addressed at P. O. Box 866, Mount Blank, Geneve, Switzerland."

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই ঘোষণাপত্রে ভুলক্রমে 'ক্লার্তে'র অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ও নেতৃস্থানীয় হিসাবে রমাঁ রোলাঁর নাম প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু উহা ঠিক নহে। ২৬ শে আগস্ট, (১৯১৯) এক পত্রে রোলাঁ রবীন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন :

"You have undoubtedly received a manifesto of the French

group "Clart'e". Through mistake my name appears in some lists among the members of the Committee. I have regard for Henri Barbusse and I admire him much as a writer; but I like to say that I am not a member of this group."

[*Rolland And Togore*-p 27]

লক্ষণীয়, 'ক্লাতে' এর সঙ্গে রোলাঁ যুক্ত নহেন, একথাটা জানা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ 'ক্লাতে' এর ঐ ঘোষণপত্রে স্বাক্ষরদান করিয়াছিলেন।

উল্লেখযোগ্য, বিপিনচন্দ্র পাল তখন বিলেতে। 'ক্লার্তে' এর ঐ ঘোষণাপত্রে রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর এবং যুদ্ধ-বিরোধী ও বিশ্বশান্তির সপক্ষে রবীন্দ্রনাথের ঐ মহান ভূমিকার জন্য তিনি মনে মনে খুবই আশা ও গর্ব অনুভব করিতেছিলেন। দেশে ফেরার পর তিনি কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে এক প্রকাশ্য জনসভায় রবীন্দ্রনাথের ঐ মহান ও গৌরবজনক ভূমিকার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন (দ্রঃ '*The World Situation and Ourselves*')

এই প্রসঙ্গে ডঃ শিবদাস চক্রবর্তী তাঁহার 'বিপিনচন্দ্র পাল, জীবন সাহিত্য ও সাধনা' (পৃ ১৬৪) গ্রন্থে লিখিতেছেন :

…"দেশে ফিরে এসে বিপিনচন্দ্র কলেজ স্কোয়ারে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল ব্যানার্জীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বিরাট সভায় (১৪ই ডিসেম্বর, ১৯১৯) 'দি ওয়ার্লড সিচুয়েশন য়্যাণ্ড আওয়রসেলভস্' (বিশ্বপরিস্থিতি ও আমরা) পর্যায়ে একটি ভাষণদান করেন।…

"যুদ্ধোত্তর বিশ্বে শান্তিপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ইউরোপে যে 'কংগ্রেস অব্ ইণ্টারন্যাশানাল ব্রাদারহুড' স্থাপিত হয়, বিপিনচন্দ্রের বিলাতে থাকাকালে (সেপ্টেম্বর ১৯১৯) তার অধিবেশন বসে। বিপিনচন্দ্র কংগ্রেস ডেপুটেশনের সভ্যরূপে তিলক, খপর্দে, ভি পি মাধব রাও, প্যাটেল, রঙ্গস্বামী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সেই অধিবেশনে যোগদান করেন। তখনই তাঁর মনে হয় যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো ভারতবর্ষেও যদি একটি 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অব্ ইউনিভার্সাল পিস্ য়্যাণ্ড ইণ্টারন্যাশনাল ব্রাদারহুড' গঠন করে উপরিউক্ত ইণ্টারন্যাশনাল ব্রাদারহুড কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত করা যায়, এবং তার বার্ষিক অধিবেশনে ভারতবর্ষ থেকে বিশ্বস্ত মুখপাত্র প্রেরণ করা যায় তা হলে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ভারতবর্ষের ভূমিকা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করতে পারে। বিপিনচন্দ্র তাঁর ভাষণে এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করে বলেন যে যদি এই ধরণের কাউন্সিল গঠন করা স্থির হয়, তাহালে তিনি রবীন্দ্রনাথকে সেই কাউন্সিলের সভাপতির পদ অলংকৃত করবার জন্য আহ্বান জানাবার প্রস্তাব করবেন। এই সভায় তিনি একথাও সগর্বে ঘোষণা করেন যে ইতিপূর্বে বিশ্বের চিন্তানায়কদের স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক শান্তি এবং যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের যে ইস্তাহার প্রকাশিত হয়েছে, তাতে আনাতোল ফ্রান্স, হেনরী বারবুসি, নরম্যান এঞ্জেল, এলেন কয়, জর্জ ব্রানডিস্, বার্নাড শ', এইচ. জি. ওয়েলস্, সেলমা লাগেরলফ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের স্বাক্ষরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরও যুক্ত হয়েছে দেখে তিনি গর্বিত।"

* পৃঃ ৬৭ঃ

১৯২০ সালে ২রা এপ্রিল, রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর আমন্ত্রণে ষষ্ঠ গুজরাটী সাহিত্য পরিষদের সভাপতিত্ব করার জন্য গুজরাটে যান। নানা কারণে এটি একটি স্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনা। সম্ভবত ইতিপূর্বে তিনি ভারতের অন্য কোন প্রদেশের ভাষা ও সাহিত্য সম্মেলনে পৌরোহিত্য করার আমন্ত্রণ পান নাই। স্বয়ং গান্ধীজী আগ্রহ প্রকাশ করিয়া কবিকে পর পর তিনখানি পত্র লেখেন। জালিওয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর গান্ধীজীর উপর পাঞ্জাব প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়া লইবার পর গান্ধীজী পাঞ্জাবে যান। সবরমতী আশ্রমে ফেরার পর ১৮ই অক্টোবর, গান্ধীজী কবিকে গুজরাটী সাহিত্য-সম্মেলনে পৌরোহিত্য করার অনুরোধ জানাইয়া প্রথম পত্রটি লেখেন ঃ

The Ashram
Sabarmati 18.10 19

Dear Gurudev,

There is to be a literary conference in Ahmedabad in December. The dates are 13th, 14th and 15th December. The organisers are most anxious that you should grace the occasion by your presence and I hope that if you could at all manage it, you will not disappoint Gujrat.

It was good of you to have permitted Andrews to go to South Africa. I have just received a telegram from him saying he is free to go. This relieves me considerably and I am sure that his going there will do the utmost good.

I hope that you are keeping good health.

Yours sincerely
Sd/M. K. Gandhi

প্রসঙ্গত বলা দরকার, এণ্ড্রুজ তখন পণ্ডিত্য মালব্যের নেতৃত্বে কংগ্রেস তদন্ত কমিশনের সদস্য হিসাবে প্রকৃত ঘটনা ও তথ্য সংগ্রহের জন্য পাঞ্জাবের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। এমন সময় গান্ধীজী তাঁহাকে দক্ষিণ-আফ্রিকায় যাইবার অনুরোধ জানাইলে এণ্ড্রুজ কবির নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিয়া পত্র দেন। বলা বাহুল্য, কবি সানন্দে সম্মতিদান করেন। এণ্ড্রুজ নভেম্বরের ৫-৬ তারিখ নাগাদ দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা করেন।

কিন্তু ডিসেম্বরে শান্তিকেতনে পৌষ-উৎসব এবং অতিথি-অভ্যাগতদের আপ্যায়ন—সর্বোপরি 'বিশ্বভারতী'র সাংগঠনিক প্রস্তুতির কাজে ব্যস্ত থাকায় কবির পক্ষে গান্ধীজীর এই আমন্ত্রণ রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। ফলে গুজরাটী সাহিত্য সম্মেলনের অনুষ্ঠানের তারিখ পিছাইয়া দিতে হয়। গান্ধীজীও অমৃতসর কংগ্রেস এবং তাহার পরবর্তী ঘটনায় নানা কর্মব্যস্ততায় সাহিত্য সম্মেলনের খবর

লইতে পারেন নাই। ১৪ই জানুয়ারী (১৯২০), তিনি পুনরায় কবিকে অনুরোধ জানাইয়া লিখিলেন,

The Ashram
Sabarmati,
14th January, 1920

Dear Gurudev,

I had no idea upto to-day that the Gujart literary Conefrence had not met at the time it was expected to. The Chief organiser Dr. Hari Prosad, however, tells me that as one of the reasons for your inability to attend was the shortness of notice (to you) given, it was decided to postpone the holding of the Conference to Easter. It could be done without violeting any canon of proprietiy as the Conference is not an annual fixture meeting at an appointed time. I know that you would come if your health and other considerations make it possible for you to accept the invitation and I sincerely hope that the Capital of Gujrat will have the honour of receiving you during Easter,

Your sincerely
Sd/M. K. Gandhi

বলাবাহুল্য, গান্ধীজীর এই পত্র পাওয়ার পর কবি সানন্দে তাঁহার সম্মতি জানাইয়া পর পর দুইটি তারবার্তা প্রেরণ করেন। কিন্তু গান্ধীজী তখন নানা কাজে দেশের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। সবরমতী আশ্রমে ফিরিয়া গান্ধীজী সে-কথা জানাইয়া কবিকে আর একটি পত্রে গুজরাটী সাহিত্য সম্মেলনের স্থান তারিখ ইত্যাদি বিস্তারিত বিবরণ দিয়া লিখিলেন (১১ই মার্চ, ১৯২০) :

The Ashram
Sabarmati, 11. 3. 20.

Dear Gurudev,

I have not been able before now to acknowledge your two telegrams, one addressed to Benares and redirected here and the other addressed here. We are all deeply grateful to you for your acceptance of the invitation. Every effort is being made not to overload you with engagements or *tamashas*. Will you please let me know, if necessary by wire, how long you will be able to give to Gujrat and whether you could visit one or two important centres. The second

question is regarding your residence. Will you put up at the Ashram ? Nothing would delight me more than to have you at the Ashram. I am most anxious that you should, during your stay, understand what it is and what it stands for. I am anxious toothat you should give the benefit of your presence to the many at the Ashram who claim to have been your pupils. Apart fom the Gujrati boys and girls and the Sindhi lad Girdhari whom you may recall, Manindra is here still and Saraladevi's son Deepak is also at the Ashram. It is situated about four miles from the centre of Ahmedabad and stands on a ridge on the bank of the Sabarmati.

You can, then, either stay at the Ashram or at a private Bunglow in Ahmedabad whith all the appointments. I need not say that your health and comfort are the primary consideration and your wishes will be faithfully carried out. Will you please also let me know any special arrangements on things you will desire.

Your sincerely
M. K. Gandhi

The Parishad lasts 3 days—2nd April to 4th.

চিঠিখানি এই কারণেই গুরুত্বপূর্ণ,—গুজরাটী সাহিত্য সম্মেলনে পৌরোহিত্য করার উপলক্ষ্যে কবি গান্ধীজীর প্রিয় সবরমতী আশ্রমটিও ভালো করিয়া দেখিয়া যাইতে পারিবেন, এই সাধন-ক্ষেত্রে তিনি কী করিতে বা বলিতে চাহিতেছেন।

২৯ শে মার্চ, কবি শান্তিনিকেতন হইতে গুজরাট যাত্রা করেন। সঙ্গে ছিলেন, ক্ষিতিমোহন সেন, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও প্রমথনাথ বিশি। এণ্ড্রুজ সবে আফ্রিকা হইতে শান্তিনিকেতনে ফিরিয়াছিলেন, তিনিও কবির সঙ্গে চলিলেন (দ্র 'শান্তিনিকেতন পত্র'-আষাঢ়, ১৩২৭ ॥ পৃ ১-২)। গুজরাট সাহিত্য সম্মেলনের পর কবি ভাবনগরেএবং পরে আরও কয়েকটি জায়গায় হিন্দীতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। 'আচার্য' রবীন্দ্রনাথের হিন্দী বক্তৃতা' শিরোনামে কবির একটি বক্তৃতার (৬ই এপ্রিল) অনুলিপি ('শান্তিনিকেতনপত্রিকা' পৌষ ১৩৩১।। পৃ ২২৪-২৬) প্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য, আচার্য ক্ষিতিমোহন কবির বক্তৃতাগুলি হিন্দীতে তর্জমা করিয়া দিয়াছিলেন। এ সম্পর্কে পরে, স্মৃতিচারণ করিয়া স্বয়ং ক্ষিতিমোহন লিখিয়াছিলেন (প্রবাসী-কার্তিক ১৩৪৮ ।। পৃ ১০৯-১৪) :

"আমেদাবাদে রবীন্দ্রনাথের আদর অভ্যর্থনা যথেষ্ট হইল। সাহিত্য সম্মেলনেও তাঁহার অভিভাষণ অতিশয় আদরের সহিত গৃহীত হইল।…"

"সাহিত্য সম্মেলনের কাজটুকু চুকিলেই আমেদাবাদের মেয়েরা আসিয়া

তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সেখানকার বণিতা-বিশ্রাম মেয়েদের একটি বড়ো প্রতিষ্ঠান। সেখানে যাইয়া মেয়েদের আদর্শ ও সাধনার বিষয়ে কিছু বলিবার জন্য কবির কাছে তাগিদ আসিল। তিনিও রাজি হইলেন। তখন সারা গুজরাতের চিত্ত রাজনীতির উত্তেজনায় ভরপুর। সেখানকার মেয়েরাও সেই উত্তেজনার স্রোতে ডুবিয়া আছেন। এমন সময় তাঁহার কথা কি ভাবে মেয়েরা গ্রহণ করিবেন তাহাও ভাবিবার বিষয়। তাহার পর আর এক সমস্যা হইল ভাষা। তখন সেখানে অধিকাংশ মেয়েই ইংরাজী জানিতেন না। তবে প্রধান উদ্যোগী শ্রীমতী বিদ্যা গৌরী ও শ্রীমতী সারদা গৌরী এই দুই জনই ছিলেন গ্রাজুয়েট। যাহা হইক কথা হইল গুরুদেব বলিবেন বাংলায় আমি তাহা দিব অনুবাদ করিয়া।"

এ সম্পর্কে কবির গুজরাট ভ্রমণের অন্যতম সঙ্গী সন্তোষচন্দ্র মজুমদার 'শান্তিনিকেতন পত্রিকায়' প্রকাশিত কবির পূর্বোক্ত বক্তৃতাটির টীকায় লিখিতেছেন:

"১৯২০ সালের ৬ই এপ্রিল কাঠিওয়াড়ের ভাবনগরে এই বক্তৃতাটি গুরুদেব দেন। ইহাই বোধ করি তাঁহার প্রথম হিন্দী বক্তৃতা। ইহার পরও তিন চার বার তিনি গুজরাটে হিন্দীতে বক্তৃতা দিয়াছেন। ভাল করিয়া হিন্দী না-জানা সত্ত্বেও বক্তব্য বিষয়টি ইংরাজি ভাষা অপেক্ষা হিন্দীতে যে সেখানে সাধারণের অন্তরে সহজে এবং ঠিকমত প্রবেশ করিত ইহা আমার বারম্বার লক্ষ্য করিয়াছিলাম।"

এ সম্পর্কে অন্যত্র আমরা বিস্তারিত তথ্যসম্বলিত আলোচনা (দ্র 'রবীন্দ্রনাথের প্রথম হিন্দী বক্তৃতা'—নেপাল মজুমদার॥ শারদীয়া 'দেশ' সংখ্যা, ১৩৭৬) করিয়াছি।

* পৃ ১০৩:

১৯২১ সালে, রোলাঁ-রবীন্দ্রনাথ সাক্ষাৎকারের বিবরণ রোলাঁ স্বয়ং তাহার জার্নাল—"ভারতবর্ষ" শীর্ষক গ্রন্থে (১০-১৮) চুম্বক আকারে লিখিয়া গিয়াছেন। এই জার্নাল হইতে জানা যায়, এবারে তাঁহাদের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল তিন দিন,—১৯, ২১ এবং ২৬ শে এপ্রিল। এই তিন দিনেরই বিবরণ রোলাঁ লিপিবন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। রোলাঁর ভগ্নী ম্যাডলিন উভয়ের মধ্যে আলোচনায় দোভাষীর কাজ করিয়াছিলেন। বিশ্ব পরিস্থিতি, বিশ্বশান্তির সমস্যা এবং কবির বিশ্বভারতী আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা এবং তাহার সাংগঠনিক সমস্যা লইয়াই প্রধানত এই আলোচনা হয়। শেষের দিনের, —২৬ শে এপ্রিলের, ঐ আলোচনা প্রসঙ্গে রোলাঁ (১৫-১৬) লিখিতেছেন,

"আমার বোন এবারও মধ্যবর্তিনী।—তাঁর আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা এবং ইংলণ্ডের দিক থেকে তিনি কী কী বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন— —প্রায় ঐ একটি বিষয়েই তিনি বলে গেলেন। সরকার অবিশ্বাস করে; ভারতীয় স্বাধীনতার কোন কেন্দ্রকেই তার বিশ্বাস নেই; তাঁকে বাধা দেবার সব

চেষ্টাই সে করেছে। আর আজ যখন সরকারের অপচেষ্টা সত্ত্বেও, তাঁর ভাবাদর্শ ইউরোপ ও আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়েছে, তখন তাঁকে সমর্থন করার ভান করছে, তাকে কুক্ষিগত করার জন্য। যেমন, রবীন্দ্রনাথ বললেন, প্রথমে বিরুদ্ধতা করে নষ্ট করার চেষ্টার পর এখন নষ্ট করতে চাইছে বদান্যতায়। রবীন্দ্রনাথকে প্রস্তাব দিয়েছে, সংগঠনের সমস্ত ব্যাপার থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেবে, অধ্যাপক ও ছাত্র নির্বাচন করে দেবে। সেদিন সকালেই এই প্রস্তাব রবীন্দ্রনাথ প্রত্যাখ্যান করে এসেছেন: তিনি লিখেছেন, এতো সব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের, পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁকে সংশ্লিষ্ট করার ইচ্ছা প্রকাশে তাঁকে যে সম্মান দেওয়া হয়েছে তার জন্য অশেষ ধন্যবাদ, কিন্তু তিনি কখনো তাঁদের সঙ্গে কাজ করতে পারবেন না, কারণ তিনি এক 'ভবঘুরে', সরকারী কেউ নন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরী করতে চেয়েছেন কেবলমাত্র অতিখ্যাত বুদ্ধিজীবী বা অধ্যাপকদের জন্যে নয়, যদি ইচ্ছে হয়, তাহলে দরিদ্র ছাত্রদের, সকল দেশের স্বাধীনচেতাদের জন্যও। তাছাড়া তিনি আরও বলেছেন, তাঁর উপর বিশ্বাস রাখতে হবে। কোনো রাজনৈতিক লক্ষ্যের পরিকল্পনা তাঁর নেই।"...

রোলাঁ রবীন্দ্রনাথকে ইংরেজ বুদ্ধিজীবীদের নিকট বিশ্বভারতীর জন্য আবেদন জানাইতে বলিলে কবি তাঁহাকে বলেন, কেন তাঁহাদের 'পরে তাঁহার ভরসা নাই। রোলাঁর সন্দেহ—"আমার মনে হয় ভারতীয়দের দরুণই তিনি ইংরেজদের সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন।"

এর পরে রোলাঁ লিখিতেছেন,

"প্রকৃতপক্ষে, যখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ভারতবর্ষে তাঁর ধ্যান-ধারণার অনুবর্তী কেউ আছেন কি না, তিনি মুক্তকণ্ঠে বললেন, নিঃসন্দেহে এমন অনেকে আছেন যাঁরা তাঁকে শিল্পী বলে শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু যাঁরা তাঁর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন ও বোঝাপড়ার আদর্শ সমর্থন করেন, তাঁরা সংখ্যায় একেবারেই নগণ্য—সম্ভবতঃ কেউ নেই। (তিনি স্বীকার করলেন, তাঁর দেশবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবাদ অতিমাত্রায় জাগ্রত হয়েছে, তাঁরা যা কিছু সহ্য করেছেন তার ফলে ইউরোপের সঙ্গে তাঁদের সমঝোতায় স্বেচ্ছায় সম্মত হবার পক্ষে জাতিবিদ্বেষ অত্যন্ত তীব্র। সর্বোপরি তাঁরা তার দিকে হাত বাড়াতে দিতে চান না, কারণ তাঁরা ভাবেন, তাঁদের সম্পর্কে ইউরোপের আছে শুধুই বোঝার অক্ষমতা এবং অবজ্ঞা। আর এই জন্যেই রবীন্দ্রনাথকে একদিকে ইংরেজদের সম্পর্কে এতো সতর্ক থাকতে হচ্ছে; তাঁর কাজ যেন ইংলণ্ডের একটা হাতিয়ার বলে সন্দেহভাজন না হয়, এবং এই ভয়েই ইংরেজদের উপরে নির্ভর করাটা তাঁকে এড়াতে হচ্ছে। —তিনি বললেন, আর অন্যদিকে এটা অত্যন্ত জরুরী বটে যে ইউরোপীয়দের ভারতবর্ষে আসতে হবে (লেখাটাই যথেষ্ট নয়) ভারতীয়দের কাছে প্রমাণ করতে হবে, পাশ্চাত্যে তবুও এমন মানুষ আছেন যাঁরা তাদের শ্রদ্ধা করেন, ভালবাসেন এবং তাদের ভবিতব্য সম্পর্কে বিশ্বাস রাখেন। এটি একটি জরুরী প্রয়োজন।"

পরিশেষে 'বিশ্বভারতী'র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের এই নিদারুণ সমস্যা-সংকট এবং অসহায় অবস্থার কথা ভাবিয়া রোলাঁ গভীর উদ্বেগ প্রকাশ

করিয়া লিখিতেছেন,

"আমার ভয় হয়, এই অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের কাজ বাস্তবে রূপায়িত হওয়া খুব কষ্টসাধ্য না হয়ে ওঠে। আমাকে যা সবচেয়ে পীড়িত করে তা তাঁর স্বীকারোক্তি যে- ভারতীয়দের মধ্যে একজনও নেই যিনি তাঁর মুখ্য সহকারী হতে পারেন। মাত্র দুজন অনুবর্তী আছেন, যাঁদের উপর তাঁর আস্থা আছে, তাঁরা আবার দুজনেই ইংরেজ, বাস করেন ভারতবর্ষে।"

এসব তথ্যাদি হতেই প্রমাণিত হয়, রবীন্দ্রনাথ ও রোলাঁর প্রথম সাক্ষাৎকার কতখানি গভীর আন্তরিক হইয়াছিল। এবারের ইউরোপ-আমেরিকা সফরকালে সম্ভবত কবি আর কাহারও নিকট তাঁহার 'বিশ্বভারতীর সমস্যা-সংকট' লইয়া এমন প্রাণখোলা আলোচনা করেন নাই।

* পৃ ১৩২ঃ

গান্ধীজী প্রবর্তিত 'অসহযোগ আন্দোলন' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিরূপতার অন্যতম কারণ ইংরেজি শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত দেশের দুই অন্যতম দিকপাল রামমোহন ও টিলক সম্পর্কে গান্ধীজীর কয়েকটি অসতর্ক মন্তব্য। তিনি তাঁহাদের 'বামন' বলিয়া অভিহিত করাতে দেশে বিশেষ করিয়া বাংলা দেশের একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর মধ্যে প্রবল উত্তেজনা ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়।

ঘটনাটি ঘটে, ১৯২১ সালের মার্চ মাসে। ঐ সময়ে গান্ধীজী কটক পরিভ্রমণে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষার 'সুফল' প্রসঙ্গে তাঁহার অভিমত জ্ঞাপন করিতে গিয়া রামমোহন টিলক (এবং তাঁহার নিজের সম্পর্কেও) উপরোক্ত মন্তব্য করিলে প্রবল চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। রামানন্দবাবু *Modern Review* ও 'প্রবাসী' (বৈশাখ, ১৩২৮ ॥ পৃ ১৬৬-৬৮) গান্ধীজীর ঐ মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করিতে গিয়া লিখিলেন,

"কটকে একটি সভায় বক্তৃতা করিবার পর গান্ধী মহাশয় শোতৃবর্গকে প্রশ্ন করিতে আহ্বান করেন। একটি এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়। 'ইংরেজী শিক্ষা আমাদের ভারতীয় নানা প্রদেশবাসীদের মধ্যে একতা আনয়ন করিয়াছে এবং ইহা অস্পৃশ্যতা দূর করিতে পারে। অতএব জিজ্ঞাস্য এই ইহা কি অবিমিশ্র অশুভ? টিলক রামমোহন ও আপনি কি ইংরেজী শিক্ষার ফল নহেন?'

"গান্ধী—'আমার কথা ছাড়িয়া দিন। আমি তুচ্ছতম বামন (miserablest pigmy) টিলক ও রামমোহন আরও বড়লোক হইতেন যদি ইংরেজী শিক্ষার ছোঁয়াচ (contagion) তাহাদিগকে না লাগিত।···রামমোহন ও টিলক বামন ছিলেন (আমার কথা ছাড়িয়া দিন) চৈতন্য, শংকর, কবীর, নানকের সহিত তুলনায় দেশবাসীদের উপর ঐ দুইজনের কোন প্রভাব ছিল না। ঐ অতি-মানবদের তুলনায় টিলক রামমোহন বামন ছিলেন। একমাত্র শংকর যাহা করিতে পারিয়াছেন, ইংরেজী জানা সমস্ত লোক মিলিয়া তাহা করিতে পারেন না।"···

রামানন্দ গান্ধীর ঐ মন্তব্য ও বক্তব্যের যুক্তি খণ্ডন করিতে গিয়া দীর্ঘ সমালোচনা করেন। অন্যান্য সংবাদপত্র-পত্রিকায় এই লইয়া আলোচনা ও

তর্ক-বিতর্ক চলিতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরিয়া এসবই শুনিলেন। কবি গান্ধীজীর উক্তি ও মন্তব্যের আক্ষরিক নয়—মূল বক্তব্যের স্বরূপ ও প্রকৃতিটি বুঝিতে পারিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কবি তখনই কিছু মন্তব্য করেন নাই বটে কিন্তু কয়েক বৎসর পর তাঁহার বিখ্যাত 'চরকা' শীর্ষক প্রবন্ধে গান্ধীর ঐ মন্তব্যে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া লিখিলেন, (কালান্তর ॥ পৃ ২৭৩-৭৪) :

"মহাত্মাজির সঙ্গে কোনো বিষয়ে আমার মতের বা কার্যপ্রণালীর ভিন্নতা আমার পক্ষে অত্যন্ত অরুচিকর। বড়ো করে দেখলে তাতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু তবু সব সময়ে মন মানে না। কেননা যাঁকে প্রীতি করি, ভক্তি করি, তাঁর সঙ্গে কর্ম-ক্ষেত্রে সহযোগিতার মতো আনন্দ আর কী হতে পারে? তাঁর মহৎ চরিত্র আমার কাছে পরম বিস্ময়ের বিষয়। ভারতের ভাগ্যবিধাতা তাঁর হাত দিয়ে একটি দীপ্যমান দুর্জয় দিব্য শক্তি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।…যে কারণ ভিতরে থাকতে রামমোহন রায়ের মতো অত বড়ো মনস্বীকেও মহাত্মা বামন বলতে কুণ্ঠিত হন নি—অথচ আমি সেই রামমোহনকে আধুনিক যুগের মহত্তম লোক বলেই জানি—সেই আভ্যন্তরিক মনঃপ্রকৃতি-গত কারণেই মহাত্মাজির কর্ম বিধিতে এমন রূপ ধারণ করেছে যাকে আমার স্বধর্ম আপন বলে গ্রহণ করতে পারছে না। সে জন্য আমার খেদ রয়ে গেল।"

* পৃ ১৩২ ঃ

রবীন্দ্রনাথ দেশে প্রত্যাবর্তনের পরই ২৩শে জুলাই (১৯২১), 'এ্যাসোসিয়েটেড প্রেসে'র (A. P.) সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে গান্ধীজীর অসহযোগ অন্দোলন সম্পর্কে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে কবির বক্তব্য যথাযথভাবে প্রকাশ পায় নাই দেখিয়া পরদিনই আর একটি বিবৃতিতে তাঁহার মূল বক্তব্য সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করেন। ২৬শে জুলাই, '*Bengalee*' পত্রিকায় '*Rabindranath on Non Cooperation*'—এই শিরোনামে এই খবর ও বিবৃতিটি প্রকাশিত হয় ঃ

"Interviewed by a representative of the '*Associated Press*' Dr. Rabindranath Tagore who looked very well after his long tour in Europe said that the rumours current that he had either written or spoken against non-cooperation were false and totally without foundation.

On the representative of the 'Associated Press' asking for his opinion about Mr. Gandhi's new movement, Tagore stated that he was in full accord with the spirit underlying the non-cooperation movement and also with the methods adopted by Mr. Gandhi to achieve his purpose.

Pressed further to state his views Dr. Rabindranath pithily but emphatically declared, '*I am entirely with Mahatma Gandhi*?'

Dr. Rabindranath Tagore has communicated the following statement in reference to the interview which he gave yesterday to a representative of the Associated Press :

'It is evident that the interviewer from the Associated Press, who came to see me yesterday, while I was hurrying to an engagement, misunderstod the one or two short sentences, which were uttered rathers hastily about the question of the present non-cooperation movement in India. I referred him to the interview I gave on this subject in Europe and America in which I expressed my approbation of the spirit and method of warfare against all wrongs as preached by Mahatmaji in which absolute faith in moral force is insisted upon. As to how his propaganda is being carried on in India and what are the ideals which he sets before his counthrmen I have yet to learn and therefore am unable to discuss.

"I have never missed an opportunity to express my unbounded admiration for Mahatmaji's personality and if ever I disagree with him in his attitude of mind towards some large human problems or small details in his method of work, I shall humbly try to be his own follower by followiog the dictates of my conscience and giving utterence to what I believe to be true."

বলা বাহুল্য, কবি এইভাবে গান্ধীজীর নেতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ও সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াও নিজের স্বাধীন বিবেকবুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনার অধিকারের সীমারেখাটুকু স্মরণ করাইয়া দেওয়াতে, তাঁহাকে নানা সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হয়। দিন দুই পর ২৮শে জুলাই 'বেঙ্গলী' পত্রিকাতেই কবির পূর্বোক্ত দুটি বিবৃতির সমালোচনা করিয়া একজন লিখলেন :

'On Sunday last the Associated Press of India informed the world that Dr. R. Tagore had emphatically declared to one of their representatives that he was entirely with M. Gandhi in the matter of Non-cooperation movement and also in the method adopted by him to achieve his object. On Monday, this week the Poet-laureate of India changes his tune and sings a diffrent song. To the some Press Agency the poet now says :

'as to how his propaganda is being carried on in India......

and therefore unable to discuss'. Of, such stuff indeed are poets made,—at any rate in India.'

এ-সব সমালোচনায় কবি খুবই বিরক্ত ও অশান্তি ভোগ করিতেছিলেন, এটা বলাই বাহুল্য।

* পৃ: ১৪০ঃ

কলিকাতায় 'শিক্ষার মিলন' ও 'সত্যের আহ্বান' শীর্ষক কবির দুটি বক্তৃতা বা ভাষণদানের সঠিক তারিখ ও স্থান সম্পর্কে 'শান্তিনিকেতন পত্রিকা'য় (মাঘ, ১৩২৮ ॥ পৃ: ১৪-১৫) লেখা হয়,

"বিদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া গুরুদেব কলিকাতায় প্রায়, তিন সপ্তাহকাল কাটাইয়াছিলেন। সে সময়ে তাঁহাকে লইয়া যে-সমস্ত সভা সমিতি হইয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল। (১) ১৫ই আগস্ট জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সম্বর্ধনা এবং তদুপলক্ষে 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধ পাঠ (২) ৮ই আলফ্রেড থিয়েটারে ঐ বিষয়েই মৌখিক বক্তৃতা। আশ্রমিক সংঘে'র উদ্যোগে এই সভার আয়োজন করা হইয়াছিল এবং টিকিট বিক্রয়ের টাকা (৬৪০ ।') খুলনা দুর্ভিক্ষভাণ্ডারে প্রদত্ত হয়। (৩) ২০শে কলকাতা সেবক সমিতির সম্বর্ধনা (৪) ২১শে সঙ্গীত সংঘের সম্বর্ধনা উপলক্ষে গানের মজলিস। তাহাতে গুরুদেব গান সম্বন্ধে একটি চমৎকার ভাষণ দেন (৫) ২৯শে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধ পাঠ। (৬) ২রা ও ৩রা সেপ্টেম্বর জোড়াসাঁকোতে বর্ষামঙ্গল উৎসব। তাহাতে ১৮ টি বর্ষাবিষয়ক গান গীত হয় এবং গুরুদেব ক্ষণিকার তিনটি কবিতা আবৃত্তি করেন।"

* পৃ: ১৪৩ঃ

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে 'অসহযোগ আন্দোলন' সম্পর্কে গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ সাক্ষাৎ আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে দেশবাসীর কৌতূহল ও আগ্রহ সম্পর্কে রসাল মন্তব্য করিতে গিয়া প্রমথ চৌধুরী মহাশয় 'সবুজপত্রে' (আশ্বিন, ১৩২৮ ॥ পৃ: ১৭০) লিখিলেন,

"রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর কি কথপোকথন হয়েছে তা জানবার জন্য যেমন কৌতূহল হয়েছে অসহযোগীদের তেমনি হয়েছে সহযোগীদের।...

"আমি আন্দাজ করছি এই কথপোকথনের ফলে রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথই রয়ে গেছেন, আর ম. গান্ধী, ম. গান্ধী। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই বীণা ছেড়ে চরকা ধরবেন না আর ম. গান্ধীও চরকা ছেড়ে বীণা ধরবেন না।"...

রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার মিলন' ও 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধের জবাবে শরৎচন্দ্রের 'শিক্ষার বিরোধ' শীর্ষক প্রবন্ধ রচনার কথা শুনিয়া প্রমথ চৌধুরী ঐ একই পত্রে মন্তব্য করিলেন, (পৃ: ১৭০-৭১):

"রবীন্দ্রনাথ সম্প্রতিকালে যে কটি বক্তৃতা দিয়েছেন তার মধ্যে সেরা দুটি হচ্ছে

'শিক্ষার মিলন' ও 'সত্যের আহ্বান'। এ দুটি বক্তৃতায় তিনি যে মতামত প্রকাশ করেছেন তা শুনে নাম লেখানো অসহযোগীদের মধ্যে কেউ কেউ যে চঞ্চল হয়ে উঠেছেন তার প্রমাণ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'শিক্ষার মিলনের' প্রতিবাদ করতে প্রবৃত্ত করেছেন। 'শিক্ষার মিলন' নাকি কবির কবিত্ব অতএব তার খণ্ডনের জন্য অবশ্য চাই উপন্যাসিকের উপন্যাস। এ রকম ব্যবস্থা এক বাঙলা ছাড়া আর কোথাও আর কারো মনে আসতো না। কিন্তু চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে 'শিক্ষার মিলনের' উপর আক্রমণ করবেন এমন ত মনে হয় না। তাঁর প্রবন্ধের নাম থেকেই বোঝা যায় যে তিনি রবীন্দ্রনাথের মতের উতোর গাইছেন না। 'শিক্ষার মিলনে'র পাল্টা জবাব 'শিক্ষার বিরোধ' নয়, তা হচ্ছে 'অশিক্ষার মিলন'। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যখন 'শিক্ষার বিরোধের' বিষয় বলবেন তখন তিনি সে বিরোধের যা হয় একটা সমন্বয় করবার চেষ্টা নিশ্চয়ই করবেন। শিক্ষার আসল বিরোধটা হচ্ছে অশিক্ষার সঙ্গে—অপর শিক্ষার সঙ্গে নয়। কেননা শিক্ষার অর্থই হচ্ছে পরের কাছে শিক্ষা।"

গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ সাক্ষাৎ আলাপ-আলোচনা সম্পর্কে এনড্রুজ রোলাঁকে যে সব কথা বলিয়াছিলেন রোলাঁ তাঁহার জার্নালে (ভারতবর্ষ॥ পৃ ৩২-৩৩) উহার যে সংক্ষিপ্ত 'নোট' রাখিয়াছিলেন, তাহা ছিল এই ;

"ভারতবর্ষে ফিরে যাবার পরে রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজীর মধ্যে যে আলোচনা হয়েছিল এনড্রুজ ছিলেন তার একমাত্র সাক্ষী—তিনি তাঁদের বর্ণনা করলেন, তাঁরা যেন দুটি বিরোধী ভারতীয় জাতির দু'টি নমুনা : গান্ধী পশ্চিম ভারতের, কম কল্পনাপ্রবণ, অত্যন্ত বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন জাতির লোক। রবীন্দ্রনাথ তার সম্পূর্ণ বিপরীত।—আলোচনার প্রথম বিষয় ছিল প্রতিমা প্রসঙ্গ। গান্ধী তা সম্পূর্ণ সমর্থন করলেন, কারণ তাঁর বিশ্বাস, জনসাধারণ এখুনি বিমূর্ত ভাবাদর্শে জেগে উঠতে অক্ষম। জনগণকে অনন্তকাল ধরে শিশুর মতো দেখতে হবে, এটি রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করেন না। প্রতিমা-পতাকার (idol-drapeau) মাধ্যমে ইউরোপে যে বড়ো বড়ো জিনিস লাভ হয়েছে গান্ধী অজুহাত হিসেবে সেগুলো তুলে ধরলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদের সুযোগ পেয়ে গেলেন। ইউরোপের পতাকায় যেখানে ঈগল ইত্যাদি আছে সেখানে তিনি তাঁর পতাকায় চরকা বসিয়েছেন, তার তুলনামূলক বৈষম্য দেখিয়ে গান্ধী নিজেকে গুটিয়ে নিলেন।—আলোচনার দ্বিতীয় বিষয় ছিল জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে। গান্ধী তাকে সমর্থন করলেন। তিনি বললেন, অন্তর্জাতিকতাবাদে উত্তীর্ণ হতে হলে জাতীয়তাবাদের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়,—ঠিক যেমন শান্তিতে পৌঁছুতে হলে যেতে হয় যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে। (ভয়াবহ যুক্তি) এই জন্যেই তিনি ইংরেজের বাহিনীর সৈন্যসংগ্রহের জন্যে এতো বার কাজ করেছেন। এ থেকে নিবৃত্ত হবার জন্যে এনড্রুজ তাঁকে কুড়িখানা চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু গান্ধী কখনো হার মানেন নি।"

* পৃ: ১৪১ :

১৯২১ সালে, বরিশালে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে' অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী এবং এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজ আনয়নের প্রতিশ্রুতিদানের তীব্র সমালোচনা করিয়া বিপিন পাল তাঁহার সভাপতির অভিভাষণের এক জায়গায় বলেন, (*Amrita Bazar P March 30, 1921*) :

"You wanted magic. I tried to give you logic. But logic is in bad odour when popular mind is excited. You wanted Mantram. I am no Rishi and cannot give Mantram. I am an ordinary mortal.... But I have never spoken a half-truth when I have known truth. I have never tried to lead people in faith blind folded...."

প্রসঙ্গত বলা দরকার, বিপিনচন্দ্র খিলাফৎ আন্দোলনকেও সমর্থন করেন নাই। ১৯১২ সাল হতেই তিনি 'প্যান ইসলামিজম'এর বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করিয়া আসিতেছিলেন।

* পৃ: ১৬৯ :

'শিক্ষার মিলন' 'সত্যের আহ্বান'—প্রভৃতি প্রবন্ধে, অসহযোগ-আন্দোলন সম্পর্কে—কবি তাঁহার প্রকৃত মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারেন নাই ;—এমন অনেক কথাই তাঁহার মনে অনেক 'প্রশ্ন' ও সন্দেহের সৃষ্টি করিয়াছিল, যাহা প্রকাশ্যে বলা বা লেখা যায় না। কিন্তু কয়েক মাস পরে, ফ্রান্সে, ডঃ কালিদাস নাগকে তিনি যে দীর্ঘ পত্রটি লেখন, তাহাতেগান্ধীজীর নেতৃত্ব এবং অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে তাঁহার প্রকৃত মনের কথা এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও যন্ত্রণাভোগের কথাটি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। কবি ঐ পত্রে কালিদাস নাগকে লিখিতেছেন (৪ঠা মে, ১৯২২),

......"আমি যখন ভারতবর্ষের দিকে ফিরছিলুম তখন আমার মনে ছিল যে, রম্যাঁ রলাঁর মত লোক যে-ভাবের মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে আছেন মহাত্মাজি এই ভাবটাকেই আমাদের জনসাধারণের মনে গভীর ও ব্যাপক রূপে উদ্বোধিত করে তুলচেন। আমি তাই ঠিক করেছিলুম আমার তরফ থেকে আমার কাজে ও রচনায় আমি এঁর সঙ্গে যোগ দেব। কিন্তু ফিরে এসে দেখি এখানে এমন একটা হওয়া বইচে যাতে আমার প্রাণমন পীড়িত হয়ে উঠল। প্রথম পীড়া হচ্চে মানসিক অত্যাচার। একে ত আমার অলস মন স্বভাবতই গতানুগতিক, তারপরে প্রকান্ড একটা moral জবরদস্তিতে প্রচলিত মতের লেশমাত্র বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করবার সাহস কারোর ছিল না। অর্থাৎ দেশের সর্বত্র স্বাধীনতার উজান হাওয়া খুব প্রবল বেগে বইছিল। সেই জন্যেই এমন মন্ত্রের মত কথা দেশের আবালবৃদ্ধবণিতার মুখে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হওয়া সম্ভবপর হয়েছিল যে, অন্য সব কিছু চিন্তা চেষ্টা অলোচনা পরিত্যাগ করে' কেবল মাত্র চরকা কেটেও খদ্দর পরে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে দেশ স্বরাজলাভ করবে। সে স্বরাজটা যে কি

তা স্পষ্ট করে প্রশ্ন করে জিজ্ঞাসা করবার ভরসা বা ইচ্ছামাত্রও কারো ছিল না। দেশের শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান লোকেরাও বলত, এটাই আমাদের creed, আমাদের ধর্মমত, অতএব এর সম্বন্ধে তর্ক চলবে না। দেশের অধিকাংশ লোকই বিনাবিচারে এমন অদ্ভুত কথা বেদবাক্যের মত মেনে নিতে পারলে এর চেয়ে স্বরাজ সিদ্ধির বিরুদ্ধ প্রমাণ আর কি হতে পারে। তারপরে সমস্ত দেশ জুড়ে একটা চোখরাঙানী, একটা মুখ-চেপে-ধরার ভঙ্গী। এই মানসিক অত্যাচারের চোরাবালির উপরে একরাত্রে এরা স্বরাজের অভ্রভেদী দুর্গ গড়ে তুলতে চেয়েছিল। বাংলা দেশে সবাই যে বিশ্বাস করেছিল যে, কোনো বিশেষ উপায়ে ৩০শে ডিসেম্বরের মধ্যে ভারত বন্ধনমুক্ত হবে তা নয়—কিন্তু অনেকেই মনে করেছিল সাধারণকে ভোলাবার এ একটা ফন্দী—এমন কি মহাত্মাজিও সেই রকম বেণের মত হিসাব করে এইরকম চাল চালছিলেন তা বিশ্বাস করবার মত প্রমাণ আছে। তিনি এণ্ডুজকে পত্রে লিখেছিলেন, সাধারণ লোককে এমন সুনির্দিষ্ট আশ্বাসবাক্য না দিলে তাদের উৎসাহ হয় না।···তুমি ত জানই এ আমি কিছুতেই সইতে পারিনে। আমি বলতে চেষ্টা করলুম আমি সত্যকে মানতে রাজি আছি কিন্তু মহাত্মাজিকে না। তাতে লোকে খুশি হল না।—এই ত গেল পয়লা নম্বর। তারপরে দেখলুম সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে ঘোরতর একটা পাশ্চাত্য বিদ্বেষ। সাধারণ পলিটিক্সের ক্ষেত্রে এইরকম উগ্র রাগদ্বেষের স্থান আছে—সর্বত্রই এইরকম রিপুর স্টীমেই স্বাদেশিকতার জগন্নাথের রথযাত্রা ঘটচে—অতএব যদি শাক্ত পলিটিশনের দল খড়্গ খর্পর নিয়ে পোলিটিকাল কালিঘাটের পশ্চিম যমদেবতার বাহন মহিষটাকে বলি দেবার সংকল্পে ঢাক ঢোল বাজাত আমি তাতে যোগ দিতুম না বটে; কিন্তু আশাভঙ্গের দুঃখ পেতুম না। কিন্তু আমার মনে এবার এই একটা আনন্দ পর্ব জেগেছিল যে আমাদের দেশের পলিটিক্স দ্বেষহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত নয় এইটেই আমরা পৃথিবীকে দেখাতে পারব। কিন্তু দ্বেষহিংসাকে শরীরের ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে তাকে মনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করলে তাতে যে কম অকল্যাণ ঘটে তা বলতে পারি নে। এই কয় বৎসর ভারতবর্ষের এক সভাতল থেকে আর এক সভাতলে কেবলি জালিয়ানবাগের অত্যাচার ও খিলাফতের অন্যায় ঘোষণা করে' সেই অভিযোগের দ্বারাই নন্-কোপারেশন নীতিকে প্রবল করার চেষ্টা করা হয়েছে। ভারতের স্বাতন্ত্র্য যে ভারতবাসীর মনুষ্যত্বের গৌরবসাধনের জন্যেই এ কথার উপর বিশেষ জোর দেখা গেল না—কেবল লোকের মনে পুনঃপুনঃ আবৃত্তি দ্বারা পরকৃত বিশেষ অন্যায়ের স্মৃতি গভীর করে দেগে দেগে দেওয়া হতে লাগল। অথচ সেইসঙ্গে মুখে বলা হতে লাগল যে, খবরদার মনে যেন হিংস্রতা না আসে—নাকের মধ্যে ঠেসে ঠেসে নস্যি গুঁজে দিয়ে বলা হতে লাগল, খবরদার হাঁচি যেন কোন মতেই না আসে। দুটো চারটে বড় বড় হাঁচি যখন সশব্দে বেরিয়ে পড়ল তখন উপদেশকেরা আশ্চর্য হয়ে হাত উলটে বললেন, 'না, এদের দ্বারা নন্-কো অপারেশনের উচ্চ নীতি কিছুতেই পালিত হতে পারে না—কেননা, এদের প্রচণ্ড হাঁচির রোগ আছে।'······ওদিকে যতক্ষণ সভায় সভায় অহিংস্রতার মন্ত্র মুখে আওড়িয়ে পদে পদে তীব্র বিদ্বেষের

চর্চা চলছিল তখন দেশের অধিকাংশ লোক—যাদের মনের মধ্যে হিংসা আছে ও হিংস্রতার উপর ষোল আনা শ্রদ্ধা আছে—তারা ভাবছিল 'এ বেশ হচ্ছে। দেশকে মদ খাওয়ানো দরকার—কিন্তু যে মহাত্মাজি সেটাকে গঙ্গাজল বলে খাওয়াচ্ছেন, তিনি আমাদের সকলের চেয়ে চতুর।'...ইংরেজ গবর্মেণ্টে যে সয়তানী এই মন্ত্রটাকে নিশিদিন জপ করানো যেতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে গান্ধিজি বারবার সকলকে ডেকে বলতে লাগলেন—'সয়তানীকে ঘৃণা কর কিন্তু সয়তানের প্রতি প্রেম যেন অক্ষুণ্ণ ও প্রবল থাকে।' কিন্তু যারা সরল বুদ্ধির লোক তারা এত অসীম সূক্ষ্মতা ধারণা করতেই পারে না। তাদের সহজেই মনে হয় যে, মার জিনিষটা abstract, একটা গড়িয়ে আসা পাথরও মারে, লাফিয়ে ওঠা ঢেউও মারে, আবার মেছোবাজারের গুণ্ডাও মারে—মারের উপর রাগ করার কোনো মানে নেই—যে ব্যক্তি মারে রাগটা একমাত্র তারি পাওনা, অতএব সয়তান-বর্জিত সয়তানীর উপর কোন নালিশই থাকতে পারে না—সয়তানটার উপরেই রাগ করতে হবে। যাই হোক্, নন-কোঅপারেশনের উদ্যোগের দুটো বড়ো জিনিষ টিকল না, একটা হচ্ছে ৩১ ডিসেম্বর—সেটা টিঁকল না তার কারণ, সাধনার অনুপাতেই সিদ্ধি এইটেই হচ্ছে সত্য—সাধনাকে চরখায় চড়িয়ে সংক্ষিপ্ত করে সিদ্ধি হতে পারে না—সাধনা ছেলেখেলা নয়,জনসাধারণকে ফাঁকা কথায় ভোলান নয়। দ্বিতীয় যেটা টিঁকল না সে হচ্চে অহিংসা—তারও প্রধান কারণ, ক্ষমার পথেই অহিংসার সাধনা এইটেই হচ্চে সত্য, অক্ষমার চর্চা করে পদে পদে বিদ্বেষবুদ্ধিকে উত্তেজিত করে অহিংস্রতায় উত্তীর্ণ হওয়া এ কেবল মহাত্মাজির উপদেশ বাক্যের দ্বারা হতেই পারে না। শুধু কেবল ইংরেজ গবমেণ্টের প্রতি ও ইংরেজ-জাতির প্রতিই যে বিদ্বেষ জেগেছে তা নয়, সমস্ত পাশ্চাত্ত্য বিদ্বার প্রতি—বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি। বিদ্যার যেন পূর্ব পশ্চিম দিগ্‌ভেদ আছে। যেমন করে বিলাতি কাপড় পোড়ানো চল্‌তে লাগ্‌ল তেমনি করেই বিদেশী culture সম্বন্ধে লঙ্কাকাণ্ড শুরু হল। তাই আমাকে আমাদের 'দেশাত্মবোধের' পাণ্ডারা বল্লে আমি পশ্চিমের মোহে মুগ্ধ—সেখানকার সাকীদের হাত থেকে প্রশংসার মদ খেয়ে সেইখানকার মাটিতেই আমার মন লুটোপুটি খাচ্চে। আমার যজ্ঞক্ষেত্রে—আমি পশ্চিমের অতিথিদের আমন্ত্রণ করেচি এতেই আমার বুদ্ধিবিকার প্রকাশ পাচ্চে। আমি পশ্চিমে রমাঁ রলাঁ প্রভৃতি যে সমস্ত মনস্বীদের দেখে এসেচি সমস্ত মানব সংসারের তপস্যাকে তাঁরা গ্রহণ করেচেন, তাঁদের কাছে দেশবিদেশের একান্ত ভেদ ঘুচে গেছে—এইজন্যে তাঁদের দেশের দেশাত্মবোধিদের কাছ থেকে তাঁরা দুঃখপাচ্চেন,—ভারতবর্ষে এসে আমি মহাত্মাজিকে দেখলুম তিনি তাঁর আইডিয়ালকে ভারতপলিটিক্সের বেষ্টনীর মধ্যে বেড়ার মধ্যেকারে ধেনুর মত পুরে রেখেচেন। আমি বরাবর এই কথাই জানি যে, যে-আইডিয়াল দেশের চেয়ে বড় সেই আইডিয়ালেই দেশ বড় হয়। এঁরা সকলেই বলেন, আগে দেশের আইডিয়ালকে মানি তার পরে সর্বজনীন আইডিয়ালকে মানা সম্ভব হবে। এঁরা ভুল যান ব্যক্তি বিশেষের বিশেষ রোগ যে আরোগ্যতত্ত্বের সাহায্যে সারে সেই আরোগ্যতত্ত্ব সকল ব্যক্তিরই।...যে পরিমাণে মনুষ্যত্বকে লাভ করব

সেই পরিমাণেই দেশকে লাভ করব।...যাই হোক দেশের লোকের মন সম্প্রতি 'গুরু'-ভারপীড়িত। চরখা ও খদ্দরের ধ্যানে নিমগ্ন। এবং এমন একটি আকাশকে অবলম্বন করবার চেষ্টা করচে, যার কেবলমাত্র পূর্বদিকই আছে পশ্চিমদিকের লেশমাত্রও নেই।"

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, কালিদাস নাগ কবির এই পত্রখানি রোলাঁকে (তর্জমা করিয়া) দেখান। এবং রোলাঁ তাঁহার জার্নালে ('ভারতবর্ষ" ॥ পৃ ২৭-৩০) দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়া সংক্ষেপে দুটি কথায় মন্তব্য করিয়াছেন—'এর সঙ্গে আমার চিন্তার মিল আছে।'

কয়েক দিন পর,...৯ই মে (১৯২২) কবি আর একখানি পত্রে কালিদাস নাগকে রোলাঁ সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছিলেন ডঃ নাগ তাহা রোলাঁকে দেখান। রোলাঁ তাঁহার জার্নালে (ভারতবর্ষ ॥ পৃ ২৩-২৪) তাহারও অংশবিশেষ উদ্ধৃতি দিয়াছেন:

..."পশ্চিমে যাঁদের সঙ্গে আমি মুখোমুখি হয়েছি, তাঁদের সকলের চেয়ে রোলাঁকেই আমার হৃদয়ের নিকটতম এবং আমার ভাবনার সবচেয়ে সগোত্র বলে মনে হয়েছে। ভাষার ব্যবধানের ফলে রোলাঁর সঙ্গে আমার চিন্তাধারার সোজা-সুজি আদানপ্রদানেআমার অক্ষমতাই ছিল আমার সব চেয়ে বড়োদুঃখ। কিন্তু তা যাই হোক, রোলাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের ফল হিসেবেই আমি অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি প্রত্যয়শীল হয়ে ভারতবর্ষে ফিরেছি আমার দেশের মানুষের হৃদয়ে সেই সব আদর্শ জীবন্ত ক'রে তুলতে, যার জন্যে রোলাঁর মতো মানুষেরা তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছেন।

..."রোলাঁর মতো মানুষেরাসামগ্রিক ভাবেমানবতার কল্যাণের জন্যে স্বেচ্ছায় তপস্যার জীবনকে গ্রহণ করেছেন। তাঁদের কাছে দেশ এবং জগতের মধ্যে কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই। আর এইজন্যেই দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের ধ্বজাধারীরা তাঁদের তাড়া করে ফিরছে। কিন্তু আমার পূর্ণ সহানুভূতি রোলাঁর এবং তাঁর সহকর্মীদের ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর প্রতি। চূড়ান্ত বিজয় আমাদেরই, কারণ আমরা সত্যের পক্ষে, যার মধ্যে আছে সত্যকার স্বাধীনতা এবং সত্যকার মুক্তি।"

বলা বাহুল্য, দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলন ও উগ্র স্বাদেশি-কতার পরিপ্রেক্ষিতেই কবি তাঁহার মানসিক যন্ত্রণার কথা ব্যক্ত করিতে গিয়াই কালিদাস নাগকে চিঠিতে এ-সব কথা লিখিলেন।

* পৃ ১৭৩:

সোভিয়েট রাশিয়ার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষদের সাহায্যের জন্য ম্যাক্সিম গোর্কিও বিশ্ববাসীর কাছে আবেদন জানাইয়াছিলেন। ভারতবর্ষেও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় গোর্কির এই আবেদন প্রকাশিত (দ্র *Bengalee*-July 27, 1921) হয়। রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপক ভিনোগ্রাদফ্‌কে এই সাহায্য সংগ্রহের ব্যাপারে তাঁহার অক্ষমতার কথা জানাইলেও ভিনোগ্রাদফের পত্রখানি প্রকাশ করিয়া দেশবাসীর উদ্দেশে সাহায্যের আবেদন জানাইয়াছিলেন। এই আবেদনের

ফলে ৫, ২৮৫ টাকা ৫ পাই সংগৃহীত হয়। এণ্ড্রুজ ১৯২৩ সালে জানুয়ারীর মধ্যভাগেই এক প্রেস-নোটে জানাইয়া দেন, উল্লিখিত টাকার ৩০০ পাউণ্ড ইতি মধ্যেই অধ্যাপক ভিনোগ্রাদফ্‌কে বিলেতে অক্সফোর্ডের ঠিকানায় (দ্র *Amrita Bazar Patrika*-January 18, 1923) পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

* পৃ ২২৯ঃ

আর্জেন্টিনায় গিয়াও শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কেন পেরু যাওয়া হয় নাই রোলাঁ সে-সম্পর্কে কিছু নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি দিয়া তাঁহার জার্নালে (ভারতবর্ষ॥ পৃ ৮৪-৮৫) লিখিয়াছেন ঃ

"রবীন্দ্রনাথ টোকিওয় দক্ষিণ আমেরিকার কন্সালদের কাছ থেকে তাঁদের দেশ দেখার এবং ডিসেম্বরে পেরুর জাতীয় উৎসবের দর্শক হবার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। তিনি সে-আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন এবং ভালো করে জানাশোনার সময় না দিয়েই আর্জেন্টিনা যাত্রা করেছিলেন। বুয়েনোস-এয়ারসে তিনি অসুখে পড়লেন এবং অসুখ আরো খারাপ হতে পারতো। কারণ এলমহার্স্ট প্রথম আবিষ্কার করলেন যে, আর্জেন্টিনাস্থ পেরুর রাষ্ট্রদূত রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানানোর কিছুই জানেন না ; এবং পেরুর সরকারও তাঁকে কোনো নির্দেশ পাঠায়নি। টেলিগ্রাম চালাচালি হলো · এবং এরই মাঝখানে বেশ কিছু অপ্রীতিকর ব্যাপার দেখা দিল। দুটি চিঠিকে কেন্দ্র করে আর্জেন্টিনার সংবাদপত্রগুলো উত্তপ্ত বিতর্কে গা ঢেলে দিল—একখানা (হায় রে !) আমার ব্যক্তিগত চিঠি, লিখেছিলাম 'ভালোরাথিওনেস্' পত্রিকার তরুণ সম্পাদকদের অনুরোধ জানিয়ে, যাতে সরকারী ভাবে পেরু সফরের বিপদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথকে সতর্ক করে দেন ঃ (আসলে আমি জানতাম পেরুর ছদ্মপ্রজাতন্ত্রী স্বৈরাচারী সরকার —যে সরকার স্বাধীনচেতাদের নির্বাসিত করে এবং দেশীয় শ্রমিকদের গুলি করে মারে—জনমতকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যে রবীন্দ্রনাথকে কাজে লাগাতে চেয়েছিল : তাঁকে তার জাতীয় উৎসবাদিতে প্রদর্শন করা হতো এবং এইভাবে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁকে স্বেচ্ছাচারের সহযোগী করে ফেলতো। কিন্তু দরকার হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে গোপনে সাবধান ক'রে দেবার এবং এটা প্রকাশ্যে বলাটা অযৌক্তিক ছিল, কারণ তাহলে রবীন্দ্রনাথকে এক সংকটজনক পরিস্থিতিতে ফেলে দেওয়া হতো।)— আমার চিঠিতে শব্দ ব্যবহারে তবু কিছুটা মাত্রা ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় একটি চিঠি বোমার মতো ফেটে পড়ল! এলমহার্স্ট যা বললেন সেই অনুসারে চিঠিখানায় স্বাক্ষর ছিল আর্জেন্টিনায় আশ্রয় নেওয়া জনৈক পেরুবাসীর। কিন্তু এলমহার্স্ট দক্ষিণ আমেরিকার ব্যাপার-স্যাপার এবং লোকজন সম্পর্কে কমই জানেন ; আমি প্রায় নিশ্চিত যে চিঠিখানা ছিল আয়া দেলিয়া তোরেসের। এটা ছিল পেরুর নির্বাসনদাতাদের বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড আক্রমণ এবং নিজের পক্ষে রবীন্দ্রনাথকে সোজাসুজি জড়িয়ে ফেলেছিল।"…

পরবর্তী ঘটনার বিবরণ দিয়া রোলাঁ লিখিতেছেন,

"এদিকে রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্যের উন্নতি হলো না। তিনি পেরু যেতে

চাইলেন, সদ্য সরকারী আমন্ত্রণ এসেছে এবং আর্জেণ্টিনা (ঐশ্বর্যে যে ফেটে পড়ছে) তাঁর ইচ্ছেমতো ব্যবহারের জন্য ড্রেড্‌নট (?) দিল গোটা আমেরিকা ঘুরে তাঁকে যাতে সোজা পেরু নিয়ে যেতে পারে। ঠিক তখনই পরামর্শক চিকিৎসকেরা আনুষ্ঠানিকভাবে এই সফর নিষেধ করে দিলেন।—ভীষণ অস্বস্তিকর অবস্থা! পেরুযাত্রা প্রত্যাখ্যান সংবাদপত্রের প্রচারের সময়ের সঙ্গে মিলে গেল। এটাকে ব্যাখ্যা করা হতে পারে—ব্যাখ্যা করা হবেই—পেরুর সরকারের প্রতি প্রযুক্ত সম্মানহানিকর এক অস্বীকৃতি হিসেবে। রবীন্দ্রনাথই শুধু এই অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়লেন না, আর্জেণ্টিনা সরকারের অস্বস্তি হলো অনেক বেশি। তার ভয় হলো, পেরু না অভিযোগ করে যে সে ই রবীন্দ্রনাথকে যাত্রার মত পরিবর্তন করিয়েছে; তখন এই সংকটজনক মুহূর্তে তার প্রাণপণ চেষ্টা হলো, পেরুর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখা। তাই, সে রবীন্দ্রনাথ এবং এলমহার্স্টের যুক্তি বুঝতে চাইল না; সে জোর করতে লাগলো যে তাঁকে স্বীকৃত কর্মসূচী মানতে হবে।—শেষ পর্যন্ত পেরু-সফর ও থাকা খাওয়ার অতি আবশ্যক খরচার জন্যে একটা টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হলো। এলমহার্স্ট পেরুর রাষ্ট্রদূতের কাছে জানাতে এলেন। কিন্তু টাকা ফিরিয়ে দেওয়াটা বাধাপ্রাপ্ত-যাত্রার সন্দেহজনক চরিত্রকে আরও প্রকট করে তুললো। এ সম্পর্কে আলোচনার পর, মনে হয়, পেরুর রাষ্ট্রদূত ঔদার্য দেখিয়ে বললেন, যা হয়ে গেছে তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই এবং সেই টাকা রেখে দিতে এলমহার্স্টকে বাধ্য করলেন।—অসুস্থ রবীন্দ্রনাথ এই সমস্ত জটিলতা বিষয়ে একটু আধটু জানতেন, তার বৃত্তান্ত তাঁর কাছে চেপে যাওয়া হয়েছিল কারণ তাঁর স্বাস্থ্যের দিকে নজরটাই কাম্য ছিল। কিন্তু অতিমাত্রায় সংবেদনশীল হওয়ায় তিনি বুঝেছিলেন কিছু ব্যাপার তাঁর কাছে গোপন করা হচ্ছে এবং তাঁর কল্পনা ধৈর্য হারাচ্ছিল কেবলমাত্র জাহাজে বুয়েনোস-এয়ারস আর জেনোয়ার মাঝখানে এলমহার্স্ট তাঁকে সব খুলে বলেছিলেন।"

আর্জেণ্টিনা হইতে ফেরার পথে কবির সুইজারল্যাণ্ডে রমাঁ রোলাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ আলোচনার কথা ছিল। কিন্তু এবার আর্জেণ্টিনায় কবি গুরুতর অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। দুর্বল ও ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া কবি রোলাঁর নিকট যাওয়ার ঝুঁকি লইতে সাহস পান নাই। ফেরার পথে ইতালির দু' একটি জায়গায় ঘুরিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। বলা বাহুল্য, এর ফলে রোলাঁ খুবই আশাহত হ'ন। তিনি রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনা ও বিশ্বশান্তি এবং আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী লইয়া কবির সঙ্গে আলোচনার জন্য উন্মুখ হইয়াছিলেন। জানুয়ারীর (১৯২৫) মাঝামাঝি নাগাদ তিনি কালিদাস নাগকে এক পত্রে লিখিতেছেন, (ভারতবর্ষ ॥ পৃ ৭৭) :

"রবীন্দ্রনাথ চলে যাওয়ায় আমি গভীরভাবে আহত হয়েছি।…দুটি মানুষের আলাপ-আলোচনার এমন প্রয়োজন আগে কখনো হয়নি। আমরা ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে ভয়ংকর সংঘর্ষের পূর্বাহ্নে পৌঁছেচি। আমাদের নিজেদের একসঙ্গে পরিকল্পনার দরকার ছিল। ঝড় যখন উঠবে—যে ঝড় আমি

উঠতে দেখছি—তখন ইউরোপ ও এশিয়ার শ্রেষ্ঠাংশের ঐক্য রক্ষা করার জন্যে ইউরোপে এক প্রতিরোধের কেন্দ্র গড়ে তুলতে আমি—ইউরোপে প্রায় একা—চেষ্টা করছি। আমার জরুরী প্রয়োজন ছিল রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ নেবার, প্রয়োজন ছিল শান্তিনিকেতনের এক ধরণের উরোপীয় শাখা, একটি বিশ্বমৈত্রীভবন, একটি কেন্দ্র এবং আন্তর্জাতিক মহাফেজখানা ইউরোপীয়-এশীয় প্রকাশনার ভিত্তি-পত্তনের জন্যে আমাদের একমত হওয়ার।…তিনি আমার সঙ্গে দেখা না-করেই চলে গেলেন।…"

কবি রোলাঁর ক্ষোভ ও অভিমানের কারণটি স্পষ্টই বুঝিলেন। রোলাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ-আলোচনার জন্য তিনি নিজেও কম উদ্‌গ্রীব ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার আর কোনো উপায় ছিল না। কী পরিস্থিতির মধ্যে তাঁহাকে দেশে ফিরিতে বাধ্য হইতে হয়—এবং রোলাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ আলোচনার জন্য কবি কতখানি ব্যগ্র-এসব কথা খুলিয়া তিনি কালিদাস নাগের মাধ্যমে রোলাঁকে এক পত্রে (২৫শে ফেব্রুয়ারী '২৫) লিখিলেন (ভারতবর্ষ॥ পৃ ৮৯):

"আমার অতিপ্রিয় বন্ধু—আমি ভগ্ন ও নিঃশেষ হয়ে ফিরেছি। আমি ফিরেছি সেই দেশে যে-দেশ মেতে আছে অনেক কিছু নিয়ে, যে-দেশের অন্তত আমার সম্পর্কে বা আমার আদর্শ সম্পর্কে ভাবার স্বাধীনতা নাই। আমি অনুভব করি এখানে অন্তত এই মুহূর্তে, আমি প্রয়োজনীয় নই। আমার ভয় হয়, আমার আন্তর্জাতিক মৈত্রীর আদর্শকে অসময়োচিত বলে, অধিকন্তু, এক কাব্যিক বিলাস—যাতে গা ঢেলে দেবার ঝুঁকি আমাদের যুগ নিতে পারে না বলে, আমার দেশের লোক না ভাবতে শুরু করে।

"কিন্তু আমি একই সময়ে অনুভব করি যে, আমার জন্যে এক দেশ আছে, আমার জন্যে এক বন্ধু আছেন, আর আছেন আমার আদর্শের জন্য আমার সহযোগীরা, আছেন সহায়করা। তাঁদের সবাইকে আমি আবিষ্কার করি আপনার মাধ্যমে, আপনার গভীর বন্ধুত্বের মাধ্যমে একজনের মধ্যে।…"

পরিশেষে কবি লেখেন,

"যদি আমি আরও কিছুদিন বাঁচি, যদি চিকিৎসকরা অনুমতি দেন, প্রথম যা করব তা হচ্ছে আপনার কাছে যাবো, আপনাকে শান্তিনিকেতনে আনার চেষ্টা করবো, দেখবেন সেখানে আপনার স্থান প্রস্তুত হয়ে আছে। চিকিৎসকরা বলেন যে, এখন থেকে ভীতিজনক গ্রীষ্মকালটি আমাকে ইউরোপে কাটাতে হবে। সেক্ষেত্রে আমি আপনার কাছেই সুইজারল্যাণ্ডে আমার গ্রীষ্মাবাস বানাবো এমনভাবে যে, আমার জীবনের শেষ কটি দিন আমি শুধু আপনার বন্ধু হিসেবেই বেঁচে থাকবো না, বেঁচে থাকবো মহৎ উদ্দেশ্যের কর্মে আপনার সহকর্মী হিসাবে।"

এই প্রতিশ্রুতি রাখিতেই ১৯২৬ সালে কবি ইউরোপে যান।

• পৃ ২৩০ :

এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের গতিবিধি ও কার্যকলাপের (এবং সেই সঙ্গে

শান্তিনিকেতনে বিপ্লবীদের যাতায়াত ও কার্যকলাপের) উপর পুলিসের কড়া নজর থাকে। কবির চিঠিপত্রাদিও (বিশেষত তাঁহার বিদেশী ডাকের) পুলিসের সেন্সর বিভাগের কেরামতীতে বেশ গোলমাল হইতে থাকে। রামানন্দবাবু 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি সরকারী নেকনজর'—এই শিরোনামে 'প্রবাসী'-তে (শ্রাবণ, ১৩৩২) সরকারী সেন্সরবিভাগের কেরামতীর স্বরূপ ফাঁস করিয়া দীর্ঘ সমালোচনা করেন।

প্রসঙ্গত বলা দরকার, এই সময় জনৈকা মার্কিন মহিলা (খুব সম্ভবত মিসেস্ ডোরোথি স্ট্রেট—পরবর্তীকালে এলমহার্স্টের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়) বিশ্বভারতীর জন্য কবি রবীন্দ্রনাথকে ৫০,০০০ ডলার দান করিতে চাহিলে পুলিসের পরামর্শে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ তাহাতে বাধা দেয়। এই সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে গিয়া পুলিসের যেসব গোপন নথিপত্র ও চিঠিপত্র চালাচালি হয় তাহাতে অনেক চাঞ্চল্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি প্রকাশ পায়। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বেই আমরা অন্যত্র বিস্তারিত তথ্যপূর্ণ আলোচনা ('রবীন্দ্রনাথ : সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সঙ্গে সম্পর্ক''—'নন্দন'-শারদীয় সংখ্যা ১৩৮৯) করিয়াছি। চিন্মোহন সেহানবীশ মহাশয়ও তাঁহার 'রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী সমাজ' গ্রন্থে ঐ প্রবন্ধের দীর্ঘ উদ্ধৃতি (সেই সঙ্গে আরও অনেক মূল্যবান তথ্যের সন্ধান) দিয়াছেন। সম্প্রতি সনৎকুমার বাগচী মহাশয়ও তাঁহার 'রবীন্দ্রনাথ ও কয়েকজন রাজপুরুষ' শীর্ষক গ্রন্থে এই সম্পর্কে বেশ কিছু মূল্যবান তথ্য ও চিঠিপত্রের সন্ধান দিয়াছেন। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ বাহুল্যমাত্র।

* পৃ ২৫১ :

এই সময় খ্রীস্টান মিশনারীদের জঘন্য সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধি এবং ভূমিকার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানাইয়া রবীন্দ্রনাথ '*Current Thought*'পত্রিকায় বিবৃতির আকারে একটি রচনা প্রেরণ করেন। রচনাটি'*Christian Missionaries and the English Clergy*'—এই শিরোনামে *Modern Review* তে (October, 1925. pp 433-35) পুনরমুদ্রিত হয়। বিগত মহাযুদ্ধের সময় কিভাবে এইসব ধর্মযাজক এবং ধর্মপ্রচারকরা ঈশ্বরের নিকট আপন-আপন রাষ্ট্রের জয়কামনা বা প্রার্থনা করিয়া হিংসা, ঘৃণা এবং বীভৎস ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের মহিমাগান করিয়াছিলেন, কবি তাহার উল্লেখ করিতে গিয়া লিখিলেন,

"During the time of war, they put up God as the leader of their own party, brought over to their side by their prayer and worship. Not only they nourish under the cover of their profession of love a racial and sectarian contempt but also political antagonism for the people of a different country and creed. It has been brought vividly home to our mind that the missionaries are on one side and we are on the other.

They are ever ready to convert us to their faith ; but there not prepared to treat us as one of themselves. The Christian missionaries, of all persons on earth, ought tohave undertaken the noble task of uniting nationwithnation with a just respect for the right and privileges of all. But the opposite has bonn true. It is the Christian missionarieswho more than any others have created a gulf of difference between Christians and non-Christians."

ভারতবর্ষে এইসব খ্রীশ্চান মিশনারীদের ঘৃণ্য আচরণ ও ভূমিকার প্রকৃত স্বরূপটি উদ্ঘাটন করিতে গিয়া কবি লিখিলেন,

"In India there exists a great national barrier of indomitable pride between the rulers ane the ruled. The missionaries have added to the volume and strength of that pride by their rligioun and social segregationand consciousness of their political prestige.

..."I see at every step their deviation from the great work they have undertaken of establishing Christ in the heart of the nations. During the last Boer War, why did the clergy merely look on ? Now, when two great fat-bodied mistress of Europe, England and Russia are ready with big fish knives to cut asunder into two unequal pieces poor Persia, why are the clergy once more looking on idle and inactive ?...

"In India again, is there no act of injustice beingdone with regard to the coolie-recruiting matters, the conditions of the the indentured labourers in the colonies, together with the treatment of Indians by the Europeans in India itself ? In some great cause, where they, are in a body, in the name of Jesus Christ, might stand by the poor the weak and the oppressed millions ot our country—have we ever had an opportunity of seeing such a heavenly sight ?"

"Hence in spite of the presence of the clery thrughout the parishes of England political leaders do not hesitate to commit lutcheries and dacoities in England's name while organised Chritifnity looks on andtakes no notice, or else holds up its hands in despair."

* পৃ ২৬২ঃ

প্রমথ চৌধুরীর 'রায়তের কথা' শীর্ষক মূল নিবন্ধটি 'সবুজপত্রে' (ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩২৬) প্রকাশিত হয়। সম্মুখে কাউন্সিল নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচনী ইস্তেহারে কি কি মূল কর্মসূচী গ্রহণ করা উচিত, সেই প্রসঙ্গেই প্রমথ চৌধুরী মহাশয় তাঁহার বন্ধু জ্ঞানেন্দ্রমোহন রায়ের প্রশ্নের জবাবে 'খোলাচিঠি'র আকারে এই পত্র-প্রবন্ধটি রচনা করেন। 'জমিদারী প্রথা' বা 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'-এর উচ্ছেদ করিয়া (স্বাধীন ভারতবর্ষে) কিভাবে 'গণতান্ত্রিক ভূমি-সংস্কার নীতি' প্রবর্তন করা যায়, সে-প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী এই প্রবন্ধ লেখেন নাই। ১৮৮৫ এর 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে'র সংস্কার উপলক্ষেই তিনি বাংলার চাষীদের 'রায়তী স্বত্ব' (*Peasant's proprietory right*) পুনরুদ্ধারের জন্য প্রবল জনমত ও আন্দোলন তুলিবার উদ্দেশ্যেই বন্ধুবর জ্ঞানেন্দ্রমোহন রায়কে উদ্দেশ করিয়া এই নিবন্ধটি রচনা করেন (দ্র 'প্রমথ চৌধুরীর রচনাবলী'—বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত সংস্করণ)। মূল পত্রপ্রবন্ধের শুরুতেই ছিল ঃ

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন রায়

সুহৃদ্বরেষু,

বাঙলার নতুন কাউন্সিলে নতুন ইলেকসনের জন্য কি প্রোগ্রাম হাতে নিয়ে লোকের সম্মুখে আমাদের খাড়া হওয়া কর্তব্য, সে বিষয়ে তুমি আমার মত জানতে চেয়েছে"...

পুস্তিকাকারে প্রকাশের সময় এই অংশটি বর্জিত হইয়াছে।

প্রসঙ্গত স্মরণ রাখা দরকার, 'সবুজ পত্রে' যখন প্রমথ চৌধুরীর এই নিবন্ধটি প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথ তখন বিলেতে (১৯২০-২১)। প্রায় বছর ছয়েক পর প্রমথ চৌধুরী তাঁহার নিবন্ধটি সম্পর্কে কবির মতামত জানাইবার অনুরোধ করিলে তিনি 'রায়তের কথা' শীর্ষক প্রবন্ধটি রচনা করিয়া 'সবুজপত্রে' পাঠাইয়া দেন। কবির এই সমালোচনার সঙ্গেই প্রমথ চৌধুরী মশায়ের টীকা সহ 'সবুজপত্রে' (১৩৩৩, আষাঢ়) প্রকাশিত হয়। এই তিনটি রচনা গ্রন্থাবলীতে একত্রে প্রকাশিত হয়। প্রমথ চৌধুরী স্বয়ং উহার 'মুখপত্র'-এ লিখিতেছেন (দ্রঃ বসুমতী সাহিত্য মন্দির সংস্করণে) ঃ

"আমার লেখা 'রায়তের কথা যখন 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিলেতে। এই কারণে সে প্রবন্ধটি সে-কালে তাঁর চোখে পড়েনি। সম্প্রতি তিনি আমার অনুরোধে সেটি পড়ে এ বিষয়ে তাঁর মতামত সম্বলিত একখানি পত্র আমাকে লেখেন। এ পত্র অবশ্য লেখা হয়েছে ছাপবার জন্য।

"এ লেখা টীকা সমেত 'রায়তের কথা'র ভূমিকা স্বরূপে প্রকাশ করবার অনুমতি রবীন্দ্রনাথ আমাকে দিয়েছেন।"

এই সময় 'ভারতী' পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদিকা সরলা দেবী 'প্রবাসী' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কিছু মন্তব্য করিলে রবীন্দ্রনাথ উহার প্রতিবাদে 'সবুজ পত্র'-এ (আশ্বিন ১৩৩৩) দীর্ঘ পত্র দেন। কবির প্রতিবাদ-

পত্রের এক জায়গায় প্রমথ চৌধুরীর 'রায়তের কথা' নিবন্ধের সমালোচনায় তাঁহার রচনাটি 'ভারতী'তে মুদ্রণ প্রসঙ্গে কিছুটা ক্ষোভ প্রকাশ পায়। সেটি ছিল এই :

"শ্রীমান প্রমথ চৌধুরীর 'রায়তের কথা' বলে তাঁর একটি প্রবন্ধ সবুজপত্র থেকে উদ্ধৃত করে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন। সেই পুস্তিকা সম্বন্ধে আমার অভিমত তাঁকে সম্বোধন করে পত্র আকারে লিখেছিলেম। সম্পাদকীয় নির্বন্ধবশত সবুজপত্রে না দিয়ে সেটা ভারতীতে পাঠানো হয়। আজ সেটা পড়তে গিয়ে দেখলেম ছাপার ভুলে আপাদমস্তক শরশয্যাগত সেই প্রবন্ধে প্রমথর নাম আছে বটে কিন্তু কোথাও সম্বন্ধ কারকের কোনো সম্বন্ধ নেই।"

* পৃ: ২৭৪ :

২২ শে জুন (১৯২৬), রবীন্দ্রনাথ সদলবলে সুইজারল্যাণ্ডের ভিলেন্যভে পেঁাছানর পর প্রায় রাত্রি ১২ টা নাগাদ রম্যাঁ রোলাঁ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তার পর বেশ কয়েকদিন রোলাঁ ও তাঁহার বন্ধুদের সহিত তাঁহার ইতালি ভ্রমণ এবং ইতালির ফ্যাসিস্ট-শাসন সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা হয়। রোলাঁ ও তাঁহার বন্ধুরা দীর্ঘ চেষ্টা ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কি ভাবে মুসোলিনী ও ইতালির ফ্যাসিস্ট শাসনের অমানুষিক বর্বরতা সম্পর্কে কবিকে সচেতন করিয়া তুলিতে সমর্থ হন, রোলাঁ স্বয়ং তাঁহার দিনলিপিতে ('ভারতবর্ষ'' ॥ ৯৭-১৭৯) তাহার দীর্ঘ তথ্যপূর্ণ বিবরণ দিয়াছেন।

অবশ্য রোলাঁর এই দিনলিপিতে রবীন্দ্রনাথের ইতালি ভ্রমণ এবং বিবৃতি-দান সংক্রান্ত ব্যাপারে কবির মানসপ্রকৃতি, স্বভাব ও চারিত্রবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অনেক জায়গায় লঘু, অসংযত মন্তব্য প্রকাশ পাইয়াছে। রোলাঁ এবং মার্শেল মার্তিনে, জর্জেস দুআমেল, এমিল রণিজে প্রমুখ রোঁলার বন্ধুরা রবীন্দ্রনাথের নিকট ইউরোপীয় মানসিকতা এবং রাজনৈতিক সচেতনতা দাবী বা প্রত্যাশা করিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই তাঁহারা প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথের নিকট মুসোলিনী এবং ইতালির ফ্যাসিস্ট-শাসন ইত্যাদি সম্পর্কে অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গীতে কঠোর ভাষায় প্রেস-বিবৃতিদানের পরামর্শ দিতেছিলেন—যাঁহার ইতালির ফ্যাসিস্ট শাসন ও পৈশাচিক পীড়ন-অত্যাচার সম্পর্কে কোনো প্রত্যক্ষ পূর্ব-অভিজ্ঞতা এবং জ্বলন্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ জানা ছিলনা। রবীন্দ্রনাথ এবং সেই সঙ্গে ভারতের বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতাদের চেতনার মান বা স্তর (বিশেষত ইউরোপের সমকালীন ঘটনাবলী) সম্পর্কে রোলাঁর ও তাঁহার বন্ধুদের কোনো পরিষ্কার ধারণা ছিল না ;—যেমন পরিষ্কার ধারণা ছিল না রোলাঁর, ভারতের রাজনৈতিক ঘটনাবলী ও বাস্তব প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ফ্যাসিজম সম্পর্কে অচিরেই তাঁহারা ভুল বুঝিতে পারিয়া তাঁহার ইতালি ভ্রমণ সংক্রান্ত ব্যাপারে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং ফ্যাসিজমকে ধিক্কার জানাইয়া ফ্যাসিস্ট ইতালির সঙ্গে তাঁহার সকল সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করেন। শুধু রোলাঁ ও তাঁহার বন্ধুদের মুখে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শুনিয়াই নয়—অধ্যাপক সালভাদোরি ও সালভেমিনি, ডাঃ এঞ্জেলিকা

বালবানোফ, ও সিনর মডগলিএনি প্রমুখ ইতালি হইতে বিতাড়িত এবং ফ্যাসিস্ট-অত্যাচারে উৎপীড়িত বুদ্ধিজীবীদের মুখে প্রকৃত ঘটনা ও বিবরণ শুনিয়া মুসোলিনী ও ফ্যাসিস্ট শাসনের আসল স্বরূপ সম্পর্কে কবি সচেতন হইতে পারিয়াছিলেন। অবশ্য কবির ভুল ভাঙাইবার জন্য উপরোক্ত বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ-আলোচনার ব্যাপারে রোলাঁই প্রায় সব ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ঐ-সব সাক্ষাৎ-আলোচনার পর কবি ভয়ানক বিচলিত হন। গভীর অনুশোচনায় তিনি অনুক্ষণ দগ্ধ হইতেছিলেন। ১৫ই জুলাই (১৯২৬), ভিয়েনা হইতে এক পত্রে কবি রোলাঁকে লিখিতেছেন (ভারতবর্ষ॥ পৃ ১৫২-৫৪):

"আপনার সান্নিধ্য ছেড়ে এসে ঘরছাড়া-আমি দিশাহারা বোধ করছি।··· জুরিখে শ্রীমতী সালভাদোরির সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তার ফলাফল পরে দেখবেন। ইতালিতে আমি নিজেকে অশুচি হতে দিয়েছি তার শুদ্ধি অনুষ্ঠানের (cérémonie de purification) মধ্যে দিয়ে আমাকে যেতে হবে।"···

ঐ দিনই প্রশান্ত মহলানবিশ এই সব সাক্ষাৎ-আলোচনার পর কবির গভীর মানসিক যন্ত্রণা ও প্রতিক্রিয়ার সংবাদ দিয়া রোলাঁকে লিখিলেন:

"অধ্যাপক সালভেমিনি কবিকে লিখেছেন এবং আমরা দেখা করার দিনক্ষণ ঠিক করার চেষ্টায় আছি। ভিয়েনায় থাকতেই সিনর মোদিগ্লিয়ানির সঙ্গে দেখা করার কথা তিনি কবির কাছে পেড়েছেন,···—জুরিখে শ্রীমতী সালভাদোরির সঙ্গে সাক্ষাৎ খুবই আগ্রহোদ্দীপক হয়েছে। তিনি যা বলেছেন তাতে কবি অত্যন্ত বিচলিত হয়েছেন।···আমি সাক্ষাৎকারের নোট নিয়েছি···শ্রীমতী সালভাদোরি তাঁর অবস্থা পরিষ্কার ভাবে দেখিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পরদিনই কবি ফর্মিকিকে একটা চিঠি লিখেছেন···এই মুহূর্তে তিনি ফ্যাসিবাদী আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর ধারণার কথা লিখতে—বরং সংশোধন করতে ব্যস্ত। গতকাল হঠাৎ তিনি আমাকে ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে অনেকগুলো প্রশ্ন করেছিলেন। দেখতে পেলাম এ সম্পর্কে তিনি ভীষণ ভেবেছেন। প্রকৃতপক্ষে, শ্রীমতী সালভাদোরির সঙ্গে সাক্ষাতের পর থেকেই তিনি অত্যন্ত বিচলিত মানসিক অবস্থায় আছেন এবং আমি জানি যে, তাঁর মনোভাবের যথাযোগ্য প্রকাশ যতক্ষণ না ঘটাতে পারবেন, তাঁর এই অবস্থা কাটবে না। ভিলেন্যভে তিনি এই প্রশ্নের ব্যক্তিগত চেহারার সঙ্গে মুখোমুখি হননি; এবং স্বাভাবিক ভাবেই, তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী, তিনি একে দেখেছেন বিচ্ছিন্ন ও বুদ্ধিগত দৃষ্টিকোণ থেকে। কিন্তু শ্রীমতীসালভাদোরির সঙ্গে সাক্ষাতেরপর থেকেতিনি সম্পূর্ণ পাল্টে গেছেন। এখন তিনি সোজাসুজি অনুভব করতে পারেন, শুধুমাত্র বুদ্ধিগতভাবে আর নয়। ইতালিতে যাওয়ার জন্যে চরম ক্ষুব্ধ; কিন্তু তিনি বলেন যে, তাঁর অন্য কোনো উপায় ছিল না, কারণ তাঁকে ইউরোপে আসতে হবে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আর, ইতালি না হয়ে তিনি আসতে পারতেন না। ইতালীয়দের কাছে তাঁর গতবছরের প্রতিশ্রুতির জন্যে তিনি একেবারে ইতালিকে বাদ দিতে পারেন নি।"···

সপ্তাহ খানেক পর—২১ শে জুলাই প্রশান্ত মহলানবিশ আর একখানি পত্রে রোলাঁকে লিখিলেন:

"রবীন্দ্রনাথ সালভের্মিনির একখানা, অধ্যাপক ও শ্রীমতী সালভাদোরির দুখানা চিঠি পেয়েছেন; অনেকক্ষণ ধরে তিনি মোদিগ্লিয়ানির সঙ্গে কথা বলেছেন এবং কথা বলেছেন আঞ্জেলিকা ব্লাবানফের সঙ্গে; ব্লাবানফ কিছুদিন আগেও 'লাভান্তি'তে মুসোলিনির সঙ্গে কাজ করেছেন। সি. এফ. এণ্ড্রুজের কাছে লেখা চিঠির মধ্যেই ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে তাঁর মনোভাবের শেষ প্রকাশ ঘটেছে; সেই চিঠি অবিলম্বে এণ্ড্রুজকে প্রকাশ করতে হবে।"...

এণ্ড্রুজকে এবং অধ্যাপক ফর্মিকিকে লেখা রবীন্দ্রনাথের এই খোলা-চিঠিগুলি প্রকাশিত হইলে সারা বিশ্বে উহার নানা প্রতিক্রিয়া ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এমনকি ভারতবর্ষেও, বিশেষ করিয়া বাংলা দেশে, উহা কম চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে নাই। কবির সব চেয়ে দুঃখ ও ক্ষোভের কারণ এই যে, তাঁহার অন্তরঙ্গ প্রিয় সুহৃদ রামানন্দবাবুর 'প্রবাসী' ও *Modern Review* পত্রিকায়ও উহার তীব্র সমালোচনা হইতে থাকে। রথীন্দ্রনাথ এবং প্রশান্ত মহলানবিশ, কবির দুই সেক্রেটারীর বিরুদ্ধে তীব্র শ্লেষ ও কটাক্ষ করা হয়। এমনকি, খোদ কবির উদ্দেশে কটাক্ষ ও বক্রোক্তি করিতেও ছাড়ে নাই। 'প্রবাসী' আশ্বিন (১৩৩৩) সংখ্যায় এক জায়গায় লেখা হয়,

"কবি বর্তমানে বৃদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার পক্ষে ইউরোপীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রের সকল খবরাখবর লইয়া দেশভ্রমণে বহির্গত হওয়া সম্ভব নহে।...কিন্তু যদি তিনি বা তাঁহার কর্মসচিবগণ উন্মুক্তচক্ষু অবস্থায় সংকীর্ণ স্বদেশবাদের চরম উদাহরণ ইতালীর প্রভু মুসোলিনির আতিথ্য গ্রহণ করিয়া প্রথমতঃ উন্নত ও উদার বিশ্বপ্রেমবাদীর অনুপযুক্ত কার্য করেন ও দ্বিতীয়তঃ যে কোন কারণ দেখাইয়া তীব্র সমালোচনায় সেই মুসোলিনির আতিথেয়তার প্রতিদান করেন, তাহা হইলে অন্তত একথা বলতে হয় যে, ব্যাপারটি সকল দিক্ হইতে দেখিলে আদর্শরূপে সম্পন্ন হয় নাই।...

"...কিন্তু তাঁহার বিচক্ষণ কর্মসচিবদ্বয় শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ (যাঁহারা যুবক, বর্তমানে জগতের সকল অবস্থা সম্বন্ধে সজাগ, ইয়োরোপ আমেরিকার বহু মনীষীর সহিত পত্রালাপে তৎপর এবং সুচিন্তা ও সুব্যবস্থায় বিচক্ষণ তাঁহারা) কি বলিয়া কবিকে ইতালীর স্বেচ্ছাচারী নেতা ও মানব-স্বাধীনতার আদর্শের বিরুদ্ধাচারী মুসোলিনির গৃহে অতিথিরূপে লইয়া গেলেন?...যে অদূরদর্শিতার ও আদর্শ নিষ্ঠার অভাবের পরিচয় আমরা ঐ বিশ্ববিদ্যালয় ঘটিত (কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বিশ্বভারতীর সম্পর্ক স্থাপনের—লেখক) ব্যাপারে প্রথম পাই আজ কবির কর্মসচিবদিগের ইতালীয় 'এ্যাড্‌ভেনচারে' আমরা তাহারই পরিচয় দ্বিতীয় দফায় পাইলাম।...

"ভগবান কবি ও বিশ্বভারতীকে 'ফরেন পলিসি' 'ডিপ্লোম্যাসি' ও 'হাই-ফাইনান্সের' কবল হইতে রক্ষা করুন। তাঁহার অনুচরদিগের মধ্যে এসকল দিকে আকাঙ্ক্ষা যাহাদিগের আছে, তাঁহাদিগের স্থান 'স্বরাজ পার্টিতে' বিশ্বভারতীতে নহে।"

বলা বাহুল্য, 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ'-এর ঐসব রচনায় কবি স্বয়ং এবং রথীন্দ্রনাথ ও প্রশান্ত মহালানবিশ মহাশয়ও অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হইয়াছিলেন। রামানন্দবাবুও তখন ইউরোপে। ভিয়েনায় রামানন্দবাবু কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তিনি তাঁহার মনোবেদনা ও ক্ষোভ গোপন করিতে পারেন নাই। কয়েকদিন পর রামানন্দবাবুর উদ্দেশে লেখা (ভিয়েনা—২৫শে অক্টোবর, ১৯২৬) এক দীর্ঘ চিঠিতে কবি তাঁহার তীব্র মনোবেদনা ও ক্ষোভ জ্ঞাপন করিতে গিয়া লিখিলেন, ('কবির সঙ্গে ইউরোপে' ॥ পৃ ২১২-১৫) ঃ

"প্রথমত বুঝতে হবে, আপনার কাগজে আমার সম্বন্ধে বিরুদ্ধতা স্বতই অতি পরিমাণ লাভ ক'রে লোকের চোখে উগ্র হয়ে লাগে। নায়কের মতো কাগজে এর গুরুত্ব অনেক কম। এই লেখায় সাধারণ লোকে যে চমৎকৃত হয়েছে, দেশের কোনো কোনো চিঠিতে তার পরিচয় পেয়েছি।

"দ্বিতীয়ত আমার সম্বন্ধে এরকম তীব্র ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও অবজ্ঞাসূচক উক্তি দেশী বিদেশী শত্রুমিত্র কারো কাছ থেকে অনেক দিন পাইনি। যাদের সঙ্গে সমাজ বা রাষ্ট্র সম্বন্ধে আমার মতান্তর আছে, আমার মত ও আচরণকে আক্রমণ করবার তাদের ন্যায্য অধিকার আছে। কিন্তু আপনার কাগজে এটা মতঘটিত প্রতিবাদ নয়, ব্যক্তিগত অবমাননা।...নন-কোঅপারেশনের ঘোর আন্দোলনের মুখেও আমার বিরুদ্ধবাদী কোনো পত্রে এমন ভাবে আমার প্রতি গ্লানিপূর্ণ শ্লেষ প্রয়োগ সম্প্রতি কোথাও ঘটেছে বলে জানি নে।

"মডার্ন রিভিউ, প্রবাসীতে যে-প্রসঙ্গে সমালোচনা বেরিয়েছে সে হচ্ছে ফ্যাসিস্ট দলের প্রতি আমার আতিথ্য-বিরুদ্ধ ব্যবহার। সে-সম্বন্ধে আমার যদি অপরাধ হয়ে থাকে, তাহলে বন্ধুরা কিছু পরিমাণে ক্ষুব্ধ হতেও পারেন ; কিন্তু তাঁদের রক্ত অত্যন্ত বেশি গরম হয়ে ওঠবার মতো বিষয় এটা নয়। আমার পত্র প্রকাশের পর ইটালীর বাহিরে ভারতবর্ষ ও য়ুরোপের নানাস্থানের কাগজ থেকে কাটা টুকরো পেয়েছি। কোথাও কেউ আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বক্রোক্তি করেনি। আমার কৈফিয়ৎ শান্তভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গেই গ্রহণ করেছেন। এমন কি ফর্মিকিও নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হলেও দুঃখ প্রকাশ করেছেন ; আমাকে অসম্মান করেননি।

"লেখাটাকে 'ভুল' বলছেন। কিসের ভুল ? ঘটনার ভুল ? এ সম্বন্ধে যেটুকু ঘটনা প্রাসঙ্গিক সে আমার চিঠিতেই আছে। কিন্তু লেখক ব্যঙ্গ ক'রে বলেছেন, চিঠি আমার কিনা, তাঁর সন্দেহ রয়ে গেছে। অর্থাৎ তাঁর মতে চিঠি আমার এতই অযোগ্য যে ওটাকে জাল বলে মনে করলেই আমার লজ্জা রক্ষা হয়। বোধ হয় ইটালীর কোনো ফ্যাসিস্ট কাগজেও এমন ছদ্ম সন্দেহের কুটিল অলংকার প্রয়োগ করা হয়নি।"

কবি জানিতেন, 'মডার্ন রিভিউ' ও 'প্রবাসী'-তে তাঁহার ইতালি ভ্রমণ ও বিবৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে ঐ-সব বিরূপ সমালোচনা ও মন্তব্যাদির পশ্চাতে রামানন্দবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র অশোক চট্টোপাধ্যায়ের ('ক্ষুদ্র') প্রধান ভূমিকা ছিল। কবির ক্ষোভ সেজন্য নয়—কালিদাস নাগ এবং তাঁহার পত্নী শান্তাদেবীর মত

অতি প্রিয়জনেরাও এ সবের প্রতিবাদে কিছুই বলিলেন না, এইটিই তাঁহার ক্ষোভ দুঃখ ও অভিমানের প্রধান কারণ। রামানন্দবাবুকে লেখা পত্রে কবি সেকথাও না জানাইয়া পারেন নাই। তিনি লিখিলেন,

"মডার্ন রিভিউতে ও তার পনেরো দিন পরে প্রবাসীতে সর্বজনগোচরে যে অবমাননা আমার বিরুদ্ধে প্রকাশ করা হয়েছে, তারাও যে তা স্বীকার ক'রে নিতে পারলে, এইটেই আমাকে সবচেয়ে বেদনা দিয়েছে। অবশ্য কর্তব্যের দাবী আত্মীয়তার দাবীর চেয়ে বেশি। এক্ষেত্রে সেই দাবী এত অত্যন্ত জরুরী ছিল যে ভাষায় অপরাধীর প্রতি সামান্য সৌজন্যের সংযম রক্ষাও অসাধ্য হয়েছিল।"

মডার্ন রিভিউ-য়ে এসব সমালোচনায় রোলাঁও কম বিস্মিত হন নাই। এ ব্যাপারে কবির ক্ষোভ ও উষ্মা প্রকাশের কথাও রোলাঁ শুনিয়াছিলেন। তিনিও তাঁহার দিনপঞ্জীতে (ভারতবর্ষ ।। পৃ ১৭৮) ঘটনাটির উল্লেখ করিতে ভোলেন নাই,

"...এমন কি, রবীন্দ্রনাথের গোষ্ঠীরমধ্যেও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ('মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদক) এক ছেলে, রবীন্দ্রনাথের নামে ইতালীয় সংবাদপত্রের চালিয়ে-দেওয়া ফ্যাসিবাদের সমর্থনসূচক উক্তিগুলোর প্রতিবাদ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশের ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন।—এতে রবীন্দ্রনাথ চটে গেছেন।"

কয়েকদিন পর রোলাঁ মডার্ন রিভিউ-এ ফ্যাসিজমের এই তৈলাক্ত প্রচার কার্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার জন্য কালিদাস নাগকে এক পত্র দেন।—তাঁহার বড় কুটুম্বটিই যে এই কার্যের 'মুখ্য উস্কানিদাতা' রোলাঁ তাহার পত্রে সে কথাও পরিষ্কার উল্লেখ (ভারতবর্ষ ।। পৃ ১৭৯) করিলেন।

রোলাঁর এই দিনপঞ্জীতে রবীন্দ্রনাথের এবারকার ইতালি ভ্রমণ সম্পর্কে একটি মূল্যবান তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। ইতালি যাত্রার শুরু হতেই রবীন্দ্রনাথ এবং রথীন্দ্রনাথ ও প্রশান্ত মহলানবিশ প্রমুখ কবির সচিবরা কি ভাবে মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ট অনুচরদের দ্বারা প্রতারিত হইয়াছিলেন, শ্রীমতী আদ্রে কার্পেলে তাহার বিবরণ মাদলিন রোলাঁকে দেন। রোলা তাঁহার দিনপঞ্জীতে তাহার যে সংক্ষিপ্ত নোট্ রাখিয়াছিলেন, তাহাতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্য, কবির ইতালি সফরকালে কার্পেলে-দম্পতি কবির সঙ্গে মিলিত হন। মুসোলিনী ও ইতালির ফ্যাসিস্টশাসন সম্পর্কে কবিকে হুঁসিয়ার করিয়া দিবার জন্যই তাঁহারা ইতালি গিয়াছিলেন। রোলাঁর দিনপঞ্জীতে কার্পেলে-দম্পতির এই বিবরণের সংক্ষিপ্ত নোটে লেখা (পৃ ১৭৬-৭৯) আছে:

..."রবীন্দ্রনাথের ইতালি সফরের পরিকল্পনায় তিনি ও তাঁর স্ত্রী (কার্পেলে দম্পতি) অস্বস্তি বোধ করেছিলেন; ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তাঁকে হুঁসিয়ার করে দেবার চেষ্টাও করেছিলেন, কিন্তু সফরে ইচ্ছুক কবি ঝুঁকেছিলেন সব কিছুর আগে তাঁর বয়স্ক-শিশুসুলভ কৌতুহল মেটাতে, তিনি কিছুতেই শুনতে চাননি এবং এই সব মন্তব্যকে বিশিষ্ট ও অযৌক্তিক এক নৈরাশ্যবাদের ফল বলেই গণ্য করেছিলেন। তা এসেছিল তাঁর সংস্কৃতবিদ্ দুই বন্ধু অধ্যাপক ফর্মিচি

ও 'সেই ব্যক্তির' (তুচ্ছ—লেখক) কাছ থেকে, দুজনেই ফ্যাসিস্ট (কিন্তু 'সেই ব্যক্তি' ফ্যাসিস্ট বিরোধিতার ভান করতেন)। হঠাৎ ফর্মিচি এসে বলেছিলেন, এক ইতালীয় জাহাজে জায়গা ঠিক হয়েছে। কিন্তু যখন রথীন্দ্রনাথ ও তাঁর স্ত্রী জাহাজে উঠতে গেলেন, ফর্মিচি তাতে বাধা দিলেন, জোর দিয়ে বললেন যে, এই জাহাজে তাঁদের মতো জায়গা নেই ; নিজের লোকজনদের কাছ থেকে কবিকে তিনি আলাদা করার চেষ্টা করেছিলেন। যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে, রবীন্দ্রনাথের ছেলে ও ছেলের স্ত্রী এই বলে ভীষণ জোরাজুরি করেছিলেন যে, কবির স্বাস্থ্য এমন নয় যে তাঁকে একলা যেতে দেওয়া চলে ঃ এবং তাঁদের নিতেই হয়েছিল ; কিন্তু এই সময় থেকেই ফর্মিচি তাদের শত্রুভাবে দেখছেন। —জাহাজ নেপলস্ পৌঁছুল। রবীন্দ্রনাথের কিছু বন্ধু আগে খবর পেয়ে জাহাজ-ঘাটায় এসেছিলেন স্বাগত জানাতে ; কার্পেলেরা এসেছিলেন প্যারী থেকে ; এলমহার্স্ট লণ্ডন থেকে। প্রথম কোলাকুলির আনন্দে তাঁরা যখন ভরপুর, ফর্মিচি তাঁদের আলাদা করে দিলেন, কবিকে বললেন, 'দশমিনিটের মধ্যে রোমের স্পেশাল ট্রেন ছাড়বে।' আর সেই ট্রেনে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের আসনই সংরক্ষিত ছিল।—এলমহার্স্ট চটেমটে ইংলণ্ডে রওনা দিলেন। কার্পেলেরা রথীন্দ্রনাথ ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কয়েকদিন নেপ্‌লস'-এ রইলেন। এই সময়টাতে কবিকে পুরোপুরি একা ফর্মিচি ও মুসোলিনির কাছে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। মহলানবিশ শুধু অন্য এক জাহাজে জায়গা জোগাড় করতে পেরেছিলেন, পেঁছেই সঙ্গে সঙ্গে ছুটেছিলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলতে ; কিন্তু তার মধ্যেই মুসোলিনির সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়ে গিয়েছে। কবি শুধুমাত্র দর্শন ও সাহিত্যগোত্রের একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেবার ছুতোয় ফর্মিচি দিয়েছিলেন মুসোলিনির গৌরব সম্পর্কে এক জ্বালাময়ী দীর্ঘ বক্তৃতা। জমায়েতকে সতর্কভাবে বাছাই করা হয়েছিল ; উর্দিপরা পতাকা হাতে ফ্যাসিস্টদের দিয়ে মঞ্চ বোঝাই করে ঘিরে রাখা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ইতালীয় ভাষা জানেন না, ধৈর্য ধরে বসেছিলেন, ফাঁদটির গন্ধও পান নি।—তাঁকে দিয়ে অসংখ্য সাদা পোষ্টকার্ড সই করিয়ে নেওয়া হয়েছিল। সরল বিশ্বাসে তিনি সই করেছিলেন। ভীরুতায় জড়তাগ্রস্ত হয়ে ক্ষমতাহীন ছেলে বসে থেকেছেন।"···

সব শেষে, কবির বিদায়কালীন ঘটনার বিবরণ দিয়ে কার্পেলে বলেন,

···"সর্বশেষে, যখন রবীন্দ্রনাথ ইতালি ছেড়ে যাচ্ছেন, ফর্মিচি এসে তাঁর কাছে ইতালিকে ধন্যবাদ জানানোর জন্যে কয়েকটি লাইন লিখে দিতে বললেন— যা তিনি সংবাদপত্রে দিতে পারেন, রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, তাঁর হাতে তুলে দিলেন ;—একমাত্র তখনই রথীন্দ্রনাথ তাঁর ভীরুতা জয়ের এক বীরোচিত প্রচেষ্টা দেখলেন ; ফর্মিচি পালাচ্ছিলেন, তিনি তাঁকে থামালেন, তিনি বুঝেছিলেন হস্তক্ষেপ না করলে পিতৃদেব ভুবেবেন, সব চেয়ে অসত্য উক্তি তাঁর নামে চালানো হবে ; তিনি ফর্মিচিকে বললেন ঃ 'মাপ করবেন, বাবা যা লেখেন আমি সব সময়েই তার কপি রাখি··· ।' আটকা পড়ে বাধ্য হয়ে ফর্মিচি তাঁকে কাগজটা দিলেন, আবার সেটা নিয়ে বেড়িয়ে গেলেন রোষদৃষ্টি হেনে।—রবীন্দ্রনাথের

মোহমুক্তি—যার জন্যে আমরা এতো খেটেছি,—তারপরের বাদ-প্রতিবাদ—সবাই জানে। আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথকে ভুগিয়েছে। —ছোটো একটি সান্ত্বনা যে, এতে ফার্মিচি ভুগেছেন আরও বেশি। রবীন্দ্রনাথের অস্বীকৃতি, ইউরোপীয় সংবাদপত্রগুলোয় তার ধ্বনিপ্রতিধ্বনি—তাঁর ম্যাকিয়াভেলীয় পরিকল্পনার সর্বনাশ ঘটিয়েছে,—এবং সম্ভবত, তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা যে-সাফল্যের প্রত্যাশা করেছিল তারও সর্বনাশ ঘটিয়েছে ঃ মুসোলিনির 'কাজে লাগার বদলে' রবীন্দ্রনাথের সফর তাঁর ক্ষতি ক'রে ছেড়েছে। লোকে বলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। —রথীন্দ্রনাথ ঠিক করে ফেলেছেন, ভারতবর্ষে একবার ফিরলেই তিনি এই ব্যাপারটা নিয়ে লাগবেন। তিনি 'সেই অধ্যাপক'কে (তুচ্চিকে) জিজ্ঞাসা করবেন ঃ 'আপনি ফ্যাসিস্টবিরোধী কি ফ্যাসিস্টবিরোধী নন? যদি হ'ন, তাহলে কী ক'রে ফ্যাসিস্ট সরকারের দৌত্য গ্রহণ করতে পারলেন? যদি ফ্যাসিস্ট হন, এখানে আপনার স্থান নেই।"

রথীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণগ্রন্থ 'পিতৃস্মৃতি'-তে এবং নির্মলকুমারী মহলানবিশের 'কবির সঙ্গে য়ুরোপে' গ্রন্থে, কবির এবারকার ইতালি-ভ্রমণ সংক্রান্ত গোলমালের যে বিবরণ আছে, তাহার সঙ্গে আঁদ্রে কার্পেলে কথিত এই বিবরণীর (কয়েকটি ছোটোখাটো ঘটনার ও বিষয়ের কথা বাদ দিলে) মোটামুটি মিল আছে।

আরও একটা কথা। ইতালি ভ্রমণের পর রবীন্দ্রনাথ স্কাণ্ডেনেভিয়া ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিতে যেভাবে সফর করিয়াছিলেন, সেটাও রোলাঁ খুব ভালো চোখে দেখেন নাই। প্রকাশ্যে না-হইলেও, তিনি তাঁহার এসময়কার দিনলিপিতে এ-সম্পর্কে যে-সব মন্তব্য করিয়াছেন (ভারতবর্ষ॥ পৃ ১৭৯) তাহাতে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সঙ্গীদের সম্পর্কে তাঁহার অশ্রদ্ধা ও বিরূপ মনোভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি মন্তব্য করিয়াছেন,

—"হায়রে? ইতালীয় ফ্যাসিবাদের ফাঁদ এড়াতে না এড়াতে তিনি ধরা দিয়েছেন হাঙ্গারীয় বা বলকান ফ্যাসিবাদের ফাঁদে! হাঙ্গারির মধ্যে দিয়ে তাঁর পথযাত্রার পদধ্বনি আমরা হাঙ্গারীয় বন্ধুদের কাছ থেকে শুনতে পেয়েছি। এটা শোচনীয়। আরও একবার তিনি নিকৃষ্টতম লোকদের কুক্ষিগত হতে এবং তাদের হাতে নাম ভাঙাতে নিজেকে ছেড়ে দিলেন। (এক হতবুদ্ধিকর অতিসরলতায় naivete) মহলানবীশ সর্বত্র বলে বেড়াচ্ছেন ঃ 'হর্থি লোকটা চমৎকার' . এবং যাঁরা সবার সেরা, যাঁরা মুক্তমতি, কম ভাগ্যবান—তাঁদের নিয়মমাফিক এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।—তাছাড়া, সমস্ত ইউরোপ সফর করার লোলুপ ও শিশুসুলভ বাসনায়, আর টাকা না-থাকায় রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতার জন্যে এক ইম্প্রেসেরিওর হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছেন। এবং সেখানে ধনী ও স্নবদেরই প্রবেশাধিকার।—এইভাবে সর্বত্র তিনি এক তিক্ত হতাশা সৃষ্টি হতে দিয়েছেন, আর সবচেয়ে উদাসীন মানুষ হয়েও তিনি ধারণা জন্মিয়েছেন—অহমিকার জন্যে, টাকার জন্যে তিনি সর্বত্র নিজেকে দেখিয়ে বেড়ান। এটা বেদনাদায়ক।"

রোলাঁর এই মন্তব্যও খুবই দুর্ভাগ্যজনক এবং বেদনাদায়কও বটে। সে-সময়ে স্কাণ্ডিনেভিয় ও বলকান রাষ্ট্রগুলিতে সফরকালে রবীন্দ্রনাথের মত

কবির পক্ষে 'প্রতিক্রিয়াশীলদের' বাদ দিয়া, বাছিয়া-বাছিয়া মুক্তমতি ও প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও সখ্যতা স্থাপন করাটা, আদৌ সম্ভব কিংবা উচিত ছিল কিনা, সে-কথা রোলাঁ ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। এ-সব দেশ সফরকালে যোহান বয়ার, সেভেন হেডেন, হেফডিং, টুকসেন, স্টেন কোনো, উইণ্টারনীজ, লেসনি, ফ্রয়েড প্রমুখ ইউরোপের তৎকালীন খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে কবি সাক্ষাৎ আলাপ-আলোচনা করিয়াছিলেন। এবং সেটা কিছু দূষণীয়ও হয় নাই।

সব চেয়ে কৌতুকজনক ঘটনা এই, রবীন্দ্রনাথের এবারকার ইতালি এবং ইউরোপ ভ্রমণের সব ঘটনা জানা সত্ত্বেও সোভিয়েতের লেখক-শিল্পীরা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁহাদের বিচারে ভুল করেন নাই। এই সময়ই সোভিয়েতের বৈদেশিক সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনের সারা ইউনিয়ন সমিতি-'ভকস্'এর পক্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথকে সোভিয়েত দেশ ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানান হয়। 'ভকস্'এর এই আমন্ত্রণপত্রের মর্মার্থ ছিল এই:

মস্কো, ২৭ শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৬

বিদেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনের সারা ইউনিয়ন সমিতি ভারতবর্ষের মহাকবি ও সাহিত্যিককে সৌভ্রাত্রীয় অভিনন্দন জানাচ্ছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাই ইউরোপ ও এশিয়ার সংস্কৃতির মধ্যে তাঁরা সংযোগ স্বরূপ, অনেকদিন আগে থেকেই গভীর আন্তরিকতায় তাঁরা আপনার সাহিত্যকর্মের পরিচয় রেখে আসছেন।

আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ পাঠক আপনার কলমে যে সব চরিত্র জীবন পেয়েছে তাদের ভাবনাচিন্তা অনুভূতি ও কাজ নিজেদের অন্তরে অনুভব করেছেন, এখনও করেন। আপনার সঙ্গে সোভিয়েত জনগণের বহুকাল আগেই এমন এক অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছে, যা কেবল সত্যকার এক মহান শিল্পীর বাণীই সম্ভব করে তুলতে পারে।

বিদেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনের সারা ইউনিয়ন সমিতি খবর পেল আপনি এখন ইউরোপ ভ্রমণরত। সমিতির দৃঢ় বিশ্বাস আপনাকে যদি আমাদের দেশ ভ্রমণ, আমাদের জীবন, আমাদের সংগ্রাম ও কাজের সঙ্গে ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ সংযোগ গড়ে তোলার আমন্ত্রণ জানায় তাহলে সে আমন্ত্রণে আমাদের সোভিয়েত জনগণের মনের ভাবই ফুটে উঠবে। নতুন রাশিয়া, যাকে, আমরা আর রাশিয়া বলে অভিহিত করি না কারণ এখন সে বহু জাতির স্বাধীন সঙ্ঘ সেই নতুন রাশিয়া শুধু যে জারের আমলের পুরনো রাশিয়ার তুলনাতেই অনেক পৃথক তা নয়, সব পুঁজিবাদী রাষ্ট্র থেকেই সে একান্ত ভিন্ন।

নতুন রাশিয়া মনে করে এখন পর্যন্ত সেই একমাত্র দেশ যেখানে সাহসের সঙ্গে এমন এক নতুন সমাজ গড়ার আয়োজন চলছে, যে সমাজে সবাই সুখে

থাকতে পারে, কেউ দুঃস্থ নয়। আমাদের আদর্শ অর্জন এখনো অনেক দূরের কথা কিন্তু তবু এই পথে প্রথম এবং সবচেয়ে কঠিন পদক্ষেপ আমরা ইতিমধ্যেই করেছি। এর মধ্যেই কিছু ফল আমরা পেয়েছি। অবিশ্বাস্য কাঠিন্যের মধ্যে দিয়ে আমরা যে শুধু নতুন অর্থনীতি ও নতুন রাজনীতিই গড়ে তুলছি তাই নয়। সেই সঙ্গে গড়ে তুলছি নতুন সংস্কৃতি, নতুন সাহিত্য।

আমাদের আশা, এই গঠনকার্যের ঘনিষ্ঠ পরিচয় গ্রহণে আপনি আগ্রহ বোধ করবেন।

আমাদের আশা, সোভিয়েত ইউনিয়নে যে নতুন জীবনের স্রোত বয়ে চলেছে, যার মধ্যে নিহিত রয়েছে মানব জাতির শ্রেষ্ঠ আশা তার প্রবল উৎস স্বচক্ষে দেখে যেতে আপনি ইচ্ছুক।

বিদেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনের সারা ইউনিয়ন সমিতি মনে করে আমাদের দেশ ভ্রমণের এই আমন্ত্রণ আপনি গ্রহণ করবেন।

একান্তই আপনার
সভাপতির পক্ষে ই. মাইস্কি
পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য ও সাধারণ সম্পাদক,
ই. করিনেৎস

'ভক্‌স্'-এর এই নিমন্ত্রণ-পত্র' সম্পর্কে সম্পাদকীয় নোটে বলা হইয়াছে (সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ॥ পৃ ১৭-২০):

"ভক্‌সের এই নিমন্ত্রণ রবীন্দ্রনাথ পান জার্মানীতে। ইউরোপ ভ্রমণরত রবীন্দ্রনাথ তখন বার্লিনে ছিলেন। ভক্‌সের কাছ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণের এই নিমন্ত্রণ রবীন্দ্রনাথ ধন্যবাদের সঙ্গে গ্রহণ করে সোভিয়েত সরকারকে একটি তার পাঠান। সে তারে তিনি বলেন, রাশিয়াকে তিনি জেনেছেন ও তাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তার মহান সাহিত্য পড়ে।

বার্লিনের এক সংবাদপত্রের সংবাদদাতার সঙ্গে আলাপে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'এই যাত্রায় (ইউরোপে) খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাশিয়া যাব, দেখতে চাই তলস্তয়, দস্তয়েভস্কি, সলোভিওভের দেশ। তারপরে মরলে আফসোস নেই। খুবই বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি। আর আমার বেশি দিন নেই⋯এই রুগ্ন হৃদ্‌যন্ত্রটা এবার জানান দিয়েছে, আর সে বেঁচে থাকতে চায় না। তাই তাড়াতাড়ি রাশিয়া দেখে নিতে হবে⋯মহান রুশ জাতি অন্তরে যে সম্পদ গড়ে তুলেছেন তা বিশ্বসভ্যতার রত্নভাণ্ডারকে সমৃদ্ধতর করেছে। গত কয়েক বছরের রক্তাপ্লুত ঘটনা সত্ত্বেও এখন তাঁরা মহান ভবিষ্যতের পথে পা বাড়িয়েছেন।'

এই 'নোটে' আরও বলা হইয়াছে,

"রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্ধনা ও শ্রদ্ধা জানানর জন্য ভক্‌স ব্যাপক ব্যবস্থা করে তাঁর সোভিয়েত দেশ ভ্রমণের কার্যসূচী রচিত হয়। রবীন্দ্র সম্বর্ধনার কাজে দেশের বহু জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান যোগ দেয়। জ্ঞানবিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও শিল্পের অনেক বিশিষ্ট কর্মী তাতে অংশ নেন। কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণ মুলতুবী রাখতে বাধ্য হন।"

বস্তুত ভিয়েনাতে ডাঃ ওয়েংকবাকের চিকিৎসাধীনে থাকার সময়ই কবি চিকিৎসকদের সমস্ত নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া একদিন গোপনে রোগশয্যাপার্শ্বে সোভিয়েত প্রতিনিধিকে আহ্বান করিয়া তাঁহার সোভিয়েত দেশ ভ্রমণের ব্যবস্থা প্রায় পাকা করিয়া ফেলিয়াছিলেন। চিকিৎসকদের ও তাঁহার অভিভাবকদের বিস্তর চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে নিরস্ত করা হয়। এ-সম্পর্কে কবির অন্যতম সেক্রেটারী প্রশান্ত মহলানবিশ মহাশয় অন্যত্র লিখিয়াছেন, (*Visva Bharati Quarterly* 1930-31-P.8)

"For a long time Rabindranath Tagore had been anxious to visit Russia. In 1926 he received an invitation from the Soviet Government but was taken seriously ill with influenza at Vienna towards the end of October. It was already late autumn, and news of an early winter were coming in from all sides ; Vienna itself was in snow. Dr. Wenkebach had strictly forbidden all visitors, but the poet managed one day to smmuggle into his bedroom a representative of the SovietGovernment,and made all arrangements to go to Moscow. It was with the greatest difficulty that he was finally persuaded to give up the idea."

রবীন্দ্রনাথের সোভিয়েত দেশ ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা যে কত প্রবল এবং আন্তরিক ছিল, এই ঘটনা হইতে তাহার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।

প্রসঙ্গত বলা দরকার, ১৯২৫ সালে 'ভক্‌স্‌'এর প্রতিষ্ঠার পর বিশ্বের প্রথম সারির যে কয়জন লেখক শিল্পীকে সোভিয়েত ভ্রমণের জন্য এমন উষ্ণ ও সাদর আমন্ত্রণ জানান হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের অন্যতম। এমন কি যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসি-বিরোধী চিন্তার অধিকারী হইলেও, রমাঁ রোলাঁকেও তখন পর্যন্ত 'ভকস'-এর পক্ষ হইতে সোভিয়েত দেশ ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানান হয় নাই। বলা দরকার, সোভিয়েত সরকারের 'কঠোর শাসন-নীতি' এবং কিছু কাজকর্মকে রোলাঁ সমর্থন করিতে পারেন নাই; এমন কি প্রকাশ্যে তিনি প্রতিবাদও জানাইয়াছিলেন। এসব কারণে সোভিয়েত দেশের লেখক শিল্পী ও চিন্তানায়ক এবং রোঁলার মধ্যে সাময়িক তিক্ততা ও ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হইয়াছিল। এর প্রায় বছর খানেক পর,—১৯২৭ সালে, সোভিয়েতের বিপ্লবের দশম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় রোলাঁ বিপ্লবের সমর্থন জ্ঞাপন করায়, এই ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটে। সোভিয়েতের শিক্ষামন্ত্রী লুনাচারস্কি স্বয়ং অগ্রণী হইয়া রোলাঁকে সংগ্রামী সোভিয়েত মৈত্রীর শিবিরে টানিয়া লইবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিয়া দেন। এসব কথা রোলাঁ স্বয়ং তাঁহার 'I *will not rest*' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন (দ্র শিল্পীর নবজন্ম ॥ পৃ ৩৪৭ ও ৩৬৪)।

* পৃ ২৮৭

এবারে রবীন্দ্রনাথের ইউরোপ আসার বৎসরখানেক পূর্বে—এম. এন. রয় প্যারিস হইতে, প্রকাশিত *'Masses of India'* (No 1, January, 1925) পত্রিকায় *'The Philosophy of Property'* শীর্ষক একটি রচনায় রবীন্দ্রনাথের রাজনীতিক চিন্তা বা অভিমতের তীব্র সমালোচনা করেন। চিন্মোহন সেহানবীশ মহাশয় তাঁহার 'রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী সমাজ' গ্রন্থের পরিশিষ্টে রচনাটি পুনর্মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন।

এম এন. রয়ের এই প্রবন্ধ-রচনার একটা উপলক্ষও ছিল। কিছুকাল পূর্বে-ফ্রান্সের বিখ্যাত 'ক্লার্তে' (*Clarte*) পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের *'Nationalism'* গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয়, কবির এই গ্রন্থের 'Nationalism' এর স্থলে 'Capitalism'—এই শিরোনাম করা উচিত (Tagore should have named his book 'Capitalism' instead of 'Nationalism') ছিল।

এম. এন. রয়ের মত বিপ্লবীদের ইহা সহ্য হবার কথা নয়। রয় কবির *'Nationalism'* গ্রন্থ এবং তাঁহার অন্যান্য বক্তৃতা ও রচনা বাদ দিয়া *Visva Bharati Quarterly*-তে প্রকাশিত (অক্টোবর, ১৯২৪) *City and Village* শীর্ষক একটি মাত্র রচনাকে অবলম্বন করিয়া কবির রাজনৈতিক মতামত যে কত প্রতিক্রিয়াশীল ছিল, তাহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন। রয় তাঁহার এই প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখিলেন,

"Mr. Tagore finds himself in such an anomalous condition because of his incoherent theories. He believes in private property, but is opposed to evolution of property forms and relations. He affirms the existence of property to be a 'moral force', yet denies the essential 'morality' of the present form of property-relatons, capitalist industrialism, which rests upon and is a product of the sacred right of private property. Not knowing how to extricate himself from this dilemma, Tagore postulates that property-relations should develop as far as feudal patriarchy and stop there."...

এ কথা সত্যি, আধুনিক যন্ত্রসভ্যতা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্থান ও ভূমিকা সম্পর্কে তখনও কবির মনে নানা ভ্রান্তি ও স্ববিরোধী চিন্তাভাবনা ছিল। তবে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কাল হইতে কবি আর কোনদিনই আধুনিক যন্ত্রশিল্প ও কারিগরী বিদ্যাকে বর্জন করিয়া পুরানো সামন্ততান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় ফিরিয়া যাইতে চাহেন নাই। আর কৃষিতেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোত-সম্বলিত সামন্ততান্ত্রিক প্রথায় ব্যক্তি ও পরিবার কেন্দ্রিক মান্ধাতা আমলের হাল-বলদের চাষবাস সমর্থন করেন নাই। প্রসঙ্গত, ১৯২১ সালে, গান্ধীজীর অসহযোগ ও চরকা আর্থনীতিক দর্শনের বিরোধিতা করিতে গিয়া কবি 'শিক্ষার মিলন' 'সত্যের আহবান' 'চরকা' এবং পরবর্তী সব রচনা বক্তৃতা ও ভাষণে 'আধুনিক যন্ত্রশিল্প-সভ্যতা

এবং সমবায়-ভিত্তিক আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বলিত কৃষি-খামার গড়িয়া তুলিবার জন্য যে নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এসব কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার।—বিশেষ করিয়া, সমবায় ও সমবায় আন্দোলন সম্পর্কিত কবির রচনাগুলি। ইতিপূর্বে আমরা তাহার বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

মনে হয়, এম. এন. রয় কবির এই সব রচনা ও চিন্তাভাবনার কথা হয় কিছুই জানিতেন না অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে সে-সব রচনার কথা এড়াইয়া গিয়াছিলেন। ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়, *Modern Review* ও *Visva Bharati Quaterly* তে কবির এতসব মূল্যবান রচনা প্রকাশিত হইয়াছে সে সম্পর্কে রয় একটি কথাও বলিলেন না, শুধু *City and Village* প্রবন্ধটি লইয়াই আলোচনা করিলেন। পরবর্তী-কালে কবির *City and Village* প্রবন্ধটি ভাঙ্গিয়া '*Organization*' ও '*Wealth and welfare*' দুটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ *Modern Review* পত্রিকায় (January, February, 1930) প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্বেই এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে আমরা উহার বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

পরিশিষ্ট-১

'বিশ্বভারতী'র পরিকল্পনা

১৯১৯ সালের প্রথম ভাগেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর শিক্ষাদর্শের পরিকল্পনা করেন। দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণকালে ও কলিকাতায় কবি '*Centre of Indian Culture*' ও '*Message of the Forest*' নামে দুটি ভাষণে এই শিক্ষাদর্শের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। এই দুইটি ভাষণের মর্মার্থ কবি স্বয়ং লিখিয়া দেন। তাহার অংশবিশেষ,

"মানব-সংসারে জ্ঞানালোকের দিয়ালি-উৎসব চলিতেছে। প্রত্যেক জাতি আপনার আলোকটিকে বড়ো করিয়া জ্বালাইলে তবে সকলে মিলিয়া এই উৎসব সমাধা হইবে। কোনো জাতির নিজের বিশেষ প্রদীপখানি যদি ভাঙিয়া দেওয়া যায়, অথবা তাহার অস্তিত্ব ভুলাইয়া দেওয়া যায় তবে তাহাকে সমস্ত জগতের ক্ষতি করা হয়।

"ভারতবর্ষ যখন নিজের শক্তিতে মনন করিয়াছে তখন তাহার মনের ঐক্য ছিল —এখন সেই মন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে।······ভারতবর্ষের যে-মন আজ হিন্দু বৌদ্ধ জৈন শিখ মুসলমান খৃস্টানের মধ্যে বিভক্ত ও বিশ্লিষ্ট হইয়া আছে সে-মন আপনার করিয়া কিছু গ্রহণ করিতে বা আপনার করিয়া কিছু দান করিতে পারিতেছে না। দশ আঙুলকে যুক্ত করিয়া অঞ্জলি বাঁধিতে হয়—নেবার বেলাও তাহার প্রয়োজন, দেবার বেলাও। অতএব ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থায় বৈদিক পৌরাণিক বৌদ্ধ জৈন মুসলমান প্রভৃতি সমস্ত চিত্তকে সম্মিলিত ও চিত্ত-সম্পদকে সংগৃহীত করিতে হইবে; এই নানা ধারা দিয়া ভারতবর্ষের মন কেমন করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে তাহা জানিতে হইবে। এইরূপ উপায়েই ভারতবর্ষ আপনার নানা বিভাগের মধ্য দিয়া আপনার সমগ্রতা উপলব্ধি করিতে পারিবে।······

"দ্বিতীয় কথা এই যে, শিক্ষার প্রকৃত ক্ষেত্র সেইখানে যেখানে বিদ্যার উদ্ভাবনা চলিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ বিদ্যার উৎপাদন, তাহার গৌণ কাজ সেই বিদ্যাকে দান করা। বিদ্যার ক্ষেত্রে সেই সকল মনীষীদিগকে আহ্বান করিতে হইবে যাঁহারা নিজের শক্তি ও সাধনা দ্বারা অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও সৃষ্টির কার্যে নিবিষ্ট আছেন।···

"তৃতীয় কথা এই যে, সকল দেশেই শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বাঙ্গীণ জীবনযাত্রার যোগ আছে। আমাদের দেশে কেবলমাত্র কেরানীগিরি ওকালতী ডাক্তারি ডেপুটিগিরি দারোগাগিরি মুন্সেফি প্রভৃতি ভদ্রসমাজে প্রচলিত কয়েকটি ব্যবসায়ের সঙ্গেই আমাদের আধুনিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ যোগ। যেখানে চাষ হইতেছে, কলুর ঘানি কুমোরের চাক ঘুরিতেছে সেখানে এ শিক্ষার কোনো স্পর্শও পৌঁছায় নাই। অন্য কোনো শিক্ষিত দেশে এমন দুর্যোগ ঘটিতে দেখা যায় না। তাহার কারণ আমাদের নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশের মাটির উপরে

নাই, তাহা পরাগাছার মতো পরদেশীয় বনস্পতির শাখায় ঝুলিতেছে। ভারতবর্ষে যদি সত্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তবে গোড়া হইতেই সে বিদ্যালয় তাহার অর্থশাস্ত্র তাহার কৃষিতত্ত্ব তাহার স্বাস্থ্যবিদ্যা তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠাস্থানের চতুর্দিকবর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবে। এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গো-পালন করিবে, কাপড় বুনিবে, এবং নিজের আর্থিক সম্বললাভের জন্য সমবায় প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্র, শিক্ষক ও চারিদিকের অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইবে।

"এইরূপ আদর্শ বিদ্যালয়কে আমি 'বিশ্বভারতী' নাম দিবার প্রস্তাব করিয়াছি।"

['বিশ্বভারতী'-শান্তিনিকেতন পত্রিকা-বৈশাখ, ১৩২৬]

'বিশ্বভারতী'র শিক্ষাদর্শ ও লক্ষ্য

১৯২১ সালের আগস্টের মধ্যভাগে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ হ'তে ফেরার কিছুকাল পরেই 'বিশ্বভারতী' বিশ্ববিদ্যালয় আস্তে আস্তে পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ পরিগ্রহণ করিতে থাকে। ঐ বৎসরই ৭ই পৌষ (১৩২৮) আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সভাপতিত্বে 'বিশ্বভারতী'র প্রথম নিয়মাবলী বা গঠনতন্ত্র সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ঐ সভায় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ভাষণে 'বিশ্বভারতী'কে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়রূপে বিশ্ববাসীর উদ্দেশে সমর্পণ করার সংকল্প ঘোষণা করিতে গিয়া বলেন :

"আজ বিশ্বভারতী-পরিষদের প্রথম অধিবেশন। কিছুদিন থেকে বিশ্বভারতীর এই বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হয়েছে। আজ সর্বসাধরণের হাতে তাকে সমর্পণ করে দেব।···

"আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, হঠাৎ আজ আমাদের মধ্যে কয়েকজন হিতৈষী বন্ধু সমাগত হয়েছেন, যাঁরা দেশে ও দেশের বাইরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। সকলে জানেন—আজ এখানে ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ডাক্তার নীলরতন সরকার এবং ডাক্তার শিশিরকুমার মৈত্র উপস্থিত আছেন। আমাদের আরও সৌভাগ্য যে, সমুদ্রপার থেকে এখানে একজন মনীষী এসেছেন, যাঁর খ্যাতি সর্বত্র বিস্তৃত। আজ আমাদের কর্মে যোগদান করতে পরমসুহৃদ আচার্য সিলভ্যাঁ লেভি মহাশয় এসেছেন। আমাদের সৌভাগ্য যে, আমাদের এই প্রথম অধিবেশনে, যখন আমরা বিশ্বের সঙ্গে বিশ্বভারতীর যোগসাধন করতে প্রবৃত্ত হয়েছি সেই সভাতে, আমরা এঁকে পাশ্চাত্য দেশের প্রতিনিধিরূপে পেয়েছি। ভারতবর্ষের চিত্তের সঙ্গে এঁর চিত্তের সম্বন্ধবন্ধন অনেকদিন থেকে স্থাপিত হয়েছে।···এই বিশ্বভারতীকে আমরা কিছু দিন লালনপালন করলুম, একে বিশ্বের হাতে সমর্পণ করবার সময় এসেছে। একে এঁরা প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করুন, এর সঙ্গে আপনার চিত্তের সম্বন্ধ স্থাপন করুন।···"

ঐদিনই মন্দিরে কবি তাঁহার প্রার্থনান্তিক ভাষণে 'নবযুগের' সাধন-বাণীর

মূল তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্যটি নির্দেশ করিতে গিয়া 'বিশ্বভারতী'র শিক্ষাদর্শের মূল লক্ষ্যটি তুলিয়া ধরিতে চাহিলেন। (দ্র 'নবযুগ'-শান্তিনিকেতন পত্রিকা-মাঘ, ১৩২৮ ॥ পৃ ২০-২১)। ভাষণটি ছিল এই :

নবযুগ

নব অরুণোদয় হয়েছে নবযুগের প্রভাত এসেছে! শান্তিনিকেতনে আমরা সেই নবযুগের অভ্যর্থনার ভার নিয়েছি। আমরা বিশ্বাস করি অন্ধকার রাত্রি কেটে গেচে। আমরা বিশ্বাস করি যে প্রাচীন কালের বিরোধের যুগ, পরস্পরের বিত্ত অপহরণ করবার যুগ কেটে গেচে। যে বিশ্বাসের মধ্যে নব সৃষ্টির শক্তি আছে তাকে আমরা গ্রহণ করব।

প্রতি বৎসরের উৎসবে এই দিনে সত্যকে আমরা কিছু না কিছু নূতন করে অনুভব করবার ও এইরূপে সমস্ত বৎসরের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করবার চেষ্টা করি। প্রতি বৎসর আমরা কিছু না কিছু লাভ করেছি যা আমাদের ক্ষুধা দূর করেছে। এবৎসর আমাদের শান্তিনিকেতনে নূতন যুগের আবির্ভাব প্রকাশমান হ'ল। এখানে আমাদের নবযুগের অতিথিশালা খুলেছে। 'অপরাজিত বাণী' এসেছে, তাকে আতিথ্যদান করবার জন্য আজকের আয়োজন। এ অনুষ্ঠান কোনো বিশেষ বিষয়ের শিক্ষার জন্য বা কোনো ক্ষুদ্র কর্ত্তব্য সাধনের জন্য নয়। আজ আমরা জয়ধ্বনি জাগাব। নূতন যুগের এই ব্রত নিয়েছি একথা আজ ঘোষণা করতে চাই সেই নবযুগের জন্যে আমরা প্রস্তুত হই। যে অবস্থায় প্রাচীনকাল বন্ধ ছিল সে অবস্থার একসময়ে প্রয়োজন ছিল। যেমন বীজকে প্রথমে ছোট আলে রোপন করা হয়, তারপর অংকুরোদ্গম হ'লে তাকে বৃহৎ ক্ষেত্রে নিয়ে যেতে হয় তেমনি এক একটি জাতি ছোট সীমানার মধ্যে সত্যসাধনার বীজ বপন করেছিল, কিন্তু কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে তার ভৌগোলিক সীমা অসত্য হয়ে গেছে। জলে স্থলে আকাশে পথ উদ্ঘাটিত হয়ে গেছে। অতীতের বাধা দূর হয়ে গেছে। চিরাভ্যাসক্রমে এই বাধাকে আজও যে স্বীকার করে সে এই বাধাগুলিকে দৃঢ় করে তোলাই আজও তার সাধনা বলে কল্পনা করেচে। জাতীয় বিচ্ছেদের সীমাগুলিকে কৃত্রিম উপায়ে সে পাকা করে খাড়া করবার চেষ্টা করচে। সমুদ্র পর্ব্বত দিয়ে দেশের যে সব সীমা নির্দ্দিষ্ট ছিল তার ভার মানুষকে তেমন করে বহন করতে হয় নি। কিন্তু আজ কৃত্রিম সীমাবেষ্টনকে জোর করে ধ্রুব রাখবার যে উদ্যোগ নিরন্তর সৈন্য সামন্ত অস্ত্রশস্ত্রের যে আয়োজন তার ভার কৃত্রিমতার ভার, এই জন্য তা দুর্ভর। এই ভার যতই বাড়ে মন ততই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে ওঠে সংশয়ের কারণ ততই বাড়তে থাকে—পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস ততই দূর হতে দূরে প্রসারিত হতে থাকে। এমনি করে অস্ত্রের ভারবৃদ্ধির সঙ্গে মানুষের রিপুর ভার এবং রিপুর ভারবৃদ্ধির সঙ্গে তার অস্ত্রের ভারবৃদ্ধি অন্তহীন আবর্ত্তে ঘুরতে থাকে। এমনি করে কৃত্রিম আত্মরক্ষার চিরবর্দ্ধমান প্রভূত প্রয়াসের চাপে প্রবল জাতিরা আত্মবিনাশের প্রবল উপায় কেবলি উদ্ভাবন করচে।

স্পষ্ট দেখা যাচ্চে যে, মানুষের সঙ্গে মানুষ যে একত্র হয়েছে এই মহৎ ঘটনাকে আমরা আজও সত্য বলে অনুভব করতে পারচি নে। তাই আমাদের শিক্ষাদীক্ষায় সেই প্রচীন অভ্যাসটাকেই মনের মধ্যে পাকা করে তোলবার চেষ্টা এখনো চলচে—তাই স্বাজাত্যের অভিমানকে অতিশয় করে তোলাকেই আমরা কর্ত্তব্য বলে স্থির করেচি। এমন অবস্থায় কোনো একজায়গায় আজ সেই বাণীর ঘোষণার কেন্দ্র থাকা চাই যে বাণী সীমাবদ্ধ অতীত কালের বাণী নয়, যে বাণী ভবিষ্যতের বিরাট মুক্তিক্ষেত্রের বাণী। সেই খান থেকে বলতে হবে, নবযুগ এসেচে নব অরুণোদয় হয়েচে। এই বাণী কারা ঘোষণা করবে? ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত যারা তারা নয়, তারা যে প্রবল বন্যায় ডুবতে ডুবতেও তাদের অতীতের সঞ্চয়কে আঁকড়ে থাকে—তারা যে লুব্ধ—বাহিরের ধনকেই একান্ত বলে মানাই যে তাদের চির অভ্যাস। তাই অকিঞ্চনের কণ্ঠ থেকে নবযুগের জয়ধ্বনি উঠবে এমন আশা আছে। বিধাতা অক্ষমকে দিয়ে সবলকে পরাভূত করেন। পৃথিবীতে বড় বড় উন্নত মস্তক যাঁদের চরণধূলি গ্রহণ করে, সার্থক, তাঁদের চরণ আশ্রয়হীন পথের ধূলির মধ্যে বিচরণ করেচে।

এমন কথা মাঝে মাঝে শুনতে পাই যে যতক্ষণ রাষ্ট্রশক্তিতে আমরা শক্তিমান না হই ততক্ষণ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে আমাদের সত্য প্রচারের অধিকার নেই, অর্থাৎ অন্যের সঙ্গে ধনে মানে সমকক্ষ না হলে তার কাছে আমরা আত্মার বাণী বহন করতে পারব না। কিন্তু পৃথিবীতে সত্যের যাঁরা দৌত্য করেচেন তাঁদের কয়জনই বা বাহ্য সম্মানের পাথেয় নিয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে যাত্রা করেচেন? দারিদ্র্য ও অপমানে কি তাঁদের বাণীর অধিকারকে হরণ ও তার তেজকে খর্ব্ব করেচে? কত কৌপীনধারী ভিক্ষু মানুষের ইতিহাসকে চিরকালের মত অগ্রসর করে দিয়েচেন। বিধাতা কালে কালে দেখিয়েছেন যে যারা ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত তারা মহতী বিনষ্টির দিকে গেছে। মানুষ্যত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আমরা বাহ্য ক্ষমতায় হীন হলেও আত্মার বাণী আমাদেরই কণ্ঠের অপেক্ষা করেছে। নিষ্ঠুর পৃথিবীর সামনে নম্র হয় আমরাই বলব দেবতার আহ্বান এসেছে। নব অরুণোদয় হয়েছে। আমরাই পৃথিবীর পূর্ব্ব প্রান্ত থেকে বলব, ঐশ্বর্য্যের মোহ দূর হয়ে যাক্‌—আনন্দের সঙ্গে বলব কোনো ভয় নেই। যার বহু সম্পদ আছে সে সম্পদ রক্ষা করতে তাকে সর্ব্বদা ত্রস্ত থাকতে হয়। সে আপনার দ্বার রুদ্ধ রাখে—সেই রুদ্ধতা তার আত্মাকেই সংকীর্ণ করে। তার কাছে পরম সত্য সহজ হয় না; আপনার লোভতৃপ্তির দ্বারাই সে আপনার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। আমরা বলব, তোমরা লোভকে বিশ্বাস কর, আমরা ত্যাগকে বিশ্বাস করি, তোমরা অস্ত্রশস্ত্রকে বিশ্বাস কর আমরা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি।

এস অপরাজিত বাণী
অসত্য হানি
অপহত শংকা অপগত সংশয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরিশিষ্ট ২

১২ই এপ্রিল (১৯১৯) গান্ধীজীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠির শেষাংশ :

"With these few words for an introduction allow me to offer the following as a poet's contribution to your noble work :—

I

Let me hold my head high in this faith that thou art our shelter, that all fear is mean distrust of thee.

Fear of man ? But what man is there in this world, what king, O King of Kings, who is thy rival, who has hold of me for all time and in all truth ?

What power is there in this world to rob me of freedom ? For do not thy arms reach the captive through the dungeon-walls bringing unfettered release to the soul ?

And must I cling to this body in fear of death, as a miser to his barren treasure ? Has not this spirit of mine the eternal call to the feast of everlasting life ?

Let me know that all pain and death are shadows of the moment ; that the dark force which sweeps between me and thy truth is but the mist before sunrise, that thou alone art mine for ever and greater than all pride of strength that dares to mock my manhood with its menace.

II

"Give me the supreme courage of love, this is my prayer, the courage to speak, to do, to suffer at thy will to leave all things or be left alone.

Give me the supreme faith of love, this is my prayer. the faith of the life in death, of the victory in defeat, of the power hidden in the frailness of beauty, of the dignity of pain that accepts hurt, but disdains to return it."

[*Modern Review*-May, 1919-p. 540.]

পরিশিষ্ট ৩

কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ-অধিবেশনে (৪-৯ সেপ্টেঃ ১৯২০) বিপিনচন্দ্র পালের সংশোধনী প্রস্তাবের শেষাংটি :

Mr. Bepin Chandra Pal's Amendment :

"And whereas the only effective remedy against these wrongs and the only guarantee against their recurrence is the immediate recognition of India's rights to full autonomy.

Be it resolved—

(a) That the Prime Minister be asked to receive a Mission composed of representative Indians to be selected by the All India Congress Committee to lay befor him the statement of India's grievances coupled with a demand for immediate autonomy.

(b) That in the case of his refusal to receive such a Mission or in the event of his refusal to replace the Reforms Act of 1919 by a measure granting full autonomy to India, a policy of such active non-co-operation be adopted as would leave no doubt in the minds of the British people that India can no longer be governed as a dependency.

(c) That in the meantime this Congress recommends to the country for favourable consideration and eventual adoption, Mahatma Gandhi's programme of non-co-operation with such modifications, alterations, and additions, either for the whole of India or for particular provinces, to suit special conditions as may be recommended by a Joint Committee consisting of :

(1) Fifteen representatives of the Indian National Congress.

(2) Five representatives of the All India Moslem League.

(3) Five representatives of the central Khilafat Committee.

(4) Five representatives of each of such Home-Rule Leagues and

(5) Two representatives of the Sikh League who accept

the principle of Non co-operation with Mahtma Gandhi as the President of this Joint Committee.

(d) That in the meantime this Congress recommends the adoption of the following measures as preparatory to the actual putting into practice of Mahtma Gandhi's programme.—

(1) The education of the electorates in the principles of complete autonomy and Non-co-operation.

(2) The establishment of National schools.

(3) The establishment of Courts of arbitration.

(4) Renunciation of titles and such honorary offices as are not conferred by the suffrage of the people.

(5) Refusal to attend Government levees, Durbars and such other functions, organised by or in honour of officials.

(6) The organisation of labour into trade unions.

(7) The gradual withdrawal of Indian capital from European Banks and such other industrial and commercial concerns as are controlled by Europeans in India and also of Indian labour from such concerns.

(8) Refusal on the part of the military, clerical and labouring classes to offer themselves as recruits for service outside the limits of India except in the event of foreign invasions.

(9) Adoption of Swadeshi especially in piece-goods on a vast scale and revival of hand-spinning and hand-weaving.

(e) That be it further resolved that inorder to achieve the abovementioned objects, a fund of Rs 20 lakhs (to start with) be immediately raised to be called the Tilak Swarajya Fund to be spent under the direction and control of a Sub-Committee of the All India Congress Committee.

[*The Statesman*-Sept. 9.-1920]

পরিশিষ্ট ৪

The Atlantic Monthly পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আমেরিকা ভ্রমণের (১৯১৬) অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করিয়া যে বিবৃতি দেন তাহার প্রথমাংশটি এইরূপ :

"The constant demand for a mental narcotic that ends in smoke and ashes, that destroys delicacy of taste and healthy appetite for nutrition, encourages illicit traffic and adulteration. I have had my personal experience of it once, when on a lecturing tour in the United States. Some persons belonging to a detective agency, evidently in the pay of interested individuals, came to me with the news that the Hindu revolutsionist party in San Francisco had decided to kill me owing to their disagreement with my political views. This canard went round the papers and when I sent a protest expressing my disbelief, it was not published, possibly in deference to a political need for strengthening the prejudice against Hindu settlers in America on the eve of an Anti-Asiatic legislation, or because the news was too rich in sensation to allow any doubt to rob it of its sparkle for the sake of mere justice.

"Shortly after my return to India the news reached me, through Japanese papers, that a law suit had been instituted against the above-mentioned party, accusing it of secret attempts at overthrowing British rule in India. My name was dragged into this case alleging that I had taken money from the Germans deceitfully to serve their purpose while in America, and at the same time to dig for my own country underground tunnels of dark politics. I began to receive letters from your people full of reproaches for having betrayed the trust of a confiding nation whose guest I had been in the disguise of an idealist. I sent an explanatory cablegram to President Wilson, asking for his protection, which remained unacknowledged."

[*Visva Bharati Quarterly*-April 1927-pp. 85-86]

পরিশিষ্ট ৫

অসহযোগ-আন্দোলন সম্পর্কে কলিকাতায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর মধ্যে একান্ত যে দীর্ঘ সাক্ষাৎ আলোচনা হয় উহার কোনো নির্ভরযোগ্য বিবরণ সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই। একমাত্র এণ্ড্রুজই সে-আলোচনার সময় উপস্থিত ছিলেন। এণ্ড্রুজ পরে রোলাঁকে সংক্ষেপে সে-আলোচনার সারমর্ম বলিয়াছিলেন। পরে দেখা যায় কবি স্বয়ং এলমহার্স্টকেও এই আলোচনার কথা সংক্ষেপে বলিয়াছিলেন। এলমহার্স্ট তাঁহার দিনলিপিতে কবির মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন (দ্র Poet And Plowman-p. 20-23)। এখানে তাহার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত হইল :

Tagore, decided, soon after he heard of this discussion, to brief me privately on his own meeting with Gandhi. 'Not long before you arrived in India', he said, 'Gandhiji came to visit me in Calcutta at my home Jorasanko. He wanted very much to persuade me to take my stand with him in public on one or other of the planks of his political platform. Gandhiji put his case to me thus : 'Gurudev, you were yourself a leader and promoter of the Swadeshi (national) movement some twenty years ago. You always wanted Indians to stand on their own feet as Indians and not to be poor copies of Westerners. My 'Swaraj' movement today is the natural offspring of your own 'Swadeshi.' Join me now and fight with me for Swaraj.' 'Gandhiji,' I said, 'the whole world is suffering today from the cult of a selfish and short-sighted nationalism. India has all down her history offered hospitality to the invader of whatever nation, creed or colour. I have come to believe that, as Indians, we not only have much to learn from the West but that we also have something to contribute. We dare not therefore shut the West out. But we still have to learn among ourselves how, through education, to collaborate and achieve a commonunderstanding.' 'Gurudev I have already achieved Hindu-Muslim unity', said Gandhi. 'I do not agree', I answered. 'You have persuaded Muslim and Hindu to sit side by side on the political platform and to crack a whip together at the British Raj. As you well know

I myself have no love at all for Britsh Imperialism. But how far down in their hearts and minds does this sense of unity you talk about penetrate within the minds of your Muslim and Hindu followers ? When the British either walk out, or are driven out, what, Gandhiji, will happen then ? Will Hindu and Muslim then lie down peacefully together ? You know they will not !' 'But, Gurudev, my whole programme for the winning of Swaraj is based on the principle of non-violence. That is why, Gurudev, as a poet who believes in peace, you can feel free to ally yourself with this peaceful movement and work for it'. 'Come and look over the edge of my verandah, Gandhiji', I said, 'look down there and see what your so-called non-violent followers are up to. They have stolen those pieces of cloth from the bazaar. They've now gone and lit a bonfire with them in *my* courtyard. You can see for yourself. There they are howling around it like a lot of demented dervishes. Is that non-violence, Gandhiji ? We Indians are, as you well know, a very emotional people. Do you think you can hold our violent emotions under firm control with your non-violent principles ? No ! You know you can't. Only when the children of our different religions, communities and castes have been schooled together can you hope to overcome the violent feelings which exist today between Hindu and Muslimbetween high caste and low caste'. 'Well, Gurudev', he answered, 'at least you and I are agreed that a new kind of approach to education is needed. You can lend your support to my movement for establishing a national system of education. Hundreds of young teachers and students are now, at my suggestion, leaving the Government schools and Colleges. They are enlisting in my scheme' 'Yes, but, Gandhiji, I notice that you first pick out the brightest of the young men and enlist them in your political organisation. The less bright you allow to open schools that can offer only a travesty of education. I don't yet believe in your national schools. They have too limited an objective. This is way I am inviting scholars from all over the world to come and help and at the same time to learn something from

the creative aspects in our own culture. And, Gandhiji, why do you allow your followers to call you Mahatma ? Are you a Mahatma' ? 'No, Gurudev, of course I'm not a Mahatma. But Indians by nature have always been worshippers of symbols, of images. They need an image, Gurudev, a symbol. If they take me for one, will that not help them to mobilise and to suffer for such a noble cause' ? 'I wonder whether you are being quite fair to our people, Gandhiji, or quite honest with them' ? 'Well', said Gandhiji, 'I see my quest for your help is almost hopeless. If you can do nothing else for me, at least you can put these Bengali 'bhadralog' to shame by getting them to do something practical. Gurudev, you can spin. Why not get all your students to sit down around you and spin' ? We both laughed. 'Poems I can spin, Gandhiji', I said, 'songs and plays I can spin, but of your precious cotton what a mess I would make' !

Tagore continued : 'When I returned to India in 1921 from my visit to America and Europe I found that nearly the whole of my staff at Santiniketan had come under the direct influence of a political programme. They were so enthusiastic about the idea of Swaraj and of non-co-operation that I realised what a struggle I would have to persuade even a handful of them to think in longer educational terms about the future. I wanted them to look beyond the immediate political horizon and not to be hemmed in by narrow nationalist ideas that were already out of date. This is why I decided to release men who understand what I am after, who are eager to help with the practical work at Surul, and who see the longer term problems of the village that we must be ready to face.'

পরিশিষ্ট ৬

রথীন্দ্রনাথকে কবির পত্র—নজরুলকে জেলে টেলিগ্রাম করা সম্পর্কে :—

"রথী, নজরুল ইসলামকে Presidency Jailএর ঠিকানায় টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলুম, লিখেছিলুম, Give up hunger strike, our literature claims you.—জেল থেকে memo এসেচে The addressee not found. অর্থাৎ ওরা আমার message ওকে দিতে চায় না—কেননা নজরুল প্রেসিডেন্সি জেলে না থাকলেও ওরা নিশ্চয় [জানে] সে কোথায় আছে।"...

[চিঠিপত্র-দ্বিতীয় খণ্ড। পৃ ৭৪]

চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু সম্পর্কে রথীন্দ্রনাথকে কবির পত্র :

(৪ঠা আষাঢ় ১৩৩২)

"চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু উপলক্ষ্যে আমার কলকাতা যাওয়া উচিত বলে আমার মনে একটা আন্দোলন চলচে। যেমন আশুবাবুর মৃত্যুঘটনায় শোকপ্রকাশে দেশের লোকের সঙ্গে আমাকে যোগ দিতে হয়েছিল এক্ষেত্রেও আমার তাই করা কর্তব্য কিনা ভালো করে ভেবে দেখিস্। বিশেষত চিত্তের সঙ্গে বরাবরই আমার একটা বিরোধ ছিল—এ কথা কেউ যেন মনে না করে যে আমার মনে তার প্রতি একটুও প্রতিকূল ভাব আছে। আর কিছু নয় কলকাতায় গিয়ে ওদের বাড়িতে একবার দেখা করে আসা উচিত হবে বলে বোধ হচ্চে। নিতান্তই যদি সভা সমিতিতে টানাটানি করে তাহলেও দুচার কথা বলতে হবে। এ চিঠি পেয়েই আমাকে urgent তার যোগে তোদের পরামর্শ জানাস। প্রশান্তকেও এ সম্বন্ধে লিখচি।"

[ঐ ॥ পৃ ৭৯]

পরিশিষ্ট ৭

রবীন্দ্রনাথের 'চরকা' প্রবন্ধের তর্জমা *Modern Review* পত্রিকায় (Sept. 1925) প্রকাশিত হইলে পর গান্ধীজী তাহার জবাবে লিখিলেন 'The Poet and the Charka' (*Young India*-5th Nov. 1925)। এই বিতর্ক ও বাদানুবাদের পরও উভয়ের পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য অক্ষুন্ন ছিল। রবীন্দ্রনাথ উহার কয়েকদিন পর গান্ধীজীকে এক পত্রে লিখিলেন :

Santiniketan. Dec. 27-1925.

Dear Mahatmaji,

I have seen the letter you have written to our Shastri-mahashaya. It is full of your noble spirit. You have my

assurance that even if you ever hit me hard in the cause of what you think as truth our personal relationships based upon mutual respect will bear that strain and will remain uninjured.'

With Namasker

(Sd) Rabindranath Tagore.*

গান্ধীজী উহার জবাবে কয়েকদিন পর লিখিলেন,

Dear Gurudev,

I am thankful for your sweet letter. It has given me much relief.

Yours sincerely

M. K. Gandhi*

Sabaramati

3. 1. 26

পরিশিষ্ট ৮

১৯২১ সালের আগস্ট মাসে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ ভ্রমণের শেষে দেশে ফেরার পর হইতেই ডঃ কালিদাস নাগ প্যারিস হইতে রোলাঁ বারবুস প্রমুখ ইউরোপের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের নিয়মিত সংবাদ দিয়া কবিকে এবং রামানন্দবাবুকে চিঠিপত্র লিখিতেছিলেন। উহার কিছু কিছু 'শান্তিনিকেতন পত্রিকা', 'প্রবাসী' ও *Modern Review*তে প্রকাশিত হয়। ১৯২১ সালের শেষভাগে, ভাবাদর্শ এবং নীতিগত প্রশ্নে রোলাঁ ও বারবুসের মধ্যে যে ঐতিহাসিক বিতর্ক হয়, সে-সম্পর্কে অবহিত করার জন্য কালিদাস নাগ ফ্রান্স হইতে রবীন্দ্রনাথকে একটি দীর্ঘ পত্র (১লা বৈশাখ ১৩২৯) লেখেন। পত্রটি জ্যৈষ্ঠ 'শান্তিনিকেতন পত্রিকা'য় (পৃ ৬৯-৭০) প্রকাশিত হয়। পত্রটি ছিল এই:

রোমাঁ রোলাঁ ও আঁরি বারবুস

ফ্রান্সের চিঠি

১লা বৈশাখ ১৩২৯

শ্রীচরণকমলেষু,—

অনেকদিন পরে আপনাকে লিখতে বসেচি; আমার এ চিঠি নববর্ষে

* পত্র দুইটি শান্তিনিকেতনে 'রবীন্দ্রসদনে' সংরক্ষিত আছে।

আপনার আর একটি নবজন্মদিনে পেঁছুবে ; আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করছি।

এবারকার প্রধান খবর Romain Rolland-র সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। এই পরিচয়ের সঙ্গে যেন প্রথম মনে হল ইউরোপে আসা ও ফ্রান্সে একবছর থাকা সার্থক হল ঃ জীবনের সব গভীর পরিচয়ই যেমন অতর্কিতে আসে এটিও তেমনি এল ঃ রোলাঁর ভগ্নি মাদ্‌লেন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু কিছু খবর জানতে চান আমার বর্ত্তমান অধ্যাপক Jules Bloch-এর কাছে। তিনি আমার নাম ধাম রোলাঁদের পাঠান তার ফলে তাঁদের বাড়ীতে আপনার ও গান্ধির আদর্শ ও সাধনা সম্বন্ধে আমায় কিছু কিছু আলোচনা করতে হয় এবং বর্ত্তমান ভারত সমস্যা সম্বন্ধে কিছু কিছু খবর দিতে হয় ; গান্ধীকে পাগল প্রমাণ করবার সাধু প্রয়াস ইংরেজ পরিচালিত কাগজে যতই প্রকট হয়ে উঠছে ফরাসী উদার নৈতিকদের মধ্যে বিশেষতঃ রোলাঁর সহকর্ম্মীদের মধ্যে সত্য গান্ধীকে আবিষ্কার করবার—ভারতের সমস্যাটি বুঝবার আগ্রহ ততই বেড়ে যাচ্ছে। এই সুযোগে তাই আমার মত নগন্য একজন মানুষও শুধু ভারতবাসী বলেই এঁদের দলে ভিড়তে পারলে।

ইতিমধ্যে এক অপত্যাশিত ঘটনা ঘটল ; যে-ফরাসী উদার-নৈতিকদল এতদিন একত্র হয়ে—রাষ্ট্রনৈতিকদের সঙ্গে সংগ্রাম করে আসছিলেন—তাঁদের মধ্যে মতদ্বৈধ উপস্থিত হল ; একদল দাঁড়িয়েছেন বিখ্যাত সাহিত্যিক আঁরি বারবুস এর (Henri Barbusse) পাশে আর একদল Rolland-র পাশে ! দুইদলই স্বীকার করেন যে সমাজকে উদ্ধার করতে হবে রাষ্ট্র সংকট থেকে ; মানুষকে রক্ষা করতে হবে কলের পেষণ থেকে। কিন্তু Barbusse-এর দল একটু অসহিষ্ণু হয়ে বলে উঠলেন, কলের সঙ্গে লড়তে হলে কল গড়তে হবে—আপনা থেকে যদি গড়ে না ওঠে জবরদস্তি করেও গড়া দরকার এবং এ জবরদস্তি যাঁরা না মানেন তাঁরা কবি বা ভাবুক হতে পারেন, সংস্কারক নন—সুতরাং সংস্কারমার্গের বাইরে তাঁদের স্থান।

এই ধরনের ভাবার বিরুদ্ধে রোলাঁ প্রথম একবার ধীর প্রতিবাদ করিলেন L'Art libre পত্রিকায়, তার উত্তর বারব্যুসের দল L'Humanite বলে কাগজে দিলেন ; তার ফলে ১লা এপ্রেলের Clarte কাগজে Rolland Barbusse-এর উত্তর প্রত্যুত্তর ছাপা হয়েছে ; বারব্যুসের লেখার মধ্যে জুলুমের সার্থকতাটা আরও বেশী প্রকট হয়েছে এবং সেই সঙ্গে রোলাঁ তাঁর বক্তব্যটি একখানি অপূর্ব্ব চিঠিতে পরিস্ফুট করেছেন ; তাঁর মতে কলের সঙ্গে সংগ্রামে কল গড়তে যাওয়া—সে যে-কোন দোহাই দিয়েই হোক—আসলে হচ্ছে কলের কাছে জীবনের পরাভব স্বীকার। জার্ম্মানীর Poison gas এ জার্ম্মানীকে হারান হল বটে কিন্তু Germanism অজেয় রয়ে গেল ! তা ছাড়া জুলুম জিনিষটা যত বড় মহৎ উদ্দেশ্যই আশ্রয় করে থাক না কেন—সেটা হচ্ছে ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ; এই জুলুমের পরওয়ানার উপর স্বার্থত্যাগের ছাপ যত বড় অক্ষরেই দেওয়া থাক না কেন সেটা জুলুমই থেকে যায় সুতরাং সেখান মনুষ্যতের পরাভব স্বীকার

করা হচ্ছে ; যে স্বার্থত্যাগ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নয় তা মানুষকে বড় করে না—খর্ব করে। আপাত ফললাভের লোভ যতই দেখান যাক না কেন কোনও সমাজনৈতিক ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মূলে আঘাত করে সমাজকে স্থায়ী-ভিত্তি দিতে পারেন না। সুতরাং প্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে মানুষের মনকে মুক্তি দেওয়া ; তবেই তার ইচ্ছা সত্যকে আশ্রয় করতে, তার হৃদয় কল্যাণকে বরণ করতে শিখবে।

এখন ফরাসী ভাষায় তাঁর মত মনীষীর কথাও বুঝতে পারি বলে কি আনন্দ হয় কি করে বোঝাব! অনেক সুকৃতির ফলে আপনার ভিতর দিয়ে রোলাঁর সঙ্গে পরিচয় হল ; এঁর সমস্ত বই একধার থেকে পড়ে যাচ্ছি…দেশে ফিরে প্রথম কাজ রোলাঁর চিন্তা ও আদর্শ দেশের লোকের সামনে ধরা এবং এঁর বইএর প্রচার করা ; যথার্থ বিশ্বপ্রেমিক মানুষ ইয়োরোপে এই প্রথম দেখলুম। অথচ চারিদিক থেকে এর উপর আক্রমণ। শুধু অত্যুগ্র স্বাজাতিক ফরাসী দেশবাসী নয়—রোলাঁর সমধর্ম্মী সহকর্ম্মীরা পর্য্যন্ত তাঁকে কতটা ভুল বুঝছেন তা দেখছি!

শিল্পী ত মানুষ বটে—তাই এই ভুল বুঝবার নিষ্ঠুরতা বোধ হয় সব চেয়ে এঁদের বাজে ; Rollandকে দেখে মনে হল যেন একটা সাময়িক অবসাদ এসেছে—আমার মত কীটানুকীট তাঁকে সান্ত্বনা দেবার স্পর্ধা রাখে না, তবু একটি কাজ না করে থাকতে পারলুম না ; 'বলাকা' থেকে আপনার 'যাত্রী' কবিতাটি অনুবাদ করে তাঁকে উপহার দিয়ে এসেছি ; অনুবাদ শুনে আমায় আসল বাংলা কবিতাটি আবৃত্তি করতে বললেন—সৌভাগ্যক্রমে কবিতাটি মুখস্থ ছিল ; শোনবার পর কিছুক্ষণ চুপ করে রোলাঁ বলে উঠলেন "কবির এই দিকটা অনুবাদের ভিতর দিয়ে পাওয়া সব সময় সহজ হয় না ; যাত্রীর ধরনের লেখা তাঁর এ পর্য্যন্ত দেখেচি বলে মনে হয় না—এ যেন Beethoven-এর sublime Symphony…"

বেথোভেনের জীবনীলেখক কি মনে করে একথা বললেন ভাবতে ভাবতে বাসায় ফিরে এলুম।

প্যারিসে থাকা বোধ হয় রোলাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তিনি শুনেছি স্থায়ীভাবে সুইটজারল্যাণ্ডে বাস করবেন ; আপনার জন্মদিন আসছে এবং আপনাকে আমি চিঠি লিখতে যাচ্ছি জেনে রোলাঁ এবং তাঁর ভগ্নি তাঁদের শুভ-ইচ্ছা ও প্রীতিনমস্কার আপনাকে পাঠাতে বলেছেন, আশা করি আপনার শরীর বেশ ভাল যাচ্ছে এবং বিশ্বভারতীর কাজ বেশ এগিয়ে চলেছে। আচার্য্য লেভি নেপাল থেকে ফিরে আবার আশ্রমে আসছেন কি? তাঁরা ভারতে কতদিন আছেন? আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করছি। ইতি

স্নেহের কালিদাস

স্পষ্টই বুঝা যায়, ডঃ নাগ রোলাঁ-বারবুস বিতর্কের গভীরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। তবে ভার্সাই সন্ধি ও যুদ্ধোত্তর ইউরোপের বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলন সম্পর্কে তিনি কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ও তথ্যাদি প্রেরণ

করিয়া চলিয়াছিলেন। এই সময় রম্যাঁ রোলাঁর নেতৃত্বে ফরাসী বুদ্ধিজীবীরা পরাভূত ও দুঃখদৈন্যভারক্লিষ্ট জার্মানীর সাহায্যে আগাইয়া আসিবার জন্য যে আবেদন জানাইয়াছিলেন, কালিদাস নাগ সে সমস্ত *Modern Rereiw* এ প্রকাশ করিতে থাকেন। তার কয়েকটি ছিল এই ঃ

An Appeal To The French For Coming To The Aid of Suffered Germany.

"Befor suffering there is neither victor nor vanquished...

"The people of Germany die of hunger. Thousands of inncocents expiate cruelly the consequences of the scourage of war of which they are not more culpable than ambition the avidity and selfishness of their governing classes. In Berlin, in Liepzig, in Firburg, when the bred cost (about the end of October) seven to ten million marks, the monthly salary of an intellectual worker, never reached the hundredth of that price. Professors, Doctors, Engineers, Advocates, sell their books and their instruments of work for buying bread. The students of certain universities are obliged to go a-begging about the country, in large groups. In Berlin 70% of the children go to school without a sufficient meal. A large number of them have no hot soup except every two days. Thousands of families weakened by privations sink slowly. The suffering from cold goes to add to that of hunger. The winter opens with a terrible famine and epidemic.

"France was chivalrous not long ago when the Great Victor Hugo was living to help. France extended her hands to the vanquished on the field of battle and nursed their wounds.

"We issue this appeal to all our race, without distinction of party or creed. Alas, the French are decimated by diverse passions. ! But let us do justice to one another....Let us affirm that there is no place in French heart for base hatred, or a more ignoble callousness about the misfortune of other peoples. Let us prove rather, that victorious France remains still the land of compassion....We invite the French to extend the hand of succour of the people, whom they have defeated."

Christmas 1923.

[This appeal of international amity issued by the greatest living writer of France in favour of her age-old adversary, was signed by some of foremost men of science and letters : Prof. Langevin (Physicist) and Prof. Millet (Philologist) of the College the France. Prof. Charles Gide (Economist) of the Faculty of Law, Mon. Bussin, President of the League of the Rights of Man, Franz Masereell, the artist, G. Duhamel, Pirre Hamph, gean Richard Bloch, Charles Vildrace and other distinguished writers of modern France—K. N.]

Victor And Vanquished.

—By Romain Rolland.

(III)

"I return spending a few weeks in Germany, I have seen many Germans, not only from one city to another, but in the same city, from one class or generation to another, and some times in the same. How could one speak of establishing relations between a Germany which is not united, which one cannot embrace as a whole and a France which is no less multiple and divided.···

"Secondly, I find that I cannot at this time, fix any more gaze on the Franco-German quarrel. The tragic events which are on the way, to accomplice their end on the whole of Old World, relegate that quarrel to museum of cast-off clothes amidst clamouring of the past ! The great nations of the Occident are on the eve of ruin. It is but natural that there should be only questions of revenge or domination between them ! If these enraged blood hounds persist in tearing one another to pieces, the heavy rod of Destiny alone will seperate them, curb them, bruised and humiliated···Here for the last eleven years I have watched this stupid, war crumbling the pillars of European civilization, and I have cried out in consternation through my article '*About the Battlefield*' (Sept. 1914). But what can an isolated voice do ? Now I am keeping silent. I have no more fear, for I see Fate. And I know that

fate is wise when the peoples are mad. Fate has possession of the helm. Let any one who can try to snatch it from her !

"Young souls, with heart strong and tempered in battle, who amongst you is ready to dispute the reign of Destiny !"

Romain Rolland

[N. B. Mon. Romain Rolland spent this summer in Germany and communicated these lines to *La Revue Europeenne* (August 1925) at the invitation of editor to write something in connection with the '*Inquest on Germany*'—*K. N.*]

[*Modern Review*-Octo. 1925. p.-385]

French Intellectuals Protest Against Treaty of Versailles

The New Republic records that

About one hundred French intellectual leaders including writers, College professors and others have jointly signed an exceedingly interesting manifesto. It protests against Article 231 of the *Treaty of Versailles*, under which Germany assumes the sole guilt for the war. It also demands abrogation of the sanctions articles 227 to 230. Among the signers, it is interesting to note, are French historians such as Georges de Martial and Mathias Morhardt, who made a special study of the origins of the war. Others whose names appear, according to the Paris correspondent of the *Manchester Guardian*, include Marc Sangier, Jules Romains, Romain Rolland, General Percin, Victor Marguerittee, Charles Gide, and Henri Barbusse. The manifesto dose not ask any revision of the treaty. "But" it says, "it is impossible to prejudge the issue [of war guilt] like this.

"There can be no way of conducting this immense trial, in which the whole humanity is interested, in all the complex detail of its causes, without having all the archives open, nor anywhere save before a supernational court……Arteicle 231 was extorted from Germany only under violence and under a threat of an immediate restraining of the war which might have led to her complete ruin. The day of such summary judgments without appeal has gone by. It is just as inquisitions to condemn a nation to dishonour unheared as an individual to death unheared."

Publication of this document, as the *Manchester Guardian* is careful to point out, does not mean that its signers absolve Germany of all guilt. It is only the admission of sole responsiblity, made with a pistol at her head, which they protest. Already, in the eyes of all intelligent people throughout the world, whatever reality may once have attached to that admission has long since disappeared. It is impossible to believe that will to take seriously by anybody in the future.

[*Modern Review*. Oct. 1925. p444]

পরিশিষ্ট ৯

অনেকের ধারণা. ১৩৩৫ সালের শ্রাবণে (ইং ১৯২৮) বর্ষামঙ্গল উৎসবের সময় রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে 'বৃক্ষরোপণ উৎসব'-এর সূচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নহে। এর প্রায় তিন বৎসর পূর্বে,—১৩৩২ সালে ২৫ শে বৈশাখ (ইং ১৯২৫) কবির পঞ্চষষ্টিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে কবি স্বয়ং 'পঞ্চবটী রোপণ ও উৎসর্গ' করিয়া বৃক্ষরোপণ উৎসবের সূচনা করেন। এই উপলক্ষেই কবি 'মরুবিজয়ের কেতন উড়াও' গানটি রচনা করেন, 'পঞ্চবটী' রোপণের সময়ই উহা গীত হয়। সমসাময়িক 'প্রবাসী' পত্রিকায় (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২) কবির এই পঞ্চষষ্টিতম জন্মোৎসবের পূর্ণ অনুষ্ঠানসূচীটি প্রকাশিত হয়। কৌতূহলী পাঠকের অবগতির জন্য এখানে সমগ্র অনুষ্ঠানসূচীটিই উদ্ধৃত হইল :

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২

গত ২৫শে বৈশাখ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের চৌষট্টি বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইয়াছে ; ঐ দিন তিনি পঁয়ষট্টি বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। ঐ দিবস নিম্নলিখিত পদ্ধতি-অনুসারে শান্তিনিকেতনে উৎসব হইয়াছিল।

আচার্য

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের

পঞ্চষষ্টিতম জন্মতিথি-উৎসব

কার্যাবলী

২৫শে বৈশাখ ১৩৩২

প্রাতে ৬ষ্ঠ ঘটিকা

১। শঙ্খ ও ঘণ্টা বাজিলে আচার্যের গৃহ "উত্তরায়ণে" সকলের উপবেশন।

২। গান।

৩। আচার্যের আগমন।

৪। সকলের দণ্ডায়মান হইয়া বেদগান ও মন্ত্রপাঠ।

৫। আশ্রমবাসীর পক্ষ হইতে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের স্বস্তি বচন পাঠ:—

আচার্য, গুরো, তাত, কল্যাণমিত্র, প্রেষ্ঠ,
আশংকাং শময়ংস্তমো বিদলয়ন্নাশাঃ সমুদ্বোধয়-
ন্নানন্দং জনয়ঞ্জগজ্জনমনঃপ্রেমাংকুরং রোপয়ন্।
শান্তিং সংঘটয়ন্ সমস্তবসুধাশ্রেয়শ্চ সংসাধয়-
ন্নদ্যায়ং তব বর্ষবৃদ্ধিদিবসঃ প্রাপ্তঃ পুনঃ পুণ্যতঃ॥
তদদ্য ইদং বয়মাশাস্মহে—
এষ ত্বাং সবিতা ধিনোতু ভগবান্ যজ্জ্যোতিরাদীপ্যতে,
ত্বাং পাত্বাশ্রমদেবতা ভগবতী নিত্যং প্রসন্নান্তরা।
জীব ত্বং শরদাং শতং স্ফুটতরং বিশ্বস্য পশ্যঞ্চ শিবং
তৃপ্যত্বেতদনারতং চ ভুবনং শান্তিং পরামাগতম্॥

৬। আচার্যকে মাল্য চন্দনাদি দান।

৭। শংখঘণ্টাধ্বনি ও আনন্দবাদ্য।

৮। বীণাবাদন।

৯। আশ্রম-কন্যকা ও পুরস্ত্রীগণের প্রশস্তি পাত্র লইয়া আগমন ও আচার্যকে অর্ঘপ্রদান।

১০। কবিতা-আবৃত্তি।

১১। গান।

প্রাতে ৭ম ঘটিকা

উত্তারায়ণে জলযোগ।

প্রাতে ৭॥০ ম ঘটিকা

১। পঞ্চবটী রোপণ ও উৎসর্গ।

কর্তা।

ওঁ অস্মিন্ কর্ম্মণি 'ওঁ পুণ্যাহং' ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু।

সদস্যগণ।

ওঁ পুণ্যাহং, পুণ্যাহং, পুণ্যাহম্।

কর্তা।

ওঁ অস্মিন্ কর্ম্মণি 'ওঁ স্বস্তি' ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু।

সদস্যগণ।

ওঁ স্বস্তি, স্বস্তি, স্বস্তি।

কর্তা।

ওঁ অস্মিন্ কর্মণি 'ওঁ ঋদ্ধিঃ' ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু।

সদস্যগণ।

ওঁ ঋধ্যতাম্, ঋধ্যতাম্, ঋধ্যতাম্।

কর্তা।

ওঁ তৎসদদ্য বৈশাখে মাসি মেষরাশিস্থে ভাস্করে শুক্লে পক্ষে পূর্ণিমায়াং তিথৌস্ববর্ষবৃদ্ধিদিবসে শাণ্ডিল্যগোত্রঃ শ্রীরবীন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা পান্থপশু-পক্ষিণাম্ অন্যেষাং চ প্রাণভৃতাং হিতায় চ সুখায় চ এতাং পঞ্চবটীং রোপয়ামি, রোপয়িত্বা চ তেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ সমুৎসৃজামি।

সদস্যগণ।

ইদং সিধ্যতু, ইদং সিধ্যতু, ইদং সিধ্যতু। সাধু, সাধু, সাধু।

আশ্রম-কন্যকা-ও পুরন্ধ্রীগণ কর্তৃক শঙ্খঘণ্টাধ্বনি।

আনন্দবাদ্য।

২। কন্যকা ও পুরন্ধ্রী-গণের প্রশস্তিপাত্র-হস্তে তিনবার পঞ্চবটীর প্রদক্ষিণ করা হইলে শঙ্খ, ঘণ্টা ও অন্যান্য আনন্দ-বাদ্যের সহিত তাহার রোপণ।

৩। স্মৃতিগাথা প্রতিষ্ঠা—

পান্থানাং চ পশূনাং চ পক্ষিনাং চ হিতেচ্ছয়া।
এষা পঞ্চবটী যত্নাদ্ রবীন্দ্রেণেহ রোপিতা॥

৪। গান— মরুবিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে,
হে প্রবল প্রাণ।
ধূলিরে ধন্য করো করুণার পুণ্যে
হে কোমল প্রাণ।
মৌনী মাটির মর্মের গান কবে
উঠিবে ধ্বনিয়া মর্মর তব রবে?
মাধুরী ভরিবে ফুলে ফলে পল্লবে,
হে মোহন প্রাণ!
পথিক বন্ধু, ছায়ার আসন পাতি,
এস শ্যামসুন্দর।
এস বাতাসের অধীর খেলার সাথী,
মাতাও নীলাম্বর।
উষায় জাগাও শাখায় গানের আশা,
সন্ধ্যায় আনো বিরাম গভীর ভাষা,
রচি দাও রাতে সুপ্ত গীতের বাসা,
হে উদার প্রাণ॥

মধ্যাহ্ন ১১শ ঘটিকা

আহার।

অপরাহ্ন ৫ম ঘটিকা

জলযোগ।

রাত্রি ৭ম ঘটিকা

১। অভিনয়—"লক্ষ্মীর পরীক্ষা"

২। গান।

রাত্রি ৮॥০ ম ঘটিকা

আহার

অশ্বত্থ, বট, বিল্ব, অশোক ও আমলকী, এই পাঁচটি বৃক্ষ রোপণ করা হইয়াছে। নিকটে একটি কূপও খনিত হইবে।

"লক্ষ্মীর পরীক্ষা"র অভিনয় আশ্রম কন্যাকাগণ করিয়াছিলেন; কেবল লক্ষ্মীদেবীর ভূমিকা কলিকাতার কোন এক মহিলা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অভিনয় খুব ভালো হইয়াছিল।

সমুদয় অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছিল।

উপরে যে নূতন গানটি মুদ্রিত হইয়াছে তাহা ব্যতীত আরও অনেকগুলি গান গাওয়া হইয়াছিল।

পরিশিষ্ট ১৫

জনসংখ্যাবৃদ্ধি সমস্যা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন সম্পর্কে *'Birth Control Review'* পত্রিকার সম্পাদক Margaret Sanger-কে রবীন্দ্রনাথের পত্র (৩০শে সেপ্টেম্বর-১৯২৫):

Dear Margaret Sanger,

I am of opinion that the Birth Control movement is a great movement not only because it will save women from enforced and undesirable maternity, but because it will help the cause of peace of lessening the number of surplus population of a country, scrambling for food and space outside its own rightful limits. In a hunger-striken country like India it is a cruel crime thoughtlelssy to bring more children to existence than could properly be taken care of, causing endless sufferings to them and imposing a degrading condition upon the whole family. It is evident that the utter helplessness of a growing poverty very rarely acts as a check controlling the burden of over-population. It proves that in this case nature's urging gets the better of the severe warning that comes from that providence of civilized social life. Therefore, I believe, that to wait till the moral sense of man becomes a great deal more powerful than it is now and till then to allow countless generations of children to suffer privations and untimely death for no fault of their own is a great social injustice which should not to be tolerated. I feel

grateful for the cause you have made your own and for which you have suffered.

"I am eagerly waiting for the literature that has been sent to me according to your letter, and I have asked our Secretary to send you our Visva Bharati Journal in exchange for your Birth Control Review."

—*Amrit Bazar Patrika*-January 5-1926.

পক্ষান্তরে, গান্ধীজী আধুনিক বৈজ্ঞানিক পন্থায় জন্মনিয়ন্ত্রণ নীতির ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। ভারতের জনসংখ্যাবৃদ্ধি সমস্যা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে গান্ধীজী বলিলেন,

…"I must not conceal from the reader the sorrow I feel, when I hear of births in India. I must confess that for years I have contemplated with satisfaction the prospect of suspending procreation by voluntary self-denial. India is to-day ill-equipped for taking care of her present population, not beacause she is over-populated, but because she is forced into foreign domination, whose creed is progressive exploitation of her resources.

"How is suspension of procreation to be brought about ? Not by immoral and artificial checks that are resorted to in Europe, but by a life of discipline and self-control. The parents must teach their children the practice of brahmacharya. According to the Hindu shastras the lowest age at which boys may marry, is twenty-five. If the mothers of India could be inclined to belive that it is sinful to train boys and girls for a married life, half the marriages of India will automatically stop. Nor need we believe the fetish of early puberty among girls, because of our hot climate. What does bring about untimely puberty is the mental and moral atmosphere surrounding our family life. The mothers and other relatives make it a religious duty to teach innocent children that they are to be married when they reach a particular age.…By reckless indulgence in their passions, parents serve for their children as models of unrestrained licence. Every untimely addition to the family is ushered in amid trumpets of joy and feasting. The wonder is that we are not less restrained than we are,

notwithstanding our surroundings. I have not a shadow of doubt that the married people, if they wished well to the country and wanted to see India become a nation of strong and handsome fullformed men and women, would practise perfect self-restraint and cease to procreate for the time being."

—*Mahatma*-Vol. II.-pp. 224-25.

পরিশিষ্ট ১১

লর্ড লিটনের দ্বিতীয়বার শান্তিনিকেতন পরিদর্শনের (২৪শে নভেম্বর, ১৯২৫) সময় কবির আপ্যায়ন ইত্যাদি লইয়া কয়েকটি সংবাদপত্রে বিরূপ সমালোচনা হয়। ইতিপূর্বে ঢাকায় পুলিসের কার্যের প্রশংসা প্রসঙ্গে লিটন ভারতীয় নারীদের সম্পর্কে যে অশালীন মন্তব্য করেন, রবীন্দ্রনাথ তাহার প্রতিবাদ করেন। অবশ্য লিটন তাঁহার জবাবে ভারতীয় নারীদের প্রশংসাই করেন। রামানন্দবাবু 'প্রবাসী'তে (আশ্বিন ১৩৩১) সে-প্রসঙ্গেও আলোচনা ও মন্তব্য করিতে ছাড়েন নাই। এবারে লিটনের শান্তিনিকেতন পরিদর্শনের প্রসঙ্গে যে বিরূপ সমালোচনা হইতেছিল, রামানন্দবাবু 'প্রবাসী' তে (পৌষ, ১৩৩২) সে-প্রসঙ্গে আলোচনা করিতে গিয়া লিখিলেন:

সম্প্রতি লর্ড লিটন শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় এবং সুরুলের শ্রীনিকেতনে পল্লীসমূহের উন্নতি সাধন চেষ্টার প্রতিষ্ঠান দেখিয়া আসিয়াছেন। এ বিষয়ে একজন 'দর্শক' একখানি খবরের কাগজে রবিবাবুর নিন্দা করিয়াছেন, এবং অন্য একখানা কাগজেও এরূপ নিন্দা দেখিয়াছি। নিন্দা যিনি যাহা করুন, সে বিষয়ে আমরা কিছু বলিতে চাহি না। কিন্তু আমরা যাহা জানি, তাহাতে "দর্শকের" চিঠিতে তথ্য হিসাবে কিছু ভুল আছে। তাহাতে লিখিত আছে, যে, রবিবাবু লর্ড লিটনকে আমন্ত্রণ করিয়া শান্তিনিকেতনে লইয়া গিয়াছিলেন। আমরা এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে কিছু জিজ্ঞাসা করি নাই; আমরা নিজে যাহা জানি তাহাই বলিতেছি।

গত পূজার ছুটির আগের দিন পর্যন্ত আমরা শান্তিনিকেতনে ছিলাম। তাহার অনেকদিন আগে তখন রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ছিলেন না, বীরভূমের একজন সরকারী কর্মচারী বোলপুরে আসেন। তাঁহাকে তাঁহার বোলপুরে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন' "যে, লাটসাহেব বীরভূম জেলায় আসিবেন এবং তখন প্রাইভেটভাবে শান্তিনিকেতন দেখিতেও তিনি ইচ্ছা করেন; কিন্তু লাট-সাহেব কোথাও প্রাইভেট ভাবে আসিলেও তাঁহার নিরাপদ অবস্থান ও আরামাদির বন্দোবস্তের দরকার বলিয়া তত আগে হইতে সব ঠিকঠাক করিতে হইতেছে। কিছুদিন আগে রবিবাবুর সহিত কলিকাতায় কথা প্রসঙ্গে লাট-সাহেবের শান্তিনিকেতন দর্শন-সম্বন্ধে তিনি যাহা বলেন তাহা লিপিবদ্ধ করিবার অনুমতি আমরা চাই নাই। অনুমতি থাকিলে প্রমাণ করা সহজ হইত যে, ঐ

দর্শন-ব্যাপারটা তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু ছিল না। ইহার বেশী কিছু লিখিব না। তবে, কেহ যদি মনে করেন ও বলেন, শান্তিনিকেতনের প্রত্যেক ভাবী অতিথি-অভ্যাগতের পাপ পুণ্যের বিচার করিয়া তবে তাহাকে সেখানে আসিতে দেওয়া উচিত, এবং লাট লিটন আসিতে চাহিলেও তাহাকে নিষেধ করা উচিত ছিল, তাহা হইলে তিনি তাহা করিতে পারেন।

লাট-সাহেবকে অভিনয়াদি দেখান হইয়াছিল, রবিবাবুর নিন্দার ইহা একটা কারণ। কিন্তু অভিনয়াদি শুধু লাট-সাহেবের জন্যই হয় নাই; পূর্বে আরও নানা উপলক্ষে হইয়া গিয়াছে। যমুনালাল বজাজ মহাশয় একবার যখন আসিয়াছিলেন তখন হইয়াছিল; বীরভূম জেলার স্বাস্থ্যকৃষি শিল্প-আদির উন্নতির জন্য কনফারেন্সের প্রতিনিধিদের জন্য হইয়াছিল, ইত্যাদি। তাহা হইয়া থাকিলেও লাট সাহেবের জন্য হওয়া উচিত ছিল না। যদি কেহ মনে করেন, তাহা করিবার অধিকার তাঁহার আছে।

রবিবাবু লিটনের সহিত আহার করিয়াছেন, ইহা তাঁহার বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ। কিন্তু আহার রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের অনেক অপ্রসিদ্ধ বাঙালী ও অবাঙালী অতিথির সহিত, জাত ও কর্মের বিচার না করিয়া, করিয়া থাকেন। তাহা হইলেও লিটন-সাহেবের সহিত তাঁহার অন্নগ্রহণ করা উচিত হয় নাই, এরূপ মনে করিবার অধিকার অবশ্য প্রত্যেক সমালোচকের আছে। তথ্য সম্বন্ধে ঠিক খবর দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য, সমালোচনার সমালোচনা করা উদ্দেশ্য নহে।

ঢাকায় পুলিসের প্রশংসাপূর্ণ যে বক্তৃতায় লিটন ভারতনারীদের উল্লেখ করেন, আমাদের বিবেচনায় রবিবাবু তাহাকে সে বিষয়ে দুখানা চিঠি লিখিয়া ভালই করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম চিঠির জবাবে লাটসাহেব ভারত মহিলাদিগের অবিমিশ্র উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে রবিবাবু দ্বিতীয় যে চিঠি লেখেন, তাহাতে লাটসাহেব কোণঠাসা হইয়া কোন প্রত্যুত্তর দিতে পারেন নাই। উহাতে রবিবাবু লিখিয়াছিলেন, যে ভারতীয়রা লাটসাহেবের গবর্ণমেণ্টকে এই 'চ্যালেঞ্জ', করিতে প্রস্তুত, যে উক্ত গবর্ণমেন্ট লাটসাহেবের উল্লিখিত এরূপ কোন মোকদ্দমার উল্লেখ করুন, যাহাতে ভারতনারীরা তাহাদের পুরুষ আত্মীয়দের প্ররোচনায় পুলিসকে জব্দ করিবার জন্য নিজেদের সতীত্বের উপর পুলিসের হস্তক্ষেপের মিথ্যা অভিযোগ আনিয়াছে। এরূপ কোন দৃষ্টান্ত লাটসাহেব বা তাঁহার গবর্ণমেণ্ট দিতে পারেন নাই। অবশ্য চর মনাইয়ের মোকদ্দমাকে তাঁহার বক্তৃতায় লক্ষ্য করেন নাই বলায়, তথাকার স্ত্রীলোকদের উপর পুলিসের অত্যাচার সম্বন্ধে ঐ স্ত্রীলোকদের সাক্ষ্য সত্য বা মিথ্যা তাহা বিবেচনার বিষয় ছিল না; অন্য দৃষ্টান্তই রবিবাবু চাহিয়াছিলেন, কিন্তু পান নাই।

কোন কোন খবরের কাগজ পাঠকদের বিশেষ দর্শনীয় স্থানে ও বড় অক্ষরে প্রচার করে, যে, রবিবাবু লিটনের অনুরোধে তাঁহাকে প্রথম চিঠি লেখেন; কিন্তু যখন ঐ কথা মিথ্যা বলিয়া প্রতিবাদ হয়, তখন প্রতিবাদ ছোট অক্ষরে, সহজে চোখে পড়ে না এরূপ এককোণে ছাপা হইয়াছিল। এরূপ লোকদের কাছে তিনি

ন্যায় বিচার পাইবেন না, জানি ; তথাপি আমাদের জ্ঞান-অনুসারে কয়েকটা তথ্য লিপিবদ্ধ করিলাম।

পরিশিষ্ট ১২

ইংরেজ সরকার কর্তৃক 'পথের দাবী' পুস্তক বাজেয়াপ্ত (পৃ ২৯২) হওয়ার পর ঐ-সম্পর্কে শরৎচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথের পত্র : (২৭শে মাঘ-১৩৩৩),

..."ইংরেজরাজ ক্ষমা করবেন এই জোরের উপরেই ইংরেজরাজকে আমরা নিন্দা করব সেটাতে পৌরুষ নেই। আমি নানাদেশ ঘুরে এলেম—আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েচে তাতে এই দেখলেম একমাত্র ইংরেজ গবর্মেণ্ট ছাড়া স্বদেশী বা বিদেশী প্রজার বাক্যে বা ব্যবহারে বিরুদ্ধতা আর কোনো গবর্মেণ্টই এতটা ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে না। নিজের জোরে নয় পরন্তু সেই পরের সহিষ্ণুতার জোরেই যদি আমরা বিদেশী রাজত্ব সম্বন্ধে যথেচ্ছ আচরণের সাহস দেখাতে চাই তবে সেটা পৌরুষের বিড়ম্বনামাত্র— তাতে ইংরেজরাজের প্রতিই শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয় নিজের প্রতি নয়। রাজশক্তির আছে গায়ের জোর, তার বিরুদ্ধে কর্তব্যের খাতিরে যদি দাঁড়াতেই হয় তাহলে অপরপক্ষে থাকা উচিত চারিত্রিক জোর—অর্থাৎ আঘাতের বিরুদ্ধে সহিষ্ণুতার জোর। কিন্তু আমরা সেই চারিত্রিক জোরটাই ইংরেজরাজের কাছেই দাবী করি নিজের কাছে নয়। তাতে প্রমাণ হয় যে, মুখে যাই বলি নিজের অগোচরে ইংরেজকে আমরা পূজা করি—ইংরেজকে গাল দিয়ে কোনো শাস্তি প্রত্যাশা না করার দ্বারাই সেই পূজার অনুষ্ঠান ......কিন্তু তাই বলে কি কলম বন্ধ করতে হবে ? আমি তা বলিনে —শাস্তিকে স্বীকার করেই কলম চলবে। যে কোনো দেশেই রাজশক্তিতে প্রজাশক্তিতে সত্যকার বিরোধ ঘটেচে সেখানে এমনিই ঘটেচে—রাজবিরুদ্ধতা আরামে নিরাপদে থাকতে পারেনা, এই কথাটা নিঃসন্দেহে জেনেই ঘটেচে। তুমি যদি কাগজে রাজবিরুদ্ধ কথা লিখতে তাহলে তার প্রভাব স্বল্প ও ক্ষণস্থায়ী হত—কিন্তু তোমার মত লেখক গল্পছলে যে কথা লিখবে তার প্রভাব নিয়ত চলতেই থাকবে—দেশে ও কালে তার ব্যাপ্তির বিরাম নেই—...। এমন অবস্থায় ইংরেজরাজ যদি তোমার বই প্রচার বন্ধ করে না দিত তাহলে এই বোঝা যেত যে সাহিত্যে তোমার শক্তি ও দেশে তোমার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তার নিরতিশয় অবজ্ঞা ও অজ্ঞতা। শক্তিকে আঘাত করলে তার প্রতিঘাত সইবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে এই কারণেই সেই আঘাতের মূল্য—আঘাতের গুরুত্ব নিয়ে বিলাপ করলে সেই আঘাতের মূল্য একেবারেই মাটি করে দেওয়া হয়।"

[বিশ্বভারতী পত্রিকা-৮'ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা-পৃ ৯৬-৯৭]

পরিশিষ্ট ১৩

১৯২৭ সালে অ্যাঁরি বারবুস্ ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের যে আবেদনপত্রটি রবীন্দ্রনাথকে পাঠান (পৃ ২৯৩) নিম্নে তাহার প্রথম অংশটি উদ্ধৃত করা হইল :

To The Free Spirits

"Since eight years that the war is over, the state of war is going on. In almost every country the essential liberties are threatened by violence. First one could believe that these were the last waves of a storm which would gradually subside, the consequence, fatal but transitory, of the pressure formerly exercised on martyrized peoples who reconquer their rights. But the mean interests of some groups or individuals have incorporated these blind forces ; they have made of violence a system of government. Under the name of Fascism we see everywhere crushed or threatened all the conquests of freedom, that had been achieved by centuries of sacrifices and strenuous efforts ; freedom of association, freedom of press, freedom of opinion, and even Conscience itself, all are persecuted. We can no longer remain silent in the presence of this bankruptcy of progress.

"We think that the time has come to ask all the persons who exercise in our times any intellectual and moral influence in the world, to unite in a committee destined to struggle against the barbarous tide of Fascism."

—*Visva Bharati Quarterly*-July 1927-p 193.

পরিশিষ্ট ১৪

১৯২৭ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রুসেলসে নির্যাতিত জাতি ও দেশগুলি সম্মেলনে যোগদানের পর জওহরলাল নেহরু ভারতে নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কর্মিটির নিকট উহার দীর্ঘ ও পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিয়া উহাতে যে সব বিষয়ে মন্তব্য বা সুপারিশ করেন (পৃ ২৯৭) তাহার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হইল :

"I feel that whatever our internal politics might be we connot, in our own interest and in the interest of the rest of the world, afford to remain isolated from the great movements and forces which are shaping the future.···We are today facing a crisis in China and it is rumoured that the British Cabinet intends to break off all relations with Russia···

If we want to prevent war, we cannot wait till it is actually declared. It is very difficult to do much when the fatal plunge has been taken. But it is possible to do a great deal even for a subject country like India if public opinion is educated and made to realise whither the imperialist policy of our rulers is tending. If we want to stop the shameless use of Indian troops against our brethren in China, we have to go to our people and tell them about it and raise such a storm of protest that it will be impossible for the Government to send a single Indian soldier abroad. Our people will not gain by the Imperialist adventures of England and her wars. Why should we not make it clear, with tremendous weight of mass oppinion behind us, that we shall not be pawns in the hands of English Imperialists, that we shall not take part in any wars at their bidding, and that, above all, we shall not permit our fellow-countrymen to be used to crush people for whom we have every feeling of friendship and sympathy ?···

"As I have stated above, I had occasion to meet many delegates from Asiatic countries, in Brussels. There was a very strong desire amongst them for a closer bond between Asiatic countries, but nothing practicable could be suggested. We felt that for the present the League against Imperialism would offer us a common meeting ground and we could always remain in touch through it.···At our Annual Congresses and meetings we should invite and welcome fraternal delegates from the other organisations, and whenever opportunity occurs we might visit the other countries and study the national movements there.

"Our Chinese friends were especially eager to welcome Indians in China whether as accredited representatives of the Indian National Congress or as students or visitors. Nothing would please them more than to have a visit from representatives of the A. I. C C, to study the Chinese situation on the spot. For students they are prepared to afford every facility, and even now, as is well-known, many of the records of ancient Indian culture can only be found in China."

পরিশিষ্ট ১৫

The Threefold Movement

An internationalist movement, composed of the '*Fellowship of Faiths*', '*Union of East and West*', and '*League of Neighbours*' has recently made its appearance in London. The first European meeting of this organisation was held at theCity Temple last July when ten-munite addresses on 'Peace and brotherhood' were given by the representives of seven world religions.···A similar gathering took place in October, and on each occasion some, 3000 persons were present. At the latter meeting it was observed that any anti-British allusions were loudly cheered.······

"The three sections of the movement are described as follows :—

First : *The 'Union of East and West'* starting in London 17 years ago endorsed by many eminent leaders, such as Viscount Bryce, Keir Hardie, H. G. Wells, Viscount Leverhulme, Sir Rabindranath Tagore, Sir Thomas Arnold, Dr. W. A de Silva and Mrs. Pethick Lawerence. Interprets to each other the best qualities of East and West and promotes cultural unity through the medium of drama, literature, art, music, science and philosophy.

Second : '*The League of Neighbours*' begining in the United States seven years ago, endorsed by President Wilson, President Harding, Rabby Wise, Father Ryan, Dr. Dyke, former sec. of War Baker, Upton Sinclair, Basil King and many others, interprets racial or national groups to each other, be friends individually···and thus, through neighbourly service, develops the needed new consciousness of human unity.

Third , *The 'Fellowship of Faiths'*, created in America three years ago by the coming together of the *Union of East and West and the League of Neighbours*, endorsed by Christains of many dominations, by Jews and by eminent representatives of the other living religions of the world. brings

together in a spirit of mutual appreciation the adherents of various religions and promotes spiritual unity by emphasising those spiritual fundamentals in which all great faiths agree

The League of Neighbours, with which the Fellowship of Faiths was associated, produced a pageant on a large scale at Elizabeth, New Jarsey, in 1924. A play was performed in which Anti-British and anti-Imperialist propaganda was conspicuous.

The London Committee includes prominent members of the Socialist Labour Party, the International Peace Society, the Free Religious Movement, and the Theosophical society.

—*The Patriot*-London-Nov. 3.-1937

পরিশিষ্ট ১৬

১৯২৮ সালে (সম্ভবত জুলাইয়ের শেষভাগে) বিলাতের সাংবাদিক F. L. Minnigerode-এর সহিত এক সাক্ষাৎকারের সময় ইউরোপের ফ্যাসিজম ও সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতা-সংস্কৃতির তীব্র নিন্দাবাদ করিয়া রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ এক বিবৃতি দেন।

উহার অংশবিশেষ এইরূপ :

In Italy the worship of unscrupulous force is the vehicle of nationalism, and this force keeps alive the fire of international jealousy. It may ultimately be the means of bringing about universal devastation.…

The methods and basic principles of Fascism concern all humanity, and it is absurd to imagine that I could ever support a movement that ruthlessly suppresses free speach, that compels obedience to its commands that are against the convictions of individuals, and that follows the bloodbespattered path of violence and of secret crime.

"I have declared over and over again that the aggressive spirit of nationalism and imperialtsm, observed by most Western nations like a religion, constitute a menace to the whole world. The moral retrogression that it has produced in European politics has very devastating consquences, especially for the people of the East who are at mercy of Western method of exploitaion.

"So even if it were not almost criminal, it would at least be very foolish for me to admire a political ideal that comes out openly for brutal violence as the moving force of civilisation. And if one considers this barbarism—which is not at all impossible of combination with material prosperity—as desirable, its cost is fearfully high"

—*The Referee*-London : 5th Aug. 1928.

পরিশিষ্ট ১৭

এসিয়া ও য়ুরোপ

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"আমার জীবনে এমন কোন রিপোর্ট বেরয়নি যাতে ঠিক মতো আমার ভাব প্রকাশ করেচে···একথা খুবই সত্য, আমরা, যারা য়ুরোপের বাহিরে আছি, আমাদের সঙ্গে য়ুরোপের প্রধান সম্বন্ধ শোষণ-সাধনের, exploitation-এর। অর্থাৎ তার প্রবর্তনা আধিভৌতিক, materialistic। প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য, প্রকাণ্ড বাণিজ্য—অপরিমিত তার আয়তন ও ক্ষুধা ; তার মধ্যে বাহ্য শক্তির চেহারাই অতিমাত্রায়। এর সংস্পর্শে আমাদের মানবচিত্ত পীড়িত হ'য়ে পড়ে ; মানুষে মানুষে আত্মীয়তার বন্ধন অনুভব করতে বাধা পাই ব'লেই বাহ্যিক বৈষয়িক স্থূল বন্ধনের কঠোরতাই আমাদের অত্যন্ত পীড়িত করে। এই পীড়া উত্তরোত্তর বেড়ে উঠেচে। আজ সমস্ত এসিয়াতে কোনো জাতিই নেই য়ুরোপকে যে ভয় ও সন্দেহের চক্ষে না দেখে।···যাদের আমরা শোষণ করি, স্বার্থ-সাধনের উপলক্ষ্য করি, তাদের আমরা অশ্রদ্ধা না ক'রে থাকতে পারিনে। ···মাছকে যখন বঁড়সি দিয়ে বিঁধতে হয় তখন বলতে ইচ্ছা করে, মাছটা প্রাণীর মধ্যে সবচেয়ে বেদনা-বোধহীন। মানুষ সম্বন্ধেও তাই—শাসনও-শোষণ করবার ধর্মনৈতিক জবাবদিহীকে নিষ্কণ্টক করবার জন্যে ওরিএণ্টালকে মানুষের কোঠায় অত্যন্ত সুদূরে ও নিকৃষ্ট স্থান দিতে পারলে ওরিএণ্টকে প্রাণান্তিক ভাবে দোহন করা সুখসাধ্য হয়। এমনি ক'রে বৃহৎ পৃথিবীকে বর্তমান বৈজ্ঞানিকবলশালী য়ুরোপ দুই ভাগে বিভক্ত করেছে। এই বিভাগের ছাঁকনির ভিতর দিয়ে য়ুরোপের যেটা শ্রেষ্ঠ সেটা পূর্বদিকে এসে পৌঁছতে পারে না।··

"কিন্তু য়ুরোপকে এই-রকম জানার মধ্যে অসত্য আছে। আমি নিজে বিশ্বাস করিনে যে, য়ুরোপ একান্ত ভাবে মেটিরিয়ালিষ্টিক। ধর্মমতে তার বিশ্বাস গেছে, কিন্তু পূর্ণ মনুষ্যত্বের পরে যায়নি।···য়ুরোপে কর্তব্যের আদর্শ শাস্ত্রের বন্ধনে জড়ভাবে বাঁধা নয় ব'লেই সেটা যথার্থ ভাবে আধ্যাত্মিক। অর্থাৎ তার অনুশাসন মানুষের অন্তরে, মানুষের বাহিরে নয়। বাহ্য শাস্ত্রের জড়বন্ধন থেকে মনুষ্যত্বের এই মুক্তি, এইটি বর্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতার মস্ত

সম্পদ। য়ুরোপীয় সভ্যতার মধ্যে সুরাসুরের যুদ্ধ নিরন্তর চলছে, অনেক সময় দানব জয়ী হয়, কিন্তু দেবতারও জয় সঙ্গে সঙ্গে আছে।···সেইজন্য য়ুরোপেই দেখতে পাই একদিকে স্বাজাত্য-জায়াণ্টের দুর্গ—আর একদিকে সার্বজাত্য জ্যাক, জায়াণ্টঘাতী। এই জায়াণ্ট-কিলারটি ছোট কিন্তু সত্য। আমরা য়ুরোপকে বাইরে যখন খুব ক'রে গালও পাড়ি তখনো আমরা আমাদের সমস্ত অর্ঘ্য নিয়ে তার জায়াণ্টেরই দুর্গ গড়তে চাই, জায়াণ্টঘাতী জ্যাককেই বিদ্রূপ ও সন্দেহের দ্বারা লাঞ্ছিত করি। তার প্রধান কারণ আমরাই বস্তু পূজারী, আমরাই সাহসহীন, বিশ্বাসহীন,। আমাদের মধ্যে দেবতা ঘুমিয়ে আছেন ব'লেই দৈত্য আসবামাত্র সমস্ত নৈবেদ্য সেই-ই একলা গ্রাস করতে থাকে —দ্বন্দ্বমাত্রই থাকে না।"···

—এসিয়া ও য়ুরোপ—প্রবাসী-কার্তিক, ১৩৩৫-পৃ ৩৫-৩৭

পরিশিষ্ট ১৮

মালয়ে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে বিবৃতি ইত্যাদি লইয়া কলকাতার *Forward* প্রভৃতি পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অত্যন্ত বিরূপ সমালোচনা হয়। সাহিত্যিক নরেশ সেনগুপ্তও সে-সময় কবির সমালোচনা করিতে ছাড়েন নাই। কয়েক বৎসর পর, অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় নরেশচন্দ্রের ঐ সমালোচনার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করিয়া লেখেন (প্রবাসী-চৈত্র ১৩৩৫)। জবাবে নরেশচন্দ্র 'প্রবাসী'র বৈশাখ সংখ্যায় নিম্নলিখিত পত্রখানি লেখেন ঃ

চৈত্রের প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একটা পুরাতন তর্কের পুনরুল্লেখ করিয়া আমার প্রতি কতকগুলি অযথা কটূক্তি করিয়াছেন। মালয়ে রবীন্দ্রনাথের উক্তি লইয়া আমি Forward পড়িয়া যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহাই তাঁহার কটূক্তির বিষয়। কিন্তু বোধ হয় তাহার লেখনী কলঙ্কিত হইবার আশঙ্কায়—তিনি আমার নামটি করেন নাই।

এ বিষয় সম্বন্ধে পুনরালোচনা করিবার স্বাধীনতা আমার এখন নাই। কাজেই তাঁর বক্তব্য বিষয়টি লইয়া রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কোনও মতামত আমি প্রকাশ করিতে অক্ষম। কিন্তু একথা আমি স্বীকার করিতেছি যে, টেলিগ্রাফে কবির উক্তির যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা সুনীতিবাবুর বর্ণিত বিবরণ হইতে ভিন্ন—এবং তন্মূলে আমি যে কথা বলিয়াছিলাম তার সব কথা সংগত হয় নাই। সেজন্য আমি ত্রুটি স্বীকার করিতেছি।

আর একটা কথা। সুনীতিবাবু বলিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর "চামড়া বাঁচাইবার জন্য" কিংবা লাটসাহেবের আতিথেয়তার লোভে তাঁর উক্তি প্রত্যাহার করিয়াছেন, এই কথা আমি বলিয়াছিলাম। অনুগ্রহ পূর্বক আমার পত্রখানি

আদ্যোপান্ত যত্ন করিয়া পাঠ করিলে তিনি দেখিতে পাইবেন যে, আমি বাস্তবিক একথা বলি নাই। আমি বলিয়াছিলাম যে, রবীন্দ্রনাথের সত্যনিষ্ঠা ও তাঁহার আন্তরিকতার প্রতি বিন্দুমাত্র সন্দেহ করি না। কিন্তু স্থানকাল হিসাবে তাঁর কথাটা সঙ্গত হয় নাই এবং ইহা হইতে লোকে সহজেই বলিবে যে তিনি একথা কেবল to save his skin বলিয়াছেন। আমার এই অভিপ্রায় আমি যথাজ্ঞান সরল ইংরেজী ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছিলাম এবং ইংরেজী ভাষায় আমার অপরিসর জ্ঞান অনুসারে আমার কথার দ্বারা ইহাই প্রকাশ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। অবশ্য সুনীতিবাবুর মত ইংরেজীতে এম-এ আমি নই এবং আমার ভাষাজ্ঞানের ত্রুটি থাকিতে পারে।

বিচার্য বিষয়ের সঙ্গে আমার সাহিত্যিক জীবনের কোনও সম্পর্ক না থাকিলেও তাহা লইয়া সুনীতিবাবু ব্যক্তিগতভাবে আমাকে কটূক্তি করিয়াছেন। তাঁর এ অপ্রাসঙ্গিক আলোচনার উত্তরে কোনও কথা বলিয়া আমি অবান্তর বিষয়ের অবতারণা করিতে ইচ্ছা করি না। এ বিষয়ে আলোচনার স্থান অন্যত্র। কিন্তু আমার বিবেচনায় এরূপ কটূক্তি সুনীতি বা সুরুচি দুয়ের একটারও পরিচয় দেয়না। ভাষাতত্ত্বে আমার অধিকার নাই, কিন্তু শুনিয়াছি সুনীতি-বাবু সে সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছেন। ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় ইতরের ভাষা ও ভাবে তাঁর এতটা দখল হইয়াছে তাহা জানিতাম না।

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রত্যুত্তর

শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে স্বীয় ত্রুটি স্বীকার করিতেছেন দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম মহাশয় যখন নরেশবাবুর চিঠির প্রতিবাদ প্রকাশ করেন, তখন নরেশবাবু নিজের ভুল দেখেন নাই। Better late than never.

নরেশবাবুর শ্লীলতা অশ্লীলতা, ভদ্র-ইতর সম্বন্ধে যে রুচি ও ধারণা তাহা আমাদিগের অনেকের থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক। সুতরাং তাহার চিঠির শেষ বাক্যে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তৎসম্বন্ধে ক্ষুব্ধ হইবার কোনও কারণ দেখিনা।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

Tagore in Fascist Italy

NEPAL MAJUMDAR

Much has been discussed about Tagore's travel in Italy in 1926, the subsequent Mussolini-Tagore embroilment and the imbroglio, for which Tagore had to face bitter criticism and attacks from both the Fascists and anti-Fascists and the larger democratic people of the world. But before his direct contact and invitation from the Facist Government of Italy, in 1926, Tagore made a very short trip to Italy in January, 1925, on his way back from Argentina to India. The critics and biographers until now have paid little attention to or taken little interest in the Poet's 1925 Italy tour. But from a close look into the facts and materials available now, it appears that Tagore's chief interest in and attraction for Italy was to have a direct contact with the great people of Italy, the dreamland of the poets and artists of the whole world, with a most glorious past;—and not with the Fascist state or the Duche, the dictator of Italy, then.

Before his departure from Italy, Tagore composed this poem, glorifying Italy and its great people. The first stanza of the poem (*To Italia*) runs thus :

I said to thee : "O Queen,
Like many other lovers, who have brought their gifts, to thy feet,
I have come, as a lark at the gate of Dawn, only to sing to thee and then to go."
From thy window thou speakest to me through thy veil :
"Now it is winter, my sky is dark, my garden without flowers."

In course of an interview with the *Free Press of India*, after his return to Calcutta, explaining how he was warmly received by the great Italian people at Milan and Venice, Tagore said :

"...The reception that was given to me was most cordial

and enthusiastic The kindness I received at their hands was touching. Italy holds a great fascination for me. I always remember the fact of a number of poets from other lands having made Italy their second home. I also wanted to join the list, as the poets that preceded me had done, and derive inspiration from Italy. I promised the people of Milan to return to their midst as soon I was better. I have now decided, health permitting, to go again to Italy and spend some months at some beautiful spot where I can rest in the inspiring beauty of natural scenery and come into touch with the living minds of the West."

Regarding his mission of establishing cultural relations with all the countries of the world, Tagore explained to the Press :

"My idea is to establish contact with the whole world. In my view, India should not remain in utter obscurity. We should be able to take our past in helping the world in her present situation and occupy an honoured place in the construction of civilization···"

At Milan, Tagore spent two days and addressed two meetings, held consecutively. Prof. Formichi, the noted Sanskrit scholar and Indologist met Tagore and volunteered to act as his interpreter. On the next day, Tagore read a paper on *People and Nation* at a press conference at Milan, subsequently published in the *Manchester Guardian* (February 23, 1925). It helps us much to understand Tagore's ideas about the national or political entity of the people of a country. He thus explains the dual character of a people : the natural and the professional man. He concludes :

"···So when I judge a people I judge them, not only from that completely human aspect, for as people they may have their love of humanity and of nature, but also as a nation, for in their national aspect they can be selfish and cruel···I find that this professional aspect in people has become predominent in the West and their humanity has become subordinated. It is this professional aspect which is the national aspect."

It is interesting to note that at the same Press Conference at Milan, Tagore sounded a note of warning against the

central-driving force and the main tendency of the big powers, towards endless rivalry for power and military supremacy—towards conflicts and devastating wars. He said :

"...Germany, in cultivating this megalomania, lost her balance ; Britain has been cultivating it ; America now has her own huge idea of greatness. It is this spirit of bigness which leads you to be always lengthening your dreadnaughts, to multiply your army, your soldiers, your wealth, your possessions...."

Needless to say, the Fascist could not tolerate such highly provocative speeches from a poet of a country like India. It should be noted, that the Fascists at first did not attach any importance to or take much interest in Tagore's tour of Italy and its enthusisatic reception by the people of Italy, wherever he went. But realising soon its dangerous implication they marshalled their attacks on Tagore and his ideal and mission of International brotherhood.

Regarding this reaction in the Fascist Press in Italy A.C. (Ashoke Chatterjee) in the '*Modern Review*' (August, 1925, p 251) comments :

"It is no doubt a fact that the Fascists did not show any great affection for the poet ; for Fascism stands for out and out nationalism whereas the Poet preaches its opposite (in most respects), namely humanism. The Italian Facist Press published things to discredit Tagore's ' propaganda of non-resistance ; which in their opinion led to "sedition and evil, to hate, to destructive ambition and civil war'...hence their alarm at the advent of the Indian 'mystic and poet', in whose wonderful beard they have seen 'power and ability'. One vulgar editorial in an Italian paper (is it an organ of Italian barbars) told Tagore to go and get his beard cut, so that people may see that 'like Samson he had no power and no ability'...".

Unfortunately, the Poet fell ill and had to cut short his Italy programme and return to India. But this was interpreted otherwise by a section of the Press, in the U. S. A., and other countries. They tried to suggest that it was due to the Fasc't's strong dislike of Tagor's presence and preaching in

Italy that he had to cut short his Italy programme and go back home.

This kind of criticism was not confined only to the foreign press. Even in Bengal Mr. Sudhindra Bose gave a descriptive account of Tagore's travel in Italy in the *Forward* (July 22, 1925), in which he tried to say that Tagore's reception in Italy was cold or not upto the mark, mainly owing to the dislike of the Fascist Government in Italy for Tagore and his pacifist and international ideas as expounded there in his meetings and press conferences. But this report and version of Mr Bose was challenged by Mr. Sudhir Kumar Lahiri, who happened to accompany and follow Tagore to almost all the places of Tagore's visit and receptions. In his rejoinder Mr. Lahiri wrote :

"There was nothing mysterious or dark about the reasons that led to Rabindranath's sudden departure from Italy. He fell very ill at Milan and was placed under the treatment of two eminent Italian physicians by the Public Reception Committee at Milan. The doctors issued signed bulletins on the state of his health daily and these were widely published in the Press. When the doctors advised him to cancel his engagements and to return to India, I am sure everybody will agree that was the only sensible course left for Dr Tagore to adopt.······

"Turning the whole of their stay in Italy Rabindranath Tagore and his party were treated as guests of the Italian people. Huge crowds awaited him almost at every station during his tour. Even at night crowds waited at stations to have a look at him···Having had the privilege of travelling Venice in the same boat with him from to Bombay, I can testify to the spontaneity and wramth of the welcome that greeted him from Italian communities at every port at which our boat stopped".

Naturally, the question arises, whether Tagore had then any knowledge or idea about Fascism? Did he not hear anything about Fascism in Italy? What was his first reaction or impression?

It is very difficult to answer all these questions, due to paucity of relevant facts and materials. Though very rough and superficial in nature, Tagore had an idea about Fascism which he gathered at that time from the Press and diffirent sources. According to Tagore: Fascism in its essence, was nothing but suppression of individual freedom of thought & conscience by coercion and brutal force, which he did not hesitate to utter openly, after his return to India, in 1925 He found its counterpart in Indian Hindu society, where the '*Sudras*' and the non-Brahmins, had been suppressed and deprived of their most elementary and fundamental rights by the *Brahmin* through their Socio-religious dictum. In his article *The Indian Ideal of Marriage* (*Visva-Bharati Quarterly*—July 1925, p 95-96) Tagore said:

"...In the West we find now-a-days all kinds of forcible attempt being made to prevent the intrusion of Bolshevic ideas. This is comparable with our prohibition of foreign travel...The liberty of the people to form their own opinions, to regulate their own conduct, is here no longer respected. *The terrorist organisation called Fascism, which seems to be daily gaining ground in Europe, is the exact counterpart of rigorous social injunctions. There was a day in India when for the Sudra to aspire to the Brahmin entailed the death penalty. The same psychological phenomenon is seen in the West in the cruel form of Lynching, Fascism, Ku-Klux-Klanism, and the like*"

Tagore wrote all these words nearly one year before his second travel or tour in Fascist Italy, in 1926.

Courtesy: The Statesman May 8, 1984

West Bengal-16 May-1 June, 1984

চীনদেশ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ

এশিয়াটিক ফেডারেশনের কাছে ভারতবর্ষ একটা বিপদ কেন ?

—চপলাকান্ত ভট্টাচার্য

[ফরওয়ার্ড-শুক্রবার ৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯২৭]

ঠিক এই মুহূর্তে সবার দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে চীনদেশের দিকে। দীর্ঘ যন্ত্রণাভোগের পর সে এশিয়া মহাদেশের নব জাগরণের উন্মেষ ঘটাচ্ছে; জোর করে চাপিয়ে দেওয়া শৃংখল ভেঙেচুরে নবীনের আহ্বান রেখেছে। শ্বেত সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনের শিকার সমগ্র পূর্বদেশের হয়ে সে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। তাকে সাহায্য করা যদি সম্ভব না হয়, আমাদের সহানুভূতি চীনের অবশ্যই প্রাপ্য। কিন্তু ভারতবর্ষ সেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে, কারণ, প্রাচ্যদেশে চীনের জাগরণকে প্রতিহত করার কাজে অসৎ বিদেশী প্রভুরা এখন ভারতীর সম্পদের অপপ্রয়োগ ঘটাচ্ছে।

চীনদেশে ভারতীয় সৈন্য পাঠানোর ফলে একটা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, সৌভাগ্যবশত এর গুরুত্ব এখনও চোখের আড়াল হয় নি। এটি একটি কূটনৈতিক চাল, একাধিক দিক থেকে তা ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষা করছে। প্রথমত অন্যায়ভাবে দখল করে রাখা চীনদেশের ভূখণ্ড গুলিকে কব্জায় রাখতে সাহায্য করছে। অপরদিকে সৌভ্রাত্র বন্ধনে আবদ্ধ এমন দুটি দেশ যারা যুগ যুগ ধরে আধ্যাত্মিকক্ষেত্রে এক অন্তরঙ্গ সম্পর্কের বন্ধনে জড়িত সেই চীনের সঙ্গে ভারতের বৈরিতা সৃষ্টি করছে।

সমস্ত দিক থেকে বিষয়টিকে বিচার করতে হলে যাঁরা এই বিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল তাঁদের সকলের অভিমতকেই গুরুত্ব দেবার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হতে হবে।

এরকম একটা উদ্দেশ্য নিয়ে আমি গত ৩০ জানুয়ারী (১৯২৭) রবিবার, কবির সঙ্গে তাঁর বাসায় দেখা করতে গেলাম। বহির্জগতে ভারতের স্থান সম্পর্কে যাঁরা ওয়াকিবহাল, তাঁদের মধ্যে তিনি অন্যতম, তাছাড়া বিগত চীন ভ্রমণের সময় তিনি সেখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে খানিকটা বুঝে এসেছিলেন। সেই সময় সমগ্র চীন তাঁকে হৃদয় উজাড় করে দিয়েছিল। যখন আমি তাঁর ঘরে ঢুকলাম, তিনি একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে ছিলেন, আমাকে স্মিতহাস্যে অভ্যর্থনা করলেন। য়ুরোপ থেকে ফেরার সময় যে উজ্জ্বল স্বাস্থ্য নিয়ে তিনি এসেছিলেন, তা তখনও অটুট ছিল, যদিও তাঁর মুখে একটা ক্লান্তির ছাপ লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। সম্ভবত 'নটীর পূজা' মঞ্চস্থ করা নিয়ে যে ধকল তাঁর ওপর গেল তার দরুণই ক্লান্তি।

দু'একটা বিষয়ে সামান্য কথাবার্তা হল। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, রাজনৈতিক বন্দীদের দিনের পর দিন জেলে আটক রাখার অর্ডিনান্সটি।

এ সম্পর্কে কবি তাঁর বক্তব্য জানাবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। যাইহোক, সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ নিয়ে দু'একটা কথাবার্তার পর আমরা চীনের বর্তমান দুর্দশার প্রসঙ্গে এলাম।

চীন সম্পর্কে তাঁর রয়েছে এক গভীর বেদনা। চীনের ওপর যে অমানবিক প্রক্রিয়ায় একটা অসাম্য চাপিয়ে রাখা হয়েছে তিনি তার কথাই বলতে চাইছিলেন, কবির গভীর কালো চোখ দুটি জ্বলে উঠছিল আর তাঁর শান্ত অথচ ধারালো কণ্ঠস্বর আবেগে উষ্ণ হয়ে উঠছিল। তিনি বললেন, "এ ব্যাপারটা নিয়ে আমি গভীর ভাবে ভেবেছি, তা ছাড়া, ওখানে যে নীতি চালানো হচ্ছে তার প্রতি আমার ধিক্কার ব্যক্ত করতে আমি কখনও পিছপা হইনি। চীনের বিরুদ্ধে ইংরেজদের বর্তমান অভিযান এক মানবিক অপরাধ, এবং লজ্জার কথা যে ভারতকে এই খেলায় ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।"

॥ দৈত্য নামক ভারতীয়রা ॥

চীনদেশে যারা স্বেচ্ছাচার চালাচ্ছে, সেই অত্যাচারী লুণ্ঠকের দল সর্বদা নিজেদের কিন্তু আড়াল করে রাখে। তাদের জঘন্য ক্রিয়াকলাপের যন্ত্র হিসেবে ভারতীয়দের ব্যবহার করা হচ্ছে এবং চীনাদের সঙ্গে তাদেরই প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়। ফলে তাদের ক্রোধ এবং ঘৃণার সবটাই বর্ষিত হত ভারতীয়দের ওপর এবং তারা এদের দৈত্য নামে অভিহিত করত। প্রায় বিনা কারণে শিখ পুলিশেরা চীনাদের চুল ধরে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে বা লাথি মারছে এরকম দৃশ্য চীনদেশে মোটেই অপরিচিত ছিল না। আশ্চর্যের বিষয় যে আমাদেরকেও ওই নামে অভিহিত করা হত।

বিগত মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধে গোর্খারা কিভাবে "শয়তানের বাচ্চা" এই লক্ষণীয় আখ্যা অর্জন করেছিল সেই বিষয়টির প্রতি আমি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। কবির বক্তব্য,—সেক্ষেত্রেও ঐ একই পদ্ধতির প্রয়োগ হয়েছিল এবং শিখ কনস্টেবলদের মত চীনদেশে ঐ হতভাগ্যেরাও ঐ একই ধরণের অকথ্য নিপীড়ন চালাবার যন্ত্রে পরিণত হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর বিগত জাপান ভ্রমণের সময়কার একটা ঘটনার উল্লেখ করলেন। হংকং-এ একজন চীনা ফেরিওয়ালা তাঁদের স্টীমারের দিকে আসতে চেষ্টা করছিল, সম্ভবত তার জিনিসপত্র বিক্রির আশায়। কিন্তু সেই সময় প্রহরারত একজন শিখ কনস্টেবল সম্পূর্ণ খেয়ালখুশির বশে তার চুল ধরে টেনে এনে একটা লাথি মেরে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। দৃশ্যটি কবির কাছে তীব্র বেদনাদায়ক হয়েছিল, সেদিন তিনি যদি স্টীমার থেকে নামতে পারতেন, তাহলে নিজেই সেই গণ্ডগোলের মধ্যে জড়িয়ে পড়তেন এবং কনস্টেবলটিকে ঐ অমানুষিক আচরণ থেকে নিবৃত্ত করতেন। এটা খুবই দুঃখজনক যে একজন পরাধীন দাস তার নিজের শৃঙ্খলের কলঙ্ক ভুলে গিয়ে তার প্রভু-প্রদত্ত মেকী অধিকারের দম্ভ প্রকাশ করছে এবং এটা আরও দুঃখজনক যে সে আবার সেই অধিকার অকারণে অন্যের ওপর প্রয়োগ করছে।

॥ ট্রাজেডী ॥

তিনি বলে চললেন, "এই হচ্ছে ভারতের বর্তমান অসহায় দুরবস্থার ট্রাজেডী। লজ্জার কথা আমরা যেহেতু দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ, অন্যান্য জনসাধারণের ওপর অত্যাচার চালানোর যন্ত্র হিসেবে তাই আমাদের ব্যবহার করা হচ্ছে। ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা এবং নৈতিকতার জন্য যে ধর্মযুদ্ধ চলছে এবং যেখানে ইংরেজরা হচ্ছে আক্রমণকারী সেখানে ভারতকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে লড়াই এর ময়দানে টেনে নামানো হয়েছে। এটা আমাদের মনুষ্যত্বের প্রতি ঘৃণ্য অপমান এবং আরো বলতে গেলে যে দুর্নাম আমাদের প্রভুদের পুরোপুরি পাওয়া উচিত তার অংশভাগ আমাদেরও নিতে হচ্ছে। বিগত যুদ্ধের সময় জার্মানদের রাগ ইংরেজদের ওপর যত না পড়েছিল তার চেয়ে বেশি পড়েছিল ভারতীয় সৈন্যদের ওপর কারণ জার্মানীর বিরুদ্ধে তারা অনর্থক এবং অকারণ আক্রমণ চালিয়েছিল।

॥ আত্মঘাতী না আরও কিছু ॥

কবি আরো একধাপ এগিয়ে একে আত্মঘাতী হওয়ার চেয়ে খারাপ বলে চিহ্নিত করলেন। এত অর্থবল ও এত লোকবলের অপচয় ঘটিয়ে ভারতের কী লাভ আছে? এই রকম অসম্মানজনক একটা কারণে লড়াই করে তার সন্তানেরা 'বীর' আখ্যা লাভ করতে পারে না এবং বিদেশী আধিপত্যের যে জোয়াল ভারতের বুকে চেপে বসেছে তাকেও ঝেড়ে ফেলার ক্ষেত্রে কোনো সুরাহা এতে হবে না। কোন কৃতজ্ঞতাও তার প্রাপ্য নয় কারণ তার এই সহযোগিতাটি হচ্ছে জোর করে আদায় করা—কোনো স্বতঃপ্রণোদিত অবদান নয়। ভারতবর্ষ তো অস্ট্রেলিয়া নয় যে সে ঘুরে দাঁড়াতে পারে এবং চীনের বিরুদ্ধে অশুভ প্রচারের জন্য যাবতীয় সাহায্যের ব্রিটিশ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পারে। তার এই আত্মত্যাগ ভস্মে ঘি ঢালা কারণ দর কষাকষিতে সে কি পায়—যা বেহিসেবী ত্যাগ স্বীকারের মধ্য দিয়ে এক বদ্ধমূল সংস্কার জন্মলাভ করে, এবং শেষ পর্যন্ত তাদের নিজেদের ক্রিয়াকলাপের দরুণ প্রতিবেশীদের সহানুভূতি হারায়।

॥ এসিয়াটিক ফেডারেশন একটি বিপদ ॥

এই কারণেই এশিয়ার অন্যান্য শক্তি ভারতকে তাদের স্বাধীনতার পথে একটি বিপদ হিসেবে মনে করে, তার বিশাল সম্পদ তাদের আশংকার অন্যতম ভিত্তি এবং যতদিন এই সম্পদের ব্যবহার তার নিজের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকবে ততদিন তারা ভারতকে সন্দেহ এবং ঘৃণার চোখে দেখবে।

ফল হয়েছে এই যে, এশিয়ায় মানবাত্মার দূত হিসেবে ভারতই একমাত্র যে সম্মানের অধিকারী ছিল, তা সে দ্রুত হারিয়ে ফেলছে। অথচ সে যুগ-যুগ ধরে আধ্যাত্মিকতার বাণী চীন ও এশিয়ার অন্যান্য দেশে পৌঁছে দিয়েছে এবং প্রেম ও মিলনের বাণী প্রচার করার জন্য ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছে। কিন্তু আজ যদি চীনের বিপদের দিনে ভারতের এই অধঃপতিত জীবেরা রাজনৈতিক নিপীড়নের মূর্ত প্রতীক হয়ে সেখানে যায়, তাহলে বহুকালের ঐতিহ্যের মধ্য

দিয়ে যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা মুহূর্তে মধ্যে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। এর থেকে দুর্দশার আর কী হতে পারে?

॥ প্রতিরোধী চীন ॥

আমি প্রশ্ন করলাম কিন্তু ইংরেজরা যে অজুহাত দিয়ে বলছে যে তারা প্রতিরোধের লড়াই লড়ছে একথা কি আমরা গ্রহণ করতে পারি? সেই ধারালো কণ্ঠস্বরের সহজাত প্রবাহ একটা আপাত আবেগের মুখে হঠাৎ থমকে গেল। তাঁর নরম ও সাদা মুখমণ্ডল হঠাৎ রক্তিম হয়ে উঠল। তিনি বলে উঠলেন, "কিন্তু কে আগ্রাসী হল? চীনের সমগ্র জনসাধারণকে বেয়নেটের মুখে রেখে কে তাদের গলায় আফিমের বিষ ঢেলে দিল এবং তারা বশ্যতা মানলো না বলে তাদের দেশের সবচেয়ে মূল্যবান ভূখণ্ডকে দখল করে নিল। চীনের জনসাধারণের কাছ থেকে কে জোর করে হংকং ছিনিয়ে নিল? চীনের দুর্বলতা এই যে তারা তখন সেটা মেনে নিয়েছিল, আগে যে অংশ তাদেরই ছিল তা পুনরুদ্ধারের জন্য আজ বলশালী চীন নিশ্চয়ই দাবী করতে পারে—দীর্ঘকাল ওদের দখলে ছিল বলেই কি তা একটা জবরদখল সম্পত্তি হিসেবে যুক্তিসঙ্গতভাবে মেনে নিতে হবে?

"ইংরেজরাই হল মূলতঃ আগ্রাসী এবং প্রতিরোধের লড়াই বলে প্রচার চালিয়ে তার আড়ালে তাদের আশ্রয় নেওয়া উচিত নয়। বাস্তবিক পক্ষে চীনই প্রতিরোধী ভূমিকায় রয়েছে।"

॥ সাম্রাজ্যের স্বার্থে ॥

আমি আবার বাধা দিয়ে বললাম, "সৈন্য সামগ্রী নিয়ে সাহায্য করার বিষয়টিকে তারা তাদের প্রাপ্য হিসেবে ভারতের কাছে দাবী করে, কারণ একই সাম্রাজ্যের তারা অন্তর্ভুক্ত।" মসৃণ পাথরের মত তাঁর মুখমণ্ডল এক চাপা হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, তিনি বললেন। "হ্যাঁ, কিন্তু তুমি কী মনে করো যে সমদর্শিতা ও ন্যায়বিচারের ওপর এই সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে? তুমি কী বিশ্বাস কর যে সেই সাম্রাজ্যের আমরা কোনো প্রাণময় অংশ? এই সাম্রাজ্যের সদস্য হিসেবে আমরা অর্জন করি যাবতীয় নিন্দা-গ্লানি, পক্ষান্তরে গৌরবের কোনো অংশভাগ আমাদের মেলে না। রামায়ণে আছে, দস্যু রত্নাকর পরিবার পরিজনদের প্রতিপালনের জন্য অর্থ উপার্জন করতে গিয়ে অপরাধে লিপ্ত হয়েছিল। মুক্তির দিন যখন এল, যারা তার উপার্জনের অংশ ভোগ করত, সেই আত্মীয় স্বজনেরা তার পাপের অংশ নিতে রাজী হল না এবং তাকে সমস্ত পাপের বোঝা একলা বইতে হয়েছিল তবু, সেই পাপী লোকটির একটা সান্ত্বনা ছিল যে সে তার পাপ কর্মের মাধ্যমে কিছু উপকার করতে পেরেছিল। কিন্তু আমরা স্পষ্টতই নিজের এবং আমাদের সকলের জন্য যে অন্যায় করছি তা কোনো উপকারে না লেগেই ফুরিয়ে যাচ্ছে। সত্যকার জীবন্ত সম্পর্ক যদি থাকত তাহলে যখন খুশী সহযোগিতার হাত গুটিয়ে নেবার অধিকারও থাকত, যেমন অন্যান্য স্বশাসিত সদস্যদেশগুলির আছে। আসলে আমাদের কোনো

অধিকার নেই এবং আমরা চাই বা না চাই, ইংরেজ প্রভুদের খেয়াল-খুশীমত নির্দেশ মেনে চলতে হবে, আমাদের সদস্যপদের এই হচ্ছে আসলরূপ। ফল দাঁড়াচ্ছে এই—অস্ট্রেলিয়া যখন ব্রিটিশ সরকারকে কোনো তোয়াক্কা করছে না, তখন আমরা সৈন্য-সামগ্রী দিয়ে সাম্রাজ্যের সেবা করছি এবং জালিয়ানওয়ালা-বাগের পুরস্কার পাচ্ছি।

॥ ভারতীয়দের জীবনের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে ॥

চীনদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করার জন্যই ভারতীয় সৈন্যদের প্রয়োজন হচ্ছে—কোনো কোনো মহল থেকে এরকম যুক্তির অবতারণা করা হচ্ছে—সেই বিষয়ে আমি আবার কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। কিন্তু তিনি এটাকেও একইভাবে বাতিল করে দিলেন কারণ, তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জানতেন যে চীনদেশে ভারতীয়দের জীবন সম্পর্কে দুশ্চিন্তা করার কিছু ছিল না। ভারতীয় বলতে সেখানে দেখা যেত কেবলমাত্র শিখ কনস্টেবলদের যাদের আমদানী করা হয়েছিল আর ছিল কয়েকজন ব্যবসায়ী। শিখ কনস্টেবলদের রক্ষা করার কোনো ব্যাপারই ছিল না, আর যেসব ব্যবসায়ী ভাগ্যান্বেষণে এরকম জায়গায় চলে আসে, দুঃসহ জীবন কাটাবার ঝুঁকি তারা নিয়েই থাকে।

॥ ধর্মের কোনো প্রশ্ন নেই ॥

চীনা জনসাধারণের ধর্ম নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে এই প্রসঙ্গটি তুলে তিনি বললেন, "এটা মূল সমস্যাকে আড়াল করছে এবং সমগ্র পরিস্থিতিকে একটা সংকীর্ণ দৃষ্টিতে দেখানো হচ্ছে। চীন যে ধর্মই প্রচার করুক না কেন, আমরা সকল ক্ষেত্রেই সেদেশে ভারতীয় সৈন্য পাঠানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবো। এক্ষেত্রে আমরা মানবিকতার প্রশস্ত ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড়াতে চাই। তাই আমরা অন্যান্য যে কোন দেশেই আমাদের সৈন্য পাঠানোর বিরুদ্ধে। বরং চীনের কৃতিত্ব হিসেবে একথা বলা যায় যে সেখানে এমন অনেক চীনা আছেন, যাঁরা মহম্মদের বাণী প্রচার করেন—যদিও তাঁরা খুবই সংখ্যালঘু, ত্রিশ শতাংশেরও কম, তবু চীনদেশকে কখনোই মুসলমান অমুসলমান সমস্যা নিয়ে ভুগতে হয় নি।

কবির সর্বশেষ বক্তব্য ছিল বেদনাবেগে পরিপূর্ণ—"এদেশের ভেতর তারা তাদের স্বেচ্ছাচার অবাধে চালিয়ে যাক্। কিন্তু তারা যেন মানবিকতার বিরুদ্ধে জঘন্যতম অপরাধগুলিতে অংশ নেবার জন্য আমাদের বাধ্য না করে। একটা অংশের মানুষের অসহায় অবস্থাকে দিয়ে অন্য অংশের মানুষের ঐতিহ্য কেড়ে নেবার অশুভ প্রচেষ্টা থেকে তারা বিরত হোক। তোমাদের আইন-শৃঙ্খলার যন্ত্রগুলিকে অমিত শক্তিধর ও বলশালী করে তুলতে চাও তোলো। কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই, এই দেশের চতুঃসীমার মধ্যে থেকেই শুধু আমাদেরই যাবতীয় অসম্মানের বিষ পান করাও বিশ্বের প্রাঙ্গণে আমাদের এই ভূমিকায় টেনে নামিও না।"

[*Forward*-Feb. 4, 19_7]

১৯২৭ সালের জানুয়ারী শুরুতেই (৪ঠা) হ্যাংকাও এবং কয়েকদিন পর সাংহাইয়ে বৃটিশের 'একস্ট্রা টেরিটোরিয়েল কন্‌সেসন্‌'এর বিলোপ করার জন্য ক্যান্টন সরকার চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করলে পর ব্রিটিশের সঙ্গে তার সংঘর্ষ অনিবার্যরূপেই দেখা দেয়। জানুয়ারীর শেষভাগে (২৪শে) ভারত থেকে সৈন্য ও গোলাবারুদপূর্ণ ব্রিটিশ রণতরীগুলি চীনের পথে যাত্রা করে, ভারতের জনমতকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেই।

এই সংবাদে ভারতবর্ষের রাজনীতিক মহলে প্রবল উত্তেজনা ও বিক্ষোভ দেখা দেয়। ঠিক সেই সময়ই কমিউনিস্ট নেতা সাপুরজী শাকলাতওয়ালা বিলেত থেকে মাসখানেকের জন্য ভারত সফরে আসেন। (১৪শে জানুয়ারী, ১৯২৭)। ভারতে পদার্পণ করেই তিনি ব্রিটিশের এই আচরণের তীব্র নিন্দা করেন। বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী সর্বত্রই তাঁর আলোচনাসভায়, বিবৃতি এবং সম্বর্ধনাসভায় তিনি একদিকে যেমন ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী নীতির নিন্দা ও সমালোচনা করেন অপর দিকে চীনের সমর্থনে জনমত গঠন এবং সেই সঙ্গে চীনে সাহায্য প্রেরণেরও আবেদন জানান। চীনের প্রতি নৈতিক সমর্থন জ্ঞাপন এবং ভারতের সেনা দল ও শক্তি সম্পদকে যাতে চীনের বিরুদ্ধে প্রয়োগ না করা হয়, সেই মর্মে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতেও একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ২০শে জানুয়ারী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে এ সম্পর্কে আলোচনার জন্য শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার একটি মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আপত্তি জ্ঞাপন করায় শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট ভি. জে. প্যাটেল মুলতুবী প্রস্তাব আলোচনার অনুমতি প্রত্যাহার করে নেন।

রবীন্দ্রনাথ তখন 'নটীর পূজা' অভিনয় (২৮, ২৯, ৩১শে জানুয়ারী '২৭) উপলক্ষে কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় এসেছিলেন। ৩০শে জানুয়ারী *Forward* পত্রিকার পক্ষে এঁদের বিশেষ প্রতিনিধি শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য মশায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে গিয়ে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। চীনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের এই নয়া অভিযান এবং এই অভিযানে ভারতীয় সৈন্য প্রেরণ ইত্যাদি নানা বিষয়ে তিনি প্রশ্ন করলে কবি একে একে তার জবাব দেন। চপলাকান্তবাবু তার যথাযথ নোট্‌ নেন এবং তা *Forward* পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়। অন্যত্র আমরা তার মর্মানুবাদ দিয়েছি। পরে এটি বিবৃতির আকারে দেশে-বিদেশে প্রচারিত হয়। ক্যান্টন সরকার কবির এই বিবৃতি চীনের পত্রপত্রিকায় এবং বেতারে পুনঃপুনঃ প্রচারের ব্যবস্থা করেন।*

বলা বাহুল্য, গান্ধীজীও এ ব্যাপারে নীরব থাকতে পারেন নি। তিনি চীনে ভারতীয় সেন্য প্রেরণ এবং ইংরেজদের এই নয়া সামরিক অভিযানের তীব্র নিন্দা করে একটি প্রেস-বিবৃতি দেন। উল্লেখযোগ্য *Forward* পত্রিকায় কবির এবং

* ক্যান্টন সরকার এর জন্য কবির প্রিয়পাত্র শুচ মো-র মারফতে কবিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন।

গান্ধীজীর বিবৃতিটি একই সঙ্গে (৪ঠা ফেব্রুয়ারী '২৭) প্রকাশিত হয়। গান্ধীজীর বিবৃতিটি ছিল এই :

"It is as a vital matter as could be imagined for the members of the Assembly not merely to discuss but to direct India's foreign policy Our helplessness becomes never so apparent as when Indian soldiers are shamelessly used to crush other people's freedom. Indeed, India is the key to the exploitation of the Asiatic and other non-European races of the Earth. She is held under bondage not merely for the sake of her own exploitation but that of her neighbours near and distant."

বিবৃতির উপসংহারে গান্ধীজী আরও বলেন :

"Let the struggling Chinese know that our soldiers will go to China only because we are more helpless than they. Lowes Dickinson by his immortal *Letters to John Chinaman* has shown us how Indian soldiers were taken to China to impose opium upon her We know what the Powers, miscalled Christian, have done in China. But no nation that is prepared to pay price can be baulked of her freedom for ever and it is well with China as she seems to be prepared to pay the price required."—A. P. [*Forward*-February 4, 1927]

বস্তুতপক্ষে, চীন সম্পর্কে এইটিই ছিল গান্ধীজীর প্রথম প্রকাশ্য বিবৃতি। এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিবৃতির প্রকৃতি ও মেজাজের পার্থক্য কতখানি তা আর বিশেষ ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন হয় না। চীনের ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধির স্বরূপ উদ্ঘাটন এবং তার বিরুদ্ধে যে সুতীব্র ঘৃণা ও ক্রোধ কবির এই ঐতিহাসিক বিবৃতিতে প্রকাশিত হয়েছে, সেই সময় আর কোন কংগ্রেস নেতার বক্তৃতায় বা বিবৃতিতে তেমনটি দেখা যায় না।

বস্তুত, এর পর থেকেই ভারতে, বিশেষ করে, বাংলায় চীনের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের সমর্থনে জনমত ক্রমে প্রবল ও ব্যাপকতর হতে থাকে। দেশে ভারত-চীন সংগ্রামী মৈত্রীর যথার্থ সূচনা হয় এই সময় থেকেই।

কবির ও গান্ধীজীর ঐ বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার পরই কলকাতায় এই আন্দোলন প্রবল হয়। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে চীনে ব্রিটিশের অভিযান এবং ভারতীয় সৈন্য প্রেরণের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে এক বিরাট জনসভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন বিখ্যাত বাগ্মী (এবং তৎকালীন বি পি সি সি'র প্রেসিডেণ্ট) অধ্যাপক জে. এল. ব্যানার্জী। পরদিন *Forward* পত্রিকায় "*Greed of Imperialism : Are Indians Hired Hooligans of the Empire" ? Calcutta's Protest : Despatch of Indian Troops To China*—বড় বড় হরফে এই শিরোনামে এই সভার

বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয়। তার শুরুতেই বলা হয় :

"That the Indians have every sympathy for the Chinese in their struggle for freedom, was clearly voiced forth in a largely attended public meeting that was held in the Shraddhananda Park (Mirzapur Park), yesterday, to record the emphatic protest of the Calcutta citizens against the despatch of Indian troops for China. Speaker after speaker strongly condemned the Government action in taking advantage of the utter helplessness of India and thus making India an unwilling party to Britain's greed of Imperialism."

সভায় প্রভাতচন্দ্র গাঙ্গুলী, মৃণালকান্তি বসু, ললিতমোহন দাস, মৌলভি আব্দুল করীম, শচীন্দ্রনাথ মুখার্জী, প্রতাপ গুহ রায়, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, এবং এস. ডি. হায়দার প্রমুখ কয়েকজনই বক্তৃতা করেন। উল্লেখযোগ্য, যেদিন এই প্রতিবাদে সভা হয়, ঐদিনই সংবাদপত্রে রবীন্দ্রনাথের ও গান্ধীজীর প্রতিবাদ-বিবৃতি দুটি প্রকাশিত হয়। এই দুটি বিবৃতি যেন বক্তাদের এবং সমগ্র প্রতিবাদ সভাটির সুর ও মেজাজ বেঁধে দিয়েছিল। 'ফরওয়াড' এর সংবাদদাতা লিখেছেন :

'Almost all the speakers echoed the sentiments that were given expression to by the Poet Tagore and Mahatma Gandhi, on the situation and emphasised that India was being exploited in the Imperialist game"

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে যে দুটি প্রস্তাব গৃহীত হয় তার প্রথমটি ছিল এই :

"This meeting records its strong and emphatic protest against the despatch of Indian troops to China without consulting Indian Legislatures and without allowing the Indian Legislative Assembly even an opportunity to express its opinion upon the point and against the declared wishes of the Indian people"

দ্বিতীয় প্রস্তাবটি ছিল এই :

"This meeting regards it as an intolerable insult to the Indian people that soldiers of Indian Nationality should be called upon to assist in the unholy war of thowarting the Chinese Nation in their attempt to achieve sovereign independence for themselves."

বলা বাহুল্য, এর পর দেশে চীনের সমর্থনে আন্দোলন ক্রমেই ব্যাপকতর হতে থাকে। এর কিছুকাল পরেই ভারত থেকে চীনে একটি চিকিৎসক দল (*Medical Mission*) পাঠাবার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু ইংরেজ সরকার তাতে অনুমতি দেয় নি।

সব শেষে ইতিহাসকার ও গবেষকদের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের প্রতি আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

ইতিপূর্বে কোনও কোনও গবেষক (আমি নিজেও এই ভুল করেছিলাম) প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, ব্রুসেলস'এ 'সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সঙ্ঘে'র আন্তর্জাতিক সম্মেলনের পর জওহরলালই ভারতবর্ষের রাজনীতিতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের এবং চীন-ভারত মৈত্রীর সূচনা করেন। এ ধারণা যে সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক, তা উপরোক্ত তথ্যাদি থেকেই প্রমাণিত হয়।

কলকাতার ঐ প্রতিবাদ সভার পাঁচদিন পর, (৯ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৬ই), বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রুসেলস নগরীতে এক সপ্তাহ ব্যাপী 'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংঘ' এর (*League Against Imperialism*) ঐতিহাসিক মহাসম্মেলন হয়। অ্যাঁরি বারবুস*, রমাঁ রোলাঁ, মাদাম সান ইয়াৎ-সেন, অধ্যাপক আইনস্টাইন প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক ও মনীষীরা ছিলেন এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক। সম্মেলনের উদ্বোধন করে স্বয়ং অ্যাঁরি বারবুস ভাষণ দেন। সম্মেলনের মাঝখানে ভারত চীন এবং ব্রিটেনের প্রতিনিধিরা তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এক যুক্ত কার্যক্রম এবং ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেন। এই ঘোষণাপত্রের বা ইস্তেহারের ভূমিকাতেই বলা হয়ঃ

"It is this extreme ignorance that makes it difficult to-day to organise effective means to prevent India's men and man-power from being used for the enslavement of the Chinese people. We think it urgent and essential that active propaganda should be carried on in India to educate the people regarding China and to arouse them to the necessity of immediate action. We must now resume the ancient personal cultural and political relations between the two peoples. British Imperialism, which in the past has kept us apart and done us so much injury, is now the very force that is uniting us in a common endeavour to overthrow it.

"We trust that the leaders of the Indian movement will do all in their power to co-ordinate their struggle with that of the Chinese people so that by simultaneously engaging British Imperialism on two of its most vital fronts, China may receive active support in her present struggle and the final victory of both people may be secured."

[*Modern Review*-May, 1927 P. 565.]

এই ইস্তেহারে উপরোক্ত তিন দেশের যে-সব প্রতিনিধি স্বাক্ষর করেন তাঁরা হলেনঃ Lei Tsung Lin, Hansin Liau (কুওমিণ্টাঙ দলের) Hsing Kwang Sen (ক্যাণ্টন সরকারের পক্ষে); ব্রিটিশ ডেলিগেশনের পক্ষে

George Lansbury, Ellen Wilkinson, Mr Breckett, S. O. Devies (Miners' Federation), R. Bridgmar, Fenner Brockway, আর ভারতের পক্ষে জওহরলাল নেহেরু। জওহরলাল ব্রুসেলস্ কংগ্রেসের বিস্তারিত বিবরণ পাঠালে এ. আই. সি. সি. র সভায় তা অনুমোদিত হয় (১৫, ১৬ই মে' ১৯২৭ জওহরলাল স্বয়ং তাঁর 'আত্মজীবনী'তে পরিষ্কার স্বীকার করেছেন যে, ব্রুসেলস কংগ্রেস এবং তৎকালীন 'তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের' দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর চোখ খুলে দেয়। তার আগে এসম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা তাঁর ছিল না।

সুতরাং এ তথ্য ঠিক নয় যে, জওহরলালই কংগ্রেসের বৈদেশিক নীতিতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিত এবং ভারত-চীন সংগ্রামীর মৈত্রীর প্রথম সূচনা করেন। তবে গান্ধীজী এবং তৎকালীন দেশের রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী এবং সংবাদপত্রগুলি সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেকবুদ্ধি থেকে বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে চীনের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন, এটাও সম্পূর্ণ ঠিক নয়। বস্তুত পক্ষে, ব্রিটিশ লেবার পার্টি, ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টি এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থাগুলি এই বিরোধের সূচনাকাল থেকেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নীতির তীব্র সমালোচনা ও নিন্দা করে এবং চীনের পক্ষে তাঁদের সমর্থন জ্ঞাপন করে চলেছিল। দিনের পর দিন এসব সংবাদ আমাদের দেশের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির চীন সংক্রান্ত প্রস্তাব গ্রহণের (২৩শে জানুয়ারী) কিংবা গান্ধীজীর ঐ বিবৃতি দানের পূর্বেই ৪ঠা ফেব্রুয়ারী '২৭ এই সব সংবাদ রয়টারের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। এ সব ঘটনা এবং সংবাদ আমাদের দেশের নেতা ও বুদ্ধিজীবীদের খুব কম প্রভাবিত করেনি। যেদিন Indian Assembly' তে শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের মুলতুবী প্রস্তাব অগ্রাহ্য হল, তার পরদিনই *Forward* পত্রিকা এর তীব্র নিন্দা ও সমালোচনা করতেগিয়ে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের সংগ্রামী মজুরদেরসিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানিয়ে লিখলে,

"While troops are being sent to China against the wishes of Indian people, no troops will be sent from either Australia or New Zealand. In fact a Reuter's message says that seamen in Melbourne have resolved to decline to man ships carrying soldiers, munitions and foodstuffs for troops acting against China. This one fact will make it clear how the dependent position of India is being exploited by the British Imperialists"

[*Forward*-January 26, 1927]

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথও যে এসব সংবাদে প্রভাবিত হন নি তা নয়, কিন্তু তাঁর পক্ষে এ সবের খুব একটা প্রয়োজনও ছিল না। 'চীনে মরণের ব্যবসায়' প্রবন্ধ রচনা—অর্থাৎ জীবনের প্রায় সূচনাকাল থেকেই সাম্রাজ্যবাদের জগৎজোড়া বীভৎস রূপটি তিনি যেভাবে চিহ্নিত এবং নিন্দা করতে পেরেছিলেন, দেশের তৎকালীন বহু প্রবীণ কংগ্রেস নেতার পক্ষেও তা করা সম্ভব হয়নি। আর ভারত-চীন মৈত্রী এবং চীনের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে কংগ্রেস

নেতারা কিছু চিন্তাভাবনা করার বহু পূর্বেই রবীন্দ্রনাথই তার মহান সূচনা করে গেলেন। পরবর্তীকালে কবি এ ব্যাপারে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, অন্যত্র আমরা তার বিস্তারিত তথ্যসম্বলিত আলোচনা করেছি।

—নেপাল মজুমদার

['নন্দন'-বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৩]

To Free Chinese Workers !

British Labours United Effort

[*Forward*-Tuesday, January 11, 192?]

"In 1920 the whole working class alike, forgetting personally and party, united to prevent the coalition government from declaring war on Russia," Robert Stewart, of the Communist Party, told the *Sunday Worker* in mail week. "To day, the need is just as urgent questions by the Tory M P's in the house show that they are determined to make intervention against the Chinese Revolution an excuse for breaking off relations with the Worker's Republic in Russia.

"*Hands off China*" Committees must be formed at once in every town to demand and enforce the withdrawal from Chinese water of all British war-ships and the recognition of the Chinese Nationl Republic.

"I am glad to learn that the twenty-seven signatories to the "*Hands off China*" Manifesto issued by the Communist Party have been invited to join the panel of speakers now being set up by the *British Labour Council for Chinese Freedom*.

The signatories are :—

"A. J. Cook (M.F.G.B), James Maxton, M.P., R.C. Wallhead. M.P., Neil Melean, M.P., Joseph Compton, Joseph Batey, M.P., Rev. Herbert Dunnico, M.P., Sapurji Saklatvala M.P., George Hicks (Chairman, General council T.U.C.), Ben Tillett (T. & G.W.U., S. B Walker (General Council, Gen. Sec. *Agricultural Workers' Union*), Allex Gossip (*N.A. T.T.A.*), R. Coppock (*N.F.B.T.O*) Will Lawther (E.C. *Durham Miners' Federation*), Dr. Norman Leys, Bertrand Russell, Tom Mann (Chairman, *National Minority Movement*), Harry Pollit (Secretary *National Minorty Movement*), Albert Inkpin (Sec. *C.P.G B.*), Rutland Boughton, Sean O'Casy, Liam O' Flaherty, W N. Ewer, William Paul (Editor, *Sunday Workers*), H. N. Brailsford, and R Wallhead, M. P.

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

কালান্তর (পরিবর্ধিত সং-১৩৫৫ পৌষ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
পল্লীপ্রকৃতি (প্রথম সং-মাঘ ১৩৬৮) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শিক্ষা (ভাদ্র ১৩৬৭) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সমবায় নীতি (প্রকাশ ১৩৬০) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রবীন্দ্র রচনাবলী-১৪শ খণ্ড প্রথম প্রকাশ, চৈত্র ১৩৪৯)
রবীন্দ্র রচনাবলী-১৫শ খণ্ড (প্রথম প্রকাশ, চৈত্র ১৩৪৯)
রবীন্দ্র রচনাবলী-১৯শ খণ্ড (প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৫২)
রবীন্দ্র রচনাবলী-২৩শ খণ্ড (প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৫৪)
চিঠিপত্র ২য় খণ্ড (আষাঢ় ১৩৪৯) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
চিঠিপত্র ৫ম খণ্ড (পৌষ ১৩৫২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
চিঠিপত্র ৭ম খণ্ড (বৈশাখ ১৩৬৭) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রবীন্দ্রজীবনী-তৃতীয় খণ্ড (প্রথম প্রকাশ ১৩৫৯)
—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী (প্রথম সং) —প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ (পরিবর্ধিত সং-বৈশাখ ১৩৬৪ —অমল হোম।
রায়তের কথা (বৈশাখ ১৩৫৪)-প্রমথ চৌধুরী।
বিশ্বভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ (প্রথম সং)-জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ।
বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ (প্রথম সংশোধিত সং)-মৈত্রেয়ী দেবী।
'শিল্পীর নবজন্ম'-রমাঁ রোলাঁ (সরোজ দত্ত অনুদিত)।
ভারত সন্ধানে (সিগনেট প্রেস প্রথম সং ১৩৫৬)—জওহরলাল নেহরু।
জওহরলাল নেহরু আত্ম-চরিত (তৃতীয় সং ১৩৫৫)
—সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার অনুদিত।
গান্ধীজীর ন্যাসবাদ-নির্মলকুমার বসু।
বাংলায় বিপ্লববাদ (বৈশাখ ১৩৬১)—নলিনীকিশোর গুহ।
নজরুল চরিত মানস (প্রথম সং)—ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত।
সঞ্চিতা (২য় সং ১৩৭৭)-নজরুল ইসলাম।
কবির সঙ্গে য়ুরোপে (২য় সং ১৩৭৭)-নির্মলকুমারী মহলানবিশ।
ভারতবর্ষ-রম্যাঁ-রলাঁ, দিনপঞ্জী-অনুঃ অবন্তীকুমার সান্যাল।
রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবীসমাজ (১লা বৈশাখ ১৩৯২)-চিন্মোহন সেহানবিশ।
চার্লস ফ্রিয়ার এণ্ডরুজ (ইং ১৯৭১)-মলিনা রায়।
প্রমথ চৌধুরী রচনাবলী-বসুমতী সাহিত্যমন্দির সংস্করণ।
কল্লোল যুগ (তৃতীয় প্রকাশ ১২৬০)-অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।
দ্বীপময় ভারত (প্রথম সং)-সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগ (দ্বিতীয় মুদ্রণ—জানুয়ারী ১৯৬০)-মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ।

প্রবাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন-
প্রথম সং-সেপ্টেঃ ১৯৬১)-মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ।
Creative Unity (Reprinted 1959)—Rabindranath Tagore.
Letters to a Friend (First published 1928)
-Rabindranath Tagore
Talks in China (First Ed.) -Rabindranath Tagore
Rolland and Tagore (Sept. 1945)
-Visva Bharati Publication.
Tagore and Gandhi Argue (First Ed. June 1945)
-Edited by Jag Pravesh Chander.
Charles Freer Andrews (First Published 1949)
-Benarasidas Chaturvedi and Marjorie Sykes.
On the edges of time (First published : June 1958)
-Rathindranath Tagore.
The History of the Indian National Congress.-Vol. I
(Reprinted 1946)-Pattabhi Sitaramayya.
Congress Presidential Addresses-Vol. II.
(Ed. 1934)-G. A. Natesan & Co.
Mahatma-Vol. I. (New Edition), Octo. 1960)
-D. G. Tendulkar.
Mahatma-Vol. II. (New Edition, March 1961)
(Published by the Publications Division. Ministry of Information and Broadcasting. Govt. of India)
The Indian National Congress (1920-23).
-Published by Jawaharlal Nehru (Being a collection of the resolutions of the Congress and of the All India Congress Committee and of the Working Committee of the Congress from Sept. 1920 to Dec. 1923—First Publised Dec. 1924).
Poet And Plowman—L. K. Elmhirst (Sept. 1975).
The Origins of Indian Foreign Policy
(First pub. April 1960)
-Bimla Prasad.
Glimpses of World History (Reprinted, January 1942)
—J. Nehru.
India Wins Freedom (Reprinted, Feb. 1959)
—Maulana A. K. Azad.

V. I. Lenin Selected Works (in two vol. Moscow Ed.)
—Vol. II. Foreign Language Publishing House Moscow.
Socialism and War-V. I. Lenin.
Socialism : Utopian and Scientific—F. Engels.
The Political Thought of Tagore,
—Dr. Sachin Sen.

দ্রঃ যে সব পুস্তক-পুস্তিকা হইতে উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে শুধুমাত্র তাহারই একটি তালিকা দেওয়া হইল। বলা বাহুল্য, ইহা ছাড়া আরও বহু পুস্তকাদির সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তাহা ছাড়া 'শান্তিনিকেতন পত্রিকা', 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', 'প্রবাসী', '*The Modern Review*', '*Visva Bharati Quarterly*', '*Visva Bharati Bulletin*' এবং দেশ-বিদেশের বহু পত্র-পত্রিকার গ্রন্থমধ্যে উদ্ধৃতি দিয়া উহার নীচে নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে পুনরায় উহাদের নাম বা তালিকা দেওয়া প্রয়োজন বোধ করি নাই।

নির্দেশিকা

বিষয়সূচি

ঙ

ল

॥ শুদ্ধিপত্র ॥

পৃঃ	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১	৬	was	war
১৭	৩৩	Armsracc	Arms race
২০	২৯	same	some
২০	৩৭	উধর্ব	ঊধর্ব
২৪	১৩	কলাণের	কল্যাণের
২৮	৩	preson	person
২৮	১৮	বিক্ষুব্ধ	বিক্ষুব্ধ
৩২	৩২	fell	feel
৩৪	১৪	os	of
৩৪	১৮	hii	his
৩৭	২২	জন্মগত	জন্মগত
৩৯	৮	মত	যত
৪২	৩৭	বহুৎসব	বহুৎসব
৪৯	১৪	মহাহ্দ্ধের	মহাযুদ্ধের
৫২	২২	পুর্বাহ্নেই	পূর্বাহ্নেই
৫৩	২	যুথবন্ধ	যুথবন্ধ
৫৪	১৬	ররীন্দ্রনাথ	রবীন্দ্রনাথ
৫৪	৩১	invition	invitation
৬৬	৩	চর্চ	চর্চা
৬৭	৪	usarpation	usarption
৭৮	১৮	মুহ্যমান	মুহ্যমান
৮৭	১০	!	I
৯২	২৭	Britrin	Britain
৯৫	৩৫	by	be
৯৬	৩১	Cay	Cry
৯৮	১১	prehched	preached
১০০	২৪	Cogress	Congress
১০১	১	Thia	This
১০২	২৬	jn	in
১০৪	১৩	প্যাট্রক	প্যাট্রিক
১০৬	৩	উইলওমিট্জ	উইন্ওমিট্জ্

১০৬	২১	ক্নুট	ন্যুট
১০৬	২৩	সেল্‌মালায়েরলক্‌	সেল্‌মা লাগেরল্‌ফ
১১১	৯	wor	world
১১৫	১৫	Wet	West
১২১	৭	হয়রাণ	হয়রান
১২১	২৮	He	His
১২২	২৪	poltics	politics
১৩৭	১০	he	the
১৪৯	২৯	ব্যাপরে	ব্যাপারে
১৫৬	১০	আদর্শে	আদর্শ
১৭৪	২	bt	but
১৭৪	১৫	oeire	dopire
১৮৯	৩৫	করিয়া	করাইয়া
২০৫	৯	লিয়াং ছি-ছাও	লিয়াং চি-চাও
২১০	৪	schme	scheme
২১৩	২৭	Relatian	Relation
২৫৮	১৯	ক্রন্দনময়	ক্রন্দনময়
২৭৮	১	সিনিয়র	সিনরা
২৮১	১৭	র‍্যাঞ্জেলিকা	এ্যাঞ্জেলিকা
২৮১	১৭	ব্যালবানভ	বালবানোফ
২৮৩	১৬	extravgant	extravagant
২৯৬	৩৬	গোস্টী	গোষ্ঠী
৩০১	১৯	wher	where
৩১৩	৩৫	আদামি	আদিম
৩১৬	১১	গতানুগতিতার	গতানুগতিকতার
৩১৭	২৮	ard	are
৩২৮	৩৭	Habld	Habib
৩৩৬	৭	সমাজতন্ত্রবাদী বা	সমাজতন্ত্রবাদীরা
৩৩৯	৬	বৃক্ষরোপণ	বৃক্ষরোপণ
৩৪৬	৬	latter	later
৩৫১	৬	ধৈর্যচ্যুতি	ধৈর্যচ্যুতি
৩৫৬	৯	mony	money
৩৫৬	১৮	Enquery	Inquiry

৩৫২	১৩	পরাশিত	পরাশ্রিত
৩৫৬	১০	লক্ষনীয়	লক্ষণীয়
৩৬৪	৯	Cotinents	Continents
৩৬৪	১৯	siad	said
৩৬৭	২৩	Visave	Visva
৩৬৯	২৫	would de	would be
৩৭৭	৩০	সম্ভরপর	সম্ভবপর
৩৭৯	৩০	দেশর	দেশের
৩৯০	২৭	আত্মবিড়াম্বনার	আত্মবিড়ম্বনার
৩৯১	২৯	ব্যায়সাধ্য	ব্যয়সাধ্য
৩৯৪	৩	Eeven the dog	Even the dog
৪০৭	১৩	with all	write all
৪১২	৭	misunderstod	misunderstood
৪১৩	৮	rathers hastily	rather hastily
৪১৩	১৫	Counthrmen	Countrymen
৪১৪	৭	শাগুনিকেতন	শান্তিনিকেতন
৪১৭	৩৬	ভুল যান	ভুলে যান
৪২০	৩৬	পূর্বাহ্কে	পূর্বাহ্ণে
৪২৩	২১	Clery thrugehout	Chergy throught
৪২৩	৩৪	Chrittisnity	Christianity
৪৪৪	১২	revolutsionist	revolutionist
৪৫২	৭	Befor	Before
৪৫২	১২	bred	bread
৪৬১	৩১	বক্তৃতায়	বক্তৃতায়
৪৭৫	৫	মুহর্তে	মুহূর্তে
৪৮০	১৯	স্রাষ্ট মন্ত্রী	স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী